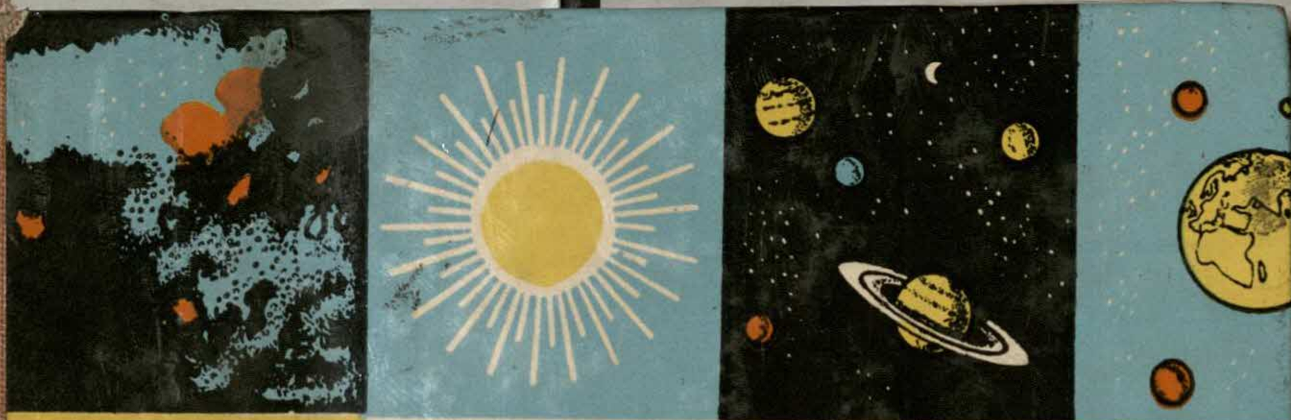




ছোটদের বিশ্বকোষ

চতুর্থ খণ্ড



মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩



ছোটদের

বিশ্বকোষ

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

চতুর্থ খণ্ড
তৃতীয় সংস্করণ—১৯৮৫
মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা

মুদ্রক ঃ
শ্রীপ্রাণকুমার মুখার্জী
এস্. অ্যাণ্টুল এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৯১, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

জীবজন্তুর কথা—জলের প্রাণী—তিন রকম—প্ল্যাঙ্কটন—মাছ—মাছের খাবার : মাছের অনুভূতি—মাছ ধরা—চার জাতের মাছ—মাছের শরীর যেন জলে থাকবার জন্তই তৈরি—সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে বড়—কয়েকটি অদ্ভুত মাছ—লণ্ঠন মাছ ও অন্যান্য অদ্ভুত মাছ—গোঁয়ারগোবিন্দ মাছ—হাঙর—হাঙরের মুখ—হাঙরের কানকো আর ডিম—হাঙর তার পূর্বপুরুষের স্বভাব পেয়েছে—নানা জাতের হাঙর—মানুষের শত্রু হাঙর, হাঙরের শত্রু মানুষ—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জন্তু—তিমি এক সময়ে ডাঙায় থাকত—জলে বাস করলেও—দু'জাতের তিমি—মোম-তিমি—তিমির বাচ্চা—তিমির শত্রু—তিমি শিকার—দু'টি সত্য ঘটনা—তিমির প্রায়-জাতভাই—অক্টোপাস—মাথা-পায়া জানোয়ার—অক্টোপাসের জাতভাই। ৯৫৩-৯৭৯

ইতিহাসের কথা—ইয়োরোপে রেনেসাঁ—বিপ্লব মানেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম নয়—রেনেসাঁয় ইতালির ভূমিকা—প্রটেস্টান্টদের আবির্ভাব—ভৌগোলিক আবিষ্কার : উপনিবেশের পত্তন—ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস : টিউডর রাজবংশ—এলিজাবেথের রাজত্ব : ইংল্যাণ্ডের স্বর্ণযুগ—স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী বনাম এলিজাবেথ—ইংল্যাণ্ডে স্টুয়ার্ট রাজবংশ, গৃহযুদ্ধ ও এগারো বছরের প্রজাতন্ত্র—আবার রাজতন্ত্র—রাণী অ্যান্ ও তৃতীয় জর্জ—ফরাসী বিপ্লব—নেপোলিয়নের অভ্যুদয়—ভারতে মোগল সাম্রাজ্য—আবার আফগান : এলেন শেরশাহ্—মোগল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আকবর—আকবরের পরে—ঔরংজেব মোগল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনলেন—শিবাজী ও মারাঠা সাম্রাজ্য—বাংলাদেশে ইংরেজের আবির্ভাব—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ : ১৭৬১—কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্র : জ্যাঁ জ্যাক্স্ রুশো—নূরজাহান। ৯৮০-১০০৮

যে গল্প চিরকালের—রাজা গিলগামেসের গল্প—কিউপিড ও সাইকি। ১০০৯-১০১৯

আমাদের শরীরের কথা—যকৃৎ বা লিভার—যকৃতের নানা কাজ—যকৃৎ আমাদের ভীষণ উপকারী ভৃত্য—প্লীহা বা পীলে—অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থি—ইনস্যুলিন—পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড : গ্ল্যাণ্ডদের রাজা—থাইরয়েড গ্রন্থি—অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কথা—নার্ভ বা স্নায়ুতন্ত্র—স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র মস্তিষ্ক বা মগজ—মগজের নানা অংশ—স্বতন্ত্র বা অনৈচ্ছিক নার্ভ। ১০২০-১০২৭

জীবনী-বিচিত্রা—আদবকায়দা—রসরাজ শ'—মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন—আপদ্ আর বিপদ্। ১০২৮-১০৩২

যানবাহনের কথা—সেকালে কি ভাবে জলপথ ব্যবহার করা হ'ত—নৌকোর পূর্বপুরুষ—নানা রকমের নৌকো—পালতোলা জাহাজ—মধ্যযুগের জাহাজ—বাষ্পীয় যানের আগে—বাষ্পীয় জলযানের শুরু কবে থেকে—স্টীমারের এঞ্জিন—নানা ধরনের জাহাজ—ডিজেল এঞ্জিন—আধুনিক যাত্রীবাহী জাহাজ—পারমাণবিক শক্তিচালিত জাহাজ—সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ—জার্মানীর কৃতিত্ব—সাবমেরিনের যন্ত্রপাতি—পেরিস্কোপ্—পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন। ১০৩৩-১০৪৬

ধর্মের কথা—ভারতবর্ষের নানা ধর্ম—বৌদ্ধধর্ম—জৈনধর্ম—শিখধর্ম—মুসলমান আমলে ধর্মপ্রচার—বৈষ্ণবধর্ম—ব্রাহ্মধর্ম—হিন্দুধর্মের নবজাগরণ। ১০৪৭-১০৫৬

বাংলা সাহিত্যের কথা—বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ—রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারা—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারা—রবীন্দ্রনাথের নাটকের ধারা—রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবন্ধের ধারা—রবীন্দ্রযুগে অন্যান্য সাহিত্যিক—

রবীন্দ্রযুগের উপন্যাস : শরৎচন্দ্র—রবীন্দ্রযুগের আর কয়েকজন কথাসাহিত্যিক—রবীন্দ্রযুগের কাব্যধারা—রবীন্দ্রযুগের ছোটগল্প—রবীন্দ্রযুগের নাটক—সমালোচনা-সাহিত্য—শিশুসাহিত্য—রবীন্দ্রযুগ কি এখনও চলছে ? ১০৫৭-১০৮২

পৃথিবীর কথা—ক্রমাগত অদলবদল—পৃথিবীর ভিতরটা ভীষণ গরম—প্রবল চাপ আর গুঁতো-গুঁতি—ভূমিকম্প—ক্রাকাটোয়ার ভূমিকম্প—আদিমযুগের ভূমিকম্প—আগুনে পাহাড় বা আগ্নেয়গিরি—ভূমিকম্পের আর একটা কারণ—মেক্সিকোয় একটি আশ্চর্য ঘটনা—আগ্নেয়গিরির মাথায় জল : ক্যালডেরা—ফল্ট বা চ্যুতি—সমুদ্রের তলায় ভূমিকম্প—ভূমিকম্পের ঢেউ—গরম জলের ঝরণা আর ফোয়ারা। ১০৮৩-১০৯৬

সংস্কৃত সাহিত্যের কথা—পুরাণ সাহিত্য ও তার বৈশিষ্ট্য—পুরাণ কত রকম—পুরাণ কবে লেখা হ'ল—পুরাণের গল্প—গয়াসুরের গল্প—প্রহ্লাদের কাহিনী—সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ—পঞ্চতন্ত্র ও অন্যান্য গল্পগ্রন্থ—পঞ্চতন্ত্রের গল্পের নমুনা : বন্ধুবিচ্ছেদ—আর একটি গল্প : বন্ধুলাভ। ১০৯৭-১১০৬

চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা—প্রথম মেটেরিয়া মেডিকা—প্যারাসেলসুস—যাতে ব্যায়রাম তাতেই সারে—ফার্মাকোলজির সূত্রপাত—জীবাণুর কথা—রবার্ট কখ্—নতুন ওষুধের গোড়াপত্তন—আমাদের ডঃ ব্রহ্মচারী—সাল্‌ফা ড্রাগ্‌স্—পেনিসিলিন আবিষ্কার—আরো আরো অ্যান্টিবায়োটিক। ১১০৭-১১১২

মহাকাশের কথা—অজানা গ্রহ এক্স—বৃহস্পতির পরেই—ধূমকেতুর কথা—ধূমকেতু দেখতে কেমন—হেলির আবিষ্কার—ধূমকেতুর চলাফেরা—ধূমকেতুর লেজটি আসলে কি—ধূমকেতুর আলো—ধূমকেতুও ভেঙ্গে যায়—পারিবারিক ধূমকেতু—উল্কার কথা—উল্কাপাত কি ক'রে হয়—উল্কাপাতের পরে—উল্কাপিণ্ড—নানা ধরনের উল্কাপিণ্ড—অতিকায় উল্কাপিণ্ড—আদ্যিকালের উল্কাপাত—উল্কাবৃষ্টি—উল্কাপাত যদি দেখতে চাও—সৌর জগতের বাইরে—নক্ষত্রেরা কত দূরে আছে—নক্ষত্রের আলো, তাপ, রং—চার জাতের নক্ষত্র—যমজ নক্ষত্র—ছায়াপথ : গ্যালাক্সি—তারাপুঞ্জ বা রাশি—রাশিচক্র—নক্ষত্র চেনা—সপ্তর্ষি নাম কেন—ধ্রুবতারা কি সত্যিই অচল—কালপুরুষ—কালপুরুষের আশেপাশে। ১১১৩-১১৪১

ভাষা ও লিপির কথা—ছাপাখানার জন্মকথা—কি করে ছাপা হয়—চীন দেশ পথ দেখাল—সহস্র বুদ্ধ গুহায়—ডায়মণ্ড সূত্র—ব্লক আর টাইপের সুবিধা-অসুবিধা—গুটেনবার্গের চলন্ত টাইপ—কি করে সম্ভব হ'ল—গুটেনবার্গ কে ছিলেন—দেশে দেশে ছাপাখানা ছড়িয়ে পড়ল—ভারতে ছাপাখানার আবির্ভাব—বোম্বাই-মাদ্রাজ-তাঞ্জোর—চালস্ উইলকিন্স—প্রথম বাংলা ছাপা বই—উইলিয়াম কেরী ও তাঁর ছাপাখানা—শ্রীরামপুরে ছাপাখানা বসল—পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর—শ্রীরামপুরে কাগজেরও কারখানা। ১১৪২-১১৫১

বিশ্বসাহিত্যের কথা—স্প্যানিশ ও পোর্তুগীজ সাহিত্য—স্প্যানিশ সাহিত্যে রেনেশাঁসের প্রভাব—ডন কুইক্সোট বা ডন কিহোটি—অষ্টাদশ শতাব্দীতে—এ যুগের স্প্যানিশ সাহিত্য—পোর্তুগালের সাহিত্য—জার্মান্ সাহিত্য—অদ্বিতীয় গ্যেটে—শিলার ও গ্যেটের সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যিকেরা—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস—এ যুগের জার্মান্ সাহিত্য—হিটলারের পরে—রাশিয়ান সাহিত্য—আলেকজান্দার পুষ্কিন—রুশ কথাসাহিত্য—নতুন যুগে—ইয়োরোপের অন্যান্য সাহিত্য—সুইৎজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড—নরওয়ে—সুইডেন—ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড—হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম—আমেরিকান সাহিত্য—ইংরেজীই হ'ল আমেরিকার ভাষা—অন্যান্য মার্কিন দার্শনিক, কবি ও ঔপন্যাসিক—নতুন যুগে। ১১৫২-১১৬৬

এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা—আধুনিক যুগের এঞ্জিনীয়ারিং—এঞ্জিনীয়ারিং-এর নানা বিভাগ—বিচিত্র ধরনের কাজ—বিচিত্র ধরনের মালমশলা—ভালো অঙ্ক জানা চাই—শিল্পবিপ্লব ও এঞ্জিনীয়ারিং-এর অগ্রগতি—এঞ্জিনীয়ারিং নানা শাখায় ভাগ হয়ে যেতে লাগল—গাঁথনির মালমশলা—রীন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীট—নানা কাজে যন্ত্রের ব্যবহার—সুড়ঙ্গ কেমন করে বানায়—নানা যুগের নানা সুড়ঙ্গ—সুড়ঙ্গ তৈরিতে বিপত্তি—সেতুর কথা—আরো কয়েক রকম—কয়েকটি বিখ্যাত সেতু—স্টীম এঞ্জিন—ইস্পাত ও সংকর ধাতু। ১১৬৭-১১৮৬

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা—আলাদীনের মায়াপ্রদীপ—এ যুগের যন্ত্রদানব কম্পিউটার—প্রথম অঙ্ক-কষা কল—যোগ করার প্রথম আধুনিক যন্ত্র—ইলেকট্রনিক কম্পিউটার—কম্পিউটার কি ভাবে কাজ করে—বৈদ্যুতিক পাটীগণিত—দু'রকম কম্পিউটার—কম্পিউটার অসাধ্য সাধন করতে পারে—আলো দিয়ে আঁকা ছবি : ফোটোগ্রাফ—ক্যামেরা অবস্কিওরা—কি করে প্রতিচ্ছবিকে স্থায়ী করা যায়—ক্যামেরায় কি করে ছবি ওঠে—ফোটোগ্রাফির প্লেট ও ফিল্‌ম্‌—স্ন্যাপ শট্‌ আর টাইম এক্সপোজার—প্লেট বা ফিল্‌মের গায়ে কি থাকে—ডেভালাপ করা আর ফিক্স করা বলতে কি বোঝায়—নেগেটিভ থেকে পজিটিভ—নানান্‌ ধরনের ক্যামেরা—ফোটো তোলায় নিত্য নূতন উন্নতি—কলির দিব্যচক্ষু—যে ছবি নড়ে বেড়ায়—কি করে সম্ভব—প্রথম সজীব ছবি তোলার চেষ্টা—সত্যিকার চলচ্চিত্র—কি করে সিনেমা দেখানো হয়—নির্বাক্‌ থেকে সবাক্‌ ছবি—কিনেটোফোন—সত্যিকার টকি তুলতে দরকার শব্দের ছবি—টকি কি করে তোলা হয়—টকি কি করে দেখানো হয়—সিনেমা-জগতের কথা—এখন আর ফাঁকি নয়—লোকশিক্ষায় সিনেমা। ১১৮৭-১১৯৪, ১২১৩-১২৩৬

দেশবিদেশের রূপকথা—পোল্যাণ্ডের রূপকথা : কুকুর, বেড়াল আর ইঁদুরের গল্প—এস্কিমোদের রূপকথা : বদ্‌মেজাজি বুড়ো—স্পেন দেশের রূপকথা : চাষার ছেলে ও রাজকন্যা—জাপানী রূপকথা : ভূতে-পাওয়া কেটলি। ১১৯৫-১২০১

চিত্রশিল্পের কথা—ভারতের চিত্রসম্পদ্‌—মধ্যযুগে—মুঘল চিত্রকলা—দক্ষিণ ভারতে—পূর্ব ভারতে কি ছিল—কিসের ওপর আঁকা হ'ত—পূর্ব এশিয়ার চিত্র—চীন থেকে জাপানে—ইয়োরোপের চিত্রসম্ভার—শিল্পে নতুন ধারা—ষোড়শ শতাব্দীর আশ্চর্য সব ছবি—পরবর্তী যুগে—শিল্পে আধুনিক যুগের শুরু। ১২০২-১২১২

সাধারণ বিজ্ঞানের কথা—আলো আসলে কি—কাল্পনিক মাধ্যম ঈথার—আলোর তরঙ্গ সৃষ্টি হয় কি করে—আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে—আলোর নানা ধর্ম—আকাশ কেন নীল—রামন এফেক্ট—শব্দশক্তিও এক রকম তরঙ্গ—গান আর চীৎকার। ১২৩৭-১২৪২

গাছপালার কথা—পাতার আসল কাজ কি—পাতার প্রথম কাজ : সালোক সংশ্লেষ কি করে হয়—সূর্যালোকের ভূমিকা—কার্বন ডাইঅক্সাইডও দরকার—পাতার দ্বিতীয় কাজ : বাষ্পমোচন—পাতার তৃতীয় কাজ : শ্বাসকার্য—পাতার চতুর্থ কাজ : সংবহন—পাতার গায়ে সূক্ষ্ম ছিদ্র—স্টোমাটা—গাছের ফুল—ফুলের বিভিন্ন অংশ—পরাগযোগ—ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ—গাছ কি খায়—যে গাছ পোকামাকড় ধরে খায়। ১২৪৩-১২৬০

মহাশূন্যের পথে—চাঁদে মানুষ নামল : পর পর ছ'বার—লুনোখোদ—চাঁদে তৃতীয় অভিযান—চাঁদে চতুর্থ অভিযান—আরও একবার : পঞ্চম অভিযান—অ্যাপোলো-১৭ অভিযান শেষ করল—গ্রহান্তরে যাবার তোড়জোড়—নক্ষত্রলোকের পথে। ১২৬১-১২৬৮

চতুর্থ খণ্ডের লেখক-পরিচিতি

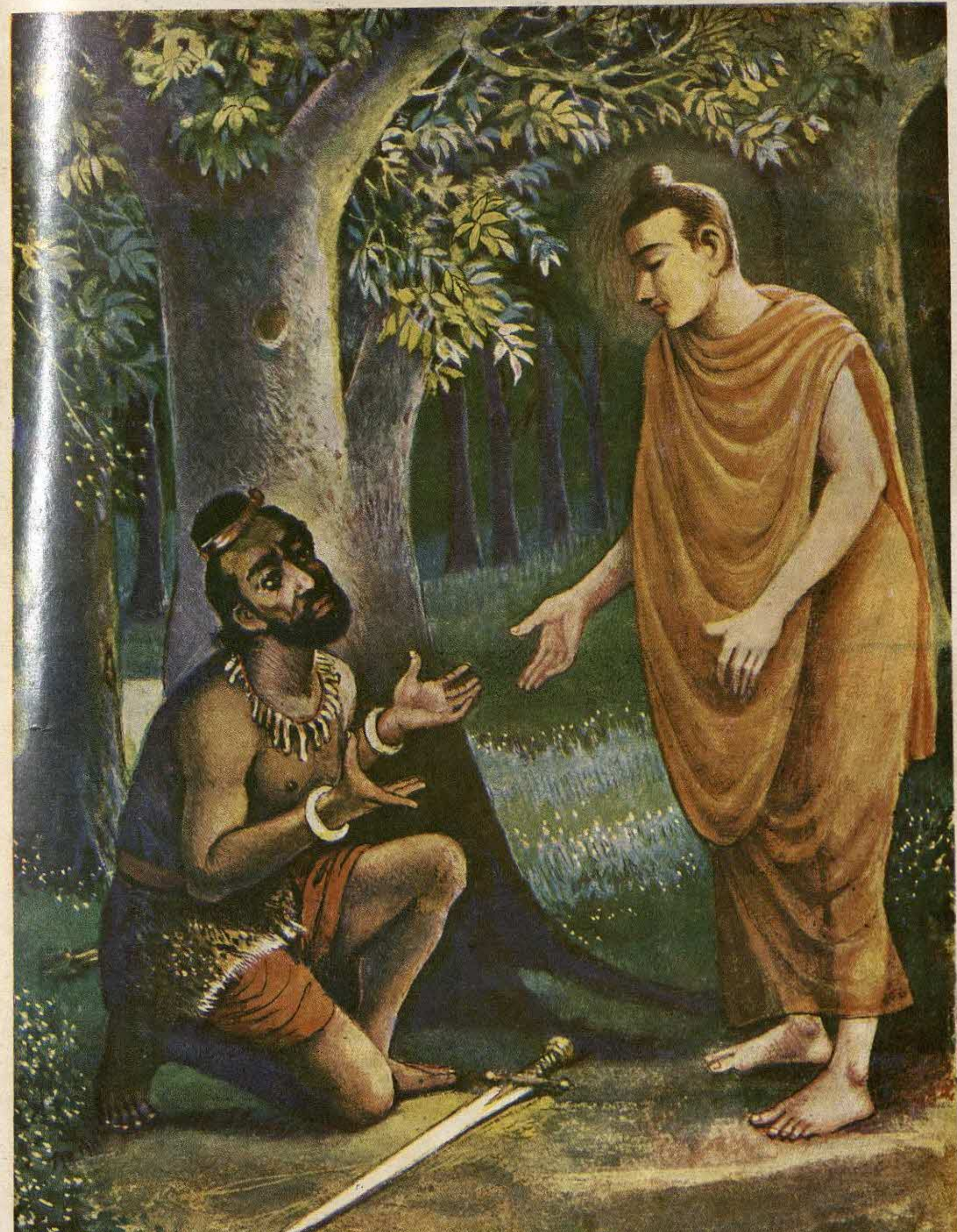
জীবজন্তুর কথা জীবনী-বিচিত্রা পৃথিবীর কথা মহাকাশের কথা বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (দ্বিতীয় অংশ) গাছপালার কথা মহাশূন্যের পথে	**অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্. এস্-সি.** প্রখ্যাত কিশোর-মাসিকপত্র রামধনুর সম্পাদক ও শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক। কলকাতা আশুতোষ কলেজ, যোগমায়াদেবী কলেজ ও বর্তমানে বি. ই. এস্. কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। ছোটদের বহু গ্রন্থ প্রণেতা। সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাস রচনায় খ্যাতিমান্। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে দু'বার (১৩৬৯ ও ১৩৭২) শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সুবর্ণ জয়ন্তী অধিবেশনে শিশুসাহিত্য শাখার উদ্বোধক। শিশু-সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ১৩৭২ সালের ভুবনেশ্বরী পদক ও ১৩৭৮ সালের রণজিৎ-স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত।	
ইতিহাসের কথা	**শ্রীআশিসকুমার রাহা, এম্. এ.** ঐতিহাসিক প্রবন্ধলেখক হিসেবে সুপরিচিত। ভারত সরকারের উচ্চপদে নিযুক্ত।	
যে গল্প চিরকালের	**শ্রীরত্নাবলী চক্রবর্তী, এম্. এ.** শিশুসাহিত্যের লেখিকা হিসেবে সুপরিচিতা। যোগমায়া-দেবী কলেজের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপিকা।	
আমাদের শরীরের কথা চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা	**ডাঃ ননীগোপাল মজুমদার, এম্. বি.** (কলিকাতা) **ডি. সি. এইচ্** (লণ্ডন), **সি-এ. পি.** খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশুচিকিৎসক। কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের শিশুচিকিৎসা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক। বয়স্কাউট-মুখপত্র যাত্রীর প্রাক্তন সম্পাদক। শিশুকল্যাণ পত্রিকার সম্পাদক। শিশুবিচিত্রা বার্ষিকীর অন্যতম সম্পাদক। বহু শিশুগ্রন্থ রচয়িতা ও ঐ সাহিত্যে অবদানের জন্য ভুবনেশ্বরী পদকপ্রাপ্ত।	
যানবাহনের কথা সাধারণ বিজ্ঞানের কথা	**শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি., এ. আই. সি.** শিশুসাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ও গ্রন্থ-রচয়িতা। কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগারের প্রাক্তন গবেষক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-সংগ্রহশালার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য গ্রন্থলেখক হিসেবে ফটিক-স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সম্পাদক।	

ধর্মের কথা	**শ্রীঅচিনারায়ণ ভট্টাচার্য, বি.এ., এল্.এল্-বি., আই-আর-এ-এস্** বড়দের ও ছোটদের সাহিত্যে সুপরিচিত কবি ও লেখক। কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত।
বাংলা সাহিত্যের কথা	**শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত, এম্. এ.** শিক্ষাব্রতী ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থরচয়িতা। দেশবন্ধু মহিলা কলেজের বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ইন্স্টিটিউশনের বাংলা সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক।
সংস্কৃত সাহিত্যের কথা	**শ্রীনীলিমা চক্রবর্তী, বি.এ.** শিশুসাহিত্যের সুপরিচিতা লেখিকা। সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ও ঐ বিষয়ে একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী।
ভাষা ও লিপির কথা	**শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত** প্রকাশনা ও মুদ্রণ-শিল্পে বিশেষজ্ঞ। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ ও বর্তমানে শিশুসাহিত্য সংসদ (প্রাঃ) লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। শিশুসাহিত্য-রচয়িতা হিসেবেও সুপরিচিত। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি।
বিশ্বসাহিত্যের কথা	**শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত** লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। সাধক কবি রামপ্রসাদের বংশধর। প্রাক্তন শিক্ষক ও অধ্যাপক, বিশ্বভারতী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সহকারী। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার প্রাক্তন সহযোগী-সম্পাদক। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ-লেখক হিসেবে খ্যাতিমান্। বহু শিশুপাঠ্য গ্রন্থপ্রণেতা।
এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা	**শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বি.এস্-সি., বি.ই.সি.ই.** (কলকাতা), **এম্. এ.এস্. সি.** (টরেন্টো), **এম্. আই. ই., এম্.এ. ই. ই.** কবি, লেখক ও প্রয়োগবিদ্যা-গ্রন্থপ্রণেতা। কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানিজেশনের প্রাক্তন মুখ্য এঞ্জিনীয়ার। সভাপতি, অ্যাসোসিয়েশন অব্ এঞ্জিনীয়ার্স। সহ-সভাপতি, ইন্স্টিটিউশন্ অব্ স্ট্রাক্চারাল এঞ্জিনীয়ার্স।
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (প্রথম অংশ)	**শ্রীরঞ্জন চক্রবর্তী, বি. ই.** শিশুসাময়িক পত্রে খেলাধূলা ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের লেখক। গেস্ট্ কিন্ উইলিয়াম্স্ প্রতিষ্ঠানে এঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত।

দেশবিদেশের রূপকথা (পোল্যাণ্ডের, এস্কিমোদের ও স্পেন দেশের)	**অধ্যাপিকা শ্রীসুচেতা মিত্র, এম্. এ.** বাংলা সাহিত্যে কবি হিসেবে সুপরিচিতা। শিশুসাহিত্যেও খ্যাতনামা কবি ও লেখিকা। প্রখ্যাত শিশুমাসিক রামধনু পত্রিকার সহযোগী-সম্পাদিকা। জীবনানন্দ ত্রৈমাসিক কবিতা-পত্রিকার সম্পাদিকা (অধ্যাপক শ্রীপলাশ মিত্রের সঙ্গে)। কলকাতা যোগমায়াদেবী কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা।
(জাপানের)	**শ্রীকুমারেশ ঘোষ** সুপরিচিত সাহিত্যিক। শিশুসাহিত্য রচনায়ও সমান দক্ষ। যষ্টিমধু পত্রিকার সম্পাদক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা।
চিত্রশিল্পের কথা	**অধ্যাপক শ্রীসন্তোষ বসু, এম্. এ.** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা-বিজ্ঞানের (মিউজিয়লজি) অধ্যাপক। ভারতীয় চারুশিল্প, লোকশিল্প ও সংগ্রহশালা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর লেখক। প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা।

শিল্পী-পরিচিতি

শিল্প-সম্পাদক	**শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী** লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী। ভারত সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র-পুস্তকের রচয়িতা ও শিল্পী হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত। শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য গ্রন্থরচয়িতা হিসেবে ফটিক-স্মৃতিপদক ও শিশু-সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ভুবনেশ্বরী পদকপ্রাপ্ত (১৩৭৬)। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি।
সহকারী চিত্রশিল্পী	**শ্রীসিতাংশুনাথ সেনগুপ্ত** **শ্রীগৌরাঙ্গনাথ পণ্ডিত** বিশিষ্ট চিত্রকর।



অঙ্গুলিমালের আত্মসমর্পণ



জীবজন্তুর কথা

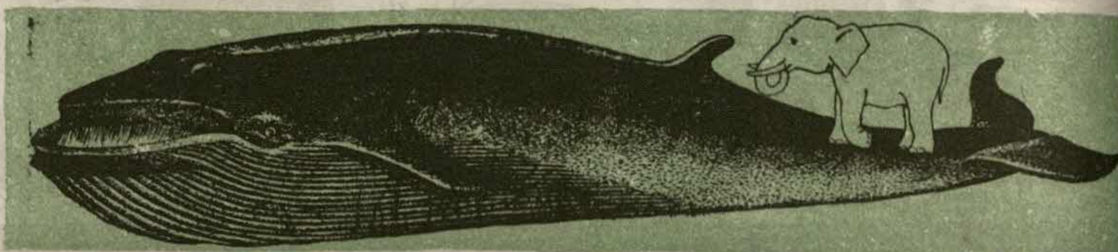
জলের প্রাণী

ডাঙ্গা ছেড়ে এবার আমরা জলচর প্রাণীদের রাজ্যে চলে আসছি। অবশ্য কোন কোন জলচর প্রাণীর কথা ইতিপূর্বেও কিছু কিছু বলা হয়েছে। পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব প্রথম শুরু হয়েছিল জলেই এবং এখনও, মাথা গুণতি হিসেব নিলে দেখা যাবে, জলেই এদের সংখ্যা অনেক বেশি। জল বলতে অবশ্য খাল, বিল, পুকুর, নদী প্রভৃতি স্বাদু বা মিঠে জলকে যেমন বোঝায় তেমনি সমুদ্র বা অতিকায় হ্রদের লোণা জলকেও বোঝায়। তবে পৃথিবীতে লোণা জলের তুলনায় মিঠে জলের পরিমাণ কিছুই না। কাজেই জলচর প্রাণী বলতে আমরা বিশেষ করে সমুদ্রের প্রাণীদের কথাই বুঝি, তাই বিশেষ করে তাদের কথাই বলব।

কত বিচিত্র এই সব প্রাণী! অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া চোখেই দেখা যায় না এমন সব খুদে খুদে প্রাণী থেকে শুরু করে অতিকায় তিমি—যার কোন কোনটা লম্বায় সত্তর-আশি-একশ' ফুট আর ওজনে কম করে আড়াই হাজার-তিন হাজার মণ, অর্থাৎ এক লক্ষ কিলো-গ্রাম বা তারও বেশি! চেহারায়, চালচলনে আর স্বভাবেও কত তফাৎ! কেউ হয়তো নড়তে-চড়তেই পারে না,—জলের তলায় একটা পাথর কি ঐ রকম কিছুর গায়ে গাছের মত নিজেকে আটকে রেখে দেয় চিরকালের জন্য। কেউ আবার বিদ্যুৎগতিতে ছুটে বেড়ায় জল তোলপাড় করে। কেউ থাকে জলের একেবারে ওপরে, কেউ একটু নীচে, আবার কেউ বা বাস করে সমুদ্রের অতল তলায় ঘন অন্ধকারের রাজ্যে, যেখানে সূর্যের আলো ঢুকবার উপায়ই নেই। ডাঙ্গায় আমাদের মাথার ওপর রয়েছে বাতাসের সমুদ্র, সেই বাতাস ওপর থেকে দিবারাত্র চাপ দিচ্ছে আমাদের ওপর। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় পনেরো পাউণ্ড ওজনের চাপ। অথচ আমরা সেই চাপে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছি না, কারণ ঐ চাপ সহ্য করার উপযোগী করেই আমাদের শরীর তৈরি হয়েছে। বলা যেতে

পারে আমরা সে চাপ উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। তেমনি সমুদ্রেও আছে জলের চাপ। যত নীচে নামবে চাপ ততই বাড়বে।

পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে এই সব প্রাণী ছড়িয়ে আছে। বিষুব রেখার কাছাকাছি গরম আবহাওয়ায় যেমন এদের দেখা পাওয়া যায়



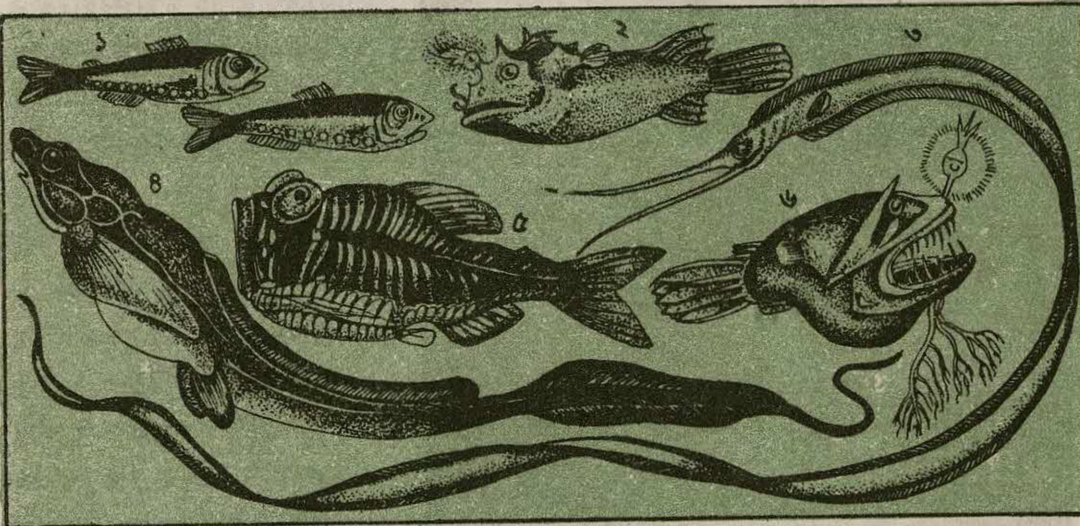
অতিকায় নীল তিমি: একটা হাতির সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে এদের এক-একটা কত বড় হয়

প্রতি ৩৩ ফুটে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড। জলের নীচে যে সব প্রাণী বাস করে তাদেরও শরীর সেই সব চাপ সহ্য করার মত করেই তৈরি। ওপরের দিকে যে সব প্রাণী বাস করে তারা বেশি নীচে নেমে গেলে সেখানকার প্রবল চাপের মধ্যে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে, তেমনি আবার যারা খুব নীচের দিকে থাকে তারা ওপরে উঠে এলে হাল্কা চাপে ফেটেই চুরমার হয়ে যাবে। অবশ্য ওদের অনেকেই জলের তলায় থেকে শরীরের চাপ দরকার মত কিছুটা এদিক্-ওদিক্ করে নিয়ে ওপরে উঠে আসতে পারে বা নীচে নেমে যেতে পারে। কিন্তু গভীর জলের প্রাণী কখনও ওপরে আসে না, তেমনি ওপরদিক্‌কার প্রাণীও গভীর জলের তলায় নামে না। গভীর বলতে কতটা গভীর? আমাদের হিমালয় পাহাড়টা ডাঙ্গা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল (আট কি. মি. এর বেশি) উঁচু। আর সমুদ্রে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে ঐ গোটা হিমালয় পাহাড়টা ডুবিয়ে দিলে সেও কোথায় তলিয়ে যাবে।

তেমনি দেখা যায় ইয়োরোপ, আমেরিকা বা এশিয়ার না-শীত-না-গরম অঞ্চলে। আবার মেরুপ্রদেশের বরফ-জমানো সমুদ্রের নীচে যদি খোঁজ করতে পার তা হলে সেখানেও দেখবে সেই শীতের রাজ্যে জলের তলায় সমুদ্রের প্রাণীরা দিব্যি ভেসে বেড়াচ্ছে।

তিন রকম

প্রাণিবিজ্ঞানীরা সামুদ্রিক জীবদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। জীব বলতে এখানে সামুদ্রিক প্রাণী এবং সামুদ্রিক গাছ-গাছড়াও ধরা হয়েছে। গাছ-গাছড়া বাদ দিয়ে আপাতত আমরা প্রাণীদের কথাই আলোচনা করব। এই তিনটি ভাগ হচ্ছে বেন্‌থস্, নেক্‌টন আর প্ল্যাঙ্কটন। গ্রীক্ ভাষায় বেন্‌থস্ কথাটার মানে সমুদ্রের তলা। যে সব প্রাণী গভীর সমুদ্রের তলায় একটা জায়গায় নড়াচড়া বন্ধ করে স্থির হয়ে পড়ে থাকে তাদেরকেই বলা হয় বেন্‌থস্। অবশ্য শৈশবাবস্থায় এদের কেউ কেউ যে এদিক্-ওদিক্ সাঁৎরে বেড়ায় না এমন নয়, কিন্তু বাকি জীবনটা



১-২। লণ্ঠন মাছ ৩। বৈদ্যুতিক বাণ মাছ ৪। কিম্ভূতকিমাকার চিমেরা ৫। হ্যাচেট্ মাছ ৬। বঁড়শিওয়ালা মাছ

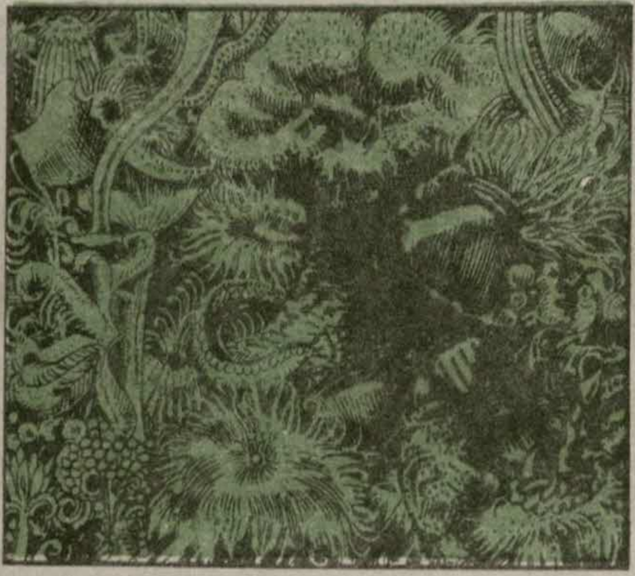
এরা প্রায় ডাঙ্গার গাছের মত একই জায়গায় পড়ে থাকে। ঝিনুক বা অয়স্টার জাতীয় প্রাণী-দের এই রকম স্বভাব। স্পঞ্জও তাই। স্পঞ্জের কথা আমরা আগেই বলেছি (ছোটদের বিশ্ব-কোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৫-৪৪৭)। তারামাছ (স্টার ফিশ্) এবং কোন কোন জাতের কাঁকড়াকেও এদের মধ্যে ফেলা হয়—যদিও সেগুলো একটু-আধটু নড়েচড়ে বেড়ায়। তবে জলে নয়,—জলের নীচেকার মাটি বা বালির ওপর। কেউ কেউ সেখানে গর্ত করেও বাস করে।

যে সব সামুদ্রিক প্রাণী সমুদ্রের জলে ইচ্ছে-মত সাঁৎরে বেড়াতে পারে তাদেরকেই বলা হয় নেক্‌টন। গ্রীক্ ভাষায় কথাটার মানে সাঁতার কাটা। এদেরকেই আমরা সচরাচর সমুদ্রের জলে নড়েচড়ে বেড়াতে দেখতে পাই। এদের মধ্যে আছে অগুণতি মাছ, হাঙ্গর, তিমি, কচ্ছপ, সাপ, অক্টোপাস এবং ছোটবড় আরও নানান জাতের জলজীব।

কিন্তু এদের চেয়েও সংখ্যায় ঢের বেশি হচ্ছে তৃতীয় দল—যাদের বলা হয় প্ল্যাঙ্কটন। প্ল্যাঙ্কটন কথাটাও ঐ রকম গ্রীক—যার মানে ঘুরে বেড়ানো। বাংলায় ভবঘুরে বলা যেতে পারে। তবে এরা যে ঠিক নিজের ইচ্ছায় ঘুরে বেড়ায় তা নয়, সমুদ্রের স্রোত এদের যেদিকে ভাসিয়ে নেয় সেই দিকেই এদের ঘুরে বেড়াতে হয়। প্ল্যাঙ্কটন বলতে আমরা খুব খুদে প্রাণী বুঝি, যদিও গোটা কয়েক অপেক্ষাকৃত বড় প্রাণীও এই দলে আছে। যেমন জেলি ফিশ্। কিন্তু অধিকাংশ প্ল্যাঙ্কটনই এত ছোট যে তাদের খালি চোখে বড় একটা দেখাই যায় না।

প্ল্যাঙ্কটন

প্ল্যাঙ্কটন বলতে কিন্তু ঠিক এক জাতের জীব বোঝায় না। প্রাণী, গাছ এবং প্রাণীর শূককীট,—এমন কি অনেক জীবাণু বা ব্যাক্-টিরিয়াকে পর্যন্ত এদের মধ্যে ফেলা হয়েছে।



সমুদ্রের নীচে রকমারি জলজীব—ঠিক যেন ফুলের বাগান!

চোখে এদের দু'দলেরই কোন কোনটাকে কোন রকমে নজরে আনা যায়, তবে খুব কষ্টে। কিন্তু বেশির ভাগ প্ল্যাঙ্কটনই এদের চেয়ে ছোট। এই সব প্ল্যাঙ্কটনের মধ্যে, আগেই বলেছি, নানা জাতের সামুদ্রিক প্রাণীর শূককীটও থাকে। যেমন ঝিনুক পোকার শূককীট, শামুক পোকার শূককীট, এমন কি অনেক কাঁকড়া বা মাছেরও শূককীট বা সন্থ-ডিম-থেকে-বেরোনো বাচ্চা। আবার মজা, এই সব শূককীটের অনেকগুলিই যখন আসল প্রাণীতে রূপান্তরিত হয় তখন আর তারা প্ল্যাঙ্কটন থাকে না—কেউ বা বেন্থস্, কেউ বা নেক্টনের দলে গিয়ে ভেড়ে।

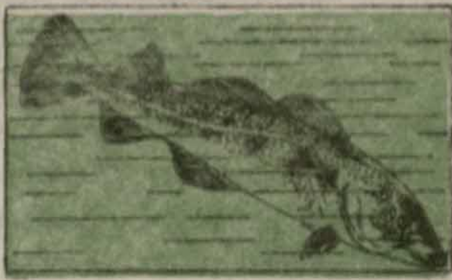
ক্ষুদ্রতম জীব হলেও প্ল্যাঙ্কটন সমুদ্রের একটা বড় সম্পদ্। অধিকাংশ সামুদ্রিক প্রাণীই এদের খেয়ে জীবনধারণ করে, কারণ খুদে হলেও সংখ্যায় এরা অসংখ্য। এই প্ল্যাঙ্কটনরা আবার অনেকে ডায়াটম খেয়ে বেঁচে থাকে। আজকাল আবার বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের মধ্যে খানিকটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে প্ল্যাঙ্কটনদের উপযোগী নানা রকম খাদ্য ছড়িয়ে দিচ্ছেন—যাতে প্ল্যাঙ্কটনরা আরও তাড়াতাড়ি সংখ্যায় বেড়ে যেতে পারে। কারণ প্ল্যাঙ্কটনরা সংখ্যায় আরও বাড়লে অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীরাও তাদের খেয়ে তাড়াতাড়ি পুষ্ট হবে, আর ঐ সব সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে প্রধান হচ্ছে মাছ। কোন কোন

ডায়াটম নামে অতি খুদে উদ্ভিদ্‌রাও এক রকম প্ল্যাঙ্কটন। গাছেদের মতই এই ডায়াটমদের শরীরে ক্লোরোফিল বা সবুজ কণা থাকে। সূর্যের আলো পেলেই ওরা নিজেদের শরীরে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরি করে নিতে পারে। কোন কোন খুদে অ্যালগি বা শ্যাওলা জাতের গাছকেও প্ল্যাঙ্কটন বলা হয় এবং ডায়াটমদের মত তারাও নিজেদের খাবার তৈরি করে নিতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ প্ল্যাঙ্কটনকেই মোটামুটি প্রাণী বলা যেতে পারে। এই সব খুদে প্রাণীরা কিন্তু সবাই এক জাতের নয়—পাঁচমিশেলি প্রাণী ওরা। কোপ্ পড্ নামের ক্রাস্টেশিয়া জাতের প্রাণীরাও যেমন প্ল্যাঙ্কটন, তেমনি অনেক প্রোটোজোয়া জাতের প্রাণীও প্ল্যাঙ্কটন। প্রোটোজোয়াদের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪১-৪৪৫)। খালি

মাছ ২।৩ বছরে যতটা বাড়ে, পর্যাপ্ত খাবার পেলে এক বছরেই ততটা বাড়তে পারে। সুতরাং মাছেদের তাড়াতাড়ি পুষ্ট করতে পারলে মানুষেরই সুবিধে। পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে মাছের চাহিদা তো বড় কম নয়! প্রোটিন, ফস্‌ফরাস, আয়োডিন এবং নানা রকম ভিটামিন—বিশেষ করে ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-ডি,—সুষম খাদ্যের জন্য আমাদের যে সব জিনিস দরকার তার অনেকগুলিই আমরা মাছ থেকে পাই। আর সমুদ্রই হচ্ছে সেই মাছের আসল ভাণ্ডার।

মাছ

সমুদ্রের বাসিন্দাদের মধ্যে মাছের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এই সব মাছ অনেক সময়েই ঝাঁক বেঁধে থাকে এবং এক একটা ঝাঁকে লক্ষ লক্ষ মাছ ঘুরে বেড়ায়। বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, কতকগুলি জায়গায় এক একটা বিশেষ ঋতুতে এই ঝাঁক বিরাট আকার নিয়ে দেখা দেয়, আর সেটাই হচ্ছে ঐ সব মাছ শিকারের আসল সময়। যেমন ধর, এমনি ভাবে এক আটলাণ্টিক মহাসাগরেই প্রতি বছর বেশ কয়েক কোটি হেরিং মাছ ধরা পড়ে। ব্লু ফিশও বড় কম নেই সমুদ্রে। ৬।৭ কোটি তো জেলেরাই ধরে বছর বছর। এ মাছ নাকি খুব সুস্বাদু, ওজনেও এক একটা ১০।১২ কিলোগ্রামের কম হয় না। তেমনি আছে কড্ মাছ। এক ইয়োরোপেই প্রতি বছর ৭।৮ কোটি টন (এক টন হচ্ছে ১০৫০ কিলোগ্রামের কাছাকাছি) কড্ মাছ ধরা পড়ে। এরা আকারে আরও বড়—২০।২৫ কিলোগ্রাম হামেশাই হয়। এ রকম আরও আছে। তার ওপর আছে নদীর বা খাল-বিল-



কড্ মাছ

পুকুরের অর্থাৎ মিঠে জলের মাছ। আমরা তো সে সব মাছই বেশি খাই। রুই, কাৎলা, মৃগেল, ইলিশ, ভেটকি, চিতল, আড়, চাইন থেকে শুরু করে ছোটবড় অসংখ্য জাতের মাছ।

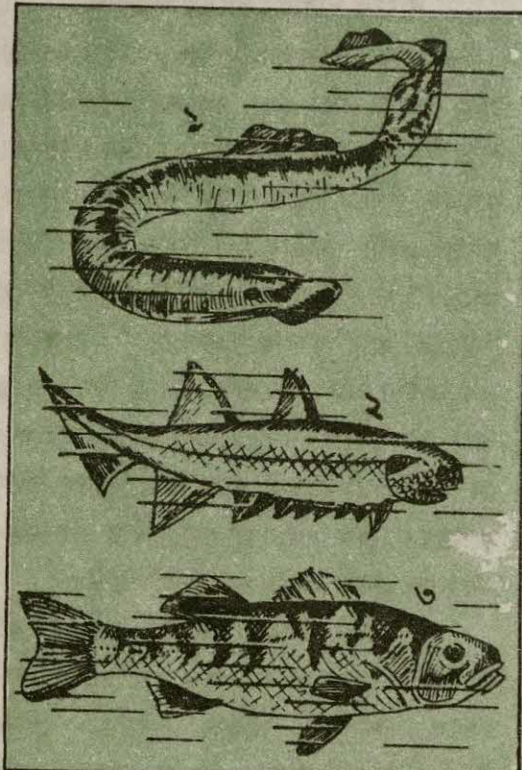
মাছের খাবার : মাছের অনুভূতি

এই সব মাছের প্রধান খাদ্য আবার অন্যান্য ছোট ছোট মাছ এবং এক একটা বড় মাছের খোরাক যোগাতে বহু ছোট মাছের দরকার। কাজেই সমুদ্রে ছোট মাছ কি পরিমাণ আছে তারও একটা মোটামুটি আন্দাজ করা যেতে পারে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে "মাছের মা'র আবার পুত্রশোক!" বাস্তবিক এক একটা মাছ এত বেশি সংখ্যক ডিম পাড়ে এবং তা থেকে এত বেশি বাচ্চা বেরোয় যে কোন মা-মাছের পক্ষে তার হিসেব রাখা অসম্ভব। এক একটা স্ত্রী-হেরিং মাছ এক একবারে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার ডিম পাড়ে।

তাই বলে মাছেরা যে শুধু মাছ খেয়েই জীবনধারণ করে তা নয়। অন্য সামুদ্রিক পোকা-মাকড়, জীবজন্তু—শামুক, ঝিনুক, গেঁড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি অনেক কিছুই খায়। কোন কোন মাছ আবার মোটামুটি নিরামিষাশী—সামুদ্রিক আগাছা খেয়েই তারা খুশি। তবে

প্ল্যাঙ্কটন প্রায় সব মাছেরই খাদ্য এ কথা বলা চলে।

মাছেরা দলছাড়া হয় না কেন এ বিষয়েও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। তাঁদের ধারণা, মাছের দৃষ্টিশক্তি বেশ প্রখর। চোখে দেখে তারা দল চিনে নিতে পারে—জলের নীচেই। কোন কোন মাছ শব্দ করে ডাকতেও পারে এবং ঐ ডাক শুনেই ওরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে। যারা শব্দ করে তারা শব্দ শুনতেও পায় সন্দেহ নেই। জলের মধ্যে কাঁপুনি উঠলেও মাছ তা বুঝতে পারে। এ ছাড়া গন্ধ টের পাওয়ারও ক্ষমতা আছে ওদের। নাকের কাছে যে ছিদ্র আছে তা দিয়ে ওরা নিঃশ্বাস নিতে পারে না কিন্তু গন্ধ শুঁকতে পারে ঠিকই। এ ছাড়া আরও কয়েক রকম উপায়ে ওরা সাড়া দেয়।



বিভিন্ন জাতের মাছ
১। অ্যাগনাথা ২। প্ল্যাকোডার্মি ৩। অস্‌টিকথিস্‌

মাছ ধরা

যে সব জাতের লোক সমুদ্রের ধারে বাস করে তারা মাছ শিকারেও পটু। আমাদের দেশে পুরী, ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলগুলিতে নুলিয়া বলে এক জাতের লোক তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। এরা নানা রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরে নিয়ে আসে। সাধারণত যারা দ্বীপে বাস করে তারাই এ বিষয়ে বেশি দক্ষ। ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এ রকম দক্ষ মৎস্যশিকারী প্রচুর দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারে বোধ হয় জাপানী জেলেরাই সবচেয়ে ওস্তাদ্‌। মাছ ধরার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, বিশেষ ভাবে তৈরি নৌকো আর জাহাজ নিয়ে তারা সমুদ্র চষে বেড়ায় আর লক্ষ লক্ষ মাছ ধরে নিয়ে আসে।

চার জাতের মাছ

বিজ্ঞানীরা মাছেদের চারটি জাতে ভাগ করেছেন। সবচেয়ে পুরোনো মাছ হচ্ছে "অ্যাগনাথা"। কথাটার মানে হচ্ছে যাদের চোয়াল নেই। সত্যি, এই জাতের মাছের মুখে চোয়াল বলে কিছু নেই, ছিলও না,—মুখের মধ্যে শুধু একটা গর্ত। আন্দাজ ৪০ কোটি বছর আগে এরা পৃথিবীতে আসে এবং এদের বেশির ভাগই এখন লোপ পেয়ে গেছে। অল্প যে কয়টি এখনও টিকে আছে তাদের দেখলে ঠিক মাছ বলে মনে হয় না। লম্বাটে চেহারা, গায়ে আঁশও নেই,

বর্মও নেই। সেকালকার অ্যাগনাথাদের গায়ে কিন্তু বেশ মোটা মোটা বর্ম আঁটা থাকত।

দ্বিতীয় দলের মাছকে বিজ্ঞানীরা বলেন "প্ল্যাকোডার্মি"। কথাটার মানে পাতের মত চামড়া। এদের চামড়া দেখে মনে হয় বুঝি কতকগুলো পাত বা প্লেট যুড়ে তা তৈরি। এদের কিন্তু মুখে চোয়ালও ছিল, বর্মও ছিল, এবং পাখনাও ছিল। প্ল্যাকোডার্মরা অবশ্য এখন আর নেই, প্রায় ২০ কোটি বছর আগেই লোপ পেয়ে গেছে। তবে ওরা ওদের চিহ্ন রেখে গেছে ফসিলে।

তৃতীয় দলকে বলা হয় "কন্‌ড্রিক্‌থিস্"। ফসিল থেকে জানা যায় যে এরাও প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল। এদের বংশ কিন্তু এখনও টিকে আছে। হাঙ্গর হচ্ছে এই জাতের মাছ। এদের বিশেষত্ব হচ্ছে, এদের শরীর শক্ত হাড়ের বদলে নরম হাড়,— যাকে ভালো বাংলায় আমরা বলি কোমল অস্থি,—তাই দিয়ে গড়া। ইংরেজিতে এই রকম হাড়কে বলা হয় কার্টিলেজ। কন্‌ড্রিক্‌থিস কথাটার মানেও নরম হাড়।

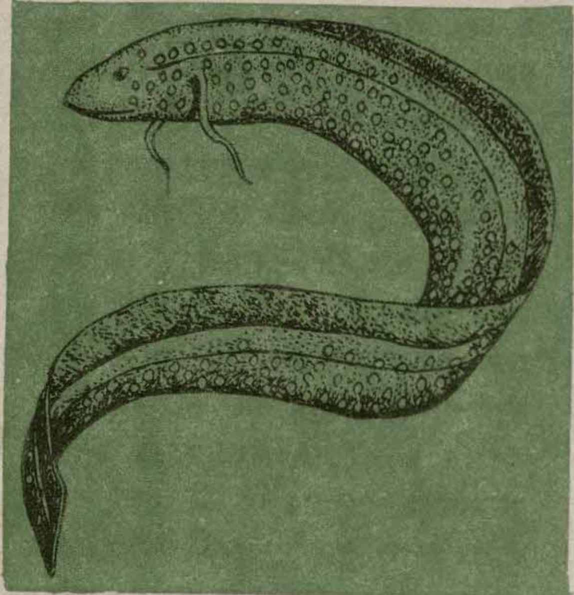
চতুর্থ বা শেষ দলের নাম "অস্‌টিক্‌থিস্"। এরাই হচ্ছে সত্যিকার হাড়ওয়ালা মাছ যা আমরা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই। নামটা এসেছে গ্রীক্ অস্‌টিওন থেকে, যার মানে হচ্ছে হাড়। এই সত্যিকার মাছ দেখা দেয় প্রায় ৩২ কোটি বছর আগে।

মাছের শরীর যেন জলে থাকবার জন্যেই তৈরি

মাছের শরীরের গড়ন দেখলেই বোঝা যায় এরা যেন জলে ঘুরে বেড়াবার জন্যেই তৈরি হয়েছে। শরীরটা লম্বাটে, মাঝখানটা চওড়া, সামনে আর পেছনে ক্রমশ ছুঁচোলো হয়ে গেছে, —বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে 'স্ট্রীম্‌লাইণ্ড্'।

এর ফলে এরা বেশ দ্রুতবেগে জলের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে। চোখ ছ'টো মাথার ছ'পাশে থাকায় এরা একই সঙ্গে ছ'দিক্ দেখে চলতে পারে। আমাদের যেমন হাত-পা, ওদের তেমনি রয়েছে যোড়া যোড়া ডানা বা পাখনা— ছ'পাশে আর পেটের নীচে; তা ছাড়া পিঠের ওপরেও আছে। লেজটিও অন্যান্য জন্তুদের থেকে স্বতন্ত্র। চলবার সময় এই লেজই মাছের হালের কাজ করে। ওরই সাহায্যে ওরা বেঁকতে পারে, এদিক্-ওদিক্ ঘুরতে পারে। মাছের সারা গায়ে আঁশ বসানো। এই আঁশ অনেকটা ওয়াটারপ্রুফ বা বর্ষাতির কাজ করে।

ডাঙ্গার জানোয়ারদের মত মাছের ফুস্‌ফুস্ নেই, তার বদলে আছে কানকো বা ফুলকো, মাথার ছ'দিকে। মাছ হাঁ করে জল দিয়ে মুখ ভর্তি করে নেয়, তারপর সেই জল চলে আসে কানকোয়। শ্বাসকার্যের জন্য যে অক্সিজেন দরকার তা এই জলের মধ্যেই গোলা অবস্থায় থাকে। কানকোর ভিতরে এসে সেই অক্সিজেন চলে যায় রক্তবাহী নলে, তারপর সারা শরীরে; আর নিঃশ্বাসের পরিত্যক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে এসে জলের ভিতর দিয়েই গুলে বেরিয়ে যায়। মাছ বাতাস থেকে সোজা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়তে বা নিতে পারে না, তাই ডাঙ্গায় তুললেই মরে যায়। তবে কোন কোন জাতের মাছ, বিশেষ করে কই মাছ,—যারা নাকি বদ্ধ জলে থাকতে ভালোবাসে,—ডাঙ্গায় উঠেও বেশ খানিকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। তার



ফুসফুস্ মাছ

কারণ ওদের কানকো ছাড়াও একটা অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। এ ছাড়া আর এক জাতের মাছ আছে যাদের বলা হয় লাং-ফিশ্ বা ফুস্ফুস্-মাছ। এদের শরীরে কানকোর সঙ্গে ফুস্ফুস্ও থাকে—যার ফলে ওরা বাতাস থেকেও অক্সিজেন টেনে নিতে পারে। ঈল বা বাণ মাছ আবার তাদের ভিজে চামড়ার ভিতর দিয়েই অক্সিজেন শুষে নেয়।

এ ছাড়া প্রত্যেক মাছেরই শরীরে আছে বাতাস-ভরা থলি—যাকে আমরা বলি পটকা। এই পটকাই মাছকে জলে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

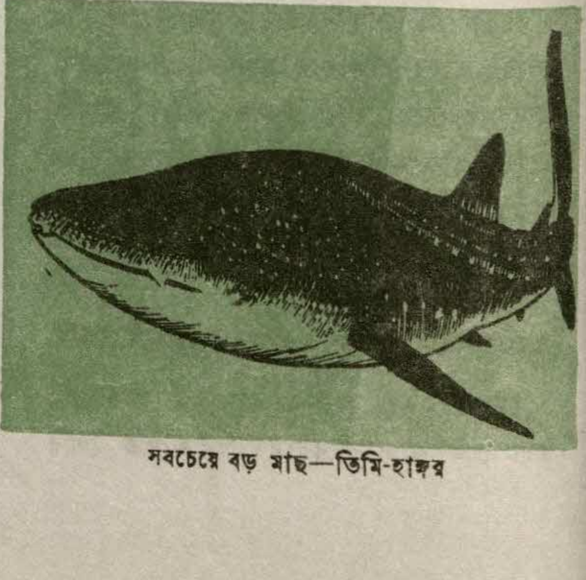
সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে বড়

সবচেয়ে ছোট মাছ দেখতে পাওয়া যায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। নাম পাণ্ডাকা। এদের এক একটা লম্বায় আধ ইঞ্চির বেশি হবে না। ঐ আধ ইঞ্চি শরীরের মধ্যেই ওদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠাসা রয়েছে। তেমনি সবচেয়ে বড় মাছ হচ্ছে 'তিমি-হাঙ্গর' বা হোয়েল-শার্ক। এদের কোন কোনটা লম্বায় ষাট ফুটও (প্রায় ১৮।১৯ মিটার) হয়। পৃথিবীর নানা জায়গায় এদের দেখতে পাওয়া যায়—ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে খুব বেশি। হাঙ্গর বলতে আমরা খুব হিংস্র জানোয়ার বুঝি ; কিন্তু এই তিমি-হাঙ্গরকে মোটেই হিংস্র বলা যায় না। অন্তত মানুষের কোন ক্ষতি করে না ওরা। ছোট ছোট মাছ আর ছোট ছোট সামুদ্রিক জন্তু খেয়েই ওরা খুশি।

সবচেয়ে হাল্কা মাছের নামও এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে—সিগুলেরিয়া। এরা বাস করে প্রশান্ত মহাসাগরে। কত হাল্কা শুনবে? এক কিলোগ্রাম মাছ কিনে যদি গুণতে বস ক'টা হ'ল তা হলেই হয়েছে! গুণে গুণে আর শেষ করতে পারবে না। সওয়া লক্ষ তো বটেই, হয়তো আরও কিছু বেশি।

কয়েকটি অদ্ভুত মাছ

সব রকম মাছের কথা বলতে গেলে সে একখানা বিরাট পুঁথি হয়ে দাঁড়াবে। তাই



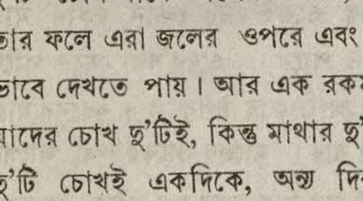
সবচেয়ে বড় মাছ—তিমি-হাঙ্গর

আজ শুধু কয়েকটা মজার মজার **মাছের কথা** বলি শোন।

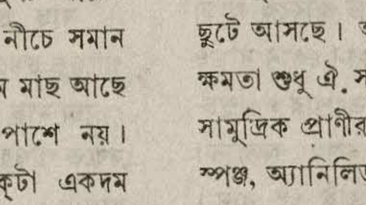
আমাদের পুরাণে আছে **ইন্দ্রের ছিল** হাজারটা চোখ, মহাদেব ত্রিনেত্র। **মা দুর্গারও** তৃতীয় নয়ন কপালে। ব্রহ্মা চতুর্মুখ, তাই তাঁর চোখও আটটি। আর রাবণেরও দশটা মাথা, কাজেই তারও চোখ ছিল কুড়িটা। কিন্তু বাস্তব জগতে কারও দু'টির **বেশি চোখ শুনেছ** কি? অবশ্য পতঙ্গজাতীয় কোন **কোন পোকা**-মাকড়ের একসঙ্গে জড়ানো **অনেকগুলি চোখের** কথা শোনা যায়—যাকে বলে পুঞ্জাক্ষি। যেমন মাছির চোখ। কিন্তু এক রকম মাছ আছে যাদের সত্যিই চারটে চোখ। যখন সাঁতার কাটে তখন দু'টি চোখ থাকে জলের ওপরে, দু'টি নীচে। তার ফলে এরা জলের ওপরে এবং নীচে সমান ভাবে দেখতে পায়। আর এক রকম মাছ আছে যাদের চোখ দু'টিই, কিন্তু মাথার দু'পাশে নয়। দু'টি চোখই একদিকে, অন্য দিক্‌টা একদম ফাঁকা। এর কারণ আর কিছুই না, এই মাছ সর্বদা কাদার ওপর এক দিকে কাৎ হয়ে পড়ে থাকে। কাজেই যে দিক্‌টা কাদায় থাকে সে দিক্‌টায় চোখের কোন প্রয়োজন নেই। আবার একচোখো মাছও আছে—যাদের নাকের ডগায় একটি মাত্র চোখ।

লণ্ঠন মাছ ও অন্যান্য অদ্ভুত মাছ

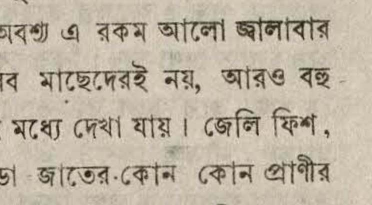
ল্যান্টার্ন ফিশ বা লণ্ঠন মাছ থাকে সমুদ্রের অনেক নীচে। সূর্যের আলো ঢুকতে না পারায় সে জায়গাটা গভীর অন্ধকার। কিন্তু তার জন্য এ মাছের কিছু এসে যায় না, কারণ এদের শরীরের দু'পাশে বোতামের মত সারবাঁধা কতকগুলো টর্চের বাল্‌বের মত জিনিস বসানো আছে। ঠিক জোনাকি পোকার মতই সেগুলো থেকে থেকে জ্বলে ওঠে, আর তারই আলোয় সে মাছ দিব্যি জলের তলা আলোকিত করে ঘুরে বেড়ায়। কোন কোন লণ্ঠন মাছের আবার একটি মাত্র লণ্ঠন সম্বল—সেটা গায়ে লাগানো থাকে না, থাকে মাথার ওপর। দূর থেকে দেখলে মনে হবে বুঝি একটা খুদে এঞ্জিন সার্চ লাইট ফেলে ছুটে আসছে। অবশ্য এ রকম আলো জ্বালাবার ক্ষমতা শুধু ঐ সব মাছেদেরই নয়, আরও বহু সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। জেলি ফিশ, স্পঞ্জ, অ্যানিলিডা জাতের কোন কোন প্রাণীর এ রকম ক্ষমতা আছে। এমন কি অনেক সামুদ্রিক পোকামাকড় (যেমন নক্‌টিলুকা), গাছগাছড়া এবং জীবাণুর মধ্যেও এ জিনিসটা দেখা যায়। এই আলোকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'বায়োলিউমিনিসেন্স'। বাংলায় 'জীবন্ত আলো' বলা যেতে পারে।



ঈল বা বাণ মাছ



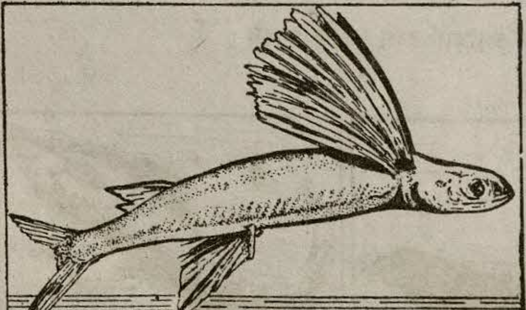
আর এক জাতের ঈল



বৈদ্যুতিক রে মাছ

কোন কোন মাছের আলোর মত বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষমতাও আছে। বৈদ্যুতিক বাণ মাছ, যাকে বলা হয় ইলেকট্রিক ঈল, ইলেকট্রিক ক্যাট্-ফিশ্ বা বৈদ্যুতিক বেড়াল-মাছ প্রভৃতি কতকগুলি জীব এই জাতের। শত্রুকে বৈদ্যুতিক 'শক্' দিয়ে অসাড় করে নিয়ে শিকার করা কিংবা শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ঈল মাছ ৫০০ ভোল্টের বিদ্যুৎও তৈরি করতে পারে। সে রকম বিদ্যুতের একটা শক্ খেলে, মানুষ কেন, অনেক বড় বড় জানোয়ারও ঘায়েল হয়ে যেতে পারে।

জীবজন্তুরা বেশির ভাগই হাঁটবার সময় উপুড় হয়ে চলে। কেবল মানুষ, ক্যাঙ্গারু, পেঙ্গুইন প্রভৃতি অল্পস্বল্প কয়েকটি জীবকে খাড়া হয়ে চলতে দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন মাছও যে খাড়া হয়ে চলে তা ভাবতে পার? সূচ-মাছের (নীড্ল্ ফিশ) এই রকম অভ্যাস। শরীরটা সূচের মত লম্বা কিনা, তাই এই নাম। আবার মজা, চলবার সময় এদের মাথাটা থাকে নীচের দিকে, লেজটা ওপরের দিকে। যোগীন সরকারের সেই 'মজার দেশ' কবিতাটা পড়েছ তো? অনেকটা সেই রকম আর কি!



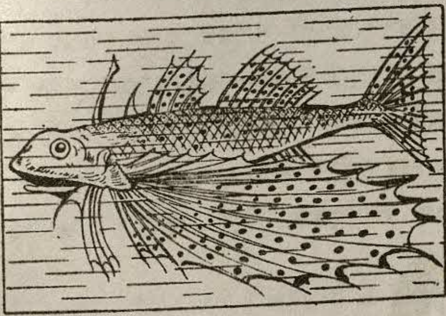
উড়ুক্কু মাছ

কোন কোন মাছ আবার উড়তে পারে, তা জান কি? এদের বলা হয় উড়ুক্কু মাছ (ফ্লাইং ফিশ্)। অবশ্য উড়ুক্কু বলতে এরা পাখির মত করে উঁচু আকাশে উড়ে যেতে পারে না, তবে ওড়ে ঠিকই। এদের পিঠের ডানা দু'টো অনেকটা পাখির ডানার মত। সেই ডানা ছড়িয়ে এরা জলের ওপর উঠে দশ-বিশ ফুট বা সময় সময় তারও বেশি পথ উড়ে চলে যেতে পারে। কখনও যদি রেড্ সী বা লোহিত সাগরে যাও, আর বরাত ভালো থাকে, দেখবে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ুক্কু মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠে শূন্যে ডানা ভর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এমন কি ঘরের কাছে আন্দামানে যাবার পথেও সমুদ্রে অনেক সময় এদেরকে দেখতে পাওয়া যায়।

মাছ শুধু ওড়েই না, কোন কোন মাছ গাছেও চড়তে পারে। এদের বলা যেতে পারে গেছো মাছ! আফ্রিকার উপকূলে এ ধরনের মাছ দেখতে পাওয়া যায়। মাছের ডাকের কথা আগেই বলেছি। ঐ সব মাছ যখন দল বেঁধে একসঙ্গে হল্লা শুরু করে দেয় তখন মনে হয় কাছাকাছি কোথাও বুঝি হাট বসে গেছে।

রকমারি চেহারায়ও মাছেরা কম যায় না। মুনি-ঋষিদের মত দাড়িওয়ালা তপস্বী মাছের কথাই ধর না কেন, যাকে আমরা চলতি কথায় বলি তপসে মাছ। ওর চেয়েও বড় দাড়ি—একেবারে ছাগলের মত দাড়িওয়ালা মাছও আছে সমুদ্রে। আবার অনেকটা মানুষের মত মুখওয়ালা মাছেরও দেখা পাওয়া গেছে সমুদ্রে, এবং জাহাজ চালাবার সময়ে দূর থেকে তাই দেখে নাবিকেরা মৎস্যকুমারী দেখেছে বলে বড়াই করতেও ছাড়ে নি।

বঁড়শি দিয়ে আমরা মাছ ধরি। কিন্তু কোন কোন মাছ যে বঁড়শি দিয়েই অন্য মাছ ধরে তা ভাবতে পার? এই সব মাছের নাকের ডগায় কিংবা অন্যত্র একটা করে লম্বা ছড়ি বসানো, আর সেই ছড়ির ডগায় থাকে এই বঁড়শি। বঁড়শি বিঁধিয়ে দিয়ে ছোট ছোট মাছকে এরা গেঁথে ফেলে, তার পর তাদের ধরে জলযোগ করে।



এক জাতের বঁড়শি মাছ

পাখিরা ডালপালা দিয়ে বাসা বাঁধে, কোন কোন মাছেরও সে অভ্যাস আছে। স্টিক্‌ল্‌-ব্যাক্ এই ধরনের এক রকম মাছ। জলের ভিতরকার আগাছা থেকে ডালপালা কেটে এনে তাই দিয়ে তৈরি হয় এই বাসা। বাসা যুড়বার জন্য ওরা ব্যবহার করে ওদের শরীর



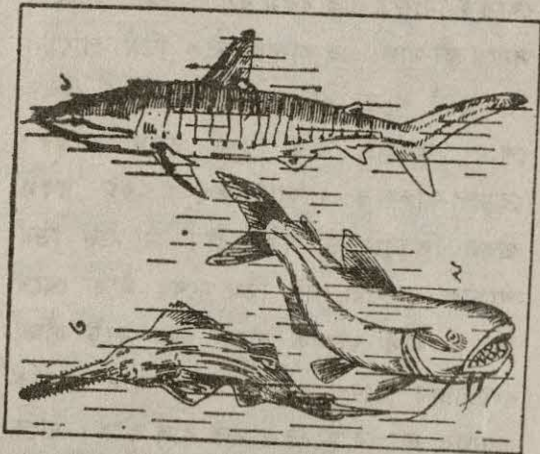
মাছের বাসা

থেকেই নিঃসৃত এক রকম রস। ডিম পাড়বার সময়ে স্ত্রী-মাছ এই বাসায় ঢুকে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনো পর্যন্ত তাকে দেখা-শোনা করবার ভার কিন্তু পুরুষ মাছের। বেড়াল-মাছরাও (ক্যাট্-ফিশ্) এই রকম প্রবল পিতৃস্নেহের অধিকারী। মা-মাছ ডিম পাড়লে বাপেরা সেই ডিম মুখের মধ্যে রেখে দেয়। মাস খানেক বাদে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবার পরেও আরও প্রায় মাস খানেক বাচ্চারা বাপের মুখের মধ্যেই বাস করে। মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসে এদিক্-ওদিক্ ঘুরে বেড়ায়, আবার ফিরে আসে মুখের মধ্যে। তার পর সাবালক হলে পরে তবেই বাপকে ছেড়ে যায়। বাপেরা এই দু'মাস কিছুই খায় না এবং ঐ সময়ের পর স্বভাবতঃই বেশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

বিলেতের স্যামন এবং আমাদের দেশের ইলিশ মাছ সামুদ্রিক মাছ, কিন্তু ডিম পাড়ে এসে নদীতে। মা-স্যামন ডিম পাড়ার আগে লেজ দিয়ে নদীর তলায় মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ডিম পাড়ে।

গোঁয়ারগোবিন্দ মাছ

বেশির ভাগ মাছই চালচলনে মোটামুটি নিরীহ, কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ মাছও কম নেই। যেমন ধর তলোয়ার মাছ,—যাকে ইংরেজিতে বলে সোর্ড ফিশ্। এদের মুখের ওপরের ঠোঁটটা প্রায় ৪।৫ হাত লম্বা, দেখতে ঠিক তলোয়ারের মত। তাতে ধারও তেমনি আর সেটা শক্তও তেমনি। এই তলোয়ার-ঠোঁট নিয়ে সে বাগে পেলেই যে কোন জন্তুকে আক্রমণ করে। বড় তিমিও বাদ যায় না। অসম্ভব তার

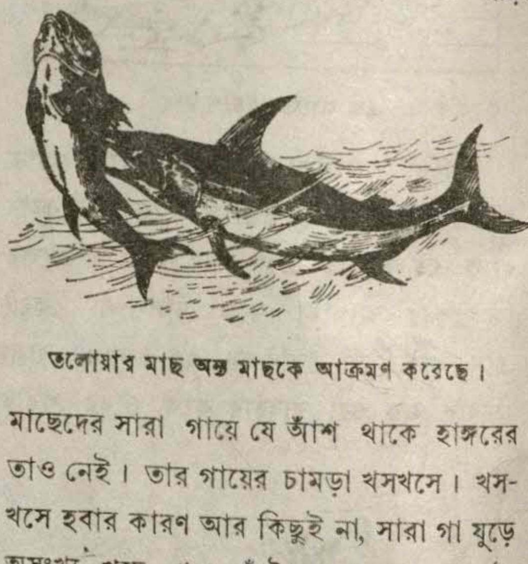


১। বাঘা হাঙ্গর ২। বেড়াল-মাছ ভাবী বাচ্চাদের ডিম মুখে নিয়ে ঘুরছে। ৩। করাত মাছ

শক্তি আর তেমনি প্রচণ্ড তার ঢুঁ। একবার একটা তলোয়ার মাছ একটা জাহাজের গায়ে ঢুঁ মেরেছিল। জাহাজের গা-টা ছিল পেতলে বাঁধানো আর তার পর একফুট পুরু তক্তা। কিন্তু সে সব ভেদ করে সেই তীব্র খোঁচা জাহাজের ভিতরে গিয়ে সেখানকার নাবিকদের জখম করে। কলকাতার যাদুঘরে এই রকম তলোয়ার মাছের গুঁতো-খাওয়া জাহাজের খোলের একটা অংশ সাজানো আছে। যারা দেখ নি, সুযোগ পেলে একবার দেখে এস। করাত মাছের করাতও ঐ রকম একটি লড়াই-এর অস্ত্র, আর সেটাও থাকে তার ঠোঁটে। আর এক রকম মাছ আছে যাদের তলোয়ার নেই, আছে চাবুক, আর সে চাবুক থাকে তাদের লেজে। চাবুকের গায়ে আবার কাঁটা কাঁটা দাঁত। সে চাবুকের একটা বাড়ি খেলে কি অবস্থা হয় ভাবা যায় না। শঙ্কর মাছ এই ধরনের মাছ। কোন কোন মাছ আবার চাবুকের বাড়ির সঙ্গে বিদ্যুতের শক্‌ও ঝাড়তে পারে।

হাঙ্গর

তবে সত্যিকার গোঁয়ারগোবিন্দ মাছ হচ্ছে হাঙ্গর। কিন্তু, আগেই বলেছি, হাঙ্গর ঠিক সত্যিকার মাছ অর্থাৎ অস্‌টিকথিসের মধ্যে পড়ে না—পড়ে কন্‌ড্রিকথিসের মধ্যে। এই জাতের মাছকে বলা হয় কোমল-অস্থি মাছ। কোমল-অস্থি কাকে বলে জান তো? আমাদের কানের হাড় বা নাকের হাড় দেখেছ তো? অন্য জায়গার হাড়ের মত মোটেই শক্ত নয়। এগুলিই হ'ল কোমল-অস্থি বা কার্টিলেজ। হাঙ্গরের শরীরে শক্ত হাড় নেই। সবটাই এই রকম **কার্টিলেজ** দিয়ে তৈরি। তা ছাড়া

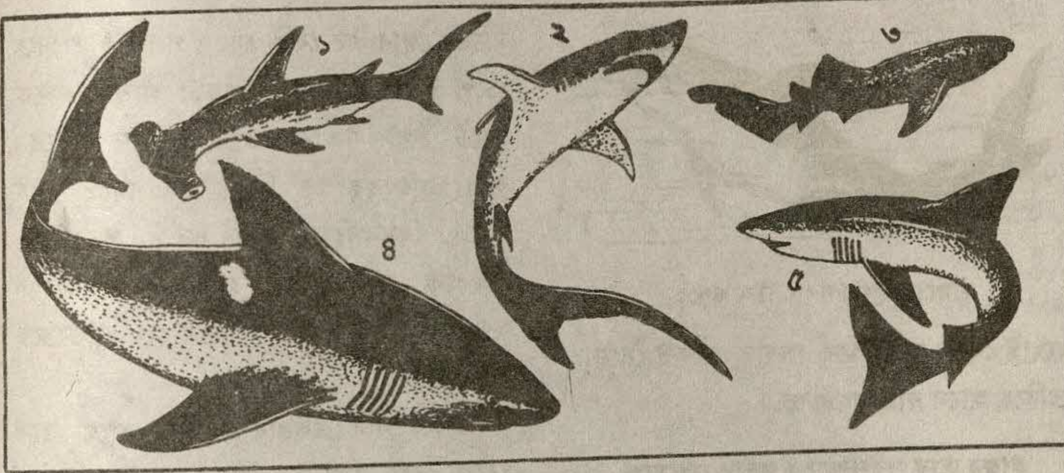


তলোয়ার মাছ অন্য মাছকে আক্রমণ করেছে।

মাছেদের সারা গায়ে যে আঁশ থাকে হাঙ্গরের তাও নেই। তার গায়ের চামড়া খসখসে। খস-খসে হবার কারণ আর কিছুই না, সারা গা যুড়ে অসংখ্য খুদে খুদে কাঁটা বসানো—অনেকটা শিরিস কাগজের মত। আর, বলতে কি, হাঙ্গরের চামড়া ব্যবহারও করা হয় উঁচুদরের শিরিস কাগজ হিসেবে—পালিশের কাজে।

হাঙ্গরের মুখ

হাঙ্গরের মুখটাও ঠিক সাধারণ মাছের মত নয়। মুখটা বসানো থাকে নীচের দিকে—বুকের



নানা জাতের হাঙ্গর

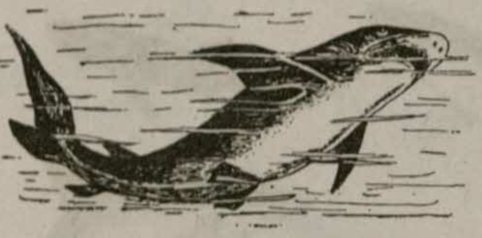
১। হাতুড়ীমুখো হাঙ্গর ২। শেয়াল হাঙ্গর ৩। ধাত্রী হাঙ্গর ৪। অতিকায় সাদা হাঙ্গর ৫। নীল হাঙ্গর

ওপরে, গলার কাছে। তাতে সারি সারি ছ'পাটি দাঁত। মুখের এই রকম গড়নের জন্য হাঙ্গর শিকারকে সোজাসুজি গিয়ে কামড়াতে পারে না, কামড়াতে হলে তাকে আগে একটু কাৎ হয়ে নিতে হয়। অভিজ্ঞ ডুবুরি এ কথা জানে এবং এও জানে যে সেই মুহূর্তে ডুব দিয়ে যদি হাঙ্গরের পেছন দিকে চলে যাওয়া যায় তা হলে ওর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব নয়। আর হাতে যদি একটা ছোরা থাকে তা হলে ঐ সময় তা দিয়ে হাঙ্গরকে ঘায়েলও করে দেওয়া যেতে পারে।

সব হাঙ্গর দেখতে এক রকম নয়। কারো মুখ মৃগেল মাছের মত লম্বা, কারো বা থ্যাবড়া। আবার এক রকম হাঙ্গর আছে যাদের মাথাটা দেখলে মনে হবে, মাথা তো নয়, যেন একটা বিরাট হাতুড়ী। হাতুড়ীর ছ'মাথায় ছ'টি চোখ। এই জাতের হাঙ্গরকে বলা হয় হাতুড়ীমুখো হাঙ্গর। ভারি মজার, নয় কি ?

হাঙ্গরের কানকো আর ডিম

সত্যিকার মাছের সঙ্গে হাঙ্গরের চেহারায় তো বটেই, স্বভাব এবং চালচলনেও বেশ খানিকটা পার্থক্য আছে। মাছের মাথার নীচে এক-এক দিকে কেবল একটা করে কানকো, কিন্তু হাঙ্গরের কানকো এক-এক দিকে ৫।৬টা করে। তা ছাড়া মাছের মত তার পটকাও নেই। সাধারণ মাছ ডিম পাড়ে থোকা থোকা—এক একটা থোকায় হাজার হাজার ডিম, যার প্রত্যেকটি থেকেই একটি করে মাছের ছানা জন্মাতে পারে। হাঙ্গর কিন্তু এক সঙ্গে অত ডিম পাড়ে না—তার ডিমের সংখ্যা সামান্য, আর ডিমও থাকে চৌকো চৌকো থলির মধ্যে। থলি থেকে লম্বা লম্বা সুতোর মত কতক-গুলি জিনিস ঝুলতে থাকে আর সেগুলিই সমুদ্রের আগাছার সঙ্গে ডিমকে আটকে রাখে, ভেসে যেতে দেয় না। আবার কোন কোন জাতের মা-হাঙ্গরের ডিম হাঙ্গরের পেটে



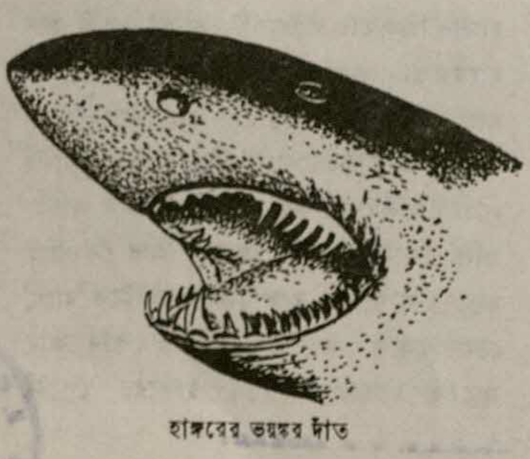
হাঙরের মুখটা গলার ঠিক ওপরে

মধ্যেই থেকে যায় আর সেখান থেকেই সোজা বেরিয়ে আসে হাঙরের বাচ্চা।

হাঙর তার পূর্বপুরুষের স্বভাব পেয়েছে

হাঙর বেশ বড়সড় জন্তু কিন্তু এক সময়ে সে আরও বড় হ'ত। আদ্যিকালের হাঙরের যে সব ফসিল পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় যে ৭০, ৮০, এমন কি ১০০ ফুট লম্বা হাঙরেরও অভাব ছিল না সে যুগে। এই সব হাঙরের যে সব দাঁত পাওয়া গেছে তার কোন কোনটা লম্বায় ৫।৬ ইঞ্চি আর তাতে করাতের মত ধার। কাজেই সে হাঙর যে কি রকম হিংস্র ছিল তা আন্দাজ করা কঠিন নয়।

পূর্বপুরুষের সেই ভয়াবহ দাঁত এখনও বহু হাঙর উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। এই



হাঙরের ভয়ঙ্কর দাঁত

দাঁতের জোর এত বেশি যে দু'পাটি দাঁত দিয়ে চেপে এক কামড়েই সে একটা আস্ত মানুষকে কেটে দু' টুকরো করে ফেলতে পারে। আর, হাঙরের মত হিংস্র জন্তু সমুদ্রে কমই আছে। যেমন হিংস্র তেমনি ধূর্ত। ইংরেজিতে হাঙরকে বলে শার্ক। হাঙরের ঐ স্বভাবের জন্য শার্ক কথাটার মানেই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ধূর্ত শয়তান।

হাঙর যদি একবার পেছনে লাগে তবে সহজে তার নিষ্কৃতি নেই। সমুদ্রের ওপর বিশালকায় জাহাজ চলেছে, দিনের পর দিন হাঙর তার পিছু পিছু চলবে। এক-আধ দিন নয়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে দেখা যাবে সে সমানে সাঁতরে চলেছে শিকারের লোভে। মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নেই। আমার এক আত্মীয় একবার আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে জাহাজে কলকাতা আসছিলেন। একটি হাঙর তাঁদের পিছু নেয় এবং আন্দামান থেকে কলকাতার কাছাকাছি পর্যন্ত সমানে জাহাজের পিছু পিছু চলে আসে।

নানা জাতের হাঙর

তাই বলে সব হাঙরকেই হিংস্র বললে ওদের ওপর অবিচার করা হবে। যেমন সাপ মাত্রই বিষধর নয়, তেমনি হাঙর মাত্রই হিংস্র নয়। বিজ্ঞানীরা প্রায় আড়াইশ' জাতের হাঙরের সন্ধান পেয়েছেন, এদের মধ্যে অর্ধেকের ওপরই নিরীহ প্রকৃতির। তারা ছোট ছোট মাছ ছাড়া আর কারো ওপর বড় একটা অত্যাচার করে না। ছোট ছোট জন্তুদের আক্রমণ তাকে করতেই হয়, কেন না সে হচ্ছে পুরো-

পুরি মাংসাশী প্রাণী। তবে বাকিরা এ ত্রুটী সুদে-আসলে পুষিয়ে নিয়েছে এবং মানুষের রক্তমাংসের ওপরেও তাদের সমান লোভ।

হাঙ্গরকে বড়সড় জানোয়ার বলেছি। ৫।১০ ফুট থেকে শুরু করে ৪০।৫০ ফুট পর্যন্ত.লম্বা হাঙ্গর প্রচুর দেখা যায়। তবে সবচেয়ে বড় জাতের হাঙ্গর হোয়েল-শার্ক বা তিমি-হাঙ্গর লম্বায় ৬০ ফুট পর্যন্তও হতে দেখা গেছে। এদের চেহারার মধ্যে একটু তিমি-তিমি ভাব আছে। তিমির মতই বিরাট মাথা, তবে দাঁতগুলো চোখা চোখা হলেও ভীষণ ছোট। সুতরাং তা দিয়ে ছোট ছোট জন্তু ছাড়া বড় জন্তু খাওয়া খুবই অসুবিধাজনক। কাজেই মানুষ নির্ভাবনায় এদের সামনে যেতে পারে, মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে না ওরা। কিন্তু এর উল্টো হচ্ছে সাদা হাঙ্গর। হাঙ্গরদের মধ্যে এরাই বোধ হয় সবচেয়ে দুর্দান্ত প্রকৃতির। মানুষ খাবারও যম। তাই নাবিকেরা এদের নাম রেখেছে 'সাদা শয়তান'। গরম দেশেই এদের বেশি দেখা যায়। আকারেও এরা বেশ বড়—লম্বায় হামেশা ৩০।৪০ ফুট পর্যন্ত হয়।

আর একটি হিংস্র জাতের হাঙ্গর হচ্ছে বাঘা হাঙ্গর বা টাইগার শার্ক। এদের সারা গায়ে বাঘের মত ডোরা কাটা বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এরাও লম্বায় ২৫।৩০ ফুটের কম যায় না। খাবার সম্বন্ধেও কোন বাছবিচার নেই এদের। যে জন্তু কাছে পাবে তাকেই মেরে খাবে, স্বজাতির মাংসেও আপত্তি নেই। গ্রীনল্যাণ্ডেও এক রকম বড় জাতের হাঙ্গর আছে যারা তিমির মাংসের খুব পক্ষপাতী। বাগে পেলেই এরা তিমি মেরে খায় আর ও অঞ্চলটায় তিমিও প্রচুর। আকারে তিমির চাইতে ছোট হলেও তিমির চেয়ে এরা গায়ে অনেক বেশি জোর রাখে।

হাতুড়ীমুখো হাঙ্গরের যেমন মুখের বাহার, তেমনি লেজের বাহার হচ্ছে শেয়াল-হাঙ্গরের, যার অন্য নাম থ্রেশার শার্ক। পঁচিশ ফুট লম্বা জন্তুটির শরীরের অর্ধেকই লেজ আর সে লেজ দেখতে অনেকটা শেয়ালের লেজের মত। সেই বিরাট লেজের ঝাপ্টা মেরে এরা সমুদ্রের জল তোলপাড় করে তোলে। 'থ্রেশ' কথাটার মানে হচ্ছে জোরে ঝাপ্টা বা বাড়ি মারা। সেইজন্যেই এদের নাম দেওয়া হয়েছে থ্রেশার শার্ক। ঝাপ্টা মারার মুখ্য উদ্দেশ্য জলের ঝাপ্টায় ছোট ছোট মাছগুলিকে ভয় পাইয়ে দিয়ে একত্র জড় করা, তারপর তাদের ধরে জলযোগ করা।

নিরীহ স্বভাবের হাঙ্গরের কথা বলতে হলে নার্স শার্ক বা ধাত্রী হাঙ্গরের কথাও বলতে হয়। এরা থাকে ফ্লোরিডা অঞ্চলে এবং প্রায়ই অল্প জলে চলে আসে। তখন ওখানকার লোকেরা, যারা সমুদ্রে স্নান করতে আসে, তারা কেউ কেউ মজা করবার জন্য ওদের পিঠে চেপে বসে আর ঐ অদ্ভুত বাহনে চড়ে অল্প জলে বেশ খানিকটা ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য হাঙ্গর গভীর জলের দিকে ছুটলেই লাফিয়ে নেমে পড়তে হয় এবং ফিরবার সময় সাঁতরেই ফিরে আসতে হয়। কারণ ও হাঙ্গর কারো অনিষ্ট না করলেও পোষা হাঙ্গর নয় তো! ওখানকার সমুদ্রতীরে এ নাকি একটা মজার খেলা।

সব শেষে বলি বাস্কিং শার্ক বা রোদ-পোহানো হাঙ্গরের কথা। ভারি কুঁড়ে এই

হাঙ্গরগুলো, রোদ পোহাবার জন্য প্রায়ই জলের ওপর ভেসে ওঠে। আকারে বেশ বড় হলেও এরাও নিরীহ জাতের হাঙ্গর। নিরীহ না হয়ে উপায়ও নেই। কারণ বিধাতা এদের যে দাঁত দিয়েছেন তাতে কুচো প্রাণী ছাড়া আর কিছু খাওয়ার যো নেই। খাবার সময় হলে তাই এরা মুখ খুলে জলের মধ্যে শুয়ে থাকে আর স্রোতের টানে ভেসে-আসা ছোট ছোট পোকামাকড়, শামুক-ঝিনুক, মরা জীবজন্তুর টুকরো, শ্যাওলা ইত্যাদি ওদের মুখের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। সেই ভেসে-আসা খাবার খেয়েই ওদের খুশি থাকতে হয়।

মানুষের শত্রু হাঙ্গর, হাঙ্গরের শত্রু মানুষ

হাঙ্গর যেমন মানুষ মারে, মানুষও তেমনি হাঙ্গর মারতে কম ওস্তাদ্ নয়। এর কারণ প্রথমত হাঙ্গরের মাংস। মানুষ সর্বভুক্, মাছ যদি খেতে পারে তবে হাঙ্গরই বা খাবে না কেন ? হাঙ্গরের চামড়াও মানুষের নানা কাজে লাগে। ও দিয়ে ভালো ব্যাগ্ হয়, শিরিস কাগজ তৈরি হয়। হাঙ্গরের ডানায় পাওয়া যায় উৎকৃষ্ট জিলেটিন। এই সব কারণে প্রতি বছর মানুষের হাতেই প্রায় লক্ষ হাঙ্গরকে প্রাণ দিতে হচ্ছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জন্তু

মাছের কথা ছেড়ে এবার জলের অন্য প্রাণী-দের কথায় আসা যাক। প্রথমেই মনে আসছে তিমির কথা, কারণ অত বড় জন্তু পৃথিবীতে আর একটিও নেই। বিজ্ঞানীরা বলেন, শুধু নেই নয়, কোন দিন ছিলও না। আগেকার দিনে সরীসৃপ যুগের অতিকায় ডাইনোসররা আকারে খুবই বড় হ'ত বটে কিন্তু তারাও বর্তমান যুগের নীল তিমির মত বড় হ'ত না। এক একটা নীল তিমি ৭০।৮০ ফুট হামেশাই হয়। একবার একটা একশ' ফুট লম্বা নীল তিমিও ধরা পড়েছিল। সেটার ওজন ছিল প্রায় ছ'হাজার মণ, অর্থাৎ ২১৪ টনেরও বেশি। তার মুখটা এত বড় ছিল যে তার মধ্যে সাড়ে তিনশ' জন ছোট ছোট ছেলেকে অনায়াসে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়।

তিমিকে অনেকে মাছ বলেন। দেখতে অনেকটা মাছের মতই বটে, কিন্তু আসলে ওরা মাছ নয়, ও জাতেরই কেউ নয়। তিমি হচ্ছে স্তন্যপায়ী জীব, অর্থাৎ ওদের বাচ্চারা আমাদের মতই মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়।

তিমি এক সময়ে ডাঙ্গায় থাকত

জলে বাস করলেও তিমি নাকি এক সময়ে ডাঙ্গাতেই বাস করত। তখন ওরাও ছিল চতুষ্পদ জন্তু। তারপর ধীরে ধীরে কেন এবং কেমন করে ওরা ডাঙ্গা ছেড়ে জলে চলে এল সে একটা রহস্য বলা যেতে পারে। তা এ রকম তো আরও কিছু কিছু জানোয়ার ডাঙ্গা ছেড়ে পুরো-পুরি জলে এসে বাসা বেঁধেছে। যেমন কুমীর, সামুদ্রিক কচ্ছপ ইত্যাদি। জলে বাস করতে হলে শরীরটাও সেই রকম জলের উপযোগী হওয়া চাই। ক্রমবিকাশের ফলে তিমিদেরও তাই হয়েছে। তার পেছনের পা অপ্রয়োজনে খসে গেছে (যদিও তার চিহ্ন এখনও তিমির গায়ে দেখতে পাওয়া যায়), সামনের পা দু'টি পরিবর্তিত হয়েছে পাখনায়। দেহটিও মাছের মত ছুঁচোলো হয়ে গেছে। ঐ রকম চেহারা হলে জলে চলাফেরা করতে খুবই সুবিধে হয় কিনা !

কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিমির পূর্ব-পুরুষরা ৫০ লক্ষ থেকে এক কোটি বছর আগেও ডাঙ্গায় বাস করত। তবে তার অনেক আগেই ওদের কেউ কেউ যে জলে বাসা বেঁধেছিল তাতে সন্দেহ নেই। আদিম সামুদ্রিক তিমি, পণ্ডিতেরা যার নাম দিয়েছেন জিউগলোডন্ট, প্রায় সাড়ে চার কোটি বছর আগে সমুদ্রে বাস করত বলে জানা গেছে। এদের মুখের গড়ন এবং চোয়াল ডাঙ্গার মাংসাশী প্রাণীদের মতই ছিল। আকারেও এক একটা ৬০।৭০ ফুটের কম হ'ত না।

জলে বাস করলেও···

জলে বাস করলেও তিমি কিন্তু এখনও ডাঙ্গার অনেক স্বভাব ছাড়তে পারে নি। ডাঙ্গার জীবদের মত ওদেরকেও ফুস্‌ফুস্ দিয়েই শ্বাসকার্য চালাতে হয়। অবশ্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওরা বহুক্ষণ জলের নীচে থাকতে পারে। আধ ঘণ্টা তো অনেকেই পারে, কেউ কেউ একঘণ্টাও পারে। এমন কি রাইট হোয়েল জাতের তিমিকে একটানা দু' ঘণ্টাও জলের নীচে থাকতে দেখা গেছে। তিমির শরীরে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে সে দরকার হ'লে জলের তলায় প্রায় আধ মাইল নেমে যেতে পারে। কিন্তু তার পরেই তাকে ওপরে উঠে আসতে হয় বাতাস থেকে অক্সিজেন নেবার জন্য। ইতিমধ্যে তার ফুস্‌ফুসে যে জলীয় বাষ্প জমে থাকে তা প্রবল চাপে তরল হয়ে যায় আর নিঃশ্বাস ছাড়বার সময় সেটাই ফিন্‌কি দিয়ে ফোয়ারার মত জলের ওপর ছিটকে যায় ১০।১২ ফুট উঁচু হয়ে। দূর থেকে তাই দেখেই বোঝা যায় ঐখানে তিমি আছে। মহাকবি কালি-দাসের রঘুবংশ কাব্যে আছে—রাম যখন সীতাকে নিয়ে পুষ্পকরথে লঙ্কা থেকে ফিরছিলেন তখন এই তিমির জল ছিটানো তিনি সীতাকে দেখিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিমির এই অভ্যাসের কথা কবি কালিদাসেরও অজানা ছিল না।

স্তন্যপায়ী জানোয়ারদের গায়ের রক্ত গরম হয়, তিমির রক্তও গরম। ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য স্তন্যপায়ীদের গায়ে লোম থাকে। তিমি যখন ডাঙ্গায় থাকত তখন তারও সম্ভবত লোম ছিল, কিন্তু সে লোমও এখন লোপ পেয়ে গেছে; শুধু মুখের সামনে ওপরের দিকে আর নীচের দিকে সামান্য কয়েক গাছা লোম চিহ্নস্বরূপ রয়ে গেছে। বাদ বাকি গা খুব মসৃণ। সেখানে আঁশও নেই, চামড়াও পাৎলা। তা হ'লে তিমি জলের তলায় শরীর গরম রাখে কি করে? সে ব্যবস্থাও আছে। তিমির চামড়ার নীচে আছে একটা পুরু চর্বির আস্তর। অনেক তিমিরই এই আস্তর প্রায় কুড়ি ইঞ্চি পুরু। এই চর্বিই তিমিকে ঠাণ্ডা জলের নীচেও গরম রাখে, সঙ্গে সঙ্গে ওর বিরাট দেহটাকে ভাসিয়ে রাখতেও সাহায্য করে। অবশ্য এ সত্ত্বেও জলের নীচে অনেক সময়েই তিমির শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তাই তাকে ক্রমাগত সাঁতার কেটে কেটে পরিশ্রম করে শরীর গরম রাখতে হয়। অবশ্য শরীরের তাপ রক্ষা করা ছাড়াও এই জমাট চর্বি উপোসের সময় খাদ্যের অভাব থেকে তিমিকে বাঁচিয়ে রাখে। অত বড় শরীরের উপযোগী খাবার সব সময়ে নাও জুটতে পারে—তাই হয়তো এই ব্যবস্থা।

দু' জাতের তিমি

প্রাণিবিজ্ঞানীরা তিমিকে ক্যাটেসিয়া বর্গের মধ্যে ফেলেন। সাইরেনিয়া বর্গের প্রাণী-দের (যেমন, ডুগং) সঙ্গে এদের যথেষ্ট মিল আছে। তিমি নানা রকমের হ'তে পারে—প্রজাতির (স্পিসিস্) হিসেব করলে কম করে ১০০ রকম প্রজাতি আছে তিমির। তবে মোটামুটি তিমিকে আমরা দু'টি বড় বড় ভাগে বা গ্রুপে ভাগ করতে পারি। এক—দাঁতাল তিমি, আর দুই—দন্তহীন তিমি। দাঁতাল তিমিগুলি আকারে একটু ছোট হয়, কিন্তু স্বভাবতই ওরা হিংস্র এবং উগ্র স্বভাবের। দন্তহীন তিমিগুলো অনেকটা নিরীহ।

দাঁতাল তিমিও আবার কয়েক রকমের আছে। কারো কারো শুধু নীচের চোয়ালেই দাঁত থাকে,—যেমন, স্পার্ম হোয়েল বা মোম-তিমি (তিমিকে ইংরেজিতে হোয়েল বলা হয়), কারো বা থাকে মাত্র দু'টি দাঁত। এরা নানা রকম ছোট-বড় সামুদ্রিক প্রাণী ধরে খায়। মাছ, হাঙ্গর, কাটল ফিশ্, অক্টোপাস—কাউকেই বাদ দেয় না। টপাটপ্ ৩।৪টে সীল ধরে খাওয়াও এদের কাছে কিছু নয়। অনেক সময় এরা দল বেঁধে এদের চেয়ে ঢের বড় অতিকায় দন্তহীন তিমিকে আক্রমণ করে। প্রথমেই তাদের ঠোঁট দু'টো টেনে ছিঁড়ে দেয়, তারপর জোট বেঁধে কামড়াতে শুরু করে। কামড় খেয়ে খেয়ে যখন সেটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে তখন তার জিভটা টেনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। তারপর চলে তার মাংস খাওয়া। এই দাঁতাল তিমিদের মধ্যে কতকগুলি আবার দেখতে ভারি অদ্ভুত। গোটা প্রাণীটার তুলনায় তার মাথাটা এত বড় যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি একটা তিমির মুণ্ডুই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসলে কিন্তু সমস্ত প্রাণীটাই দেখতে ঐ রকম।

দন্তহীন তিমিগুলি আকারে অতিকায় এবং মাথাটাও সেই রকম বড়। কিন্তু হলে কি হবে, ওদের গলার ফুটো ভীষণ ছোট। এত ছোট যে একটা ফুটবলও বোধ হয় তার ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে না। তবে এরা কি খায়? কি আর খাবে, ছোট ছোট মাছ কিংবা ঐ রকম ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণী—গেঁড়ি, শামুক, ঝিনুক—এই সবই ওদের খাদ্য। এমন কি খুদে প্ল্যাঙ্কটনও।

দাঁত না থাকলেও এই সব তিমিদের দাঁতের বদলে আছে একটা প্রকাণ্ড চিরুণীর মত হাড়ের ঝালর। গলার ভিতর থেকে ঝুলছে সেটা। এই ঝালরকে বলা হয় 'হোয়েল বোন্'। খাবার সময় ওরা ওদের ঐ বিরাট মুখের মধ্যে যতটা পারে জল টেনে নেয়, তারপর ঐ হোয়েল বোনের ভিতর দিয়ে তা ছেড়ে দেয়। ওর ফলে জলটা সব বেরিয়ে যায় কিন্তু জলের সঙ্গে ভেসে-আসা ছোট ছোট মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী বা আগাছাগুলি ঝালরে আটকে যায়। তখন সেগুলি গিলে ফেলতে আর বাধা কি? কিন্তু কোন বড় জীবজন্তু খাওয়া? না, তা ওদের কপালে নেই।

তিমির মধ্যে সবচেয়ে বড় জাতের তিমি হচ্ছে নীল তিমি তা আগেই বলেছি। এরাও কিন্তু দন্তহীন তিমি, সুতরাং ঐ বিরাট বপু নিয়েও তাকেও ঐ রকম ছোট ছোট খাবার খেয়েই খুশি থাকতে হয়। বড় জাতের অন্যান্য তিমিদের মধ্যে সাদা তিমি, উত্তর আটলান্টিকের

অতিকায় তিমি ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

মোম-তিমি

কিন্তু তিমিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোধ হয় মোম-তিমি বা স্পার্ম হোয়েল। এগুলি দাঁতাল তিমি, কিন্তু তাই বলে আকারে নেহাৎ ছোট নয়। ৬০ ফুট লম্বা মোম-তিমি অনেক সময়েই দেখা যায়। এই তিমির মাথাটা থ্যাবড়া, কিন্তু মস্ত বড়। সেই মাথা ভর্তি রয়েছে মোমের থলি। থলি না বলে চৌবাচ্চা বললেই ঠিক বলা হয়। সেই চৌবাচ্চা বোঝাই মোম। সেইজন্যই ওর নাম মোম-তিমি।



১। মোম-তিমি ২। আর এক জাতের দাঁতাল তিমি
এরা সকলেই ভীষণ হিংস্র

এই মোম তিমির কি কাজে লাগে? বিজ্ঞানীরা বলেন, গভীর সমুদ্রের তলায় প্রবল চাপে শরীরের কোমল অঙ্গগুলিকে সুরক্ষিত রাখা এই মোমের একটা বড় কাজ। তা ছাড়া মারামারি বা লড়াইএর সময় ঐ মোম বা চর্বির কুশান ওর মাথাটাকেও রক্ষা করে সন্দেহ নেই। মারামারি বলছি এইজন্যই যে মোম-তিমি বেশ উগ্র স্বভাবের প্রাণী। এরা বেশ বড় বড়—অনেক সময় অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণী ধরে খায় এবং তখন স্বভাবতই তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। মোম-তিমির একটি জাত-শত্রু হচ্ছে রাক্ষুসে অক্টোপাস। আকারে হাতির মত, আটটা শুঁড়ওয়ালা এই প্রাণী সমুদ্রের এক আতঙ্ক; কিন্তু মোম-তিমির আবার ওরাই হচ্ছে প্রিয় খাদ্য। অক্টোপাসও বাগে পেলে ওদেরকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে রক্ত চুষে খেতে ছাড়ে না। কাজেই সমুদ্রের জলে মোম-তিমি বনাম অক্টোপাস এই দুই মহাকায় দৈত্যের লড়াই যে কী ভীষণ ব্যাপার তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। কোন কোন তিমি-শিকারী সে রকম দৃশ্য দেখেছেনও এবং তার বর্ণনাও দিয়ে গেছেন। অবশ্য আসল লড়াইটা সাধারণত হয় জলের নীচে, বাইরে থেকে তো আর সেটা দেখা যায় না! তবে অনেক মোম-তিমির পেটে ৮।১০ ফুট আকারের (১৫।২০ ফুট শুঁড়ওয়ালা) অক্টোপাসের দেহ পাওয়া গেছে। তেমনি পাওয়া গেছে ১০।১২ ফুট লম্বা আস্ত আস্ত হাঙ্গরের দেহ। বলা বাহুল্য, দু'টি ক্ষেত্রেই, লড়াইয়ের ফাঁকে শত্রুর কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে মোম-তিমি গোটা জানোয়ার-টাকেই গিলে ফেলেছিল সন্দেহ নেই। সুতরাং ৪।৫টা আস্ত মানুষ একসঙ্গে গিলে ফেলা তো ওদের কাছে কিছুই না।

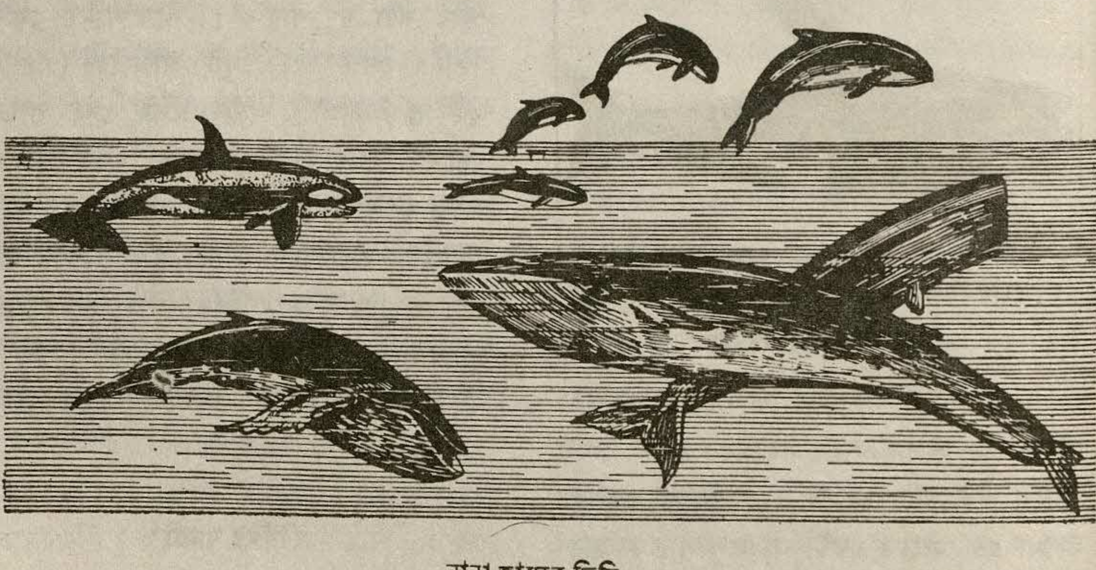
তিমির বাচ্চা

মা-তিমি সাধারণত প্রতি দু'বছরে একবার

করে বাচ্চা দেয়। তিমির বাচ্চা জন্মের সময়েই বেশ বড়সড় হয়ে জন্মায়। নীল তিমির বাচ্চা তো জন্মের সময়েই হয় ২০।২৫ ফুট লম্বা, ওজনে অন্তত ষাট মণ। তারপর দু'বছরের মধ্যেই বাড়তে বাড়তে ৭০ ফুটে গিয়ে দাঁড়ায়। জন্মের পরেই বাচ্চারা সাঁতরাতে শুরু করে আর জলের ওপর ভেসে উঠবার চেষ্টা করে, কেন না কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাকে ওপরে উঠে বাতাস থেকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হবে। তারপর সে মায়ের দুধ খেতে আরম্ভ করে। দুধ খাওয়াবার সময়ে মা-তিমি ঈষৎ কাৎ হয়ে যায়, যাতে বাচ্চা তার বিরাট দেহের চাপে চিপ্‌সে না যায়। এক একটা সদ্যোজাত তিমির বাচ্চারও দিনে অন্তত আড়াই মণ মায়ের দুধ না হলে চলে না। এইভাবে ৬।৭ মাস কাটে। তিন বছর থেকে সাত বছরের মধ্যে তিমির বাচ্চা সাবালক হয়ে ওঠে। তখনই সে দস্তুর মত পূর্ণবয়স্ক জোয়ান,—যদিও তিমি অত্যন্ত দীর্ঘায়ু প্রাণী, ২০০-৩০০, এমন কি ৫০০ বছরও বেঁচে থাকে বলে শোনা গেছে। কারো কারো মতে ওদের পক্ষে হাজার বছর বেঁচে থাকাও অসম্ভব নয়।

তিমির শত্রু

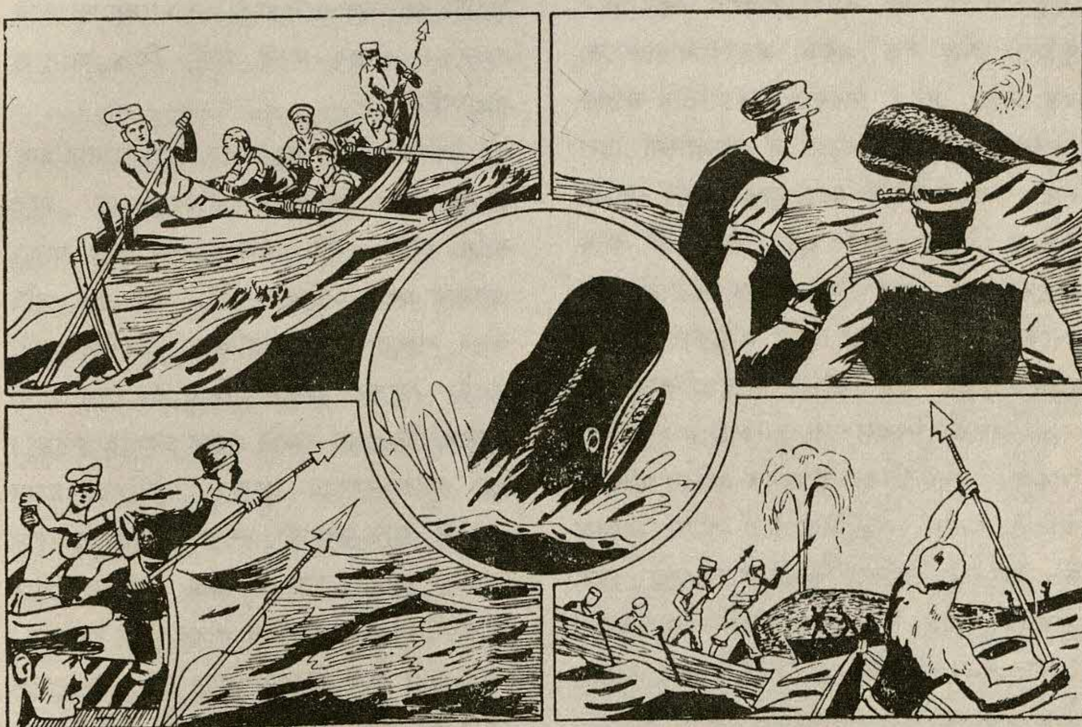
অক্টোপাস, হাঙ্গর প্রভৃতি প্রাণীরা তিমির শত্রু হলেও তিমির সবচেয়ে বড় শত্রু বোধ হয় মানুষ। তিমির শরীরের ঐ বিরাট চর্বির ওপর মানুষের চিরদিনের লোভ। তেমনি লোভ মোম-তিমির মাথার মোমের ওপর। অর্থাৎ বিধাতা যে জিনিসগুলি তিমিকে বর হিসেবে দিয়েছিলেন মানুষের পাল্লায় পড়ে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিশাপ। ঐ চর্বি আর মোমের লোভে আজ পর্যন্ত কত তিমিকে যে মানুষ হত্যা করেছে তার আর লেখাজোখা নেই। তারপর আছে ওর ঐ হোয়েল বোন্‌। সেটিও কম লোভনীয় সামগ্রী নয়। সৌখীন



নানা জাতের তিমি

মানুষের ওটি বড় প্রিয়। মানুষের এই উৎকট শখ মেটাবার জন্যও অনেক নিরীহ স্বভাবের অতিকায় তিমিকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই তিমি-নিধন-পর্ব এক সময়ে এত বেড়ে গিয়েছিল যে প্রাণিবিজ্ঞানীরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন ওদের বংশ বুঝি শীগ্‌গিরই লোপ পেয়ে যাবে। এ বিষয় নিয়ে তাঁরা প্রচুর আন্দোলনও করেছিলেন।

তিমির তেল বা চর্বি দিয়ে কি হয়? তা, বিজ্ঞানীদের হাতে পড়লে অনেক কিছুই হ'তে পারে। সাবান, কৃত্রিম মাখন, কল-কারখানায় যন্ত্রপাতিতে লাগাবার লুব্রিকেটিং অয়েল, পাট, শণ ইত্যাদি থেকে সুতো তৈরি করবার জন্য ব্যাচিং অয়েল ইত্যাদি নানা ব্যাপারে এই চর্বি ব্যবহার করা হয়। মোম-তিমির মোম থেকে হয় মোমবাতি এবং অনেক কিছু রাসায়নিক পদার্থ। সম্প্রতি তিমির শরীরের অন্যান্য অংশও নানা কাজে লাগানো হচ্ছে। ওর চামড়া থেকে তেল পিষে নিয়ে সেই চামড়া দিয়ে তৈরি হচ্ছে বড় বড় থলে, ব্যাগ্, জুতো, বেল্ট ও অন্যান্য চামড়ার জিনিস। হাড় পুড়িয়ে তৈরি হচ্ছে জমির সার, ওষুধ-বিষুধ। বাকি রইল মাংস। আজকাল তারও বেশ চাহিদা। তেলাল বলে সে মাংস নাকি খেতে বেশ সুস্বাদু। আর, একটা তিমি মারলে যে মাংস পাওয়া যায়, তা দিয়ে ৩।৪ হাজার লোককে ভোজ দিয়ে দেওয়া যায়। একটা ছোটখাটো বা মাঝারি আকারের তিমি থেকেই



তিমি শিকার

৩।৪শ' মণ মাংস পাওয়া যেতে পারে। বড় জাতের তিমি থেকে পাওয়া যায় হাজার মণেরও বেশি। ঐ মাংস বায়ুশূন্য টিনে ভরে দেশবিদেশে চালান দিয়ে বেশ ফলাও মাংসের কারবারও চলছে আজকাল।

তিমি শিকার

তিমি শিকার অবশ্য খুব সহজ শিকার নয়, তবে মানুষ বহু দিনে নানাভাবে ঠেকে শিখে এখন সে ব্যাপারেও খুব পোক্ত। আগেকার দিনে নৌকো চড়ে হার্পুন নামে একরকম বল্লম দিয়ে সামনাসামনি তিমি শিকার করা হ'ত। তাতে নানা বিপদ্ ছিল। আহত তিমির লেজের ঝাপ্‌টায় নৌকো উল্টে যাওয়া কিছু বিচিত্র ছিল না। তারপর বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে অত বড় একটা জন্তুকে মারাও তো বড় সহজ নয়! মরবার সময় তিমি জলের ভিতর যে হুটোপাটি করত তা সামলানো ছিল দায়। এখন তিমি ধরার জন্য বিশেষ ধরনের জাহাজ তৈরি করা হয়। হার্পুনও আর বল্লমের মত হাত দিয়ে ছোঁড়া হয় না, দূর থেকে কামানের ভিতর দিয়ে অতিকায় হার্পুন ছুঁড়ে দেওয়া হয় তিমির গায়ে। হার্পুনের সঙ্গে থাকে শিকল বাঁধা—হাজার ফুট লম্বা শিকল। সেই শিকল ইচ্ছেমত গুটিয়ে গুটিয়ে, আবার ছেড়ে দিয়ে বঁড়শিতে গাঁথা মাছের মত খেলিয়ে খেলিয়ে তিমিকে অবসন্ন করে তারপর কাছে টেনে আনা হয়। আজকাল আবার অনেক সময় হার্পুনের মাথায় বিশেষ এক ধরনের মৃদু বিস্ফোরক পোরা থাকে। তিমির গায়ে হার্পুন বেঁধার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও জ্বলে ওঠে আর তিমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখন তাকে টেনে তোলা অনেক সহজ হয়ে ওঠে। তিমি ধরা হলে তার পেটে পাম্প করে বাতাস ভরে দেওয়া হয়। তাতে ওর শরীরটা ফুলে ওঠে আর সহজেই জলের ওপর ভেসে থাকে।

তিমি প্রায় পৃথিবীর সর্বত্রই, যেখানে সমুদ্র সেখানেই, পাওয়া যায়। তবে উত্তর আর দক্ষিণ মহাসাগরই হচ্ছে ওদের আসল আড্ডা। তিমি-শিকারীরা তাই বেশির ভাগ সময়ে সেখানেই পাড়ি দেন।

দু'টি সত্য ঘটনা

তিমির কথা শেষ করার আগে ওদের সম্বন্ধে ২।১টি গল্প বললে হয়তো তোমাদের ভালোই লাগবে। গল্পের মতই বটে, কিন্তু আসলে সত্য ঘটনা।

তিমির জিভ খুব নরম, প্রায় কাদার মত, বিশেষ করে অতিকায় তিমির জিভ। মরে বাসি হ'লে সেটা আরও নরম হয়ে যায়। একবার একটা অতিকায় তিমি ধরে এনে সেটা লণ্ডন শহরে দেখানো হচ্ছিল। তিমির মুখটা একটা বাঁশের ঠেকনা দিয়ে হাঁ করে রাখা হয়েছে, ঠিক যেন একটা গুহায় ঢুকবার দরজা। বহু লোক দেখতে এসেছে। তাদেরই মধ্যে একজন অতি-উৎসাহী দর্শক মুখের ভিতরটা ভালো করে দেখবার জন্য এগিয়ে গিয়ে একেবারে তিমির জিভের ওপর চড়ে বসলেন। আর, সঙ্গে সঙ্গে, চোরাবালিতে পা বসে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি ভাবে তিনি সেই জিভের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগলেন। তাঁর চীৎকারে

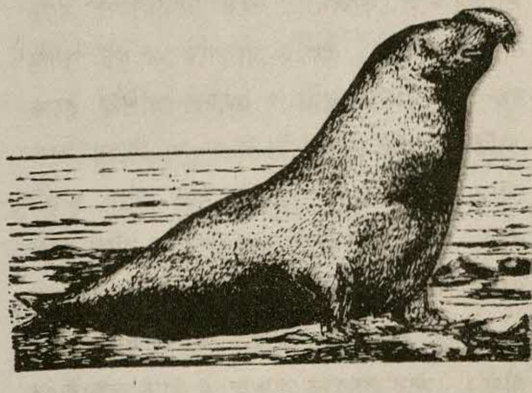
আশপাশের লোকজন ছুটে এসে দড়িকাছি দিয়ে তাঁকে কোন রকমে টেনে তুলল। ততক্ষণে ভদ্রলোকের গলা পর্যন্ত তিমির জিভের মধ্যে ঢুকে গেছে। আর একটু দেরী হলেই তিনি হয়তো তিমির জিভের মধ্যে একেবারেই ঢুকে যেতেন।

আর একবার এক সাহেব ফটোগ্রাফার গেছেন দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি একটা জায়গায় বরফের ছবি তুলতে। একটা জায়গায় খানিকটা জল জমাট বেঁধে বরফ হয়ে গেছে। তিনি সেই বরফের চাঁইটার ওপর উঠে চারদিক্ দেখছেন কোথাকার ছবি তুললে দেখতে ভালো লাগবে, হঠাৎ দেখেন জলের মধ্যে কয়েকটা দাঁতাল তিমি দেখা যাচ্ছে। ভারি মজার ব্যাপার তো! সাহেব উৎফুল্ল হয়ে ভাবলেন, বরফ থাক; এই তিমিগুলোর ফটোই আগে তুলে নি। ছবি তুলবার জন্য যেই তিনি ক্যামেরা বাগিয়ে ধরেছেন অমনি তাঁর মনে হ'ল পায়ের তলার বরফের চাঁইটা যেন অসম্ভব দুলছে। চমকে উঠে দেখেন ইতিমধ্যে আরও অনেক তিমি এসে ভিড় করেছে এবং প্রাণপণে বরফের চাঁইটাকে ঠেলছে। পর মুহূর্তেই চড়্‌চড়্ শব্দ করে বরফের চাঁইটা চৌচির হয়ে গেল। সাহেব দেখেন তিনি একটা ছোট্ট বরফের টুকরোর ওপরে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর চারদিকেই তিমি। তিমিগুলির উষ্ণ নিঃশ্বাসে সেই প্রচণ্ড শীতেও তাঁর গা দিয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করল। এই সময় বরফটা ভাসতে ভাসতে অনেকটা ডাঙ্গার কাছে চলে এল। হঠাৎ তিনি শুনলেন তাঁর সঙ্গীরা ভয়ার্ত কণ্ঠে চীৎকার করছে, "লাফাও—লাফাও, শীগ্‌গির লাফিয়ে পড়।" সাহেব তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হয়ে সামনের দিকে লাফিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে যে বরফটুকুর ওপর তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সেটাও ফেটে ভেঙ্গে পড়ল আর তার পাশে ভেসে উঠল কয়েকটা দাঁতাল তিমির মাথা। সাহেব বুঝলেন, আজ তিনি বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন। তিমিগুলো কৌশলে তাঁকে জলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল। উদ্দেশ্য তো বুঝতেই পারছ।

তিমির প্রায়-জাতভাই

তিমির কথা বলতে গিয়ে তিমির প্রায়-জাতভাই আরও দু'-চারটি প্রাণীর কথা মনে পড়ছে। এদের অনেকেই এক সময়ে পুরোপুরি ডাঙ্গার বাসিন্দা ছিল, ধীরে ধীরে জলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তবে এদের কোন কোনটা ডাঙ্গায় উঠেও ঘুরে বেড়াতে পারে।

প্রথমেই বলতে হয় সীলের কথা। সীলকে আমরা অনেকে তিমির মতই সীল মাছ বলি, কিন্তু সীলেরা মাছ নয়, ওরাও স্তন্যপায়ী। সীল অনেক জাতের আছে। কোন কোনটা,—হাতির সঙ্গে তুলনা করে যাদের বলা হয় হাতি-সীল,—

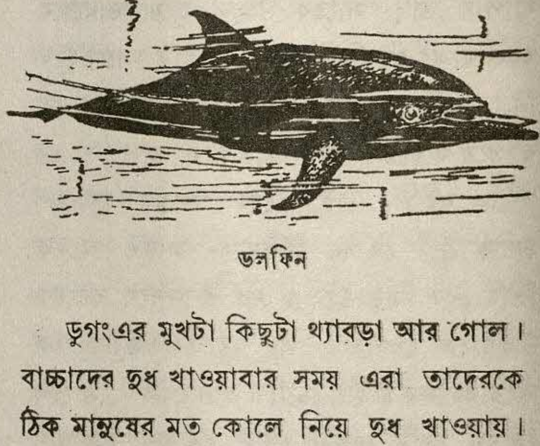


হাতি-সীল

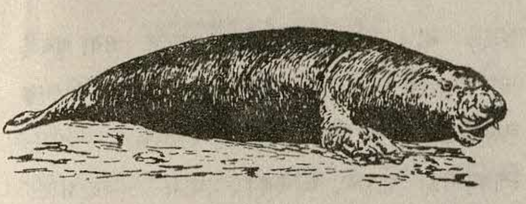
লম্বায় ৩০ ফুট এবং বেড়ে ১৫।২০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। তবে বেশির ভাগ জাতের সীলই আরও ছোট। এদের পেছনের পা দু'টি যুড়ে গিয়ে অনেকটা লম্বা লেজের মত হয়ে গেছে, যার সাহায্যে ওরা সমুদ্রে সাঁৎরাতে পারে। সীলকেও তিমির মত জলের ওপরে উঠে নিঃশ্বাস নিতে হয়, তবে তিমির মতই ওরা অনেকক্ষণ জলের নীচে ডুবে থাকতে পারে। জলে থাকলেও জন্মাবামাত্রই কিন্তু ওরা সাঁতরাতে পারে না। বাচ্চাদের দস্তুরমত সাঁতার শেখাতে হয়। সামনের পা দু'টো দিয়ে ওরা অনেক সময় হাতের কাজও করতে পারে; এমন কি, যখন ডাঙ্গার ওপর চরে বেড়ায়, তখন ঐ "পা" দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ঢিল ছুঁড়তেও পারে। সীলের চামড়া মানুষের খুব প্রিয়, এজন্য মানুষের হাতে ওদের বংশ প্রায় নির্মূল হতেই চলেছে। এরা পুরোপুরি মাংসাশী। সমুদ্রের মাছ এদের প্রধান খাদ্য। সাধারণত শীতপ্রধান দেশেই এদের বেশি দেখা যায় তবে অন্যত্রও যে নেই তা নয়। হাতি-সীলের মত সিংহ-সীলও বেশ বড়সড় এবং বলবান্ প্রাণী।

সিন্ধুঘোটক বা ওয়াল্‌রাস্‌কে অনেকে সীলের দলে ফেলেন। তবে বিজ্ঞানীদের মতে এরা সীল নয়। এরাও আকারে ১৫ ফুট পর্যন্ত হয় আর তেমনি ভারী। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হাতির দাঁতের মত দু'টো দাঁত—যা নীচের দিকে নেমে এসেছে। এক-একটা দাঁত প্রায় দু'ফুট লম্বা। এই দাঁত দিয়ে ওরা শিকার গেঁথে তুলে নেয়—বিশেষ করে শেল ফিশ্, যা সমুদ্রের একেবারে তলায় বাস করে। সেটাই ওদের প্রিয় খাদ্য। তবে দরকার পড়লে ঐ দাঁত লড়াইএর সময়েও কাজে লাগে। সীলের মত এরাও ডাঙ্গায় চরে বেড়াতে পারে, কিন্তু হিঁচড়ে হিঁচড়ে। আকৃতিতে ভয়ঙ্কর হলেও এরা নাকি তেমন হিংস্র নয়। তা ছাড়া এদের সন্তানস্নেহ অসম্ভব, সন্তানকে বাঁচাবার জন্য এরা প্রাণ দিতেও ইতস্তত করে না। বিশেষ করে পুরুষ সিন্ধুঘোটকেরা এ ব্যাপারে খুবই সাহসী।

ডলফিন দেখতে অনেকটা মাছের মত, কিন্তু ঠোঁটটার সঙ্গে পাখির ঠোঁটের একটু মিল আছে। অবশ্য ঐ ঠোঁটে দু'পাটি দাঁত বসানো, যা পাখিদের নেই। এরা দল বেঁধে ঘোরে আর খুব আমুদে প্রাণী। জলের তলায় ডিগ্‌বাজী খেয়ে আর নানা কসরৎ দেখিয়ে এরা সমুদ্রযাত্রীদের খুব আনন্দ যোগায়।


ডলফিন

ডুগংএর মুখটা কিছুটা থ্যাবড়া আর গোল। বাচ্চাদের দুধ খাওয়াবার সময় এরা তাদেরকে ঠিক মানুষের মত কোলে নিয়ে দুধ খাওয়ায়। জলের ওপর ঐ অবস্থায় ওদের মাথা ভেসে থাকতে দেখে ওদের অনেক সময় মানুষ বলে ভুল হয়। ম্যানাটীও এই রকম ডুগং জাতের প্রাণী এবং হাবভাবে অনেকটা একই ধরনের। এরা আবার সরু গলায় চীৎকারও করতে পারে। ডুগং এবং ম্যানাটীকে দেখেই মৎস্যকুমারীর গল্পের চলন হয়েছে। দূর থেকে বাচ্চা কোলে মানুষ,



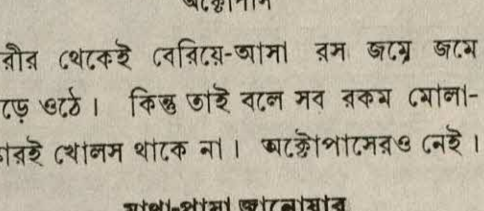
ডুগং

চীৎকার করে গান গাইছে—এ মৎস্যকুমারী ছাড়া আর কি হতে পারে ? শত শত বছর ধরে নাবিকদের এই রকম ধারণাই ছিল, যত দিন না বিজ্ঞানীরা সে ভুল শুধরে দেন। সাইরেনের মত শব্দ করে বলে এদের বৈজ্ঞানিক নাম সাইরেনিয়া।

অক্টোপাস

মোম-তিমির সঙ্গে অক্টোপাসের লড়াইএর কথা বলেছি। অক্টোপাস তার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়ে সত্যিই সমুদ্রের একটি বিভীষিকা। কিন্তু তিমির সঙ্গে জাতবিচার করলে সে নেহাৎই হরিজন। তিমি হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক স্তন্যপায়ী জীব, আর অক্টোপাস হচ্ছে সেই আদ্যিকালের নেহাৎ নীচু-তলার প্রাণী—শামুক-ঝিনুকের জাতভাই,—যাদের না আছে হাড়গোড়, না আছে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া। শামুক-ঝিনুককে আমরা ভয় করি না, কিন্তু অক্টোপাসকে ভয় না করে উপায় নেই। একটি ছোট্ট আটপেয়ে মাকড়সা তার তু'ইঞ্চিটাক লম্বা লম্বা লোমশ ঠ্যাং নিয়ে যখন ঘুরে বেড়ায় তখন সে আমাদের কোন অনিষ্ট করবে না জেনেও গা-টা শিরশির করে না কি ? আর সেই মাকড়সাই যদি আকারে একটা হাতির মত হয় তা হলে কি হয় ? বড় বড় অক্টোপাস দেখতে অনেকটা ঐরকমই। ৩।৪টে হাতি একত্র করলে যত বড় হয় তত বড় অক্টোপাসও আছে।

শামুক-ঝিনুকরা যে ফাইলাম বা পর্বে পড়ে তাকে বলা হয় মোলাস্কা। কথাটা এসেছে ল্যাটিন 'মোলাস্কাস' থেকে—যার মানে 'নরম'। এই জাতের প্রাণীদের সবাইকার শরীরই নরম বলে এই নামকরণ। তবে নরম বলেই যে মোলাস্কা জাতীয় সমস্ত প্রাণীই দেখতে মোটামুটি এক রকম তা নয়। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার প্রজাতির (স্পিসিস্) মোলাস্কার সন্ধান পেয়েছেন এবং তাদের অনেকের সঙ্গেই অনেকের "আশমান জমিন ফারাক"। তবে, নরম হলেও, এদের অনেকেরই শরীরে একটা করে শক্ত খোলস থাকে যা ওদের



অক্টোপাস

শরীর থেকেই বেরিয়ে-আসা রস জমে জমে গড়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে সব রকম মোলা-স্কারই খোলস থাকে না। অক্টোপাসেরও নেই।

মাথা-পায়া জানোয়ার

শামুক-ঝিনুকের কথা এখন থাক, অক্টো-পাসের কথাই বলি। অক্টোপাসকে যে শ্রেণীর মোলাস্কার মধ্যে ফেলা হয়েছে তাকে বলা হয় সেফালোপড। কথাটার মানে মাথা-পায়া জানোয়ার। মাথা-পায়া শুনে কিছু বুঝতে পারলে না তো ? তার মানে, এই

প্রাণীদের পাগুলি মাথার চারদিকে ঘিরে থাকে। অক্টোপাসেরও ঠিক তাই। মাঝখানে মাথাটা, তার ওপর ড্যাব ড্যাব করছে দু'টি জ্বলজ্বলে চোখ, আর সেই মাথাকে ঘিরে রেখেছে আটটা আঁকাবাঁকা পা—যার জন্যে ওর নামই হয়েছে অক্টোপাস অর্থাৎ আটপেয়ে। আসলে কিন্তু পা নয়, এগুলোকে বলা হয় টেন্‌টাক্‌ল্‌স্‌। বাংলায় আমরা বলি শুঁড়। এই শুঁড়গুলির মধ্যে আছে অসংখ্য পেশী, যার জন্য অক্টোপাসের গায়ে অসম্ভব জোর।

অক্টোপাস মাংসাশী প্রাণী আর এই শুঁড়গুলিই হচ্ছে তার শিকার ধরার অস্ত্র। শিকার সামনে পেলেই অক্টোপাস তাকে আটটা শুঁড় দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। অজগরের প্যাঁচের মত সেই সাংঘাতিক প্যাঁচ থেকে মুক্ত হওয়া খুব শক্তিশালী জীবের পক্ষেও কঠিন। শুধু তাই নয়, অক্টোপাসের প্রত্যেকটি শুঁড়ের গায়ে আছে অসংখ্য গোল গোল চোষক বা 'সাকার'—অর্থাৎ চুষবার যন্ত্র। শিকারকে শুঁড়ে জাপটে ধরে অক্টোপাস এই চোষকগুলি দিয়ে তার রক্ত চুষে নেয়, মাংস ছিঁড়ে নেয়। তেমন তেমন অক্টোপাসের এক-একটা চোষক কম করে ৮।১০ কিলোগ্রাম ওজনের জিনিস টেনে তুলতে পারে, আর কোন কোন অক্টোপাসের প্রতিটি শুঁড়ে কম করে ৩০০ চোষকও পাওয়া গেছে। অর্থাৎ আটটা শুঁড়ে ৩ আটে ২৪০০ চোষক!

অক্টোপাসের মুখটা ঠিক টিয়েপাখীর মত বাঁকা। ধারালও কম নয়। মাংস কুরে কুরে খাওয়ার পক্ষে খুবই উপযোগী। জীবটি পুরোপুরি আমিষভোজী। ছোটবড় মাছ তো বটেই, বড় বড় হাঙ্গর, তিমি প্রভৃতি জন্তুকেও সে খেতে ছাড়ে না। তিমির মাংস খেতে ওরা খুবই ভালোবাসে। মোম-তিমির সঙ্গে ওদের লড়াইএর কথা তো আগেই বলেছি। তিমি-শিকারীরা বলেন, অতিকায় মোম-তিমির গায়ে এই সব লড়াইএর ক্ষতচিহ্ন প্রায়ই চোখে পড়ে। নিজেদের মধ্যে মারামারি করতেও অক্টোপাসরা কম ওস্তাদ্‌ নয়।

অক্টোপাস অবশ্য ছোটবড় সব রকমই হয়—কয়েক ইঞ্চি থেকে চল্লিশ ফুট পর্যন্ত। তোমরা, যারা বোম্বাইএর অ্যাকোয়েরিয়াম (জলজন্তুদের চিড়িয়াখানা) দেখেছ তারা ৪।৫ ফুট লম্বা জ্যান্ত অক্টোপাস দেখে থাকবে। কলকাতার যাদুঘরেও ঐ রকম ছোট অক্টোপাসের মৃত সংরক্ষিত নমুনা আছে। কোন কোন প্রাণিবিজ্ঞানীর মতে অক্টোপাসকে যতটা হিংস্র বলে প্রচার করা হয় ততটা হিংস্র সে নয়। অক্টোপাস মানুষের ক্ষতি করেছে এ রকম ঘটনা বড় একটা শোনা যায় না। তা ছাড়া এদের কতকগুলির স্বভাব বেশ লাজুকই বলা চলে। দিনের বেলা তারা ডুবো পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, রাত্রে শিকারে বেরোয়। তবে অতিকায় অক্টোপাসদেরকে এ রকম সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না। তাদের চেহারাও যেমন দানবের মত, স্বভাবও তেমনি।

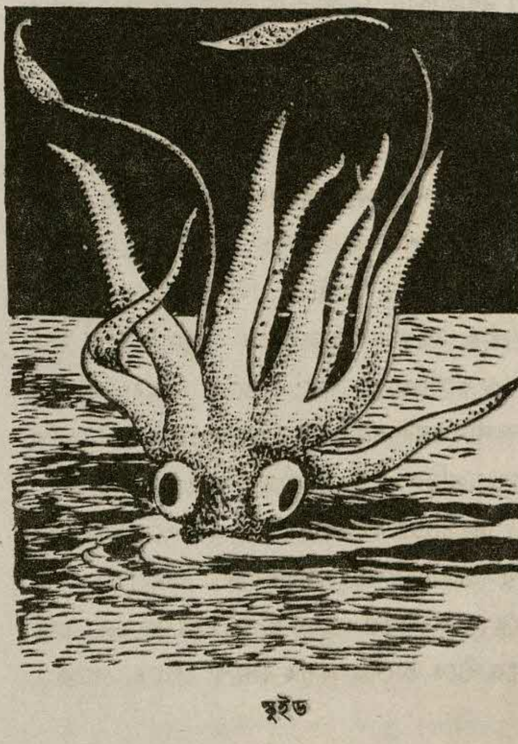
অক্টোপাসের শরীরের মধ্যে একটা থলি আছে যার ভিতরে ঠিক কালির মত এক রকম তরল রস জমা থাকে। শত্রুর হাত থেকে পালাবার সময় এরা ঐ কালি সজোরে জলের মধ্যে ছিটিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে সেই কালি-গোলা জল আশপাশের চারদিক্‌ অন্ধকার করে দেয় আর ওরাও সেই ফাঁকে গা ঢাকা দেয়।

অক্টোপাসের জাতভাই

অক্টোপাসের নিকটতম জাতভাই বা জ্ঞাতি হচ্ছে স্কুইড। এরাও সেফালোপড শ্রেণীর প্রাণী এবং চালচলনে এবং চেহারায়ও অক্টোপাসের সঙ্গে এদের খানিকটা মিল আছে। স্কুইডের দশটা শুঁড়, তার মধ্যে দু'টো বাকিগুলোর চেয়ে লম্বা। এই শুঁড় দিয়েই স্কুইডরা শিকার ধরে। এদেরও শুঁড়ের মধ্যে অক্টোপাসের মত চোষক বসানো। স্কুইডরা কিন্তু দেখতে অনেকটা তাঁতের মাকুর মত এবং ওরা জলের মধ্যে এত তীব্র বেগে, প্রায় ধনুকের তীরের মতই, ছুটতে পারে যে সেজন্য ওদের দেওয়া নামই হয়েছে সী-অ্যারো, অর্থাৎ সমুদ্রের 'তীর'। এদের চলার কৌশলটা কিন্তু ভারি মজার। চলতে হলে এরা শরীরের একটা গর্তের মধ্যে প্রচুর জল টেনে নেয়, তার পর সেই জল পিচকিরির মত একটা সরু নলের ভিতর দিয়ে সজোরে বার করে দেয়। এর ফলে "নিউটনের নিয়ম" অর্থাৎ জেট প্লেন বা রকেট যে নিয়মে চলে সেই নিয়মে ওরাও উল্টোদিকে তীরবেগে ছুটে চলে। (ছোটদের বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯৫-২৯৬)। অক্টোপাসও অনেক সময় এইভাবে জলের নীচে চলাফেরা করতে পারে। অক্টোপাসের মত স্কুইডরাও পালাতে হলে কালি ছিটিয়ে পালায় এবং কালি ছিটোবার পদ্ধতিটাও ঠিক জল ছিটোবার মতই। কোন কোন স্কুইড উড়ুক্কু মাছের মত খানিকটা উড়েও যেতে পারে। ভূমধ্যসাগরে এ রকম উড়ুক্কু স্কুইড অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও উড়তে গিয়ে এরা সমুদ্রগামী জাহাজের ডেকের ওপরেও এসে চড়াও হয়।

কিন্তু স্কুইডদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দানব স্কুইড বা জায়ান্ট স্কুইড। গোটা অমেরুদণ্ডী প্রাণিজগতের মধ্যে এত বড় প্রাণী আর নেই। এদের কোন কোনটা লম্বায় ৫০ ফুটেরও বেশি হয়। দানব ছাড়া আর কি ?

তোমরা কাট্‌ল্ ফিশের নাম শুনে থাকবে। এরাও অক্টোপাস আর স্কুইডদেরই জাতভাই, তবে আকারে অনেক ছোট—বড় জোর ৬ ইঞ্চি থেকে ১০ ইঞ্চি। এদের শরীর থেকে এক রকম রস নিঃসৃত হয়ে শরীরের ভিতর দিকে একটা খোলসের মত তৈরি হয়, তাকে বলা হয় কাট্‌ল্ বোন্। এরাও পালাবার সময় কালি ছিটিয়ে পালায়, তবে সে কালি কালো নয়, অনেকটা পাটকিলে। একে বলা হয় সিপিয়া। আমরা যে সিপিয়া রঙ ব্যবহার করি তা এই কাট্‌ল্ ফিশের ছিটানো রঙিন কালি থেকেই পাওয়া যায়।



স্কুইড



ইতিহাসের কথা

ইয়োরোপে রেনেসাঁ

ইয়োরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁর যুগ একটি অসামান্য যুগ। রেনেসাঁর কথা বলতে হলে আগে বলতে হয় রেনেসাঁ কাকে বলে। চলতি কথায় আমরা ওকে বলি নতুন করে জাগা বা নবজাগরণ। শব্দগত অর্থে রেনেসাঁ বলতে **বোঝায় পুনর্জন্ম**, অর্থাৎ অতীতের স্বর্ণযুগে **আবার ফিরে** আসা। অতীতের স্বর্ণযুগ বলতে **আমরা** বুঝি গ্রীক ও রোম সাম্রাজ্যের সব **চাইতে** গৌরবময় অধ্যায়। এই সময় শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদিতে গ্রীক ও রোমানরা যে মনীষার পরিচয় দিয়েছিলেন পরবর্তী হাজার বছরেও তার কোন তুলনা মেলে নি। কিন্তু পনেরো ও ষোল শতকে আমরা আবার দেখলাম সেই প্রতিভার বিস্ফোরণ। এর প্রস্তুতি কিন্তু চলছিল সেই ক্রুসেডের সময় থেকেই।

ক্রুসেডের ফলে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায় ইয়োরোপের ইতিহাসে। ক্রমাগত যুদ্ধ করে করে **সামন্ত** প্রভুরা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে তাঁদের প্রভুত্ব লোপ পেতে থাকে। এই সামন্ত প্রভুদের দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজারাও সব সময়ে কম্পমান্ থাকতেন। এখন এঁদের দুর্বলতার সুযোগে রাজারা ফিরে পেলেন তাঁদের আগেকার একচ্ছত্র ক্ষমতা। সামন্ততন্ত্রে আমরা দেখেছি জমি যার শক্তি তার। কিন্তু ক্রুসেড চলা-কালীন এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী জল-পথে যুদ্ধের উপযোগী জিনিসপত্র কেনা-বেচা করে প্রচুর লাভবান্ হয়ে পড়েন। এঁদের মাধ্যমেই **ক্রীশ্চান সভ্যতার সঙ্গে ইসলাম** সভ্যতার **যোগাযোগ ও আদান-প্রদান ঘটে**। আরবদের **কাছ থেকে ক্রীশ্চানরা বিজ্ঞান,** চিকিৎসা-**শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে**। এই মধ্যবিত্ত **ব্যবসায়ী** শ্রেণীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই অনেকবার শুনেছ। এঁদেরকেই বলা হয় বুর্জোয়া। পনেরো ও ষোল শতকের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পুরোভাগে এঁরাই এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সামন্ত প্রভুদের পর এঁরাই ইয়োরোপে ক্রীশ্চান সমাজে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন। তদানীন্তন রাজারাও সেই মহান্ বিপ্লবে এঁদেরই পাশে এসে দাঁড়ান।

বিপ্লব মানেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম নয়

লক্ষ করে দেখবে, আমরা বার বার 'বিপ্লব' কথাটা ব্যবহার করছি। বিদ্রোহ বা যুদ্ধ রক্তক্ষয়ী, কিন্তু বিপ্লব সব সময়ে তা নয়। বিপ্লব মানে হ'ল মানুষের চলতি ভাবধারায় এবং আদর্শে একটা আমূল পরিবর্তন। রেনেসাঁ সে সময়কার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক—সব ক'টি ধারণাতেই এনেছিল আমূল পরিবর্তন। এই অর্থেই রেনেসাঁকে আমরা বলতে পারি এক মহান্ বিপ্লব।

সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে পুঁজিপতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তরই হ'ল অর্থনৈতিক বিপ্লব। এর ফলে মানুষের দৃষ্টি জমি থেকে ধীরে ধীরে সরে এল বাণিজ্যের দিকে। ভূমিদাস প্রথারও বিলোপ ঘটল। বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের চাহিদাও বাড়ল। চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে যোগানও বাড়াতে হয়। এই চাহিদা-যোগানের



লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

ভাবনাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গেল ১৮ ও ১৯ শতকের শিল্প-বিপ্লবের দিকে। গড়ে উঠল নতুন নতুন কল-কারখানা, অভাবনীয় যন্ত্রপাতি। এই সব যন্ত্রপাতির মধ্যে গোড়ার দিকে তৈরি হারগ্রীভ্‌সের 'স্পীনিং জেনি', কার্টরাইটের 'পাওয়ার লুম', জেম্‌স্ ওয়াটের বাষ্পের শক্তি



মিকেল এঞ্জেলো

দিয়ে চালানো এঞ্জিন প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, আর এ সমস্তই হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান।

পনেরো ও ষোল শতকের রেনেসাঁর মূল কথাই হ'ল এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিবাদী মন। ঐতিহাসিকেরা যাকে ইয়োরোপে মধ্যযুগ বলেন, সে যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল রাজা ও পোপের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। এ লড়াই ক্রীশ্চান জগৎকে নেতৃত্ব দেবার অধিকার নিয়ে। রেনেসাঁকে আধুনিক যুগের আরম্ভ বলা যায় এই অর্থে যে রেনেসাঁই মানুষের বিচারবুদ্ধিকে মধ্যযুগের ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে। ক্রীশ্চান চার্চের গোঁড়ামিতে শিল্প, সাহিত্য,



র‍্যাফেল

বিজ্ঞানসাধনা যখন প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল, ঠিক তখনই ঘটে এই নবজাগরণ। যে সব মনীষীদের অক্লান্ত চেষ্টায় এটি ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হ'ল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মিকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল (শিল্পী), দান্তে, পেত্রার্ক, বোক্কাচিও (সাহিত্যিক); কোপারনিকাস, গ্যালিলিও (বিজ্ঞানী), ম্যাকিয়াভেলি (দার্শনিক)। এঁদের মধ্যে লিওনার্দো ছিলেন আবার একাধারে শিল্পী, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী। এ বিষয়ে তাঁকে প্রাচীন গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টটলের সঙ্গে



পেত্রার্ক

তুলনা করা যায়। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে তার সাহায্যে প্রমাণ করলেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। ওদেশের প্রচলিত ধারণা ছিল সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। মধ্যযুগে ইয়োরোপীয়দের অন্ধ বিশ্বাস ছিল বাইবেলই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস। বাইবেলে যে কথার সমর্থন নেই, সে কথা সত্যি হতে পারে না। গ্যালিলিওর আবিষ্কারের কথা যে-হেতু বাইবেলে নেই, সে-হেতু গ্যালিলিও মিথ্যুক আর অবিশ্বাসী। এই মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্তির আন্দোলনই হ'ল রেনেসাঁ।



কোপারনিকাস

রেনেসাঁয় ইতালির ভূমিকা

রেনেসাঁর বেশির ভাগ মনীষীরাই কিন্তু ইতালির লোক। এর কারণ আর কিছুই নয়, আরব জগতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস প্রভৃতি ইতালির কয়েকটি নগর সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে ভাবের আদান-প্রদান, আর সমৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের উৎসাহও বাড়তে থাকে। ইতালি থেকে এই নবজাগরণের বিরাট ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন দিকে,

দোলা দিয়েছিল ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশকেও। এইভাবেই আমরা পেয়েছি ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যিক শেক্সপীয়ার, ফ্রান্সিস বেকন, চ্যসার প্রভৃতিকে, ফ্রান্সের চ্যসোকে, স্পেনের সাহিত্যিক সার্ভেন্টিসকে ও জার্মানীর শিল্পী অ্যালবার্ট ডুরাকে। জার্মানীতেই প্রথম ছাপার হরফে বই বার হয়।



ম্যাকিয়াভেলি

রাজনৈতিক ভাবধারায় এক বিরাট পরিবর্তন আনলেন ম্যাকিয়াভেলি। তাঁর বিখ্যাত বই 'দি প্রিন্স'-এ তিনি স্পষ্টই লিখলেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোন যোগাযোগ নেই। রাজা নিজের বা দেশের স্বার্থে যে কোন অন্যায় কাজই করতে পারেন, তবে রাজাকে সব সময় অভিনয় করতে হবে যেন তিনি প্রজাদেরই মঙ্গল চান। ম্যাকিয়াভেলির লেখা থেকেই তাঁর কূটনীতির একটা নমুনা দিচ্ছি: 'যদি কাউকে খুন করতে চাও তবে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিনীত কণ্ঠে ব'লো, 'মশাই, আপনার তলোয়ারটা আমায় একটু ধার দেবেন কি?'

রেনেসাঁর প্রভাবে মানুষের মন অন্ধ বিশ্বাস থেকে যুক্তিতর্কের দিকে ঝুঁকে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে রাজার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা প্রভৃতি ধারণাও ভেঙ্গে যায়। এ যাবৎ সাধারণ মানুষেরা বিশ্বাস করত রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। অতএব রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মহাপাপ। রেনেসাঁ যুগে রাজারা কিন্তু বেশ বুঝতে পারলেন, এ সব ভাঁওতায় আর মানুষকে ভোলানো যাবে না। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা জনসাধারণের কাছে নেমে এলেন, প্রজাদের সুখ-দুঃখের দিকে নজর দিলেন।

প্রটেস্টান্টদের আবির্ভাব

রেনেসাঁর খাঁড়া পড়ল ক্যাথলিক ধর্মের ওপরও। ক্ষমতার মোহে অন্ধ খ্রীশ্চান ধর্মযাজকেরা ইতিমধ্যেই ভোগ ও বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে এবার তাঁরা ঘোষণা করে বসলেন, মহানুভব পোপ পাপী-তাপী মানুষদের নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবেন, কিন্তু একটি শর্তে। দিতে হবে টাকা,—অনেক টাকা। প্রতিবাদের ঝড় উঠল জার্মানীতে, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভিটেনবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্টিন



মার্টিন লুথার

লুথার। ভণ্ডামি অনেক সয়েছেন, আর নয়। লুথারের নেতৃত্বে ক্রীশ্চানদের এক বিরাট অংশ রোমান চার্চের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বসল সরাসরি। এদেরই বলা হয় 'প্রটেস্টান্ট' বা প্রতিবাদী ক্রীশ্চান। এবার শুরু হয় ক্রীশ্চান-দের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া, যাকে বলা হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। লুথারের চাইতেও উগ্র প্রটেস্টান্ট ক্যালভিন। ক্যালভিনপন্থীদের সঙ্গে ক্যাথলিক জেসুইটদের শুরু হয়ে গেল প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব।

এই ধর্মীয় জাগরণের সুফলও হয়েছিল একটা। যুক্তিবাদী প্রটেস্টান্টরা যেমন কুসংস্কার আর দুর্নীতি থেকে ক্রীশ্চান ধর্মকে মুক্ত করার অভিযানে নামলেন, ক্যাথলিকরাও তেমনি নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি শুধরে নিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা চালাতে লাগলেন।

ভৌগোলিক আবিষ্কার: উপনিবেশের পত্তন

এর পর ভৌগোলিক আবিষ্কারের কথা বলেই আমরা রেনেসাঁ পর্ব শেষ করব। নাবিকের কম্পাস আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায়ী শ্রেণীর তাগিদে শুরু হ'ল সমুদ্রপথে দুঃসাহসিক অভিযান। চাই পণ্যদ্রব্যের বাজার, চাই মশলা ও মণিমুক্তোর দেশ ভারতে জলপথে



মার্কো পোলো



ভাস্কো ডা গামা

পৌঁছবার সরল রাস্তা। এগিয়ে এল পোর্তুগাল, ইতালি, ইংল্যাণ্ড ও স্পেনের দুর্দান্ত সাহসী নাবিক আর জলদস্যুরা। ইতিপূর্বেই (তেরো শতক) ইতালিয় নাবিক মার্কো পোলো চীন ও ভারতে কিছুকাল কাটিয়ে এই দুই দেশের ধনসম্পদের কথা তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখে গিয়েছিলেন। এর পর স্পেনের কলম্বাস ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করলেন। পোর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে জলপথে ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হলেন ১৪৯৮ সালে। এই সব নতুন আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটল। শক্তিশালী রাজারা নিজেদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়লেন। এই ভাবেই স্পেন, পোর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও ইতালি ধীরে ধীরে গড়ে তুলল নিজেদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য।

তোমাদের কাছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন রেখে এবার আমি রেনেসাঁ অধ্যায় শেষ করব। রেনেসাঁ যুগে যে সব মনীষীদের পরিচয় তোমরা পেলে, ঘটনাক্রমে ঐ সময় তাঁদের জন্ম হয়েছিল বলেই কি রেনেসাঁ সম্ভব হয়েছিল? না কি

সে সময়কার পরিবেশ, অর্থাৎ ধর্মীয় গোঁড়ামি, চার্চের দুর্নীতি, ক্রুসেড, সামন্ত প্রভুদের অবলুপ্তি, বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, বাণিজ্যের প্রসার ও আরবদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়—এইসব ঘটনাই ইয়োরোপে নব-জাগরণকে সম্ভব করেছিল ? তোমাদের কোন্‌টি সত্যি বলে মনে হয় ?

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস : টিউডর রাজবংশ

ইয়োরোপের সর্বত্র যখন রেনেসাঁর হাওয়া বইছে সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসেও ঘটে গেল একটা পরিবর্তন। সপ্তম হেনরী বসওয়ার্থের যুদ্ধে তৃতীয় রিচার্ডকে হারিয়ে দিয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে এসে বসলেন। হেনরীই টিউডর বংশের প্রথম রাজা।

রেনেসাঁর যাদুকাঠির ছোঁয়ায় ইংল্যাণ্ডের ভোলও পালটাতে শুরু করল। সামন্ততন্ত্রের ঘটল অবসান। পার্লামেন্টের * হাতেও এল অনেকটা ক্ষমতা। রাজাকে টাকার জন্য পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী থাকতে হ'ত। রাজা সপ্তম হেনরী অভিজাত সম্প্রদায়ের চাইতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (জেন্‌ট্রি) ওপরই বেশি নির্ভর করতেন। তবে তিনি কিন্তু পোপের আনুগত্য বরাবরই স্বীকার করে গেছেন।

রাজা অষ্টম হেনরীর আমলেই (১৫০৯-১৫৪৭) রোমান চার্চের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সম্পর্ক



অষ্টম হেনরী

শেষ হয়। এর পেছনে একটা মজার কাহিনী আছে। অষ্টম হেনরীকে বলা হয় বিয়ে-পাগলা রাজা। অনেকবার বিয়ে করেছেন উনি। প্রথম বিয়ে করেন বড় ভাই মারা যাবার পর তাঁরই স্ত্রী (অর্থাৎ তাঁর বিধবা বৌদি) স্পেনের রাজ-কন্যা ক্যাথেরিনকে। স্বয়ং পোপ এই বিয়েতে সম্মতি দেন। বিয়ের ১৭ বছর পর হেনরী অ্যানি বোলেন নামে এক সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। কিন্তু আইনে একাধিক স্ত্রী থাকা অপরাধ। সুতরাং অষ্টম হেনরী চাইলেন ক্যাথেরিনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ। অষ্টম হেনরী যুক্তি দেখালেন খ্রীশ্চান মতে দাদার স্ত্রী অর্থাৎ বৌদির সঙ্গে বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়। অতএব তিনি এখনও অবিবাহিত। পোপের কাছে আবেদনও করা হ'ল এই মর্মে। পোপ কিন্তু টালবাহানা করতে লাগলেন বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করার ব্যাপারে। এতে হেনরী গেলেন বেজায় চটে। তিনি অবিলম্বে রোমান চার্চের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বসলেন। তাঁর নিজের কোর্টে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করিয়ে তিনি বিয়ে করলেন

* ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের দু'টি বিভাগ—হাউস্ অব্ লর্ড্‌স্ আর হাউস্ অব্ কমন্‌স্। আমরা এখানে হাউস্ অব্ কমন্‌স্ অর্থেই পার্লামেন্ট শব্দটা ব্যবহার করছি।

অ্যানি বোলেনকে। অ্যানি বোলেনের একটি মেয়ে হ'ল—এলিজাবেথ। হেনরী কিন্তু এবার আকৃষ্ট হলেন আর একটি মেয়ের দিকে। তাঁকে বিয়ে করার জন্য হেনরী অ্যানি বোলেনকে প্রাণদণ্ড দিলেন একটা মিথ্যা অপরাধের ওজুহাতে।

এ তো গেল হেনরীর পারিবারিক ব্যাপার। এবার হেনরী রাজ্যের সর্বস্তরে পোপের প্রাধান্য নিশ্চিহ্ন করবার জন্য চাইলেন পার্লামেন্টের সাহায্য। পার্লামেন্টের সভ্যরাও পোপের ওপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। সুতরাং এই সুযোগে তাঁরা হেনরীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঘোষণা করলেন, ইংল্যাণ্ডের চার্চের সর্বময় কর্তা হলেন ইংল্যাণ্ডের রাজা,—পোপ ন'ন। হেনরী পোপকে অস্বীকার করলেও লুথারের প্রটেস্টান্ট ধর্ম কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন নি। হেনরীর ধর্ম-সংস্কারের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। লুথারের ধর্মসংস্কারের পেছনে তেমন কোন রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল না।

এলিজাবেথের রাজত্ব : ইংল্যাণ্ডের স্বর্ণযুগ

অষ্টম হেনরীর আমল থেকেই ইংল্যাণ্ড ইয়োরোপে শক্তিসাম্য,—যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ব্যালান্স অব্ পাওয়ার,—বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ শক্তির পাল্লা যে দিকে ঝুঁকবে ইংল্যাণ্ড তার নিজের ওজন চাপাবে তার উল্টো দিকে। এভাবেই সে কখনও ফ্রান্সকে আবার কখনও বা স্পেনকে হাতে রাখবে।

অষ্টম হেনরীর পর সিংহাসনে বসেন যথাক্রমে ছেলে এডওয়ার্ড (১৫৪৭-৫৩) ও মেয়ে মেরী (১৫৫৩-১৫৫৮)। কিন্তু হেনরীর আর এক মেয়ে প্রথম এলিজাবেথের শাসনকালই (১৫৫৮-১৬০৩) হ'ল ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যুগ। ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগকে এবং এথেন্সের ইতিহাসে পেরি-ক্লিসের যুগকে যেমন স্বর্ণযুগ বলা হয়, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসেও তেমনি এলিজাবেথের শাসনকাল হ'ল স্বর্ণযুগ। ইংরেজদের সুখসমৃদ্ধির শুরু এই সময় থেকেই। ফ্রান্সিস ড্রেক, হকিন্স প্রমুখ কুখ্যাত ইংরেজ বোম্বেটেরা এলিজাবেথের সমর্থন পেয়ে সমুদ্রপথে চালাতে শুরু করে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। কিন্তু এই বোম্বেটেরাই ইংল্যাণ্ডকে করে দিয়ে গেল পয়লা নম্বরের নৌশক্তি। সাহিত্যক্ষেত্রেও এ সময় দেখা যায় প্রতিভার ছড়াছড়ি। সারে, স্পেন্সার, চ্যাপম্যান, হ্যারিংটন, ফেয়ারফেক্স, সিডনী,



রাণী প্রথম এলিজাবেথ

মার্লো এ সময়কার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম। এঁদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন শেক্সপীয়ার।

এলিজাবেথের সামনে ছিল দু'টি সমস্যা—

পার্লামেণ্ট আর পোপ। পার্লামেণ্ট চাইত রাণীর ওপর খবরদারি করতে, কিন্তু বুদ্ধিমতী রাণী জানতেন কি ভাবে একটা বিদ্রোহী পার্লামেণ্টকে দাবিয়ে রাখতে হয়। যেই পার্লামেণ্ট এলিজাবেথের সমালোচনা করত অমনি তিনি পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিতেন। পার্লামেণ্ট ডাকা বা ভেঙ্গে দেওয়া রাজা বা রাণীর ইচ্ছের ওপরই নির্ভর করত।

কিন্তু বিপদ্ এল পোপের দিক্ থেকে। পোপ ঘোষণা করলেন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে এলিজাবেথের কোনই অধিকার নেই। অধিকার হচ্ছে স্কটদের রাণী মেরীর (ক্যাথলিক)। এলিজাবেথ নিজেকে প্রটেস্টাণ্ট বলে ঘোষণা করলেন, ষড়যন্ত্রের অপরাধের মেরীর প্রাণদণ্ডও হয়ে গেল। এতে চটে গেলেন স্পেনের ক্যাথলিক রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ। স্পেন তখন ইয়োরোপের সবচাইতে শক্তিশালী রাজ্য। ফিলিপের ফন্দী ছিল এলিজাবেথকে বিয়ে করে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনটাও দখল করবেন। এলিজাবেথ কিন্তু স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, ফিলিপকে বিয়ে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ফিলিপ এবার এলিজাবেথকে শাস্তি দিতে পাঠালেন তাঁর বিরাট নৌবাহিনী। এলিজাবেথের নৌশক্তিও কোন অংশে কম ছিল না। তা ছাড়া ইংরেজ জলদস্যুরাও রাণীর পক্ষে যোগ দিয়ে স্পেনের নৌবাহিনীকে ধ্বংস করে দিল (১৫৮৮)। এর পর ফিলিপ আর সাহস করেন নি রাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী বনাম এলিজাবেথ

রাণী এলিজাবেথের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী। স্কটল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জেম্স্ যখন মারা যান তাঁর মেয়ে মেরী তখন মাত্র ছ'দিনের। তা হলে হবে কি, মেরীর মাথায় তখনই উঠল রাজমুকুট। এবার ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী চাইলেন-মেরীকে



স্পেনের নৌবাহিনী

তাঁর ছেলে এডওয়ার্ডের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন হাত করতে। ফ্রান্সের রাজাই বা এ সুযোগ হারাবেন কেন, বিশেষতঃ মেরীর মামার বাড়ী যখন ফ্রান্সে? মেরীর মা কিন্তু ঠিক করলেন, মেয়ের বিয়ে দেবেন ফ্রান্সের যুবরাজ ফ্রান্সিসের সঙ্গেই। অমনি অষ্টম হেনরী রেগেমেগে পাঠিয়ে দিলেন সৈন্য। ফ্রান্সের রাজাও স্কটল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠালেন মেরীকে উদ্ধার করার জন্য, আর মেরীও পালিয়ে চলে এলেন ফ্রান্সে। একটু বড় হলে মেরীর বিয়ে হ'ল যুবরাজ ফ্রান্সিসের সঙ্গে। ফ্রান্সিস কিন্তু ছিলেন চিররুগ্ন। মারাও গেলেন তাড়াতাড়ি। অগত্যা মেরী ফিরে এলেন স্কটল্যাণ্ডে।

ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তখন এলিজাবেথ। মেরী হলেন এলিজাবেথের দূরসম্পর্কের বোন। কিন্তু মেরী এলিজাবেথের মত কূটনীতিজ্ঞ বা দূরদর্শী ছিলেন না। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ওপর মেরীর লোভ এলিজাবেথের অজানা ছিল না। আর মেরী ছিলেন ক্যাথলিক, সুতরাং মেরীর দাবীর পেছনে ক্যাথলিকদেরও ছিল সমর্থন। কিন্তু এলিজাবেথের ক্ষমতা ছিল অনেক। তাই যুদ্ধে তাঁকে হারানো সহজ ব্যাপার ছিল না। বিধবা মেরী তাই বিয়ে করতে চাইলেন এমন একজন শক্ত সমর্থ পুরুষকে যিনি তাঁকে পাইয়ে দেবেন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন। সব দিক্ ভেবেচিন্তে মেরী বিয়ে করলেন ডার্নলিকে। কিছুদিন পরে মেরী বুঝতে পারলেন ডার্নলি হলেন আসলে একটা অকর্মার ঢেঁকি। এবার মেরী পছন্দ করে ফেললেন আর্ল অব্ বথওয়েলকে, আর তাঁকে বিয়ে করার জন্য মেরী করলেন এক জঘন্য অপরাধ। কৌশলে তিনি হত্যা করলেন স্বামী ডার্নলিকে।

মেরীর স্বপ্ন কিন্তু সফল হ'ল না। বরং প্রজারা রাণীর বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ



মেরীর প্রাণদণ্ড

করল। বথওয়েল পালালেন ডেনমার্কে আর মেরী হলেন বন্দী।

এবার এলিজাবেথ মেরীকে নিয়ে খেলতে লাগলেন বেড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে। এলিজাবেথ গোপনে একটা আংটি পাঠিয়ে মেরীকে বললেন, এই আংটি দেখালে প্রহরীরা মেরীকে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে দেবে। অতএব মেরী যেন তার প্রিয় বোনের কাছে তাড়াতাড়ি চলে আসে। বোকা মেরীও এলিজাবেথের ফাঁদে

পা দিয়ে স্কটল্যাণ্ড থেকে ইংল্যাণ্ডে চলে এলেন। এবার মেরী হলেন এলিজাবেথের নজরবন্দী। মেরী কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্রী ন'ন। তিনি গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন এলিজাবেথের বিরুদ্ধে। অবশ্য এলিজাবেথই ইচ্ছে করে তাঁকে সেই সুযোগ করে দিয়েছিলেন নতুন করে বিপদে ফেলবার জন্য। হ'লও তাই। মেরী ধরা পড়লেন হাতেনাতে। বিচারে মেরীর হ'ল প্রাণদণ্ড। মেরীর ছেলে জেম্‌স্‌ মায়ের মৃত্যু-দণ্ডে মত দেন এই শর্তে যে এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তিনিই পাবেন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন।

ইংল্যাণ্ডে স্টুয়ার্ট রাজবংশ, গৃহযুদ্ধ ও এগারো বছরের প্রজাতন্ত্র

রাণী এলিজাবেথ বিয়ে না করায় তাঁর মৃত্যুর পর স্কটদের রাণী মেরীর ছেলে জেম্‌স্‌ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসেন (১৬০৩-১৬২৫)। জেম্‌স্‌



প্রথম জেম্‌স্‌

আগেই ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের রাজা, এবার ইংল্যাণ্ডেরও রাজা হলেন। তাঁর নাম হ'ল প্রথম জেম্‌স্‌। তাঁর রাজবংশের নাম হ'ল স্টুয়ার্ট।

এই জেম্‌স্‌কেই বলা হয় 'ক্রীশ্চান জগতের সবচাইতে পণ্ডিত অথচ বোকা রাজা' (ওয়াইজেস্ট ফুল অব্‌ দ্য ক্রিশ্চানডম্‌)। সিংহাসনে বসেই তিনি ঘোষণা করলেন, রাজা



প্রথম চার্ল্‌স্‌

হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ঈশ্বরের ক্ষমতা কতখানি সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা যেমন পাপ, রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলাও তেমনি ঘোরতর অন্যায়। রাজা দাবার ঘুঁটির মত প্রজাদের যেমন খুশি তেমনি চালাবেন। চটে গেল পার্লামেণ্ট। রাজা ঘোষণা করলেন পার্লা-মেণ্টের আয়ু নির্ভর করে রাজার দয়ার ওপর। জেম্‌স্‌-এর ছেলে প্রথম চার্ল্‌স্‌ (১৬২৫-১৬৪৯) এগারো বছর পার্লামেণ্ট ছাড়াই রাজত্ব করলেন। অর্থের চাহিদা মেটালেন প্রজাদের ওপর ইচ্ছেমত কর বসিয়ে। কিন্তু ১৬৪০ সালে স্কট-ল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে তাঁর রাজকোষ হয়ে গেল শূন্য। বাধ্য হয়ে তিনি ডাকলেন

পার্লামেন্ট। পার্লামেন্ট প্রথমেই বাতিল করে দিল চার্ল্‌স্‌-এর বসানো বেআইনী করগুলি। রাজা কিন্তু পার্লামেন্টের সব কাজেই বাধা দিতে লাগলেন। শেষে সৈন্য পরিচালনার অধিকার নিয়ে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বাধল ঝগড়া। এই ঝগড়াকে কেন্দ্র করেই শুরু হ'ল গৃহযুদ্ধ—রাজার দলের সঙ্গে পার্লামেন্টের সমর্থকদের (১৬৪২)। যুদ্ধের মীমাংসা হ'ল ১৬৪৯ সালে, যখন অলিভার ক্রমওয়েল



অলিভার ক্রমওয়েল

রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠা করলেন কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌। চার্ল্‌স্‌-এর হ'ল প্রাণদণ্ড। এরপর ক্রমওয়েল তাঁর দুর্ধর্ষ সৈন্য-বাহিনীর জোরে নিজেই সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। ক্রমওয়েল ছিলেন গোঁড়া প্রটেস্টান্ট। স্টুয়ার্ট রাজাদেরকে প্রটেস্টান্টরা 'পোপের চর' বলে সন্দেহ করতেন।

আবার রাজতন্ত্র

ক্রমওয়েল মারা যাওয়ার কিছুদিন পরই কিন্তু কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ ভেঙ্গে গেল। ১৬৬০ সালে



দ্বিতীয় চার্ল্‌স্‌

ক্রমওয়েলের অনুগত সঙ্গীরাই আবার দ্বিতীয় চার্ল্‌স্‌কে ডেকে এনে সিংহাসনে বসালেন। দ্বিতীয় চার্ল্‌স্‌ ছিলেন একজন বুদ্ধিমান্‌ এবং উচ্চকাঙ্ক্ষী রাজা। পার্লামেন্টকে শত্রু করবার ঝুঁকি কতখানি তা তিনি ভালোই বুঝতেন। গোলমাল দেখা দিল যখন দ্বিতীয় চার্ল্‌স্‌-এর ভাই দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ (১৬৮৫-৮৯) সিংহাসনে বসলেন। তিনি ছিলেন খাঁটি ক্যাথলিক। ফলে প্রটেস্টান্ট পার্লামেন্টের সঙ্গে তাঁর কোনও বনিবনাও হ'ল না। ১৬৮৮ সালে পার্লামেন্টের



দ্বিতীয় জেম্‌স্‌

সভ্যরা রাজা জেম্‌স্‌-এর প্রটেস্টান্ট মেয়ে মেরী ও জামাই উইলিয়াম অব্‌ অরেঞ্জ (হল্যাণ্ড-এর রাজা)-কে আমন্ত্রণ জানাল ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসবার জন্য। দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ পালিয়ে গেলেন ইংল্যাণ্ড থেকে। বিনা রক্তপাতেই ঘটে গেল এই পরিবর্তন। ইতিহাসে একে তাই বলা হয় 'গৌরবময় বিপ্লব'।

পার্লামেণ্ট যে ইচ্ছে করলে এক রাজাকে সরিয়ে আর কাউকে রাজা করতে পারে সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না। পার্লামেণ্ট ঠিক করল, কোন ক্যাথলিক আর ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, কোন বিদেশী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে গেলে রাজাকে অবশ্যই পার্লামেণ্টের সম্মতি নিতে হবে।

ইতিমধ্যেই কিন্তু ইংল্যাণ্ডে দু'টি দল বা পার্টির জন্ম হয়ে গেছে—হুইগ আর টোরী। হুইগরা চাইত পার্লামেণ্টই রাজার ওপর খবরদারি করুক। আর টোরীরা ছিল রাজপন্থী।

রাণী অ্যান্‌ ও তৃতীয় জর্জ

উইলিয়াম-এর পর সিংহাসনে বসেন রাণী অ্যান্‌ (১৭০২-১৭১৪)। এঁর আমলেই ইংল্যাণ্ড স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। একদিকে ছিল ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড এবং বেশির ভাগ জার্মান রাজ্যগুলি। অন্যদিকে ছিল ফ্রান্স, স্পেন ও ব্যাভেরিয়া। ১৭০৪ সালে ইংল্যাণ্ডের মার্ল্‌বরো ফ্রান্সের ক্যাথলিক রাজা চতুর্দশ লুই-এর প্রায় অপরাজেয় বাহিনীকে হারিয়ে দেন। এই যুদ্ধের পর ইয়োরোপে ফরাসীদের প্রতিপত্তি অনেকটা কমে যায়।

রাণী অ্যানের মৃত্যুর পর ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন চলে যায় হ্যানোভার রাজবংশের হাতে (১৭১৪)। হ্যানোভার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন তৃতীয় জর্জ (১৭৬০-১৮১০)। তিনি যখন ছোট্ট ছিলেন তখন থেকেই তাঁর মা তাঁকে সব সময় বলতেন, 'জর্জ, মনে রেখো তুমি রাজা।' রাজার মত রাজাই হলেন তৃতীয় জর্জ। পার্লামেণ্টকে সাজালেন নিজের খেয়াল-খুশিমত। যাকে ইচ্ছে তাকেই যখন খুশি তখন



তৃতীয় জর্জ

বরখাস্ত করলেন। ছ' ছটা ক্যাবিনেট বাতিল করে দিলেন তিনি।

তৃতীয় জর্জের রাজত্বের শুরুতে ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩)। তাঁর রাজত্বের শেষভাগেও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের চলছিল মরণপণ সংগ্রাম। মাঝামাঝি সময়ে—আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা।

আমেরিকা আবিষ্কার হবার (১৪৯২) প্রায় দেড়শ' বছর পর বহু ইংরেজ নিজেদের দেশ ছেড়ে



ফরাসী বিপ্লব

আমেরিকায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। পরে এই আমেরিকাই হয়ে উঠল ইংল্যাণ্ডের সবচাইতে বড় উপনিবেশ। ইংরেজরা আমেরিকার ওপর নানা বাধানিষেধ ও কর চাপিয়ে দেওয়াতে আমেরিকার লোকেরা বিদ্রোহ করল ও ১৭৭৬ সালে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করল। ইংরেজরা অনেক চেষ্টা করেও আমেরিকাকে আর বাগে আনতে পারল না।

এই সময় থেকেই জর্জের ক্ষমতা কমতে থাকে। ১৭৮১ সালে তিনি হঠাৎ পাগল হয়ে যান। শোনা যায়, এই সময় জর্জ একটা ওক গাছকে প্রাশিয়ার রাজা ভেবে হঠাৎ স্যালুট করে বসেন। পরে সুস্থ হয়ে তিনি আরও কিছুকাল রাজত্ব করেন। ১৮১০ সালে তিনি আবার পাগল হয়ে যান ও ১৮২০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফরাসী বিপ্লব

তৃতীয় জর্জ যখন ইংল্যাণ্ডের রাজা সেই সময়ে ফ্রান্সে ঘটল এক যুগান্তকারী ঘটনা, যা সমস্ত পৃথিবীকে নাড়া দিল ভীষণ ভাবে। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই ছিলেন শক্তিশালী রাজা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ফ্রান্সের দুর্ভাগ্য আরম্ভ হয়। পঞ্চদশ লুই তাঁর মৃত্যুর আগে ভবিষ্যৎবাণী করে যান, 'আমার পরই সব ধ্বংস হয়ে যাবে।' ষোড়শ লুই সিংহাসনে বসেই দেখলেন রাজকোষ প্রায় শূন্য। রাজা এবং তাঁর অমাত্যদের ভোগ-বিলাসের পেছনেই সব অর্থ শেষ। অথচ এই অর্থ আসে খেটে-খাওয়া গরীবদের পকেট থেকে, যাদের জীবনে নেই কোন বৈচিত্র্য বা আনন্দ। গরীবদের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফসল ভোগ করে ওপরতলার মানুষেরা—অভিজাত ও যাজক শ্রেণী। ষোড়শ লুইএর সুন্দরী স্ত্রী মেরী আঁতোয়ানিয়েত আবার ছিলেন অত্যন্ত সৌখীন ও বিলাসী। তাঁর পেছনেও খরচ হ'ত বিস্তর। তা ছাড়া ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে লেগে-থাকা যুদ্ধের একটা বিরাট খরচা তো ছিলই। গল্প আছে, গরীব প্রজারা যখন এক টুক্‌রো রুটির জন্য বুক চাপড়ে

হাহাকার করছিল ভার্সাই রাজপ্রাসাদের সামনে, মেরী তখন অবাক্ হয়ে তাঁর পার্শ্বচরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'গরীবরা রুটি পাচ্ছে না তো কেক্ কিনে খাচ্ছে না কেন ?'

এই সময় ফ্রান্সে রুশো, ভলতেয়ার, মঁতেস্কু প্রমুখ দার্শনিকেরা তাঁদের চিন্তাধারার সাহায্যে **বিপ্লবের পরিবেশ** তৈরি করে চলেছিলেন। **এবার জনসাধারণকে** নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন **মিরাবো, দাঁতো, ম্যারা।** ফ্রান্সের উপোসী **ও বেপরোয়া মানুষের** দল ঝাঁপিয়ে পড়ল **অত্যাচারের মূর্ত প্রতীক** বাস্তিল দুর্গের ওপর (**১৪ জুলাই, ১৭৮৯**), যেখানে হাজার হাজার মানুষ বিনা বিচারে বন্দী হয়ে মৃত্যুর দিন গুণত। বাস্তিল দুর্গের পতন হ'ল। বিপ্লব এগিয়ে চলল দ্রুতলয়ে। গিলোটিনের ধারাল ব্লেড রাজা ও রাণীর দেহ থেকে মুণ্ডু খসিয়ে দিল। রাজতন্ত্রের শেষ হ'ল ফ্রান্সে। বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চে এলেন রোবস্পীয়র, গিলোটিনের তলায় বইয়ে দিলেন রক্তের স্রোত। এবার ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, স্পেন, পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশ একযোগে আক্রমণ করল বিপ্লবী ফ্রান্সকে। উদ্দেশ্য—তাদের বিপ্লবের বীজকে আর বাড়তে না দেওয়া ; তা হলে রাজতন্ত্র ভেঙ্গে যাবে তাদের দেশেও।

নেপোলিয়নের অভ্যুদয়

এগিয়ে এলেন ফ্রান্সের পরিত্রাতা নেপোলিয়ন বোনাপার্টি (নাপোলিওঁ)। তিনি একে একে সব ক'টি বিদেশী শক্তিকেই পরাজিত করে স্বদেশকে রক্ষা করলেন। কিন্তু ফ্রান্সের ভিতরকার অবস্থা ছিল শোচনীয়। দেশে না



নেপোলিয়ন

ছিল কোনও শৃঙ্খলা, না ছিল কোনও নেতা। সুযোগ বুঝে নেপোলিয়ন নিজেই এবার সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। তাঁর সংগঠনী ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। দেশকে গড়ে তোলার কাজ শেষ করে এবার তিনি বেরোলেন বিদেশী রাজ্যগুলিকে শায়েস্তা করতে। বললেন—সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব—ফরাসী বিপ্লবের এই তিন মহান্ বাণীই ছড়িয়ে দেবেন তিনি তরবারির মুখে। ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ন নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট্ বলে ঘোষণা করলেন। একে একে তিনি অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, স্পেন, ইজিপ্ট, ইতালি দখল করে নিলেন। কিন্তু পারলেন না শায়েস্তা করতে চিরশত্রু ইংল্যাণ্ডকে। রাশিয়াকে দখল করতে গিয়ে নেপোলিয়ন এবার মস্ত ভুল করলেন। রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতে বেশির ভাগ সৈন্য খুইয়ে কোনমতে প্রাণ নিয়ে তাঁকে ফিরতে হ'ল ফ্রান্সে। ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার নেতৃত্বে বিরোধী শক্তিরা এবার নেপোলিয়নকে বন্দী করে এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসন দিল। নেপোলিয়ন

কিন্তু এল্‌বা থেকে পালিয়ে আবার দেশে ফিরলেন। এর পর ওয়াটারলুর যুদ্ধে (১৮১৫) নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডের ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের হাতে পরাজিত হয়ে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন। সেখানেই তিনি মারা যান।

নেপোলিয়নের পতন হ'ল, কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ও ভাবধারাকে মুছে ফেলা সম্ভব হ'ল না। সাম্য ও স্বাধীনতার ভাবধারা থেকেই জন্ম নিল গণতান্ত্রিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধ। ভিয়েনা কংগ্রেসে (১৮১৫) বিজয়ী পক্ষ অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া ছিল রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল। তা সত্ত্বেও ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লবকে (ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে) ঠেকাবার মত শক্তি তাদের ছিল না। ১৮৪৮ সালেই শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবে প্রথম অংশ গ্রহণ করে। ঐ একই বছরে কার্ল মার্ক্‌স্-এর 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো' ছাপা হয়।

ভারতে মোগল সাম্রাজ্য

ইয়োরোপ ছেড়ে এবার আমরা ভারতবর্ষে ফিরে আসছি।

পানিপথের যুদ্ধে (১৫২৬) সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে হারিয়ে বাবর দিল্লীর সিংহাসনে মোগল বংশের গোড়াপত্তন করেন। এখন, প্রশ্ন হ'ল, সুলতানী রাজ্যের পতনের কারণ কি ? প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্‌ড্ টয়ন্‌বীর মতে যে কোন সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ভিতরকার শত্রু,—বাইরের শত্রু নয়। চিন্তা করলে তোমরাও বুঝতে পারবে যে বাইরের শত্রু বাবরের আক্রমণের ফলেই দিল্লীর লোদী বংশের পতন হয় নি।



বাবর
(প্রাচীন চিত্র থেকে)

পরাজয়ের আসল কারণ ছিল সুলতানী শাসনের দুর্বলতা। লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম আবার ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল আর অকর্মণ্য। সুলতানের তেমন দৃষ্টি না থাকাতে সেনাবাহিনীতেও ঢুকে গিয়েছিল বিশৃঙ্খলা। এই কারণেই বাবরের ক্ষুদ্র শক্তির কাছে হার মানতে হয়েছিল ইব্রাহিম লোদীর বিরাট বাহিনীর। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে বাবরের শক্তির আসল উৎস ছিল কামান, যা তখন ভারতীয়দের কাছে অজ্ঞাত ছিল।

এখন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের কথাতেই আসা যাক। কারা ছিল এই মোগল ? মোগল কথাটা এসেছে 'মোঙ্গল' শব্দ থেকে।

এই মোঙ্গলরা ছিল মধ্য এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ জাত, সমস্ত এশিয়ার আতঙ্ক। এদের একজন শ্রেষ্ঠ নায়কের নাম চেঙ্গিস খাঁ। এর পরেই নাম করতে হয় তৈমুর লঙ্গ-এর। তৈমুরের শরীরে ছিল মোঙ্গল আর তাতার রক্ত। বাবর ছিলেন বাপের দিক্ দিয়ে তৈমুরের আর মায়ের দিক্ দিয়ে চেঙ্গিস খাঁর বংশধর।

'বাবর' মানে হ'ল সিংহ। সিংহের মতই তেজস্বী ছিলেন এই বাবর। খুব অল্প বয়স থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনসংগ্রাম। মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি ফরগনার রাজা হন উত্তরাধিকার সূত্রে, কিন্তু আত্মীয়দের ষড়যন্ত্রে সিংহাসন হারান। এর কিছুদিন পর তিনি কাবুল অধিকার করেন। এর পরের ঘটনা পানিপথের যুদ্ধ ও বাবরের ভারতপ্রবেশ। ভারতে তখন সবচাইতে শক্তিশালী রাজা ছিলেন রাজপুত বীর রাণা সংগ্রামসিংহ। খানুয়ার যুদ্ধে বাবর তাঁকেও হারিয়ে দেন (১৫২৭)। ১৫৩০ সালে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে বাবর মারা যান। এ সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে। একবার তাঁর ছেলে হুমায়ুন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাবর কোন এক পীরের কাছ থেকে জানতে পারেন যে তিনি যদি তাঁর সবচাইতে প্রিয় জিনিস খোদাকে নিবেদন করেন তা হলেই কেবল হুমায়ুন বাঁচবে। বাবর নিজের প্রাণের বিনিময়ে হুমায়ুনকে বাঁচাবার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা জানান। হুমায়ুন সেরে ওঠেন, কিন্তু বাবর মারা যান।

বাবর মোগল হলেও তাঁর পূর্বপুরুষদের মত নিষ্ঠুর আর হিংস্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুশাসক আর রুচিবান্। তাঁর লেখা আত্মজীবনী ঐতিহাসিকদের কাছে এক মূল্যবান্ গ্রন্থ।



শের শাহ্

আবার আফগান : এলেন শের শাহ্

বাবরের পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু বাবরের মত প্রতিভাবান্ তিনি ছিলেন না। আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি সিংহাসন হারান। আফগান-নায়ক শের শাহ্ এবার সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ফরিদ খাঁ ছিল তাঁর আসল নাম। একবার একা লড়াই করে একটা বাঘ মারার জন্য তিনি 'শের' উপাধি পান। চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯) হুমায়ুনকে হারিয়ে শের খাঁ হলেন শের শাহ্। বাবরের মতই শেরেরও প্রথম জীবন কাটে ভাগ্যবিড়ম্বনা ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। যুদ্ধক্ষেত্রেই এই বীরের মৃত্যু ঘটে (১৫৪৫), কিন্তু এর মধ্যেই তিনি গৌড় (বাংলা দেশ), সিন্ধুদেশ, মুলতান, গোয়ালিয়র, মালব ও রায়সিন দুর্গ জয় করেন। মেবারও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে।

শের শাহ্-র আসল পরিচয় কিন্তু যুদ্ধজয়ী বীর হিসেবে নয়, সুশাসক হিসেবে। ভারতের ইতিহাসে শের শাহ্-র মতো সুশাসক খুব বেশি জন্মান নি। এ যাবৎ মুসলমান শাসকেরা ওয়াজির নামে এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ফলে এই ওয়াজিররা অত্যাচারী হলে প্রজাদের দুর্ভোগের শেষ থাকত না। আবার ওয়াজিররা ক্ষমতালোভী হলে সুলতানের পক্ষে তাদের দাবিয়ে রাখা মুশ্‌কিল হ'ত, কারণ প্রজাদের সঙ্গে সুলতানের কোন সরাসরি যোগাযোগ ছিলনা। শের শাহ্ ওয়াজির প্রথা উঠিয়ে দিয়ে প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি নিজের যোগাযোগ স্থাপন করলেন। মুসলমান শাসন-ব্যবস্থায় আর একটি চল্‌তি প্রথা ছিল জায়গীর প্রথা। এই প্রথা অনুযায়ী রাজকর্মচারীরা মাস-মাইনের বদলে জমির অধিকার পেত। পুরুষানুক্রমে সেই জমির মালিকানা অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের ওপরও বর্তাত। শের এই প্রথা উঠিয়ে দিয়ে রাজকর্মচারীদের মাস-মাইনে দেওয়া চালু করেন। শেরের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব জমি অনুযায়ী জমির খাজনা বেঁধে দেওয়ায়। সুবিচারক হিসেবেও শের ছিলেন আদর্শ। তিনি আলা-উদ্দীন খিলজী বা ফিরুজ তুঘলক্-এর মত ধর্মোন্মাদ ছিলেন না। তাঁর সেনানায়ক ছিলেন একজন হিন্দু বাঙ্গালী—ব্রহ্মজিৎ গৌড়। শেরের আর একটি বড় কৃতিত্ব হ'ল রাস্তাঘাট নির্মাণ। বর্তমানে যাকে বলা হয় 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড', সেই বিরাট লম্বা রাস্তা শের শাহ্-র সময়েই তৈরি হয়। শের শাহ্-র শাসন-প্রতিভার সঙ্গে একমাত্র আকবরেরই কিছুটা তুলনা চলে।

মোগল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আকবর

আকবর হলেন হুমায়ুনের ছেলে। শেরের উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহ্‌কে হটিয়ে হুমায়ুন ১৫৫৫ সালে আবার দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। ১৫৫৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর আকবর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। আকবরের প্রথম বাধা ছিল এক প্রচণ্ড শক্তি-শালী হিন্দু রাজা—হিমু বা রাজা বিক্রমজিৎ। ১৫৫৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে হিমু আকবরের কাছে পরাজিত হন। ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৯ বছর আকবর রাজত্ব করেন। এই সময়ে মোগল সাম্রাজ্য উত্তরে কাবুল ও



আকবরের নবরত্ন সভা
(প্রাচীন চিত্র থেকে)

কাশ্মীর থেকে পূর্বে বাংলা দেশ ও দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

আকবর ছিলেন বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, শুধু তলোয়ারের জোরেই দেশকে মুসলমানেরা শাসন করতে পারবে না। শের শাহ্-র মত আকবরও ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, সাম্রাজ্যকে স্থায়িত্ব দিতে গেলে স্বাধীনচেতা হিন্দু রাজপুতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। এই রাজপুতদের তেমন রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। বিদেশী মুসলমানদের বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়াবার প্রয়োজন তারা কখনও বোঝে নি। কিন্তু এদের একটা বড় গুণ ছিল, এরা কখনও কথার খেলাপ করত না। আকবর তাই পেরেছিলেন রাজপুতদের ওপর নির্ভর করতে। রাজপুত বীর মানসিংহ হলেন তাঁর প্রধান সেনাপতি। টোডরমলকে করলেন তিনি রাজস্বমন্ত্রী।

কিন্তু বাদ সাধলেন মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ। রাজপুত ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে মেবারের বশ্যতা স্বীকার করাকে তিনি আজীবন ঘেন্না করতেন। অতএব আকবরের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হ'ল হলদিঘাটের মাঠে (১৫৭৬)। প্রতাপের ক্ষুদে রাজপুত বাহিনী হেরে গেল যুদ্ধে, কিন্তু তাদের অপূর্ব বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কাহিনী অমর হয়ে রইল ইতিহাসের পাতায়। প্রতাপ ছাড়াও আকবরকে শক্ত বাধা দিয়েছিলেন আহম্মদনগরের চাঁদবিবি ও বাংলার বারো ভুঁইয়া,—যাঁদের মধ্যে ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আকবরকে যদি মহান্ বলতে হয় তবে তা তাঁর অপরের ধর্ম সহ্য করার নীতির জন্যেই। শেখ মুবারক, ফৈজী, আবুল ফজল প্রমুখ মনীষীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আকবর জন্ম দেন এক নতুন ধর্মের—দীন ইলাহী। কিন্তু এ ধর্ম প্রচারের অভাবে বেশি দিন টেঁকে নি। নিজে নিরক্ষর হলেও আকবর কিন্তু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিকে যোগ্য সমাদর দিতে জানতেন। বিক্রমাদিত্যের মত তাঁরও ছিল নবরত্ন সভা। এই সভা গানের রাজা তানসেন ও হাস্যরসিক রাজা বীরবল আলো করে রাখতেন।

আকবরের পরে

আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-২৭) মোগল সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হয়। তিনি তাঁর বড় ছেলে খসরুর বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন। খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুনের প্রাণদণ্ড হয়। এতে কিন্তু সমস্ত শিখ জাতিই মোগলদের ওপর চটে যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে জাহাঙ্গীর ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী ও অসংযত। মেহেরুন্নিসা নামে অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়েকে তিনি খুব পছন্দ



শাহ্ জাহান ও মমতাজ

করতেন। পরে মেহেরুন্নিসার স্বামী শের আফগানকে হত্যা করিয়ে জাহাঙ্গীর তাঁকে বিয়ে করেন। বর্ধমান শহরে শের আফগানের সমাধি এখনও আছে। এই মেহেরুন্নিসাই পরে নূরজাহান নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন রূপসী তেমনি বুদ্ধিমতী। শেষ জীবনে কিন্তু সম্রাট্ নূরজাহানের ওপর বড় বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এই সময় তৃতীয় ছেলে খুর্‌রম (শাহ্‌জাহান) জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই স্যর টমাস রো ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্-এর দূত হিসেবে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন ও চার বছর ভারতে কাটিয়ে যান। তাঁর লেখা থেকে জাহাঙ্গীরের আমলের ভারত সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়।

জাহাঙ্গীরের পরই ভারতের সিংহাসনে আসেন শাহ্‌জাহান (১৬২৮-৫৯), যাঁর তাজমহল আর ময়ূর সিংহাসনের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। শাহ্‌জাহান তাঁর প্রিয় পত্নী মমতাজের নামেই তাঁর সমাধিসৌধের নাম রাখেন 'তাজমহল'। তোমরা তাজমহল আর আগ্রার দুর্গ দেখলে শাহ্‌জাহানের সৌখীনতা আর শিল্পীমনের কিছুটা পরিচয় পাবে। তবে শুধু সৌখীনতা নয়, নিষ্ঠুরতার দিক্ থেকেও শাহ্‌জাহান কোন অংশে কম্‌তি ছিলেন না। আকবর এবং জাহাঙ্গীরের মত উদার ও সহিষ্ণুও তিনি ছিলেন না।

ঔরংজেব মোগল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনলেন

সিংহাসনের লোভে বাপের বিরুদ্ধে ছেলের



ঔরংজেব (মোগল চিত্র)

বিদ্রোহ সুলতানী ও মোগল যুগের এক অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু বিদ্রোহ ও বিশ্বাস-ঘাতকতার এক জঘন্য ইতিহাস রচনা করলেন শাহ্‌জাহানের তৃতীয় ছেলে ঔরংজেব (১৬৫৮-১৭০৭)। তিনি তাঁর বড় ভাই দারা আর ছোট ভাই মুরাদকে হত্যা করে ও বুড়ো বাপকে আগ্রার কেল্লায় বন্দী করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান এবং অসম্ভব হিন্দু-বিদ্বেষী। এমন কি শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরও পরিত্রাণ ছিল না. তাঁর হাত থেকে। ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে শিখ, রাজপুত, জাঠ ও বুন্দেলা সম্প্রদায় এবং দক্ষিণ ভারতে মারাঠারা এই ধর্মোন্মাদ সম্রাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। সম্রাট কাউকেই আবার বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং তিনি নিজেই সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ালেন বিদ্রোহ দমন করতে ও রাজ্য বাড়াতে। এ ভাবেই চিরটা

কাল যুদ্ধ করে করে অবসন্ন ঔরংজেব মারা গেলেন ১৭০৭ সালে।

এত সব বলেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কূটনীতিতে ঔরংজেবের তুলনা মেলা ভার। তবে এ কথাও ঠিক যে আকবরের মত দূরদর্শিতা তাঁর ছিল



দারা (মোগল চিত্র)

না। আর সে জন্যেই তাঁর মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের পতন ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা।

শিবাজী ও মারাঠা সাম্রাজ্য

ঔরংজেবের বিরুদ্ধে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যখন গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখরা এবং রাজসিংহ ও দুর্গাদাসের নেতৃত্বে রাজপুতরা গর্জে উঠেছিল, সেই সময় দক্ষিণ ভারতে এক তরুণ মারাঠী সমস্ত ভারত যুড়ে হিন্দুরাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছিলেন। এই তরুণই হলেন শিবাজী। তিনি বুঝেছিলেন সম্মুখযুদ্ধে ঔরংজেবের বিশাল বাহিনীকে হারিয়ে দেওয়া স্বপ্নের মতই অবাস্তব। কিন্তু মোগলদের ঘায়েল করা যাবে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে।



শিবাজী

শত্রুকে প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করার নামই গেরিলা যুদ্ধ।

ঔরংজেব শিবাজীকে শায়েস্তা করবার অন্য কোন উপায় না দেখে ছলের আশ্রয় নিলেন। তিনি শিবাজীকে নিজের দরবারে আমন্ত্রণ করে পরে বন্দী করলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ শিবাজী ফলের চুপড়িতে লুকিয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। এর পরই শুরু হয় শিবাজীর আপোষহীন সংগ্রাম। মোগলরা যেমন হিন্দুদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করত, মারাঠারাও তেমনি মুসলমান শাসন-কর্তাদের কাছ থেকে চৌথ আর সরদেশমুখী আদায় করত। এ-ভাবেই শিবাজী এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন পশ্চিম ভারতে। ১৬৭৪ সালে তিনি ছত্রপতি উপাধি ধারণ করেন। ১৬৮০ সালে এই মহাবীরের মৃত্যু হয়।

শিবাজীর বংশধররা কিন্তু শিবাজীর মত প্রতিভাবান্ ছিলেন না। তা সত্ত্বেও ঔরংজেবকে তাঁরা শক্ত বাধাই দিয়েছিলেন।

মারাঠা রাজ্যে ছত্রপতি ছিলেন সর্বেসর্বা। কিন্তু কালক্রমে ছত্রপতির ক্ষমতা কমতে থাকে এবং তাঁর প্রধান মন্ত্রী বা পেশোয়াই রাজ্যের প্রধান হয়ে ওঠেন। পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের আমলে ছত্রপতি রইলেন নাম কা ওয়াস্তে রাজা, আর পেশোয়া দখল করলেন তাঁর সমস্ত ক্ষমতা।

বালাজীর ছেলে পেশোয়া বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০) ছিলেন শিবাজীর মতই বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী। তিনিও হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের কথা চিন্তা করতেন। হায়দরাবাদের নিজাম ও মোগল সম্রাটের মিলিত বাহিনীকে তিনি ভূপালের কাছে পরাজিত করেন (১৭৩৭)। পোর্তুগীজদেরও পরাজিত করে তিনি সলসেট্ ও বেসিন দখল করেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা সাম্রাজ্য কয়েকটি ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যেমন, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার গাইকোয়াড়, নাগপুরের ভোঁসলে। বাজীরাও এই সব রাজ্যগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে 'মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করেন।

বাংলা দেশে ইংরেজের আবির্ভাব

রেনেসাঁর ইতিহাস পড়বার সময় তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ ইয়োরোপে কি ভাবে সামন্ততন্ত্রের বিলোপ ঘটল, ধনতন্ত্রের আবির্ভাব হ'ল। ধনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। 'মুক্তো ও মশলার দেশ' ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তাই একে একে হাজির হ'ল পোর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি হরেক রকমের জাতি। পোর্তুগীজরা গোয়া, দমন ও দিউতে নিজেদের **আস্তানা** গেড়ে বসল। ফরাসীরাও পণ্ডিচেরী (**দক্ষিণ** ভারত) ও চন্দননগরে (বাংলা) কুঠি স্থাপন করল। ইংরেজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি ছিল মাদ্রাজে, কলকাতায়, মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে আর মুম্বাইতে (বম্বে)।

প্রথম থেকেই ইংরেজ বণিক্দের লক্ষ ছিল মোগল সম্রাট্দের কাছ থেকে কিছু বাণিজ্যিক সুবিধে আদায় করা। কিন্তু ঔরংজেবের দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে ইংরেজরা বাংলা দেশে তেমন সুবিধে করতে পারে নি। নবাব আলিবর্দী খাঁও (১৭৪০-১৭৫৬) ইংরেজদের সন্দেহের চোখে দেখতেন। তবে মারাঠা বর্গীদের আক্রমণে সব সময়ে বিব্রত থাকাতে আলিবর্দী ইংরেজদের শত্রুতার চাইতে মিত্রতাই বেশি পছন্দ করতেন।

ইতিমধ্যে **অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের** উত্তরাধিকার নিয়ে **ইয়োরোপে এক ঘোরতর যুদ্ধ** শুরু হয়েছিল (১৭৪০)। **এই যুদ্ধের ঢেউ** এল ভারতেও। **ইংরেজ ও ফরাসীরা নিজেদের** মধ্যে যুদ্ধ শুরু করল **দক্ষিণ ভারতে। কর্ণাটের প্রথম** যুদ্ধে তেমন সুবিধে করতে না পারলেও কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজরা রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ফরাসীদের নাস্তানাবুদ করল বেশ ভালো ভাবেই। ফরাসী নায়ক ত্যুপ্লে ভারত ছাড়তে বাধ্য হলেন।

বাংলা দেশের কলকাতায় ইংরেজরা তখন বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। ১৬৯০ সালে এই কলকাতা গড়ে তোলেন একজন ইংরেজ—নাম জব্ চার্নক। ইংরেজরা কলকাতার বুকে গড়ে তুলল তাদের বিখ্যাত দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম।

আলিবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা যখন বাংলার সিংহাসনে বসেন (১৭৫৬) তখন ঘটনার স্রোত বইছিল ইংরেজদের অনুকূলে। সিরাজের উদ্ধত ব্যবহার ক্ষমতাবান্ অনেক ব্যক্তিকেই শত্রু করে তুলল। এঁদের মধ্যে মীরজাফর (প্রধান সেনাপতি), রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র



সিরাজউদ্দৌলা

প্রভৃতি সিরাজকে গদীচ্যুত করার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। সিরাজ বুঝতে পেরে কলকাতা দখল করে নিলেন। ইংরেজরা ফলতা দুর্গে পালিয়ে গেল। তখন মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভ আর ওয়াটসন এসে কলকাতা পুনর্দখল করলেন—



ক্লাইভ



মীরজাফর

একরকম বিনা যুদ্ধেই। এর পর পলাশীর মাঠেই হ'ল চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষা (২৩শে জুন, ১৭৫৭)। মীরমদন ও মোহনলালের বীরত্ব সত্ত্বেও মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের পরাজয় ঘটল।

শর্ত অনুযায়ী ক্লাইভ সেই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকেই মসনদে বসিয়ে বাংলার রাজকোষ প্রায় শূন্য করে ফেললেন। দেখা গেল নবাব শুধু



মীরকাশিম

নামে রাজা, আসল ক্ষমতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। ১৭৬০ সালে ইংরেজরা ষড়যন্ত্রের ওজুহাতে মীরজাফরকে সরিয়ে দিয়ে মীরকাশিমকে মসনদে বসাল। মীরকাশিম ছিলেন দৃঢ়চেতা নবাব। তিনি অযোধ্যার নবাব

সুজাউদ্দৌলা এবং মোগল সম্রাট্ শাহ্ আলমের সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের তাড়াতে চাইলেন বাংলা থেকে, কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) হেরে গিয়ে পালাতে হ'ল তাঁকে। মসনদে আবার এসে বসলেন "পুতুল নবাব" মীরজাফর। এইভাবে বাংলায় মুসলিম রাজত্ব ফিরিয়ে আনবার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধঃ ১৭৬১

ইংরেজরা যখন বাংলা দেশে বেশ জেঁকে বসেছে, সেই সময় পশ্চিম ভারতে শুরু হয়েছে অন্য নাটক। বাজীরাও মারাঠা শক্তিকে ভারতের পয়লা নম্বর শক্তি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর (১৭৪০) বালাজী বাজীরাও হলেন পেশোয়া। বাজীরাও-এর নীতি বিসর্জন দিয়ে নতুন পেশোয়া কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অবাধে চালাতে লাগলেন লুঠতরাজ। মোগল সম্রাট্ তখন মারাঠাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছেন।

কিন্তু এই সময় দিল্লীর ওপর নজর পড়ল আফগানিস্তানের সুলতান আহম্মদ শাহ্ আবদালীর। ১৭৪৮ থেকে শুরু করে বেশ কয়েকবার তিনি দিল্লী আক্রমণ করে প্রচুর ধন-সম্পদ্ লুঠ করেন। মারাঠারা এবার আবদালীর সঙ্গে মোকাবিলায় এগিয়ে এল। পানিপথে মারাঠা-আফগানে দেখা হ'ল। এই যুদ্ধে মারাঠারা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হ'ল। এদের পরাজয়ের কারণ দু'টি। প্রথমত, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লুঠতরাজ চালিয়ে মারাঠারা হিন্দু রাজাদের সমর্থন হারায়। দ্বিতীয়তঃ, তাদের চিরাচরিত গেরিলা পদ্ধতি বিসর্জন দিয়ে মারাঠারা নিজেদের পরাজয় ডেকে আনে।



আহম্মদ শাহ্ আবদালী

মারাঠাদের এই পরাজয়ে সবচাইতে লাভবান্ হ'ল ইংরেজ। যদিও মারাঠারা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আবার শক্তিসঞ্চয় করেছিল, কিন্তু তারা তাদের পুরোনো ঐক্য ও শৃঙ্খলা আর ফিরে পেল না। ইংরেজরা ততদিনে এগিয়ে গেছে অনেক দূর।

কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্র :
জঁা জ্যাক্স্ রুশো

ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরা থেকে সরে এসে এবার আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই যে ভদ্রলোকটির গল্প শোনাচ্ছি তিনি কিন্তু কোন সম্রাট্, রাজা অথবা রাজকুমার ন'ন। এমন কি কোন বীর যোদ্ধা বা অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকও তিনি ছিলেন না। আর এঁকে ভদ্রলোক বলা চলে কিনা তা নিয়েও সে যুগের লোকদের মধ্যে,

বলতে গেলে, যথেষ্ট সংশয় ছিল। অথচ ফরাসী বিপ্লবের সময়কার ফ্রান্সে এই লোকটির নামই উচ্চারিত হ'ত সবচাইতে বেশি। কাফেতে, রেস্তোরাঁয়, অভিজাত পরিবারের চায়ের টেবিলে, এমন কি ফরাসী সম্রাট্ ষোড়শ লুই-এর খাস অন্দর-মহলেও 'জাঁ জ্যাক্স্ রুশো' এই নামটি ছিল বিশেষ পরিচিত।



রুশো বই লিখছেন।

রুশো যে কী ছিলেন না সে কথা বলা বড় শক্ত। প্রথম জীবনে বাঁচার তাগিদে তাঁকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। এই লোকটিকে আমরা তাই দেখেছি বহু রূপে—একবার গৃহশিক্ষক, পরমুহূর্তেই আবার কারো সেক্রেটারী, এমন কি কখনো আবার কারও বাড়ির চাকর। তাঁর সংস্পর্শে এসে যে ধারণা স্বভাবতই জন্মায় তা হ'ল রুশো ছিলেন এক অত্যন্ত অসৎ, সদাই অসন্তুষ্ট এবং চরিত্রহীন ব্যক্তি। কিন্তু এই সব পরিচয়ের আড়ালে 'রুশো' নামে যে বিরাট প্রতিভা লুকিয়ে ছিল তা ফ্রান্সকে,—শুধু ফ্রান্সকেই বা বলি কেন, সমস্ত ইয়োরোপকেই নাড়া দিয়েছিল ভীষণ ভাবে। ইতিহাসের কাছে রুশোর পরিচয়—তিনি ছিলেন একজন মস্ত বড় দার্শনিক বা ভাবুক।

ফরাসী বিপ্লবের কারণ কি এ প্রশ্ন যদি তোমাদের করা হয় তা হলে তোমরা নিশ্চয় ইতিহাসের বই ঘেঁটে বার করবে অনেক কারণ। কিন্তু তখনকার লোকদের যদি প্রশ্ন করা হ'ত, তাঁরা কিন্তু উত্তরে বলতেন একটি কথাই— জাঁ জ্যাক্স্ রুশো।

শুনে নিশ্চয়ই অবাক্ লাগবে এই ভেবে যে যার নিজেরই কোন চালচুলো নেই এমন একজন 'ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দারে'র পক্ষে কি করে এত বড় একটা বিপ্লব করা সম্ভব হ'ল? আর তা ছাড়া ফরাসী বিপ্লব তো হয়েছিল ১৭৮৯ সালে, আর রুশো মারা গেছেন ১৭৭৮ সালে—অর্থাৎ বিপ্লবের ১১ বছর আগে। তবে এই লোকটি কেমন করে বিপ্লব করতে পারেন?

না, রুশো নিজে কোন রক্তাক্ত বিপ্লব করেন নি। তবে তাঁর চিন্তা আর লেখাই ছিল ভাবজগতের এক বিপ্লব, আর ভাবজগতের এই বিপ্লবই এনেছিল ফরাসী দেশে রক্তাক্ত বিপ্লব। রুশোই প্রমাণ করলেন যে কলমের নিবের ধার তরবারির ধারের চাইতেও বেশি।

রেনেসাঁর ইতিহাস পড়তে গিয়ে তোমরা

দেখবে যে মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহ্রা জন-সাধারণকে এ কথাই বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে তাঁরা হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ হ'ল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, যা নাকি একটা ক্ষমার অযোগ্য পাপ। রেনেসাঁ-যুগে এই ভাবধারা কিন্তু পালটাতে আরম্ভ করে। প্রজারা যখন আর রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে মানতে বা বিশ্বাস করতে চাইল না তখনই রাজপন্থী ইংরেজ দার্শনিক হব্স্ লিখলেন তাঁর 'লেভায়াথান'। এই বইটিতে তিনি লিখলেন, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোন অধিকারই নেই প্রজাদের, কারণ প্রজারাই চুক্তি করে রাজার হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রজারা কেন করল এমন চুক্তি? হব্স্ বললেন, এমন একটা চুক্তির প্রয়োজন হয়েছিল, কারণ কোন শাসক না থাকলে আইন ও শৃঙ্খলা থাকতে পারে না। আর মানুষ যে হেতু স্বার্থপর, হিংসুটে, সুতরাং শান্তিও আসতে পারে না রাজার অবর্তমানে। অতএব রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা শুধু বে-আইনী নয়, বোকামিও বটে। কারণ রাজাকে না মানলে রাজ্যে আবার অশান্তি ফিরে আসবে, আর প্রজারাও নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ধ্বংসের পথে এগুবে।

রুশো কিন্তু মানলেন না এই যুক্তি। তিনি লিখলেন তাঁর 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট'-এ—চুক্তি একটা হয়েছিল ঠিকই, তবে এ চুক্তি দ্বারা প্রজারা মোটেই চূড়ান্ত ক্ষমতা তুলে দেয় নি রাজার হাতে। চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হ'ল আসলে জনগণের ইচ্ছা, যাকে বলা যায়



মেরী আঁতোয়ানিয়েত

'জেনারেল উইল', আর রাজা হলেন এই 'জনগণের ইচ্ছা'রই প্রতিনিধি। অতএব রাজা যদি স্বেচ্ছাচারী হ'ন, তা হ'লে জনগণ রাজাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারেন। রুশো আরও লিখলেন, মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মায়, কিন্তু তারপরই মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে সর্বত্র বাঁধা পড়ে। এই পরাধীনতার বিরুদ্ধেই ছিল রুশোর বিদ্রোহ।

রুশোর লেখা পড়ে সমস্ত ফরাসী জাতি যেন জেগে উঠল নতুন উদ্যমে। গরীবদের ওপর মুষ্টিমেয় ক'জন ধনীর যুগ যুগ ধরে অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে সমস্ত ফরাসী জাতি রুখে দাঁড়াল। সম্রাট ষোড়শ লুই ছিলেন অপদার্থ। রাণী মেরী আঁতোয়ানিয়েতের বিলাসের পেছনেই তিনি রাজকোষের সব



ষোড়শ লুই

সম্পদ্ ঢেলে দিয়েছিলেন। অতএব প্রজারা দাবী করল রাজাকে ছেড়ে দিতে হবে সিংহাসন। এখন, প্রশ্ন হ'ল, এত সাহস প্রজারা পেল কোথা থেকে? আর্থিক অনটন আর ধনীদের অত্যাচার নিশ্চয়ই তাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস যোগায় নি, কারণ অত্যাচার মুখ বুজে সয়ে যাওয়া তো গরীবদের বহুকালের অভ্যাস। এর উত্তরও কিন্তু একটাই —জাঁ জ্যাক্‌স্ রুশো। এঁর লেখা পড়েই ফরাসী মধ্যবিত্তদের রাজভক্তি দূর হয়, আর এই ফরাসী মধ্যবিত্তরাই নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ মানুষকে নেতৃত্ব দেন বিপ্লবের পথে।

রুশোর ব্যক্তিগত জীবন কিন্তু অদ্ভুত। এত বড় দার্শনিক রুশো শেষ জীবনে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন চিন্তা করতে করতে। মৃত্যুর আগে সমস্ত চিন্তাশক্তিই তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। শুধু শেষ বয়সে নয়, সারা জীবনই রুশো পাগলামোর পরিচয় দিয়েছেন অনেকবার। বাচ্চাদের কি ভাবে মানুষ করতে হয় এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন বিস্তর, কিন্তু মজার কথা এই, নিজের বাচ্চাদের কি ভাবে মানুষ করবেন সে সম্বন্ধে ভেবে কূল না পেয়ে তিনি স্ত্রীকে না জানিয়ে তাদের এক অনাথ আশ্রমের সামনে ফেলে রেখে আসেন। রুশোর সন্তানদের আর পরে কোন হদিশ মেলে নি। এমনই পাগল ছিলেন এই বিরাট দার্শনিক।

কিন্তু যখন মনে পড়ে, ফরাসী বিপ্লবের তিনটি মহান্ বাণী—স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব —আসলে রুশোরই চিন্তার ফসল, তখন আপনা থেকেই আমাদের মাথা নত হয়ে আসে এই বিরাট মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধায়।

নূরজাহান

নূরজাহান মোগল ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ইতিহাসে মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পত্নী হিসেবেই তিনি পরিচিত। কিন্তু এই পরিচয়ের আড়ালে যে কাহিনী রয়েছে এবার তোমাদের তাই শোনাব।

নূরজাহান বা 'জগতের আলো' হচ্ছে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দেওয়া নাম। আসল নাম মেহেরুন্নিসা। মেহেরের বাবা ঘিয়াস বেগ ও মা যখন তেহেরান থেকে ভাগ্যের সন্ধানে আসছিলেন হিন্দুস্থানে, তখন পথের মধ্যেই নির্জন মরুপ্রান্তরে এক বাবলা গাছের তলায় জন্ম হয় মেহেরুন্নিসার। গল্প আছে যে এই সময় ঘিয়াস্ ও তাঁর পত্নী এমনই দুর্দশায় পড়েছিলেন যে মেয়েকে বাঁচাবার কোন উপায় না দেখে তাঁরা পথের মাঝেই কচি মেয়েকে শুইয়ে রেখে রওনা হ'ন। আশা তাঁদের, কোন সদাশয় ব্যক্তি যদি মেহেরকে আশ্রয় দেন নিজের বাড়ীতে। কিন্তু বাপ-মায়ের প্রাণ! কিছু দূর গিয়েই শিশুকন্যার



মেহেরের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করল না।

কান্না শুনে তাঁরা আর থাকতে পারলেন না। ফিরে এসেই দেখেন, সর্বনাশ! ছোট্ট মেহেরের মাথার ওপর একটা বিরাট কেউটে সাপ তার ফণা মেলে দুলছে। ঘিয়াসের চীৎকারে সাপটা আস্তে আস্তে চলে গেল, কিন্তু মেহেরের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করল না। তখনই বোধ হয় বুঝেছিলেন ঘিয়াস, এই মেয়ে থেকেই হবে তাঁর সৌভাগ্যের সূচনা।

মেয়েকে বুকে চেপে নিঃসহায়, নিঃসম্বল ঘিয়াস বেগ এসে পৌঁছলেন লাহোরে। এবার কিন্তু ঘিয়াসের ভাগ্যের পরিবর্তন হ'ল। আকবর বাদ্‌শাহের সুনজরে পড়লেন তিনি, আর ছোট্ট মেহেরের স্থান হ'ল হারেমে। সেখানেই মেহের শিখল লেখাপড়া, নাচ-গান, তরবারি-যুদ্ধ, আরও নানান্ বিদ্যা। আর মেহেরের বয়স যতই বাড়তে লাগল তার রূপও ততই ফেটে পড়তে লাগল। তার মত সুন্দরী তখন নাকি কেউ ছিল না মোগল সাম্রাজ্যে।

এবার মেহেরের বিয়ে ঠিক হ'ল তুর্কীস্তানের খানদানী বংশের আলি কুলি বেগ-এর সঙ্গে। আলি কুলি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, নির্ভীক্ ও সচ্চচিত্র যুবক। একলা খালি হাতে বাঘ মারার জন্য তাঁর নাম হয় শের আফগান।

শোনা যায়, মেহের একবার যুবরাজ সেলিমের নজরে পড়ে যায়। সেলিমও অমনি ক্ষেপে উঠলেন মেহেরকে বিয়ে করবার জন্য। বাপজান আকবরের কাছে আর্জিও পৌঁছে গেল —মেহেরকে আমি বিয়ে করতে চাই। আকবর

কিন্তু নিজের বংশমর্যাদার কথা ভেবে সেলিমকে দিলেন ধমকে, আর আলি কুলির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন মেহেরের। মেহেরের বয়স তখন ষোল। বিয়ের পর মেহের স্বামীর সঙ্গে চলে গেলেন বর্ধমানে।

এবার হ'ল ইতিহাসের পট পরিবর্তন। বাপজানের মৃত্যুর পর যুবরাজ সেলিম বসলেন সিংহাসনে। নাম নিলেন জাহাঙ্গীর। সম্রাট্ হয়েও জাহাঙ্গীর কিন্তু মেহেরকে ভুলতে পারলেন না। মেহেরকে তাঁর চাই-ই। কিন্তু উপায়? জাহাঙ্গীর ভেবেচিন্তে দেখলেন, আলি কুলিকে যদি হত্যা করা যায় তবেই মেহেরকে বিয়ে করা সম্ভব। কিন্তু আলি কুলিও সহজ পাত্র ন'ন। আর তা ছাড়া দেশের সম্রাট্ হয়ে প্রকাশ্যে এমন একটা জঘন্য কাজই বা তিনি করেন কি ভাবে? অতএব নিতে হ'ল কৌশলের আশ্রয়।

শিকারে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন তিনি আলি কুলিকে। সরল মনে আলি কুলি চললেন সম্রাটের সঙ্গে বাঘ শিকারে। ধূর্ত সম্রাট্ এবার তাঁকে আদেশ দিলেন একটা ক্ষিপ্ত বাঘকে মারবার জন্যে। কিন্তু তাজ্জব বনে গেলেন জাহাঙ্গীর। আলি কুলি খালি হাতেই বাঘটাকে গলা টিপে খতম্ করলেন। এবার সম্রাট্ একটা পাগলা হাতির সামনে ফেলে দিলেন আলি কুলিকে। সম্রাট্ যখন নিশ্চিত যে হাতির পায়ের চাপে এবার তাঁর দফা রফা হবে, তখনই আলি কুলি তাঁর তলোয়ারের এক কোপে হাতির শুঁড় দু'ভাগ করে দিলেন। হাতি বেচারীর ভবলীলা সাঙ্গ হ'ল।

শের এবার আঁচ করতে পারলেন তাঁকে



জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান

মারবার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি ফিরে গেলেন বর্ধমানে। জাহাঙ্গীর মরীয়া হয়ে বাংলার সুবাদার কুতুবকে নির্দেশ দিলেন আলি কুলিকে হত্যা করবার জন্যে। কুতুব তাঁর বহু অনুচর নিয়ে শেরকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই মারা পড়লেন শেরের হাতে। হতভাগ্য শেরও কিন্তু প্রাণ হারালেন কুতুবের অনুচরদের বন্দুকের গুলিতে। জহাঙ্গীরের পথ হ'ল পরিষ্কার।

শেরের মৃত্যুর পরই মেহেরকে বর্ধমান থেকে নিয়ে আসা হ'ল আগ্রাতে। মেহেরের বয়স তখন তেত্রিশ। কিন্তু তেত্রিশ বছর বয়সেও মেহের ছিলেন অপূর্ব রূপসী। মোগল হারেমে থাকলেও দীর্ঘ চার বছর মেহের সম্রাটের মুখ-দর্শন করতেও চান নি। এরপর কিন্তু মেহের আর পারলেন না সম্রাট্কে ফেরাতে। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করলেন জাহাঙ্গীরকে। জাহাঙ্গীর তাঁর নাম দিলেন নূরজাহান বা জগতের আলো। এর থেকেই তোমরা বুঝতে পারেব কী অসামান্য সুন্দরী ছিলেন এই মেহের।

ইংরেজ দূত স্যর টমাস্ রো লিখে গেছেন মেহেরই আসলে দেশ শাসন করতেন। নাম-কা ওয়াস্তে সম্রাট্ ছিলেন জাহাঙ্গীর। এ কথা কিন্তু পুরোপুরি সত্যি। সেই সময়কার মুদ্রাতে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সঙ্গে নূরজাহানেরও ছবি ছাপা হ'ত। সর্বগুণসম্পন্না এই নূরজাহান যে দক্ষতার সঙ্গে রাজকার্য চালাতেন তা অনেক পুরুষ সম্রাট্‌কেও লজ্জা দিত। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিকে যখন তাঁর ছেলে খুর্‌রম (শাহ্‌জাহান) ও সেনাপতি মহব্বত খাঁ বিদ্রোহ করেন, তখনও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন নূরজাহান স্বয়ং। শোনা যায় মহব্বত খাঁ এক গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে ছিলেন ঘুমন্ত অবস্থায় নূরজাহানকে হত্যা করার জন্য, কিন্তু ঘাতক নূরজাহানের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর বুকে ছোরা না বসিয়ে ফিরে আসে মহব্বতের কাছে।

নূরজাহানের শেষ জীবন কিন্তু সুখের হয় নি। তাঁর বিরাট উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ছিল এর জন্য দায়ী। নূরজাহানের ইচ্ছে ছিল চিরকালই কর্তৃত্ব করে যাবেন সবার ওপর, এমন কি জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরও। তাই তিনি ফন্দী আঁটলেন জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসাতে হবে সবচাইতে ছোট রাজকুমার শাহ্‌রিয়রকে, কারণ শাহ্‌রিয়র ছিলেন সবচাইতে অযোগ্য। শাহ্‌রিয়রকে হাতের মুঠোয় রাখতে তাঁর বিশেষ বেগ পাবার কথা নয়। নূরজাহান এবার তাঁর আগের পক্ষের (শের আফগানের) মেয়ে লাড্‌লী বেগমের সঙ্গে বিয়ে দিলেন শাহ্‌রিয়রের। রাজকুমার খুর্‌রম, পরে যিনি শাহ্‌জাহান নামে পরিচিত হ'ন, নূরজাহানের অভিসন্ধি বুঝে বিদ্রোহ করলেন বাপের বিরুদ্ধে। নূরজাহান সেনাপতি মহব্বতকে পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন করলেন। কিন্তু পরে মহব্বতও যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তখন আর নূরজাহানের আশা বলতে রইল না কিছু। খুর্‌রমকে দাবিয়ে রাখবার মত ক্ষমতাও আর রইল না তাঁর।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর নূরজাহানও লাহোরেই থেকে গেলেন শেষ পর্যন্ত। অবশেষে বাহাত্তর বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ঐ লাহোরেই, এবং সেখানেই, জাহাঙ্গীরের কবরের কিছু দূরে, রচিত হ'ল নূরজাহানের কবর।

নূরজাহান নিজে ছিলেন কবি; তাঁর কবরের গায়ে আজও তাঁর রচিত দু'টি লাইন লেখা দেখতে পাওয়া যায়। ফারসীতে লেখা, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার বাংলা অনুবাদ করেছেন:

"গরীব গোরে দীপ জ্বেলো না,
ফুল দিও না কেউ ভুলে,
শ্যামা পোকার না পোড়ে পাখ,
দাগা না পায় বুলবুলে।"

সত্যি, লাহোরের শাহ্‌ডেরায় ঝলমল-করা জাহাঙ্গীরের সমাধিসৌধের অনতিদূরে নূরজাহানের অবহেলিত অতি সাধারণ কবরটি দেখলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

যেমন রূপে তেমনি গুণে নূরজাহান সত্যি সত্যিই অতুলনীয়া ছিলেন। ইতিহাসের পাতা তন্নতন্ন করে ঘেঁটেও নূরজাহানের মত এমন বহুমুখী প্রতিভাময়ী দ্বিতীয় কোন নারীকে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর।

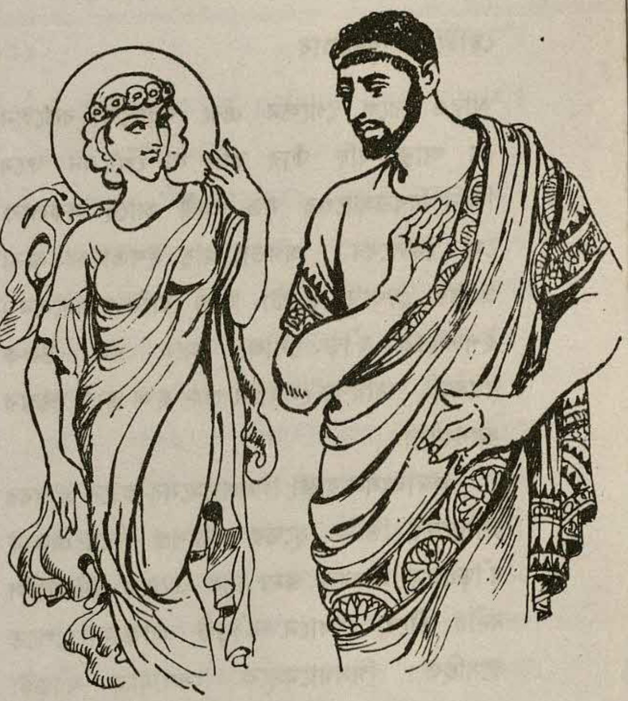
যে গল্প চিরকালের

রাজা গিলগামেসের গল্প

যীশু খৃষ্টের জন্মেরও বহু বছর আগেকার কথা। বর্তমান ইরাকের দক্ষিণ দিকে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে উরুক রাজ্যে গিলগামেস্ নামে একজন রাজা ছিলেন। সারা পৃথিবীতে রূপে, গুণে আর বীরত্বে গিলগামেসের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। সুন্দর চেহারার জন্য গিলগামেস্ ছিলেন তাঁর প্রজাদের অত্যন্ত প্রিয়। গিলগামেসের পূর্বপুরুষ ছিলেন মহানুভব শামাশ। শামাশ মহাপ্লাবনের মধ্যেও বেঁচে ছিলেন এবং নিজের সৎকাজের জন্য পরবর্তী-কালে তাঁর স্থান হয় স্বর্গের অমর দেবতাদের মধ্যে।

গিলগামেসের রূপে এবং বীরত্বে এক সময় সৌন্দর্যের দেবী ইশতার আকৃষ্ট হলেন। এক দিন গিলগামেস্ যখন তাঁর রাজপ্রাসাদের বাগানে বেড়াচ্ছিলেন তখন ইশতার তাঁকে এসে বললেন, "গিলগামেস্, তুমি আমাকে বিয়ে কর। আমি তোমাকে এক অপরূপ রত্ন-খচিত রথে বসিয়ে দেব। পৃথিবীর সব রাজারা এসে তোমাকে অভিনন্দন জানাবে, আর তোমার জন্য নিয়ে আসবে দেশবিদেশের সুন্দর সুন্দর উপহার।"

ইশতারের প্রস্তাব শুনে গিলগামেস্ বললেন, "দেবী, আপনি আমায় যে সম্মান দিলেন তা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষেরই কাম্য। কিন্তু আপনার আমাকে ভালো লাগা সাময়িক হতে



রাজা গিলগামেস্ ও দেবী ইশতার

পারে এবং পরে আপনি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন। ক্ষমা করবেন, আমার পক্ষে আপনাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়।"

গিলগামেসের কথা শুনে রাগে, অপমানে ইশতার জ্বলে উঠলেন এবং কোনও কথা না বলে সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন স্বর্গে। স্বর্গে ফিরে গিয়ে ইশতার তাঁর বাবা আনুকে বললেন, "বাবা, গিলগামেস্ অবজ্ঞা ভরে আমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছে। এ অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। এক্ষুনি আমার জন্য একটা ভয়ঙ্কর ষাঁড় বানিয়ে দাও, যাতে সেই ষাঁড় গিয়ে গিলগামেস্ ও তার রাজ্য ছারখার করে দিয়ে আসতে পারে।"

গিলগামেসের মত একজন ভালো লোককে এ ভাবে শাস্তি দিতে আনুর ইচ্ছে হ'ল না। ইশতার তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে

আরও রেগে গেলেন এবং আনুকে বললেন যে আনু যদি তাঁর কথা না শোনেন তবে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত প্রাণী আছে সকলকে মেরে ফেলবেন। অগত্যা আনু ইশতারের জন্য ভয়ঙ্কর দেখতে একটা ষাঁড় বানিয়ে দিলেন। ইশতারের ষাঁড় সোজা নেমে এল উরুক রাজ্যে। তারপর সেখানে শুরু হ'ল তার ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা।

প্রজাবৎসল রাজা গিলগামেসের কানে এ খবর পৌঁছতেই তিনি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একাই ষাঁড়টাকে মারবার জন্য চলে এলেন ইউফ্রেটিস নদীর তীরে, যেখানে ষাঁড়টি আস্তানা পেতে বসেছিল। গিলগামেস্‌কে দেখামাত্র ষাঁড়টা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তাঁর দিকে তেড়ে এল। রাগে, উত্তেজনায় তার মুখচোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরোতে লাগল। কিন্তু গিলগামেস্ ঘাবড়ালেন না, চট্ করে ষাঁড়টার পায়ে বসিয়ে দিলেন তাঁর ধারালো তলোয়ারের এক ঘা। তারপর দু'হাত দিয়ে তার ব্রোঞ্জের তৈরি শিং দু'টোতে এত জোরে চাপ দিলেন যে ষাঁড়ের ঘাড়, গলা সব ভেঙ্গে দুমড়ে গেল। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এইভাবে ষাঁড়টাকে দমন করে গিলগামেস্ নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। প্রজারা তাদের রাজার বীরত্বের ও কৃতিত্বের আনন্দে দেশব্যাপী বিজয়োৎসব শুরু করে দিল। কিন্তু তবুও গিলগামেসের উৎকণ্ঠা গেল না। দেবতাদের রোষ! কি জানি, ইশতার এবার কি ভাবে তাঁর ওপর প্রতিশোধ নেবেন।

সে রাত্রে গিলগামেস্ যখন ঘুমিয়ে পড়লেন তখন ইশতার তাঁর সামনে এসে আবার দেখা দিলেন। রাগে, অপমানে ইশতারের তখন সাংঘাতিক রূপ। ইশতারের সে চেহারার দিকে তাকাতে পর্যন্ত গিলগামেসের ভয় হ'ল। ইশতার বললেন, "ভেব না গিলগামেস্, যে ষাঁড়কে মেরে তুমি আমার রোষ থেকে মুক্তি পেয়েছ। পৌরুষ-দীপ্ত যে সুন্দর চেহারা নিয়ে তোমার এত গর্ব, তোমার সে চেহারা আমি নষ্ট করে দেব। ঘুম থেকে উঠেই তুমি দেখতে পাবে তোমার রঙ হয়ে গেছে অন্ধকারের মত কালো। তোমাকে দেখতে এত কুৎসিত হয়ে যাবে যে সমস্ত লোক তোমাকে দেখামাত্র ভয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।"

ইশতারের মুখ থেকে এই নিদারুণ কথা শুনে গিলগামেসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিজের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন ইশতার যা বলেছিলেন তাই সত্যি হয়েছে।



ষাঁড়টা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তেড়ে এল।

রূপবান্ গিলগামেস্ এক কুচকুচে কালো, কুৎসিৎ, কুঁজো বামন হয়ে গেছেন।

মনের দুঃখে গিলগামেস্ তখনই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন নিবিড় নির্জন অরণ্যের মধ্যে তাঁর কুৎসিৎ চেহারা লুকিয়ে রাখবার জন্য। দিনের পর দিন উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে বেড়াতে লাগলেন তিনি। অবশেষে গিলগামেস্ এক বিরাট মরুভূমি পার হয়ে এসে পৌঁছলেন মাশু পর্বতের সামনে। মাশু পর্বতের প্রবেশপথ সারাক্ষণ পাহারা দিত একদল কাঁকড়াবিছে, তাদের মাথাগুলো মানুষের মত। গিলগামেস্‌কে দেখে কাঁকড়াবিছে-মানুষদের বড় মায়া হ'ল। তারা বলল, গিলগামেস্ যদি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যে সুখী দ্বীপ আছে সেখানে গিয়ে সৌন্দর্যের ঝর্ণায় স্নান করতে পারেন তবে তিনি তাঁর আগের সুন্দর চেহারা ফিরে পাবেন।

গিলগামেস্ তাদের কাছে জানতে চাইলেন সেখানে যাবার পথের নিশানা। কাঁকড়াবিছে-মানুষরা জানাল যে সে পথ এত ভয়ঙ্কর দুর্গম যে কোনও মানুষের পক্ষেই সেখানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। গিলগামেস্ বললেন, এই কুৎসিৎ চেহারা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তাঁর পক্ষে সেই দুর্গম পথে গিয়ে মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয়ঃ এবং তিনি যে-কোনও বিপদের মধ্যে যেতে রাজী আছেন। কাঁকড়াবিছে-মানুষেরা বলল, "তা হ'লে বলি শোন। প্রথমে পার হতে হবে ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ঢাকা মাশু পর্বত। তার পর আসবে মহাসমুদ্রের তীরে একটি সুন্দর সবুজ বন। সেখানে গিয়ে জলদেবী সাবিটুর কাছে তোমায় সাহায্য চাইতে হবে তোমাকে সুখী দ্বীপে নিয়ে যাবার জন্য, কারণ এ ব্যাপারে আমরা তোমাকে কোন সাহায্যই করতে পারব না।"

কাঁকড়াবিছে-মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় গিলগামেসের চোখে জল এল। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিলগামেস্ পা বাড়ালেন সেই দুর্গম পথের উদ্দেশে। চারদিকে শুধু জমাট অন্ধকার। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। অন্ধকারে গিলগামেসের পথ হারিয়ে গেল। তিনি তখন আকুল হ'য়ে তাঁর পূর্বপুরুষ শামাশকে ডাকতে লাগলেন তাঁকে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য। শামাশ অমনি আকাশের গায়ে পাঠিয়ে দিলেন আগুনের তৈরি একটি উজ্জ্বল তীর। সেই তীর গিলগামেস্‌কে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। গিলগামেস্ সেই তীরকে অনুসরণ ক'রে অন্ধকার মাশু পর্বত পার হয়ে এসে পড়লেন খুব সুন্দর একটা বনের মধ্যে। সেখানে এতটুকুও অন্ধকার নেই। মাথার ওপর আকাশে জ্বল জ্বল করছে সূর্য আর তার সোনালী আলোর কণা ঠিকরে পড়ছে গাছের পাতায় আর মহাসাগরের ঢেউএর ওপর। গিলগামেসের বুকটা আনন্দে ভরে উঠল। তিনি চারদিক্ ঘুরেফিরে দেখতে লাগলেন। গাছে গাছে কী সুন্দর মুক্তোর ফুল, চুনীর ফুল, হীরের ফল আর পান্নার পাতা!

গিলগামেস্ এগিয়ে চললেন মহাসাগরের দিকে—যেখানে সাদা সাদা ঢেউ তীরের ওপর আছড়ে পড়ছে। কিন্তু আর যাওয়া সম্ভব হ'ল না। সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে আর এক বিরাট সমুদ্র। তার এপার ওপার দেখা যায় না। গিলগামেস্ তখন ডাকতে লাগলেন জলদেবী সাবিটুকে। সাবিটু এসে বললেন, "এই

সমুদ্র পার হওয়া যে বড় দুষ্কর! তা ছাড়া এর অপর পারে আছে মৃত্যু-সমুদ্র। সেই মৃত্যু-সমুদ্র তুমি কি করে পার হবে? একটি মাত্র মানুষই তা পেরেছে। সে হচ্ছে অমর শামাশ, যে পৃথিবীর শেষ প্রান্তের সুখী দ্বীপে থাকে।"

গিলগামেস্ যখন বার বার করে সাবিটুকে বললেন যে সাবিটু সাহায্য করলে তিনি ঐ দুর্গম পথে অবশ্যই যেতে পারবেন, তখন সাবিটু শামাশের নাবিক আরবেল্‌কে ডাক দিলেন গিলগামেস্‌কে সমুদ্র পার করে দেবার জন্য। সাবিটুর ডাক শোনা মাত্র এক কালো রঙের জাহাজ নিয়ে হাজির হ'ল আরবেল্। তারও আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা। সাবিটুকে প্রণাম জানিয়ে গিলগামেস্ উঠে বসলেন আরবেলের জাহাজে। জাহাজ ভেসে চলল উত্তাল সমুদ্রের বুকে। এই ভাবে চল্লিশ দিন চলার পর তাঁরা এসে পৌঁছলেন মৃত্যু-সমুদ্রে। অতল, গভীর সেই সমুদ্র; তার মধ্যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় দাপাদাপি করছে। সেদিকে তাকিয়ে গিলগামেসের বুকটা কেঁপে উঠল। কিন্তু ঢেউএর সঙ্গে লড়াই ক'রে সুদক্ষ নাবিক আরবেল্ জাহাজটাকে নিয়ে এল এক দ্বীপের কাছাকাছি।

দূর থেকে দ্বীপটাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে! সূর্যের আলো তার ওপর চিক্‌চিক্ করছে, মনে হচ্ছে যেন সোনার সমুদ্রের বুকে খুব দামী একটা রত্ন। জাহাজ যখন তীরে এসে পৌঁছল তখন একজন দীর্ঘকায় সুদর্শন পুরুষ তাদের দিকে এগিয়ে এলেন। পরনে তাঁর বহুমূল্য পোশাক, গায়ে হীরে-জহরতের গয়না। তিনি আর কেউ ন'ন, গিলগামেসের পূর্বপুরুষ শামাশ। শামাশ



শামাশের সামনে গিলগামেস্

আরবেল্ আর গিলিগামেস্‌কে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন সুখী দ্বীপের ভিতরে। গিলগামেস্ তখন শামাশকে বললেন, "আমায় সৌন্দর্যের ঝর্ণা দেখিয়ে দিন, যাতে সেখানে স্নান করে আমি আমার আগের সুন্দর চেহারা ফিরে পেতে পারি।" শামাশ বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তা তো দেবই। তবে তার আগে তুমি একটু ঘুমিয়ে নিয়ে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে নাও।" এই বলে তিনি গিলগামেস্‌কে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

ঘুম থেকে উঠে গিলগামেস্ দেখলেন শামাশ তাঁর জন্য একটা চমৎকার সরবৎ বানিয়ে

রেখেছেন। সেটা পান করা মাত্র গিলগামেসের গায়ে ফিরে এল সিংহের মত শক্তি। শামাশ গিলগামেসের হাত ধ'রে তাঁকে নিয়ে চললেন সৌন্দর্যের ঝর্ণার কাছে। গিলগামেস্ দেখলেন ভারি সুন্দর একটা ঝর্ণা; তার স্বচ্ছ নির্মল জল সাদা পাথরের গা বেয়ে ঝ'রে পড়ছে। গিলগামেস্ সেই ঝর্ণায় স্নান করে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কুৎসিৎ চেহারার বদলে আগেকার সুন্দর চেহারা ফিরে এল। শরীরটা হ'ল একটা বলবান্ সিংহের মত আর চোখ দু'টো জ্বলতে লাগল ঈগল পাখীর চোখের মত।

গিলগামেস্ নতজানু হয়ে শামাশকে বললেন, "আপনার জন্যই আমি আমার হারিয়ে-যাওয়া রূপ ফিরে পেলাম।" শামাশ উত্তর দিলেন, "এ সমস্তই তোমার অধ্যবসায় ও কষ্ট স্বীকারের ফল। যারা এই ভাবে নিজেদের উন্নতির চেষ্টা করে ভগবান্ সব সময়ে তাদের সাহায্য করেন। যাও, এখন নিজের রাজ্যে গিয়ে সুখে-শান্তিতে রাজ্যশাসন কর।"

শামাশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিলগামেস্ আরবেলের জাহাজে উঠে সমুদ্র পার হলেন। তারপর আরবেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুন্দর বনটা পার হয়ে এসে দাঁড়ালেন মাশু পর্বতের পাদদেশে। সেখানকার কাঁকড়াবিছে-মানুষরাও গিলগামেসের সুন্দর চেহারা দেখে খুব খুশি হ'ল। তারা গিলগামেসের মাথায় পরিয়ে দিল সোনার মুকুট আর তাঁকে দিল খুব সুন্দর একটা ঘোড়া। সেই ঘোড়ায় চড়ে গিলগামেস্ ফিরে এলেন উরুক রাজ্যে। দেশশুদ্ধ লোক গিলগামেস্‌কে ফিরে পেয়ে আনন্দ-উৎসব শুরু করে দিল।

দেশে ফিরে গিলগামেসের প্রথম কাজ হ'ল দেবী ইশতারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। ইশতারেরও মন নরম হ'ল। গিলগামেসের এত কষ্ট দেখে তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন। এর পর থেকে গিলগামেস্ সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগলেন।

(এই গল্পটি প্রাচীন নিনেভা শহরের (ব্যাবিলন) ধ্বংসস্তূপের ভিতর একটি পাথরের গায়ে খোদাই করা ছিল।)

কিউপিড ও সাইকি

এক দেশে ছিলেন এক রাজা। তাঁর ছিল পরমা সুন্দরী তিনটি মেয়ে। এদের মধ্যে আবার সব থেকে সুন্দর ছিল ছোট রাজকুমারী সাইকি। সাইকি সৌন্দর্যের দেবী ভেনাসের চেয়েও দেখতে সুন্দর ছিল। দেশের লোকেরা সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা সাইকিকে দেবীর মত শ্রদ্ধা করত, সে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তার চলার পথে ফুল ছড়িয়ে দিত।

যে সম্মান ভেনাসের প্রাপ্য সে সম্মান সাইকির ভাগ্যে আসছে দেখে ভেনাসের যত রাগ গিয়ে পড়ল সাইকির ওপর। তিনি তাঁর ছেলে কিউপিডকে ডেকে বললেন, "লোকে এখন আমাকে ছেড়ে সাইকিকেই সব রকম সম্মান জানাচ্ছে। তুমি এক্ষুনি তোমার ধনুকের তীর সাইকির গায়ে ছুঁড়ে দাও, যাতে পৃথিবীর সব-চেয়ে নীচ ও কুৎসিৎতম লোককে তার ভালো লাগে এবং সে তাকে বিয়ে করে।"

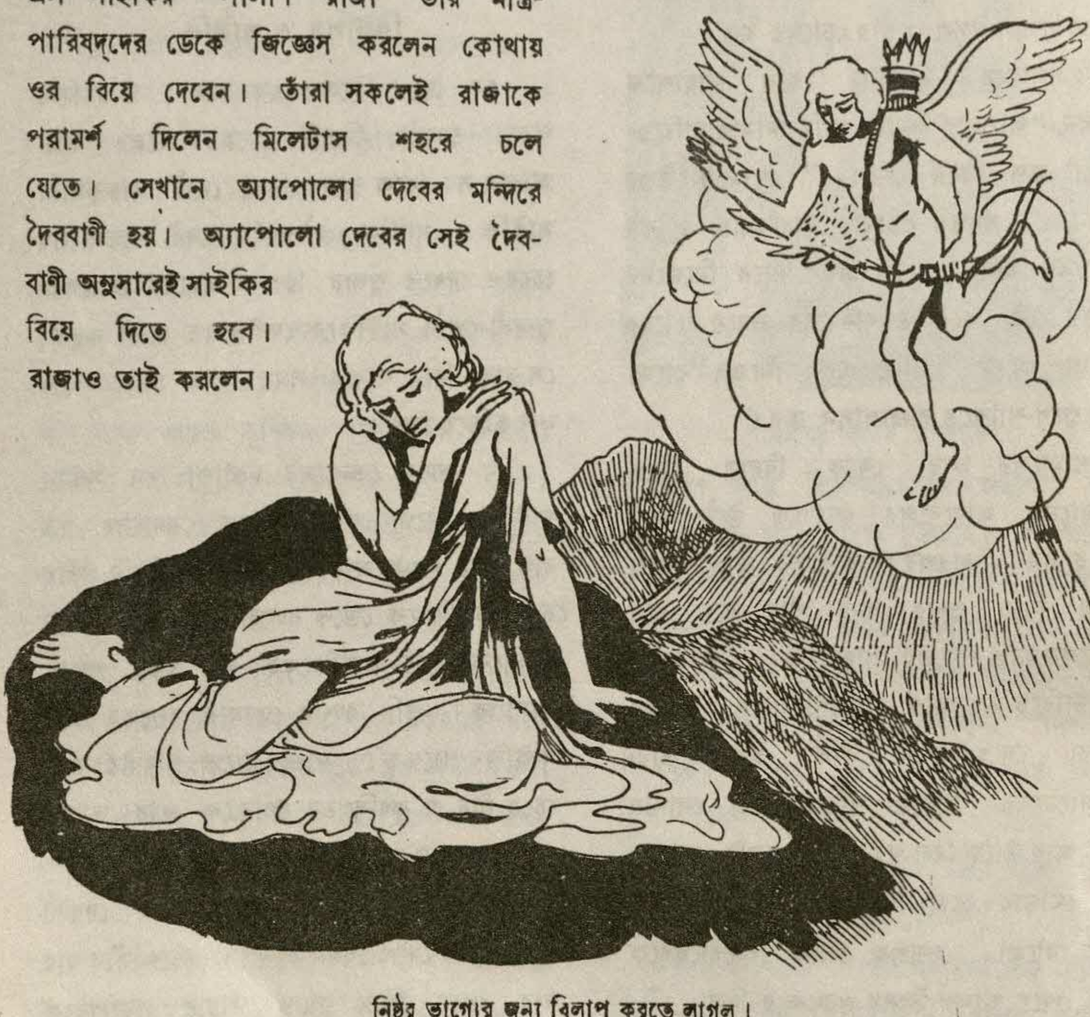
কিউপিড হচ্ছেন ভালোবাসার দেবতা (আমাদের দেশে যেমন মদন)। তাঁর তীর যার যার গায়ে গিয়ে পড়ে তাঁরাই পরস্পরকে

ভালোবাসে। ভেনাসের কথা শুনে কিউপিড সাইকির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সত্যি, স্বর্গে মর্ত্যে সাইকির মত সুন্দরী আর নেই। কিউপিড ভেনাসকে কিছু বললেন না, কিন্তু মনে মনে স্থির করলেন যে এত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কখনই তিনি কোন কুৎসিৎ লোকের বিয়ে দেবেন না।

দিন যায়, বছর যায়। এক এক করে সাইকির দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেল। এবার এল সাইকির পালা। রাজা তাঁর মন্ত্রি-পারিষদ্‌দের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় ওর বিয়ে দেবেন। তাঁরা সকলেই রাজাকে পরামর্শ দিলেন মিলেটাস শহরে চলে যেতে। সেখানে অ্যাপোলো দেবের মন্দিরে দৈববাণী হয়। অ্যাপোলো দেবের সেই দৈববাণী অনুসারেই সাইকির বিয়ে দিতে হবে। রাজাও তাই করলেন।

অ্যাপোলোর দৈববাণী হ'ল—সাইকিকে বিয়ের পোশাক পরিয়ে এক উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় রেখে আসতে হবে। সেখানে এক ভয়ঙ্কর দানবের সঙ্গে সাইকির বিয়ে হবে। আসলে কিন্তু ওর পেছনে ছিল ভেনাসেরই চক্রান্ত।

দৈববাণী শুনে রাজা শোকার্ত হয়ে দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু কি আর করেন, অ্যাপোলোর কথামত সাইকিকে ছেড়ে দিয়ে আসা হ'ল এক নির্জন পাহাড়ের ওপর।



নিষ্ঠুর ভাগ্যের জন্য বিলাপ করতে লাগল।

বেচারা সাইকি একা একা সেখানে বসে তার নিষ্ঠুর ভাগ্যের জন্য বিলাপ করতে লাগল। তার পর এক সময়ে সে ঢুলে পড়ল গভীর ঘুমের কোলে।

সাইকির দুঃখ দেখে কিউপিডের বড় কষ্ট হ'ল। সাইকি যেই ঘুমিয়ে পড়ল অমনি কিউপিড তাঁর অনুচর জেফিরকে পাঠিয়ে ঘুমন্ত সাইকিকে নিয়ে গেলেন বহুদূরে এক সুন্দর রাজপ্রাসাদে।

পরদিন যখন সাইকির ঘুম ভাঙল তখন সে অবাক্ হয়ে দেখল কি সুন্দর রেশমের নরম বিছানায় সে শুয়ে আছে। চারদিকে তার দুধ-সাদা শ্বেতপাথরের দেওয়াল, তাতে সোনার কারুকার্য। জানালা দিয়ে তাকিয়ে সাইকি দেখতে পেল সুন্দর ফুলের বাগান। তার কানে ভেসে আসতে লাগল দূরের পাহাড়ী ঝর্ণার শব্দ আর নাম-না-জানা পাখিদের মিষ্টি গানের সুর।

অবাক্ হয়ে সাইকি বলে উঠল, "আমি কোথায় এসেছি ?"

অদৃশ্য থেকে কে যেন বলে উঠল, "আপনি আপনার নিজের প্রাসাদেই আছেন, আমি আপনার দাসী। আজ্ঞা করুন, কি করতে হবে।"

সাইকির খুব খিদে পেয়েছিল, সে কিছু খাবার চাইল। অমনি এক অদৃশ্য হাত সাইকির সামনে রকমারি মুখরোচক খাবার এনে হাজির করল। খাবার খেয়ে সাইকি মহানন্দে সেই রাজপ্রাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

তারপর সন্ধ্যে হবার পর সাইকি শুনতে পেল কে যেন অদৃশ্য থেকে সুন্দর গলায় তাকে বলছে, "সাইকি, এই প্রাসাদ আমি তোমার জন্যেই তৈরি করেছি, তুমি এই প্রাসাদে তোমার যা ভালো লাগে তাই করবে।"

এই ভাবে রোজই সাইকি শুনতে পেত সেই স্বর নানাভাবে সাইকিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু লোকটিকে কখনও দেখা যেত না। লোকটির কথা শুনে সাইকি বুঝতে পারল সে কত দয়ালু আর কী মিষ্টি তার স্বভাব! শেষ পর্যন্ত লোকটিকে সাইকির এত ভালো লেগে গেল যে সে যখন সাইকিকে বিয়ে করার প্রস্তাব করল, তখন তাকে বিয়েই করে বসল, যদিও তার চেহারা সে কখনও দেখে নি। বিয়ের পর সাইকির বর তাকে বলল, "আমি সব সময়ে, তুমি যাতে সুখী হও, সেই চেষ্টা করব; কিন্তু একটা কথা, তুমি কখনো আমাকে দেখতে চাইবে না। তা হলে তোমার সর্বনাশ হবে, আর আমাকেও চিরদিনের জন্য তোমায় ছেড়ে যেতে হবে।"

সাইকি সম্মত হ'ল। তবুও তার মনে এ জন্য একটা দুঃখ রয়ে গেল। সাইকির বর রাত্রির অন্ধকারে সাইকির কাছে আসত, দিনের বেলা সাইকিকে একদম একা থাকতে হ'ত। শেষকালে একা থাকতে সাইকির এত খারাপ লাগতে লাগল যে সে তার বরকে বলল, তার দিদিদের তার কাছে এনে দিতে। অদৃশ্য থেকে সাইকির বর বলল, "তোমার কথা আমি নিশ্চয়ই রাখব, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, সাইকি, এর ফল ভালো হবে না।"

পরের দিন জেফির তার দুই দিদিকে নিয়ে এল সাইকির কাছে। তারা তো সাইকির প্রাসাদ দেখে অবাক্। যতই তারা সাইকির ঐশ্বর্য দেখতে লাগল ততই তাদের সাইকির

ওপর হিংসে হ'তে লাগল। তার বড়দি বলল, 'সত্যি, সাইকি, তোর কী সৌভাগ্য! তুই কী সুন্দর প্রাসাদে থাকিস! কিন্তু কই, তোর বরকে তো দেখছি না! সে কোথায়?"

সাইকি তাদের জানাল, সে নিজেও কখনও তার বরকে দেখে নি। সে শুধু রাত্রির অন্ধকারে সাইকির কাছে আসে।

শুনে তার দিদিরা বলল, "তোর বর নিশ্চয়ই অ্যাপোলোর দৈববাণীর সেই ভীষণ দানব। তাই সে তার চেহারা তোকে দেখায় না।"

দিদিদের কথায় সাইকির মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। দিদিরা যখন নিজের বাড়িতে ফিরে গেল তখন সাইকি ঠিক করল, সে এবার তার বরকে দেখবে। সেই রাত্রে তার বর যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন সাইকি তাকে দেখবার জন্য একটা প্রদীপ জেলে তার মুখের ওপর ধরল। সে অবাক্ হয়ে দেখল, এ তো দানব নয়, এ যে দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর স্বয়ং প্রেমের দেবতা কিউপিড। উত্তেজনায় তার সারা শরীর কেঁপে উঠল। অমনি তার হাত থেকে প্রদীপের এক ফোঁটা গরম তেল গিয়ে পড়ল কিউপিডের হাতের ওপর। কিউপিডের ঘুম ভেঙে গেল। করুণ ভাবে সাইকির দিকে তাকিয়ে কিউপিড বললেন, "আমার মা ভেনাসের কথামত দানবের সঙ্গে তোমার বিয়ে না দিয়ে আমি নিজে তোমায় বিয়ে করেছিলাম, আর তুমি এইভাবে আমার অনুরোধ রক্ষা করলে?" এই বলে কিউপিড তাঁর ডানা মেলে দিয়ে সেখান থেকে উড়ে চলে গেলেন।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে চোখ ফেটে জল এল সাইকির। শেষে সে ঠিক করল, যে ভাবেই হোক, সে একাই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে কিউপিডকে খুঁজে বার করবে।



একটা প্রদীপ জেলে তার মুখের ওপর ধরল।

এদিকে ভেনাসও জানতে পারলেন যে কিউপিড তাঁর কথা মত কাজ করেন নি। রাগে অন্ধ হ'য়ে তিনি তাঁর ছেলেকে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন আর তাঁর অনুচরদের পাঠিয়ে দিলেন সাইকিকে ধরে আনবার জন্য। তারা অনেক খুঁজে সাইকিকে নিয়ে হাজির করল ভেনাসের সামনে।

এইবার শুরু হ'ল সাইকির ওপর ভেনাসের নির্যাতনের পালা। ভেনাস সাইকিকে পাঠিয়ে দিলেন পাথরের তৈরি এক কারাগারে। তারপর তাঁর দুই দাসী 'দুঃখ' আর

'হতাশা'কে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন তাকে কষ্ট দেবার জন্য। শুধু তাই নয়, সাইকিকে প্রত্যেক দিন অনেক রকম কঠিন কঠিন কাজ করতে দেওয়া হ'ল এবং বলা হ'ল যে সে কাজ না করতে পারলে তার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু সাইকির স্বভাব এত মিষ্টি ছিল যে পৃথিবীর যেখানে যত প্রাণী আছে সকলে এগিয়ে এসে সাইকিকে সাহায্য করতে লাগল, যার ফলে সব রকম কঠিন কাজই সাইকি ঠিক সময়ে করে ফেলতে লাগল।

একদিন ভেনাস করলেন কি, বস্তায় ভরে যেখানে যত রকমের শস্য আছে সব এনে জড় করলেন সাইকির ঘরে। তার পর সেগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে সাইকিকে বললেন, এর থেকে প্রত্যেক রকমের শস্য বেছে আলাদা আলাদা ক'রে আলাদা আলাদা বস্তায় ভরে রাখতে। এই কাজ সূর্য অস্ত যাবার আগেই শেষ হওয়া চাই। কিন্তু সাইকিকে সবাই ভালোবাসে, এমন কি পিঁপড়েরাও। হাজার হাজার পিঁপড়ে এসে সাইকির হয়ে শস্যগুলো আলাদা ক'রে আলাদা আলাদা বস্তায় ভরে দিল।

ভেনাস তার পর সাইকিকে একটা বালতি দিয়ে একটা মস্ত উঁচু পাহাড় দেখিয়ে বললেন যে ঐ পাহাড়ের চূড়োয় যে ঝর্ণা আছে তার জল নিয়ে আসতে হবে। ঝর্ণার মুখে সারাক্ষণ বসে থাকত কতকগুলো বিষধর সাপ। ভেনাস ভাবলেন, সাইকি যদিও বা পাহাড়ে উঠতে পারে তবুও সে তার প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না। তার আগেই সাপেরা তাকে হত্যা করবে। এবার সাইকিকে সাহায্য করল এক



পাহাড়ের চূড়োয় যে ঝর্ণা আছে তার জল নিয়ে আসতে হবে।

ঈগল পাখী। সে ঠোঁটে ক'রে বালতি তুলে নিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে জল নিয়ে এল সাইকির জন্য।

ভেনাস দেখলেন কোনও মতে সাইকিকে মেরে ফেলা যাচ্ছে না। তার ওপর তাঁর চিন্তা হ'ল যদি কিউপিড কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে সাইকিকে উদ্ধার করেন। আর কালবিলম্ব না ক'রে ভেনাস সাইকির ওপর এমন এক কঠিন কাজের ভার দিলেন যাতে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তিনি একটা খালি রূপোর বাক্স সাইকির হাতে দিয়ে বললেন, "যাও, এটা পাতালপুরীর রাণী প্রসারপাইনের

হাতে দিয়ে এস, আর তাঁকে ব'লো, তিনি যেন এই বাক্সটা সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে ভর্তি করে দেন।"

সাইকি ভেবে দেখল, তার পক্ষে শুধু নয়, কোন মানুষের পক্ষেই কখনও পাতালপুরীতে যাওয়া সম্ভব নয়। হতাশ হয়ে সে ঠিক করল এবার সে আত্মহত্যা করবে। এই ভেবে সে একটা উঁচু দুর্গের ওপর উঠল সেখান থেকে মাটিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরবার জন্য। কিন্তু দুর্গের পাথরদেরও সাইকিকে দেখে বড় মায়া হ'ল। তারা বলল, "সাইকি, এ ভাবে মরতে চেষ্টা ক'রো না। তুমি এখান থেকে চলে যাও ল্যামেডিমন রাজ্যের কাছে যে টিনেরাস শহর আছে সেইখানে। সেখান থেকে পাতালপুরী খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু পাতালপুরীতে যেতে হ'লে শুধু হাতে যেও না। তোমার হাতে দু'টো মধুর তৈরি পিঠে নিয়ে নিও আর মুখে রেখো দু'টো তামার পয়সা। আর একটা কথা, পথে তুমি যাকেই দেখ না কেন, কারো সঙ্গে একটাও কথা ব'লো না। যদি বল তবে তোমাকে আর কখনও সূর্যের আলো দেখতে হবে না।"

পাথরের কথা শুনে সাইকি চলে এল টিনেরাস শহরে। সেখান থেকে সে পাতালপুরীর পথ ধরল। ভয়ে সাইকির গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল। দেখতে দেখতে সে একটা খরস্রোতা নদীর সামনে এসে পড়ল। সেখানে সে দেখতে পেল ছায়ার মত একটি লোক একটি



সাইকি তার দিকে নিঃশব্দে একটি তামার পয়সা এগিয়ে দিল।

কালো রঙের নৌকো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাইকি তার দিকে নিঃশব্দে একটি তামার পয়সা এগিয়ে দিল। লোকটিও তাকে নৌকো ক'রে নদী পার ক'রে দিল।

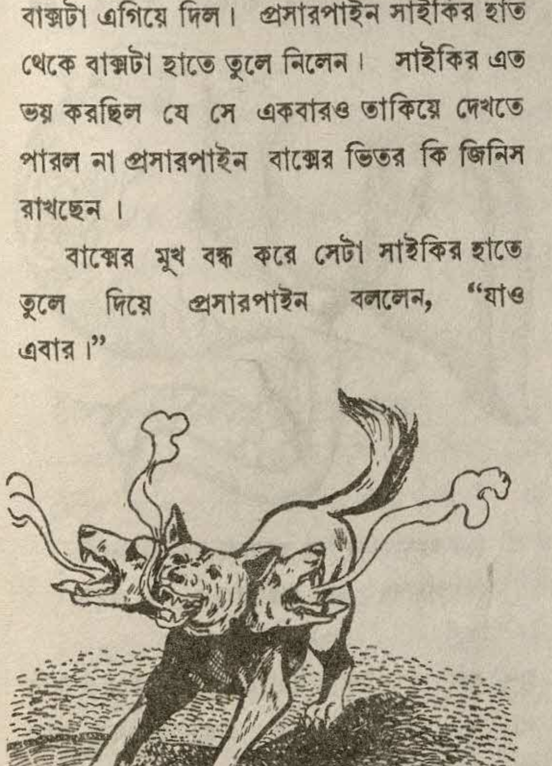
সাইকি এবার পৃথিবীর নীচে পাতালপুরীর দরজায় এসে পৌঁছল। সেখানে পাহারা দিচ্ছিল তিনটে মাথাওয়ালা দেখতে বিকট এক কুকুর। সাইকিকে দেখা মাত্র সে সাইকির দিকে ভীষণ ভাবে তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সাইকি তার হাতের থেকে একটা মধুর পিঠে ছুঁড়ে দিল তিন-মাথাওয়ালা কুকুরটার দিকে। পিঠে পেয়ে কুকুর সাইকিকে পথ ছেড়ে দিল।

পাতালপুরীর প্রাসাদের ভিতর ঢুকে সাইকি দেখতে পেল আবছা অন্ধকারের মধ্যে

প্রসারপাইন বসে আছেন। তাঁকে দেখে সাইকির ভীষণ ভয় করতে লাগল। এমন সময় সে শুনতে পেল, অদৃশ্য থেকে কিউপিড বলছেন, "ভয় পেয়ো না সাইকি, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিউপিডের কথা শুনে সাইকি সাহস পেয়ে প্রসারপাইনের পায়ের কাছে এসে বসে পড়ল। একজন জীবন্ত মানুষকে পাতালপুরীতে আসতে দেখে রাণী প্রসারপাইনের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। তিনি সাইকিকে জিজ্ঞেস করলেন, কি উদ্দেশ্যে সাইকি এখানে এসেছে। পাথরদের নির্দেশমত কোনও কথা না বলে সাইকি প্রসারপাইনের দিকে ভেনাসের দেওয়া রূপোর বাক্সটা এগিয়ে দিল। প্রসারপাইন সাইকির হাত থেকে বাক্সটা হাতে তুলে নিলেন। সাইকির এত ভয় করছিল যে সে একবারও তাকিয়ে দেখতে পারল না প্রসারপাইন বাক্সের ভিতর কি জিনিস রাখছেন।

বাক্সের মুখ বন্ধ করে সেটা সাইকির হাতে তুলে দিয়ে প্রসারপাইন বললেন, "যাও এবার।"



তিন-মাথাওয়ালা কুকুর

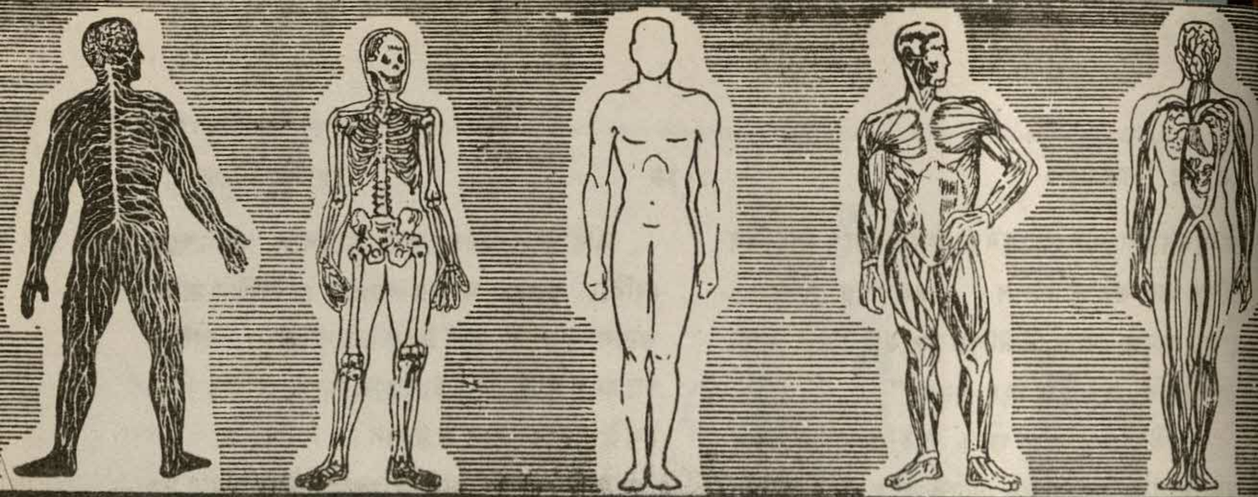
সাইকি কোনও কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আবার দরজায় সেই তিন-মাথা-ওয়ালা কুকুরটা তার দিকে তেড়ে এল। সাইকি হাতের বাকি পিঠেটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে নির্বিঘ্নে দরজা পার হয়ে এল।

বাইরে এসে সাইকি দেখল সেই ছায়ার মত লোকটি নৌকো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও কথা না বলে শেষ পয়সাটি তার হাতে দিতেই সে সাইকিকে নদী পার করে দিল।

সাইকি বাক্স নিয়ে ফিরে এল আলোয় ভরা সবুজ পৃথিবীতে। কিন্তু নিরাপদ জায়গায় এসে আর সে লোভ সামলাতে পারল না। তার ভীষণ জানতে ইচ্ছে হ'ল বাক্সের ভিতর কি আছে। সাইকি বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেলল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ছু'চোখে নেমে এল গভীর ঘুম। আসলে পাতালপুরীর রাণী বাক্সের মধ্যে ভরে দিয়েছিলেন বিষাক্ত চিরনিদ্রার ওষুধ। ঢাকনা খোলা মাত্র সেই ওষুধ বেরিয়ে এসে সাইকিকে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

এদিকে কিউপিড কারাগার থেকে পালিয়ে এসে অদৃশ্য ভাবে সাইকির গতিবিধি লক্ষ করছিলেন। তিনি তাঁর যাছ-মাখানো তীরটা ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিলেন সাইকির চোখে। অমনি সাইকির ঘুম ভেঙে গেল। কিউপিড সাইকিকে তুলে নিয়ে চলে এলেন অলিম্পাস পাহাড়ের চূড়োয়। সেখানে এসে সাইকি দেবতাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। এর পর থেকে সাইকি হ'ল অমর দেবতাদেরই একজন, আর তারপর কিউ-পিডের সঙ্গে মহানন্দে অলিম্পাস পাহাড়ে বাস করতে লাগল।

[অ্যাপুলিয়াসের (গ্রীস) একটি কাহিনী থেকে]



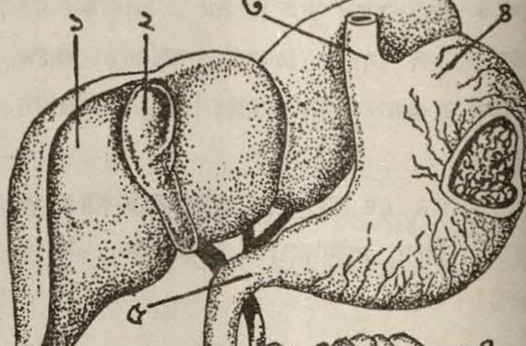
আমাদের শরীরের কথা

যকৃৎ বা লিভার

এর আগে আমরা আলোচনা করেছি কি করে খাবার নরম হয়ে মণ্ডের আকারে পাকস্থলীতে গিয়ে সেখানে নানা ভাবে পচন ও পাচনের পর অন্ত্রে যাবার জন্য তৈরি হয়ে যায়, তারপর অম্লাশয় বা আমাশয় ছাড়িয়ে চলে আসে গ্রহণী বা ডিয়োডেনামে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১১)।

খাবারের মণ্ড অম্লাশয় ছাড়িয়ে গ্রহণীতে এলে সে খবর চলে যায় যকৃতে, আর সঙ্গে সঙ্গে যকৃৎ ঢেলে দেয় পিত্তরস, যাতে খাবারের মধ্যেকার স্নেহ-পদার্থগুলি হজম হতে পারে। তোমরা হয়তো ভাবছ, এত বড় একটা যন্ত্রের কাজ মাত্র এইটুকুন! মোটেই তা নয়। আমাদের দেহে যকৃৎ অন্ততঃ ৫০০ রকমের কাজ ক'রে চলেছে, আর তার মধ্যে কোন একটা কাজে যদি একটু হেরফের হয় তা হ'লেই হয়ে পড়ে জীবন-মরণ সমস্যা।

যকৃৎটি বসে আছেন আমাদের পেটের ডানদিকে—মধ্যচ্ছদার তলায়। অসুখে বড় না হলে এর বড় একটা হদিস পাওয়া যায় না—ওজনে প্রায় ৩-৩½ পাউণ্ড হ'লে হবে কি! কিন্তু এই যকৃৎ বা লিভারের ব্যায়রাম হ'লেই হয় মুশ্‌কিল। কারণ আমরা যে কোন কাজই করি না কেন যকৃতের তাতে একটু-না-একটু হাত থাকবেই। আর, তা তো হবেই, কারণ এতে যে প্রায় এক হাজার রকমের এন্‌জাইম্‌ তৈরি হয়!



(১) যকৃৎ (২) পিত্ত-ভাণ্ডার (৩) খাদ্যনালী
(৪) অম্লাশয় (৫) পাইলোরাস (৬) গ্রহণী
(৭) অগ্ন্যাশয়

যকৃতের নানা কাজ

হয়তো আমাদের আঙ্গুল কেটে গেল, রক্ত পড়তে থাকল। কিন্তু খানিক বাদে আমরা দেখতে পাই যে রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ কাটা জায়গায় রক্ত জমে গেছে। এই রক্ত জমবে না, যদি না যকৃৎ এর জন্য রস তৈরি করে —ফিব্রিনোজেন ও প্রোথ্রমবিন। আমাদের শরীরে বীজাণু ঢুকল, তাদের মারতে হবে। যকৃতে তৈরি হ'ল সেজন্যও কতকগুলি রস।

আমরা যখনই কোন কাজ করি তখনই আমাদের মাংসপেশীগুলিকে নড়াচড়া করতে হয়। এর জন্য চাই এদের খাবার। এ খাবার নিতে গিয়ে এরা তৈরি করে ল্যাকটিক অ্যাসিড। এমনিতে নির্দোষ মনে হ'লেও আসলে এ বড় সাংঘাতিক জিনিস। শরীরে বেশি জমলে আমাদের মৃত্যুও ঘটতে পারে। কিন্তু যেই রক্তের সঙ্গে এই অ্যাসিড এসে পৌঁছল যকৃতে, যকৃৎ একে ভেঙ্গেচুরে তৈরি করল গ্লাইকোজেন। আর ঐভাবেই ওরা জমা রইল আমাদের শরীরে।

তুমি মাংস খেলে—সেগুলি পাচক রসে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তৈরি হ'ল অ্যামাইনো-অ্যাসিড —আমাদের শরীরের ইটকাঠ আর কি! তার থেকে যকৃৎ তৈরি করবে রক্তের প্রোটিন। শুধু কি তাই? এই প্রোটিন তৈরি করতে গিয়ে তৈরি হয় অ্যামোনিয়া। এর সঙ্গে নানা রকম রাসায়নিক জিনিস লাগিয়ে যকৃৎ তৈরি করে ইউরিয়া,—ঢেলে দেয় তা রক্তে, তা কিডনী বা বৃক্কে গিয়ে আমাদের প্রস্রাবের সঙ্গে শরীরের বাইরে বেরিয়ে যায়। তা ছাড়া আমাদের তো গুণের ঘাট নেই! আমরা নেশা করতে ছাড়ি না। কেউ খায় মদ, কেউ সিগারেট, কেউ নানা রকম ওষুধ। ভাগ্যিস যকৃৎ ছিল, তা না হ'লে এদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাত কে? যকৃৎই এ সবের প্রতিক্রিয়া সামলাবার- ভার নেয়, তাই রক্ষা!

যকৃৎ আমাদের ভীষণ উপকারী ভৃত্য

আমাদের শরীরের অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থি তো তাদের রস তৈরি করেই খালাস। তারা যা বেশি তৈরি করছে যকৃৎ বসে বসে সেগুলিকে ধ্বংস ক'রে দিচ্ছে।

যকৃতের আবার ভাঁড়ার ঘরের কাজও আছে। যা কিছু শরীরের এখন দরকার নেই অথচ পরে দরকার হতে পারে সে সব জিনিস জমিয়ে রাখে যকৃৎ—চিনি বা শর্করাজাতীয় জিনিস, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন, লোহা। শরীরের যখন যেখানে যা দরকার হয় সে সব জিনিস যকৃৎই পাঠিয়ে দেয় রক্তের ভিতর দিয়ে সেখানে।

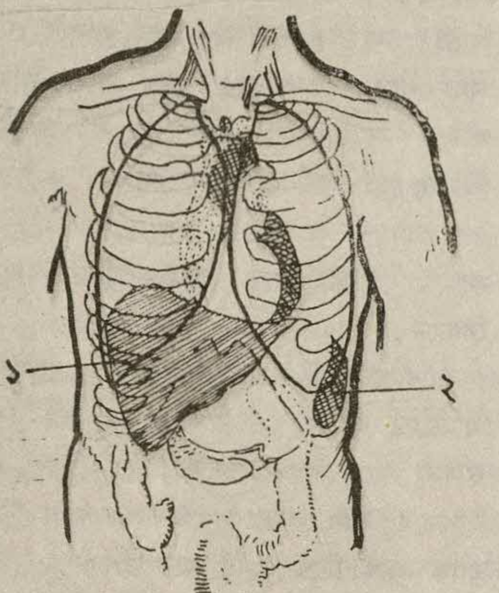
এর আগে আমরা পিত্তরসের কথা বলেছি। আমাদের শরীরে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ রক্ত-কণিকা মরে যায়। তাদের নিয়ে আসা হয় যকৃতে। যকৃৎ লোহাকে আলাদা ক'রে নিয়ে বাকি অংশ দিয়ে তৈরি করে পিত্তরস। কিন্তু পিত্তরস তো সব সময় দরকার হয় না, কাজেই একে জমিয়ে রাখার জন্য তৈরি হয়েছে গল্ ব্লাডার বা পিত্ত-ভাণ্ডার। এখানে যে কেবল এরা এসে জমা হয় তাই নয়, এখানে এদের জলের ভাগও কমে যায়, আর সেই সঙ্গে পিত্তে কিছু নতুন জিনিসও দিয়ে দেওয়া হয়। তার পর যেই খবর পৌঁছয় যে গ্রহণীতে এসে

জমা হয়েছে স্নেহজাতীয় খাদ্য, অমনি এরা এদের ছোট্ট নল দিয়ে চলে যায় গ্রহণীতে।

কাজেই বুঝতে পারছ যে যকৃৎ জিনিসটি আমাদের কী ভীষণ উপকারী ভৃত্য! বন্ধুও বলতে পার। কাজেই একে একটু সমীহ করে চলতে হবে বই কি।

প্লীহা বা পীলে

যকৃতের কথা মনে হ'লেই মনে আসে প্লীহার কথা। ওটা পোষাকী নাম, চলতি কথায় আমরা বলি পীলে। কারও শক্ত ব্যায়রামের কথা উঠলেই লোকে বলে, "আরে, ওর লিভার,



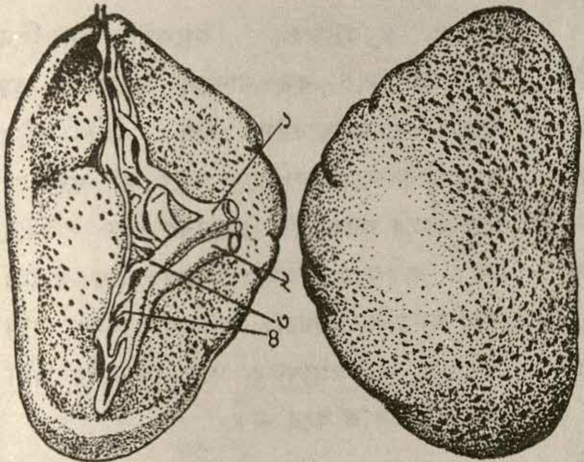
(১) যকৃৎ (২) প্লীহা

পীলে বড় হয়েছে, ওর অসুখ সারা শক্ত।" কাজই "পীলে" সম্বন্ধেও দু'-একটা কথা জানা ভালো।

আমাদের দেশে যখন ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের খুব প্রকোপ ছিল তখন বড় বড় পীলে ছিল আমাদের শরীরের একটা বড় অঙ্গ; কারণ ঐ সব ব্যায়রামের জীবাণুরা এসে বাসা বাঁধত ঐ পীলেতেই, আর তাদের জায়গা দেওয়ার জন্য পীলে যেত বড় হয়ে।

আমাদের পেটের ডানদিকে যেমন যকৃৎ, বাঁ দিকে তেমনি এই পীলে বা প্লীহা। বড় না হ'লে অবশ্য বোঝাই যায় না যে মধ্যচ্ছদার নীচে এমন একটি যন্ত্র লুকিয়ে আছে।

প্লীহা প্রায় ৬ আউন্স হবে ওজনে, ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, ইঞ্চি তিনেক প্রস্থে। যদিও এটি আমাশয়েরই ঠিক ওপরে বসে আছে,—আমাদের বক্ষ-পিঞ্জরের তলায়, তবু খাবার-দাবারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর আসল কারবার হচ্ছে রক্তকণিকা নিয়ে। আমরা জানি লাল রক্তকণিকা ফুস্‌ফুস্ থেকে অক্সিজেন নিয়ে সব কোষে কোষে বিলি করে—যাতে কোষের কাজকর্ম চালাবার কোন অসুবিধে না হয়। কিন্তু রক্তকণিকারাও এক সময়ে বুড়ো হয়ে যায়, তারা আর তখন তাদের কাজ করতে পারে না। তখন প্লীহাই এদের ভেঙ্গে ফেলে আর পাঠিয়ে দেয় যকৃতে। যকৃৎ লোহাটুকু রেখে দিয়ে তৈরি করে পিত্ত। যদিও এটাই প্লীহার সবচেয়ে বড় কাজ, কিন্তু এ ছাড়াও সে আরও দু'-একটা বাড়তি কাজ করে।—যেমন, শরীরে কোন রোগের বীজ ঢুকলে (যেমন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর) তাদের ধরে রাখতে চেষ্টা করে,—চেষ্টা করে মেরে ফেলতে—শ্বেতকণিকা তৈরি করে, আর দরকার হলে রক্তকণিকাও তৈরি করতে পারে। বাচ্চারা যখন মায়ের পেটে থাকে তখন তো রক্তকণিকা তৈরির একটা প্রধান



প্লীহা : সামনের থেকে আর পেছন থেকে
(১) ধমনী (২) শিরা (৩) ও (৪) হাইলাম অথবা
ধমনী ও শিরা যেখান দিয়ে ঢোকে।

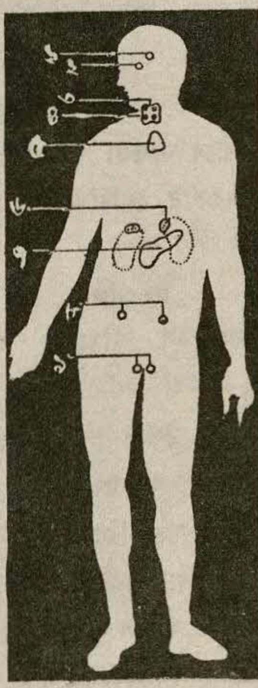
জায়গাই হ'ল প্লীহা। কাজেই দেখ, যিনি ভাঙ্গেন, তিনিই আবার গড়তেও পারেন।

আমাদের শরীরে এমন কতগুলি ব্যায়রাম হতে পারে যার জন্য ডাক্তাররা প্লীহা কেটে বাদ দিয়ে দেন। আশ্চর্যের বিষয়, বড়দের বেলা এতে কোনই অসুবিধে হয় না কিন্তু ছোটদের বেলায়, দেখা গেছে, তারা অনবরত অসুখে ভোগে। তা হলে অন্তত ছেলেবেলায় রোগ-প্রতিরোধের কোন কোন কাজও প্লীহা নিশ্চয়ই করে। কি বল? তোমাদেরই কেউ হয়তো বড় হয়ে বার করবে আসল তথ্যটা।

অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থি

তোমাদের মনে আছে বোধ হয় যে আমাদের খাবার হজম করবার জন্য কত না খাদ্যরস মুখে, পাকস্থলীতে, গ্রহণীতে আর অন্ত্রে এসে পড়ে। এদের সব রসগুলিই নল দিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দেহে এমন কতগুলি গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড আছে যাদের রস সরাসরি নল দিয়ে গ্রন্থির বাইরে আসে না। তারা তাদের তৈরি রস ঢেলে দেয় রক্তে। রক্ত তাদের বহন করে নিয়ে যায় দূরে, অন্যান্য তন্ত্রে, নানা রকম কাজ করবার জন্য।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে এ রকম গ্রন্থি আছে আটটি—খুব ছোট ছোট; হয়তো সবগুলিকে একত্র করলে ওজনে হবে আউন্স দুয়েক। কিন্তু কী তাদের প্রতাপ! আমাদের চলা, বলা, মেজাজ, কাজ করার ইচ্ছে-অনিচ্ছে,



অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থি
(১) পিনিয়ল (২) পিটুইটারী (৩) থাইরয়েড
(৪) প্যারাথাইরয়েড (৫) থাইমাস (৬) অ্যাড্রিন্যাল
(৭) অগ্ন্যাশয় (৮) যৌনগ্রন্থি—মেয়ে
(৯) যৌনগ্রন্থি—পুরুষ।

বেড়ে ওঠা—সব এরা বসে বসে চালাচ্ছে। আমাদের দেহরাজ্যের এরাই যেন সব মন্ত্রীর দল। এক একজন আবার আছেন অন্যকে খোঁচা দেওয়ার জন্য। যা হোক এঁদের কথা একটু বিশেষ ভাবে বলা যাক। এঁরা হ'লেন :

(১) পিনিয়ল, (২) পিটুইটারী, (৩) থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড, (৪) থাইমাস, (৫) অ্যাড্রিন্যাল, (৬) অগ্ন্যাশয়ের ল্যাংহানসের দ্বীপ, (৭) ও (৮) যৌনগ্রন্থি—পুরুষ ও মেয়ে।

এর মধ্যে তিনটির কথা খুব সংক্ষেপেই সারা চলে। পিনিয়ল ও থাইমাসের যে কি কাজ আজও সে সম্বন্ধে সবাই একমত ন'ন।

প্যারাথাইরয়েড সম্বন্ধে আমরা জানি যে আমাদের শরীরের ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের কাজের ওপর এদের যত জারিজুরি। অর্থাৎ আমাদের শরীরে কতটা ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস্ থাকা দরকার সেদিকে এই গ্রন্থির লক্ষ্য খুব প্রখর।

ইনস্থলিন

অগ্ন্যাশয়ের রস আমাদের খাবার হজম করতে লাগে, আমরা জানি ; কিন্তু অগ্ন্যাশয়ের একটা জায়গায় তৈরি হয় 'ইনস্থলিন' নামে এক রকম রস। অগ্ন্যাশয়ের যে রস এসে গ্রহণীতে পড়ে তাতে কিন্তু ইনস্থলিন একটুকুও থাকে না। ইনস্থলিন সরাসরি চলে যায় রক্তে, কারণ ইনস্থলিনের আসল কাজ হ'ল আমাদের খাবারের চিনি বা শর্করার ওপরে। আমাদের খাবারের শর্করা গ্লুকোজ হয়ে রক্তে চলে যায় এবং ইনস্থলিনের সাহায্যে শরীরের কোষ এই গ্লুকোজ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। আবার স্নেহজাতীয় পদার্থ হজম করতেও দরকার গ্লুকোজের। কাজেই ইনস্থলিন আমাদের দেহে কম থাকলে আমাদের হয় বহুমূত্র বা ডায়েবেটিস রোগ। এতে শরীর গ্লুকোজকে কাজে লাগাতে পারে না বলে তা রক্তে জমতে থাকে এবং প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে বাইরে থেকে ইনস্থলিন নেওয়া। আজকাল অবশ্য বড়ি বেরিয়েছে এ অসুখের ; তবে ছোটদের জন্য বড়ি ভালো কাজ করে না।

পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড : গ্ল্যাণ্ডদের রাজা

অন্তঃক্ষরণ গ্ল্যাণ্ডদের রাজা হ'ল পিটুইটারী। একটি ছোট্ট মটরদানার মত, থাকে আমাদের মাথার একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে, আমাদের মস্তিষ্কের ঠিক নীচে। দেখতে ছোট হ'লে হবে কি, এরও প্রতাপ সাংঘাতিক। দেহের সমস্ত অংশের ওপরই এ খবরদারি করে, সেজন্য একে বলা হয় 'জীবননাট্যের পরিচালক'। প্রায় পঞ্চাশ হাজার নার্ভ বা স্নায়ু এই ক্ষুদ্র গ্ল্যাণ্ডটিতে এসে মিশেছে। এর চতুর্দিক্ ঘিরে যে সব রক্তজালি জাল তৈরি করে বসে আছে তারা এর থেকে নিয়ে আসে জীবনের নানা রস শরীরের অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডে, অন্যান্য তন্ত্রে।

একটা যায় থাইরয়েডে, তার কাজ যাতে সে ঠিক মত করে তার জন্য ; আর একটার কাজ হ'ল অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডের রস ঠিক মত তৈরি হয় কিনা তা নিয়ন্ত্রণের জন্য। অগ্ন্যাশয়েও আছে আর একটা রসের কাজ, আর একটা রস যায় যৌনগ্রন্থিতে,—কখন বালক যুবক হবে, কখন বালিকা হবে যুবতী তা বলে দেয় এই রস।

সবচেয়ে মজার হ'ল এর সেই রসটি যেটি

কাজ করে আমাদের শরীর বেড়ে ওঠার ওপর। এ রস বেশি কাজ করলে লোক হয়ে উঠবে দানবের মত বড়, কম কাজ করলে হবে বামন।

তা ছাড়া ছেলেপুলে হওয়ার সময় এর এক রস গিয়ে জানিয়ে দেয় মায়ের জরায়ুকে ; আর এক রস গড়ে তুলতে সাহায্য করে মায়ের বুকের দুধ। আর এক রস এসে ঢেলে দেয় সেই মায়ের দুধ শিশুর মুখে।

কাজেই দেখ, ছোট্ট একটি গ্রন্থির কাজ কত!

থাইরয়েড গ্রন্থি

এর পরে আসা যাক থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থির কথায়। থাইরয়েড গ্রন্থি থাকে আমাদের গলার সামনে। এর দু'পাশে দু'টো অংশ, মাঝখানের একটা অংশ দিয়ে জোড়া। এই গ্রন্থি তৈরি করে **থাইরক্সিন নামে** একটা রস। এ রস শরীরের **সমস্ত কোষেরই** দরকার—মস্তিষ্ক থেকে হাড় **পর্যন্ত। থাইরক্সিন** কম তৈরি হলে লোকেরা **হয় ধীর, মোটা,** একটু জবুথবু, **বুদ্ধিশুদ্ধি** কম। **ছোট ছেলেদের** যদি এ রস **কম থাকে** তা হলে তাদের বলা হয় ক্রেটিন—তারা যেন মানুষ নয়, বনের জন্তুর মত কিচ্ কিচ্ করে, লাফায়, না পারে কথা বলতে, না পারে হাঁটতে-চলতে ; দেখতেও হয় যেন জরদ্গব। এ তো গেল এক দিক্। অন্যদিকে যদি এ রস কাজ বেশি করতে আরম্ভ করে তবে গলার সামনে হয় গলগণ্ড। হাত-পা থাকে কাঁপতে, বসতে পারে না। সব সময়েই অস্থির অস্থির ভাব। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়।

অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির কথা

বাকি থাকল অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির কথা। বুকের মাথার ওপর এঁরা বসে আছেন টুপির মত দু'দিকে দু'টি। যদিও এরা কাজ করে পিটুইটারির হুকুম মত, তবু এদেরও প্রতাপ কম নয়। এদের দু'টো ভাগ—কর্টেক্স ও মেডালা। মেডালা যে অ্যাড্রিনেলিনই তৈরি করে সে কথা আমাদের জানা ছিল অনেকদিন ধরেই, কিন্তু কর্টেক্সের যে কি কাজ তা আমরা জেনেছি মাত্র কয়েক বছর হ'ল।

অ্যাড্রিনেলিন আমাদের সর্ব অঙ্গের ওপর কাজ করে চলেছে। চোখ, হৃৎপিণ্ড, রক্তনালী, যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থি, মেয়েদের জরায়ু, ত্বক্, ফুস্ফুস্, মাংসপেশী—এদের সবার ওপরই কাজ করতে হয় অ্যাড্রিনেলিনকে। ভয় পেলে আমাদের যে বুক ধড়ফড় করে তার কারণও অ্যাড্রিনেলিন।

কর্টেক্সের রসের সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল আমাদের রক্ষা করা। যখনই কোন ভয়ভীতি-ভাবনা এসে আমাদের বিপর্যস্ত করতে চায় তখনই কর্টেক্সের রস—কর্টিসোন এসে আমাদের বাঁচাতে চেষ্টা করে।

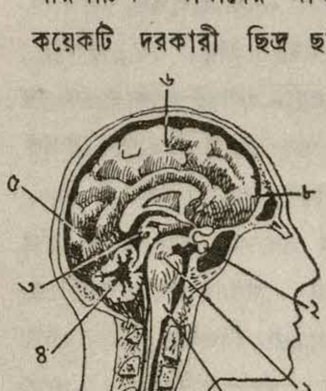
নার্ভ্ বা স্নায়ুতন্ত্র

আমাদের শরীরের কথার মোটামুটি প্রায় সব কথাই আমরা বলে ফেলেছি। কেবল বলা হয় নি আমাদের দেহের রাজা—নার্ভ্তন্ত্রের কথা। আমাদের দেহে যে অনবরত কাজ চলছে, এই যে পরিপাকতন্ত্র আমাদের খাবার হজম করে রক্তে ঢেলে দিচ্ছে, হৃৎপিণ্ড পাম্প করে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে কোষে কোষে, তার সঙ্গে ফুস্ফুস্ দিচ্ছে অক্সিজেন,—এ সব হচ্ছে কি করে? এদের সব চালাচ্ছে কে? এ সব চালাচ্ছে আমাদের নার্ভ বা স্নায়ুতন্ত্র।

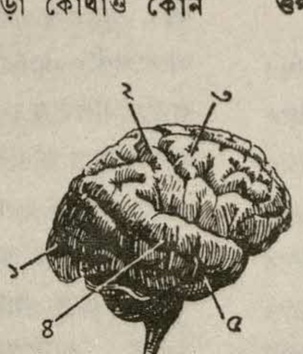
স্নায়ুতন্ত্রকে তিন ভাগ করা যায়—মস্তিষ্ক, বাইরের স্নায়ু আর অনৈচ্ছিক বা স্বতন্ত্র নার্ভ্।

স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র মস্তিষ্ক বা মগজ

মস্তিষ্ক, যাকে আমরা চলতি কথায় বলি মগজ,—হ'ল আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র। আমাদের দেহের কোথায় কি কাজ হবে, কি কাজ হচ্ছে এবং কি করতে হবে সবই ঠিক করে মস্তিষ্ক। তাই তার থাকবার জায়গা এত পরিপাটি। আমাদের মাথার খুলিতে কেবল কয়েকটি দরকারী ছিদ্র ছাড়া কোথাও কোন



(১) মধ্যমস্তিষ্ক; (২) পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড; (৩) পিনিয়ল গ্ল্যাণ্ড; (৪) সেরিবেলাম; (৫) দর্শন-কেন্দ্র; (৬) গুরুমস্তিষ্ক; (৭) মেডালা, (৮) ফ্রণ্টাল লোব বা মস্তিষ্কের সামনের ভাগ



(১) দর্শন-কেন্দ্র
(২) সংজ্ঞাধিষ্ঠান
(৩) চেষ্টাধিষ্ঠান
(৪) শ্রবণ-কেন্দ্র
(৫) ঘ্রাণ-কেন্দ্র

ফাঁক নেই। শুধু কি তাই? এর চারপাশে আছে তিনপল্লা চাদর আর এরই দুই চাদরের মাঝখানে আছে খানিকটা জল। এর কাজ হ'ল যদি হঠাৎ মাথায় কোন চোট লাগে তা হলে তা যেন মস্তিষ্কের কোন ক্ষতি করতে না পারে—ঠিক যেন মোটর গাড়ীর "শক্-আবজর্ভার"।

মস্তিষ্ক ওজনে হবে প্রায় দেড় কিলোগ্রাম, দেখতে অনেকটা ছাড়ানো আখরোটের মত। আখরোটের যেমন দু'টি অংশ থাকে, মস্তিষ্কেরও তেমনি দু'টি অংশ—ডানদিক্, বাঁদিক্। আর দু' দিক্‌কে জোড়া লাগিয়েছে "কর্পস্ ক্যালোসাম্" বলে একগাদা নার্ভতন্ত্র। সাধারণভাবে বলতে গেলে ডানদিক্ আমাদের দেহের বাঁদিক্‌টাকে চালায়, আর বাঁদিক্ চালায় ডানদিক্‌টাকে।

মগজের নানা অংশ

আমাদের মগজ বা মস্তিষ্কের সব চেয়ে **ওপরের ভাগের নাম** দেওয়া হয়েছে গুরু-মস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম্। তার নীচে হ'ল মধ্য-মস্তিষ্ক মিড্-ব্রেন, তার নীচের অংশের নাম হ'ল পন্‌স্। পন্‌স্ থেকে নার্ভ্‌গুচ্ছ সোজা নেমে চলে গেছে সুষুম্নাশীর্ষক মেডালা অবলঙ্গটা হয়ে, সুষুম্না-কাণ্ডে। সুষুম্না-কাণ্ড আমাদের শিরদাঁড়ার গর্ত দিয়ে চলে গেছে প্রায় আমাদের পিঠের শেষ পর্যন্ত।

আমাদের গুরুমস্তিষ্কের প্রায় মাঝামাঝি একটা সরু নালীর মত আছে। তার সামনের ভাগ হ'ল চেষ্টাধিষ্ঠান (মোটর এরিয়া), অর্থাৎ আমরা চেষ্টা করে যা করি তার সবেরই উৎস হ'ল এ জায়গায়। কিন্তু কাজ করতে পারা যায় তখনই যখন আমাদের কাছে খবর এসে পৌঁছয় বাইরে থেকে। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় থেকে আমাদের চারপাশের খবর চলে আসে ঐ নালীর পেছনের ভাগে, সেজন্য তার নাম হচ্ছে সংজ্ঞাধিষ্ঠান (সেন্‌সরী এরিয়া)। এ দু'টি জায়গায়ই আমাদের শরীরের সব অংশের জন্য আলাদা আলাদা স্থান নির্দিষ্ট আছে,

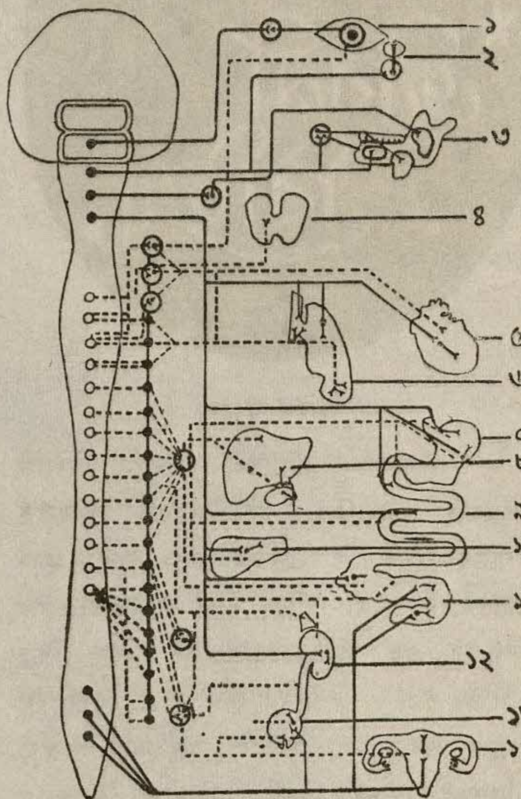
কিন্তু সব উল্টো রকমের। অর্থাৎ আমাদের মাথাটা আছে এখানে নীচের দিকে, আর পা ওপরের দিকে। তা ছাড়া মস্তিষ্কের পেছনের দিকে হচ্ছে চোখের জায়গা, সামনে গন্ধ শোঁকার জায়গা, পাশে কানে শোনার আর বাঁদিকে, কানের পাশেই, কথা বলার জায়গা।

আমাদের মাথার খুলির পেছন দিকে এবং গুরুমস্তিষ্ক দিয়ে ঢাকা হচ্ছে আমাদের লঘু-মস্তিষ্ক বা সেরিবেলাম। এর কাজ হচ্ছে আমাদের ঐচ্ছিক কাজের সমতা রক্ষা করা। যেমন, হাঁটতে গেলে যখন অনেকগুলি মাংস-পেশীকে একসঙ্গে কাজ করতে হয়, তখন তাদের কাজের সঙ্গতি রক্ষা করে লঘুমস্তিষ্ক।

মাথা থেকে মাথা ও মুখের জন্য বেরিয়েছে বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু (ক্রেনিয়াল নার্ভ্স্)। তারা নাক, চোখ, কান, জিভ, মুখ, গলা প্রভৃতির জন্য রয়েছে। আর একটি বড় স্নায়ু চলে গেছে নীচে, এর কাজ হচ্ছে আমাদের দেহের তন্ত্রগুলির সঙ্গে। যেমন, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এদের কাজ। সুষুম্না-কাণ্ড থেকে আমাদের শরীরের দু'দিকে গেছে ৩১ জোড়া মেরু-স্নায়ু (স্পাইনাল নার্ভ্স্)। এরাও দু'রকমের। একদল খবর আনে বাইরে থেকে, আর একদল হুকুম আনে মস্তিষ্ক থেকে।

স্বতন্ত্র বা অনৈচ্ছিক নার্ভ্

এতক্ষণ আমরা যে সব স্নায়ুর কথা বললাম সেগুলো আমাদের ইচ্ছার অধীন, অর্থাৎ আমরা যখন যে কাজ করতে চাই, এদের চালিয়েই আমরা করে থাকি। কিন্তু আমাদের শরীরে এমন কতকগুলি নার্ভ্ আছে যারা আমাদের



অনৈচ্ছিক নার্ভ্

(১, ২) চোখের; (৩) লালা-গ্রন্থির; (৪) থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের; (৫) হৃৎপিণ্ডের; (৬) ফুস্‌ফুসের; (৭) অন্না-শয়ের; (৮) যকৃতের; (৯) ক্ষুদ্র অন্ত্রের; (১০) অগ্ন্যাশয়ের; (১১) বৃহৎ অন্ত্রের; (১২) বৃক্কের; (১৩) মূত্রাশয়ের; (১৪) জরায়ুর।

ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। তাই তাদের বলা হয় অনৈচ্ছিক স্নায়ু বা নার্ভ্। অনৈচ্ছিক স্নায়ুর কাজ হ'ল আমাদের শরীরের ভিতরের যে সব তন্ত্র অনবরত কাজ করে চলেছে তাদের চালানো। যেমন, এরা দেখছে যে আমাদের হৃৎপিণ্ড কাজ না করে বসে আছে কিনা, ফুস্‌ফুসের হাপরের কাজ যেন চলতেই থাকে, খাবার হজমের যেন কোন গলতি না হয়। এরা সব নীরব কর্মী আর স্বতন্ত্র নার্ভ্ এদের চালক।

জীবনী বিচিত্রা

আদব কায়দা

'গ্যালিভার্স' ট্র্যাভেল্স্' নামে বিখ্যাত **ইংরেজি বইখানির** গল্প তোমরা অনেকেই পড়েছ—সেই যে একজন লোক প্রথমে ক্ষুদে মানুষদের রাজ্যে পৌঁছে নানা অভিজ্ঞতার পর আবার এক অতিকায় মানুষের দেশে গিয়ে হাজির হ'ল। 'বামনের দেশ' আর 'দৈত্যপুরী' নামে ওর বাংলা সংক্ষিপ্ত অনুবাদটা অন্তত নিশ্চয়ই পড়েছ? এই গ্যালিভার্স' ট্র্যাভেল্স্ বইখানা লিখেছিলেন জোনাথান সুইফ্‌ট্ নামে এক ইংরেজ।

সুইফ্‌টের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু মাঝে মাঝে তাঁকে নানা উপহার পাঠাতেন আর সেগুলো বয়ে নিয়ে আসত তাঁরই এক ছোকরা-বয়সী চাকর। সুইফ্‌ট ছেলেটির হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে তুলে রাখতেন কিন্তু তাকে যে মাঝেসাঝে একটু-আধটু বখশিস দেওয়া দরকার তা তাঁর খেয়ালই হ'ত না। বলা বাহুল্য, ছেলেটি এজন্য তাঁর প্রতি খুব খুশি ছিল না।

একদিন বন্ধুটি সুইফ্‌টকে কিছু মাছ পাঠালেন। ছেলেটি নিতান্ত দায়-সারা ভাবে সেটা সুইফ্‌টের ঘরে রেখে চলে যাচ্ছিল, সুইফ্‌ট বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওহে ছোকরা, তুমি তো দেখছি আদব কায়দার কোনও ধার ধার না! ঐ ভাবে কি জিনিস দিতে হয়? কি ভাবে দিতে হয় আমার কাছে শিখে নাও। ধর, তুমিই এ-বাড়ির কর্তা, আমি তোমার বন্ধুর কাছ থেকে মাছ উপহার নিয়ে আসছি। কি ভাবে দেব? তুমি ঐ চেয়ারটায় গিয়ে ব'স, মনে কর তুমিই কর্তা।"

ছেলেটি কথা শুনে সত্যিই কর্তার ভঙ্গীতে চেয়ারে গিয়ে বসল। সুইফ্‌ট চাকরের অভিনয় করে বললেন, "হুজুর, আমার মনিব আপনার জন্য কিছু মাছ উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি গ্রহণ করলে তিনি খুব খুশি হবেন।"

ছেলেটি অমনি গম্ভীরভাবে নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা বার করবার ভঙ্গী করে বলল, "বেশ, ওখানে রেখে যাও, আর এই নাও কিছু বখশিস।"

সুইফ্‌ট লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারলেন না। আদব কায়দা কাকে বলে তা ছেলেটি তাঁকে ঠিক বুঝিয়ে দিয়েছে।

রসরাজ শ'

বিখ্যাত লেখক ও নাট্যকার বার্নার্ড শ' ছিলেন পরম রসিক। শুধু লেখার ভিতর দিয়ে নয়,—তাঁর চালচলনে, কথাবার্তায়ও সে রসের আভাস মিলত সর্বদাই। সারা জীবন তিনি ক্ষুর স্পর্শ করেন নি—তাঁর ছিল লম্বা দাড়ি আর মোটা গোঁফ। বলতেন, "প্রত্যহ এইভাবে আমি পাঁচ মিনিট করে সময় বাঁচিয়েছি দাড়ি কামাবার সময়টা নষ্ট না করে। ফলে সারা



আপনি গ্রহণ করলে তিনি খুব খুশি হবেন।

জীবনে আমার প্রায় আড়াই বছর সময় লাভ হয়েছে—যা আমি অন্য ভালো কাজে লাগাবার সুযোগ পেয়েছি।"

বিলেতের সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর মদ খায় —ওদেশে ওটাই চল। দৈনিক খাদ্যের মধ্যে আমিষ অর্থাৎ মাংসও ওদেশের একটি প্রধান খাদ্য। বার্নার্ড শ' কিন্তু ওর কোনটাই খেতেন না। মাংস খাওয়ার কথা বললে বলতেন, "ও মরা জন্তুর লাশ খাওয়া আমার কর্ম নয়।"

একদিন বার্নার্ড শ' আর তাঁর এক সাহিত্যিক বন্ধু চেষ্টারটন বসে বসে গল্প করছিলেন। সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল। বার্নার্ড্ শ' ছিলেন অত্যন্ত রোগা আর চেষ্টারটন তেমনি মোটা। হঠাৎ চেষ্টারটন বার্নার্ড শ'র দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেশে যে দুর্ভিক্ষ চলছে তা তোমাকে দেখলেই টের পাওয়া যায়।"

বার্নার্ড শ' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "আর তার কারণটাও বোঝা যায় তোমাকে দেখলেই।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যখন বিলেতে গিয়ে তাঁর অদ্ভুত আবিষ্কারের পরীক্ষা দেখিয়ে সমস্ত ইয়োরোপে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন তখন ওদেশে তাঁর অনেক ভক্ত জুটে গেলেন এবং তাঁরা তাঁকে নানা উপহার পাঠাতে লাগলেন। বার্নার্ড শ'ও ছিলেন এঁদের মধ্যে একজন। তিনি তাঁর নিজের লেখা সমস্ত বই একখানা করে জগদীশচন্দ্রকে উপহার পাঠিয়ে দিলেন আর সেই সঙ্গে লিখে পাঠালেন—"পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট জীবতত্ত্ববিদের কাছ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জীবতত্ত্ববিদ্‌কে উপহার।"

গান্ধীজী আততায়ীর হাতে নিহত হলে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বিশিষ্ট লোকেরা নানা মন্তব্য প্রকাশ করেন। বার্নার্ড্ শ' শুধু বললেন, "এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে বেশি ভালো হবার বিপদ্ কতখানি!"

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন

এ যুগের একজন মহাবিজ্ঞানী এবং অঙ্কশাস্ত্রে ধুরন্ধর পণ্ডিত হচ্ছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। জাতে ইহুদী, বাড়ি জার্মানী, কিন্তু নাৎসিদের অত্যাচারে শেষ-জীবনে দেশত্যাগী হয়ে আমেরিকার বাসিন্দা হন তিনি। তাঁর আবিষ্কৃত আপেক্ষিক তত্ত্ব—যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'থিয়োরী অব্ রিলেটিভিটি' তাঁকে অমর করে রেখেছে।



'দেশে যে দুর্ভিক্ষ চলছে তোমাকে দেখলেই তা টের পাওয়া যায়।'

অত বড় বিজ্ঞানী, কিন্তু চালচলন ছিল তাঁর অতিমাত্রায় সাদাসিধে—টাকাপয়সার দিকে মোহ ছিল না একেবারে। ১৯২১ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারের সব টাকাটাই নাকি তিনি দান-ধ্যান করে উড়িয়ে দেন। টাকাপয়সার কথা উঠলেই বলতেন, "টাকাপয়সা কখনও মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে দিতে পারে না—কখনও পারে নি। যীশু বা গান্ধী আমেরিকার ধনকুবের কার্নেগী বা ফোর্ডের মত টাকার কুমীর হয়ে বসে আছেন —এ আমি ভাবতেই পারি না।"

একবার কোন্ এক প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য সাতশ' ডলারের একটা চেক্ পাঠিয়ে দিল তাঁকে। আইনস্টাইন সেটিকে ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে বইএর পৃষ্ঠা-চিহ্ন অর্থাৎ পেজ-মার্ক হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন। তার পর একদিন সেটা কোথায় হারিয়ে গেল, সে চেক্ আর কোনদিনই ভাঙ্গানো হ'ল না। আইনস্টাইন কিন্তু তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না।

চলাফেরায়ও তেমনি ছিলেন সাধারণ মানুষের মত। পারতপক্ষে কখনও মোটর গাড়ি বা ট্যাক্সী চাপতেন না—কোথাও যেতে হ'লে সাধারণের মত বাস্ বা ট্রামে চড়েই যাওয়া-আসা করতেন।

ট্রেনেও তাই। সেখানেও বেশির ভাগ থার্ড ক্লাসেই যাতায়াত করতেন তিনি। ট্রেনের সবচেয়ে নীচের, অর্থাৎ কমদামী ক্লাসটাকেই বলা হ'ত থার্ড ক্লাস। আমাদের দেশেও।

একবার এক মজার কাণ্ড ঘটেছিল, সেই কথা বলি। বেলজিয়ামের রাণী ছিলেন আইনস্টাইনের বিশেষ ভক্ত। একবার রাণী তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন ব্রাসেল্‌স্‌এ। আইনস্টাইন যেতে রাজী হয়েছেন এবং যথা সময়ে ট্রেনেও চেপে বসেছেন। ব্রাসেল্‌স্ স্টেশনে নেমে দেখেন প্ল্যাটফর্মে, আশেপাশে লোকে লোকারণ্য। ব্যাপার কি? তিনি ভিড়ের দিকে না গিয়ে তাঁর স্যুটকেস আর শখের বেহালাটি নিয়ে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করে করে রাজবাড়ির দিকে রওনা হলেন, পায়ে হেঁটেই।

আসলে স্টেশনে ঐ অত যে ভিড় হয়েছিল তা কিন্তু তাঁকে দেখবার জন্যই—তাঁকেই অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। রাণী তাঁকে আনবার জন্য দামী গাড়ি আর লোকজন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্টেশনে। আইনস্টাইন ভাবতেই পারেন নি যে তাঁর জন্যই অমন ব্যবস্থা হ'তে পারে।



এইটুকু তো পথ, এর জন্য আবার গাড়ি!

স্টেশন থেকে খালি গাড়ি ফিরে এল। আইনস্টাইন আসেন নি শুনে রাণী ভারি ক্ষুণ্ণ হলেন। এমন সময় দেখা গেল একটি লোক সারা গায়ে ধুলো মেখে, এক হাতে স্যুটকেস, অপর হাতে একটি বেহালা নিয়ে শিষ দিতে দিতে এগিয়ে আসছেন গুটিগুটি। রাণী দূর থেকেই চিনতে পারলেন। "প্রফেসর আইনস্টাইন! আপনি এভাবে এলেন? আমি যে আপনাকে আনতে গাড়ি পাঠিয়েছিলাম!"

"গাড়ি! এইটুকু তো পথ, এর জন্য আবার গাড়ি!" বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জবাব দিলেন বিজ্ঞানী। "স্টেশনে বড্ড ভিড় দেখলাম, তাই আর খোঁজও করি নি কারও; দিব্যি হেঁটে হেঁটেই চলে এলাম। কোন কষ্ট হয় নি তো!"

আপদ্ আর বিপদ্

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলা হয় সাহিত্যসম্রাট্। তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যে তাঁর মত শক্তিশালী লেখকের কথা কেউ ভাবতে পারত না। শুধু উপন্যাস নয়, প্রবন্ধ-রচনায়ও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তা ছাড়া লোকটিও ছিলেন খুব রসিক,—হাস্যরস, ব্যঙ্গরস দু'টিরই পরিবেশনে

ছিলেন সমান দক্ষ। তাঁর লেখা 'লোকরহস্য' বা 'কমলাকান্তের দপ্তরের' পাতায় পাতায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু ঐ দু'খানি বইতেই নয়, তাঁর অন্যান্য বইএর মধ্যেও এই রসিকতা এখানে-সেখানে এমন ভাবে ছড়িয়ে আছে যে পড়লেই লেখকের রসবোধ সম্বন্ধে বেশ একটু ধারণা করা যায়।

আবার, শুধু লেখার মধ্যেই নয়, তাঁর কথা-বার্তার মধ্যেও এই হাস্যরস ও ব্যঙ্গরস ঝরে পড়ত অজস্র ধারায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক যুগের লোকেরা তাঁদের স্মৃতিকথায় তার অনেক উদাহরণ রেখে গেছেন, তারই একটি কাহিনী এখানে বলছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। গ্র্যাজুয়েট হবার অল্প পরেই ইংরেজ সরকার তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগ করেন। এখন, সরকারী চাকরিতে ঢুকবার পরেই কতকগুলি পরীক্ষা দিতে হয়—যাকে বলা হয় "ডিপার্ট্‌মেণ্টাল পরীক্ষা"। নানারকম সরকারী রীতিনীতি, আইনকানুন, ভাষা ইত্যাদির ওপর এই পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং এগুলিতে পাশ করতে পারলে তবেই চাকরিতে স্থায়ী ভাবে বহাল করা হয়। এ নিয়ম বরাবরই চলে আসছে এবং এখনও আছে।

তখনকার দিনে সরকারী চাকরির বড় বড় পদগুলি সবই ছিল ইংরেজদের জন্য বাঁধা। এই সব ডিপার্ট্‌মেণ্টাল পরীক্ষা যাঁরা নিতেন তাঁরাও ছিলেন সব ইংরেজ। এই ইংরেজ অফিসারদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রকেও পরীক্ষা দিতে হবে।

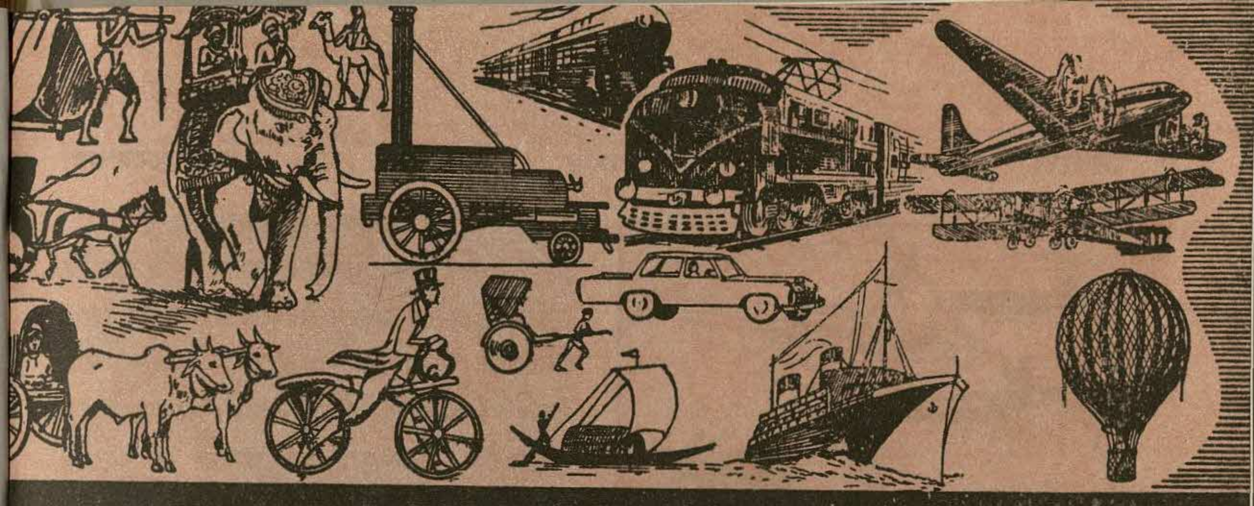
পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল বাংলা ভাষা। সম্ভবত বিদেশী ইংরেজদের বাংলা ভাষার জ্ঞান পরীক্ষার জন্যই এই বিষয়টি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং, যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরিটাও সে আমলে ছিল বেশ বড় অফিসারের চাকরি, সেজন্য নিয়ম অনুযায়ী ঠিক হ'ল তাঁকেও বাংলা ভাষার পরীক্ষা দিতে হবে এবং ঐ ইংরেজ পরীক্ষকদেরই কাছে।

যথা সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র হাজির হলেন পরীক্ষা দিতে। লিখে পরীক্ষা নয়,—মুখে মুখে পরীক্ষা। কয়েকজন হোমরাচোমরা সাহেব-পরীক্ষক টেবিল ঘিরে বসে আছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকেও এক কোণে বসতে বলা হ'ল।

একজন সাহেব মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে বললেন, "ওয়েল বাবু, তুমি তো বেশ বাংলা জান। আচ্ছা, বলতে পার, হোয়াট্‌স্ দ্য ডিফরেন্স বিটউইন আপদ্ অ্যাণ্ড বিপদ্?"—আপদ্ আর বিপদের মধ্যে তফাৎ কি? (সাহেব অবশ্য দ্-টা উচ্চারণ করতে পারেন নি, বলেছিলেন—আপড্ অ্যাণ্ড বিপড্)।

বঙ্কিমচন্দ্র হেসে বললেন, "একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সেবার পদ্মার ওপর দিয়ে স্টীমারে ফিরছিলাম, হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ করে দেখা দিল প্রবল ঝড়, স্টীমার ডোবে ডোবে। সেটাই হ'ল বিপদ্। আর আজ, এই যে আমাকে বাঙ্গালী হয়ে আপনাদের কাছে বাংলা ভাষার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, এটাই হচ্ছে আপদ্।"

সাহেব-পরীক্ষকেরা পরীক্ষার্থীর এই রসিকতাটা কি ভাবে নিয়েছিলেন জানা যায় নি, তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁরা পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন।



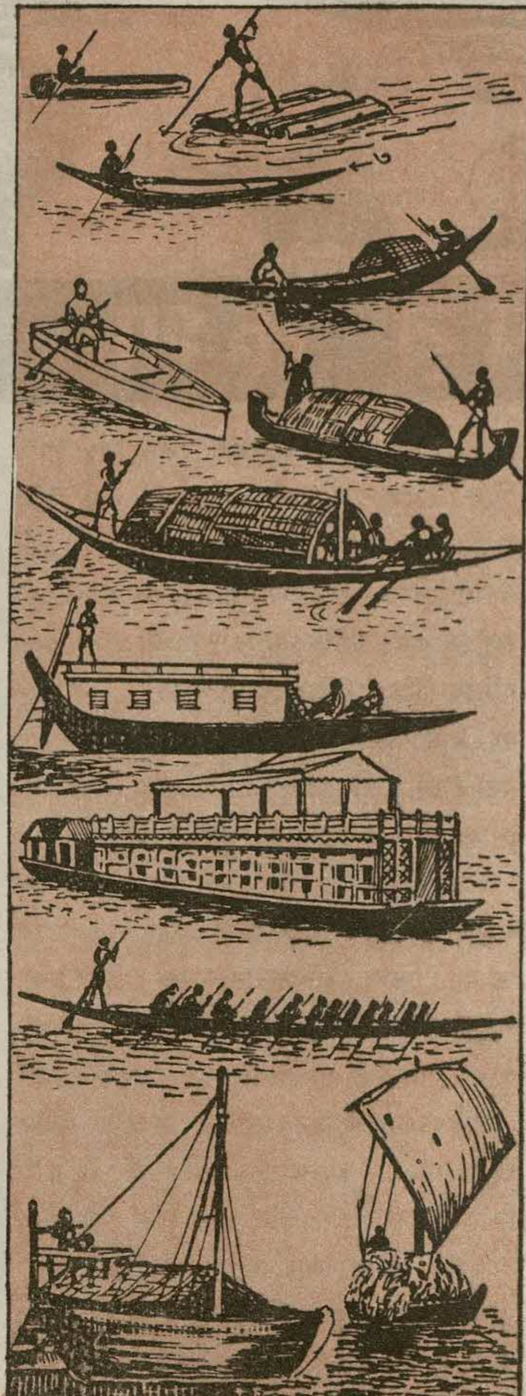
যানবাহনের কথা

সেকালে কি ভাবে জলপথ ব্যবহার করা হ'ত

যাতায়াতের জন্যে আমরা তিন ধরনের পথ ব্যবহার করে থাকি—স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ। স্থলপথের কথা আগেই বলেছি, এবারে শোন জলপথের কথা।

অতি প্রাচীনকালের মানুষও জলপথে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত ছিল,—যদিও তার উপযোগী যানবাহনের প্রচলন তখনও হয় নি। হয়তো সেই প্রাচীন যুগের কোন একটি মানুষ একদিন পড়েছিল মহাবিপদে। সে সেদিন কোন নদীর জলে ডুবে মরতে বসেছিল। হঠাৎ হয়তো ভাসমান কোন কাঠের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে প্রাণে বেঁচেছিল সেদিনকার মত। কিন্তু বিপদ্ কেটে যেতে সে এক নতুন আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে দেখল, কাঠ জলে ভাসে, তাতে চড়ে সে অনায়াসে ভেসে থাকতে পারে বা দরকার পড়লে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়ও যেতে পারে স্রোতের টানে। সে আরও দেখল, একখানা কাঠের চেয়ে কয়েকখানা কাঠ একত্র বেঁধে নিলে কাজটা আরও সুবিধের হয়। তা ছাড়া চলাচলের জন্যে স্রোতের ওপর নির্ভর না করে কোন লম্বা লাঠি দিয়ে ঠেলে বা দড়ি বেঁধে তা ধরে টেনে অনায়াসে কাঠগুলোকে জলের ওপর দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। শুধু লোকজন চড়াই নয়, তার ওপর মালপত্তরও বসিয়ে টেনে নেওয়া যেতে পারে। এই বোধ হয় মানুষের ইতিহাসে আদিমতম জলযান। বলা বাহুল্য, এই রকম ভাবেই ভেলা, লগি এবং নৌকো টানার গুণের আবিষ্কার হয়েছিল।

ক্রমে ভেলারও উন্নতি হতে লাগল। শুধু কাঠই যে এই কাজে ব্যবহার করা হতে লাগল তা নয়; ভেলা তৈরি করার কাজে গাছের ছাল, পশুর চামড়া, বাঁশ, নলখাগড়া প্রভৃতিও ব্যবহৃত হ'ত। আজও পৃথিবীর কোন কোন দেশে এমনি ধরনের আদিম জলযান ব্যবহার করতে দেখা যায়। কলাগাছের গুঁড়ি বাঁশের কাঠি দিয়ে যুড়ে তৈরি ভেলায় চড়ার অভিজ্ঞতা আমারও ছেলেবেলায় যথেষ্ট হয়েছে। নদী-নালার দেশ পূর্ববঙ্গ; সেখানকার অধিবাসীদের অনেকেরই হয়তো এমনি ধরনের অভিজ্ঞতা আছে।



ভেলা, ডোঙ্গা থেকে শুরু করে নানা ধরনের নৌকো

নৌকোর পূর্বপুরুষ

মানুষ দেখল, ভেলার বদলে যদি কাঠের গুঁড়িতে কায়দা মত গভীর গর্ত করে নিয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায় তবে ভাসবার ক্ষমতা তার আরও বেড়ে যায়। এমনি ভাবে পাওয়া গেল ক্যানো। আফ্রিকার বহু অঞ্চলে এ ধরনের জলযান আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি শালতিও এই ধরনের জিনিস। আমাদের দেশের পাড়াগাঁয়ে শালতির প্রচলন এখনও নিতান্ত কম নয়, বর্ষাকালে তো বটেই।

নানা রকমের নৌকো

শালতি বা ক্যানোর উন্নত সংস্করণ হ'ল নৌকো। কাঠের তক্তা লোহা বা কাঠের পেরেক দিয়ে যুড়ে যুড়েই তৈরি হয় নৌকো। ছোট বড় নানা আকারের এবং আকৃতির নৌকো দেখা যায় পৃথিবীর নানা দেশে। রোদবৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে নৌকোর ওপরে তৈরি করা হয় ছই, বসা-শোয়ার জন্যে পাটাতন। চালাবার জন্যে নৌকোর সঙ্গে যুক্ত থাকে হাল, দাঁড় প্রভৃতি। ছোট নৌকোয় হাল বা দাঁড় থাকে না, থাকে বৈঠা। মাঝি বা চালক বৈঠা বেয়েই নৌকো চালায়। তবে হাওয়ার শক্তি কাজে লাগাবার জন্যে পাল খাটাবার ব্যবস্থা থাকে প্রায় সব রকম নৌকোতেই। তিন-চারজন লোক বহন করবার বৈঠাযুক্ত এবং ছই-ওয়ালা নৌকো দেখা যায় পূর্ববঙ্গের সর্বত্র। মাঝি থাকে একজন। সেখানে এ ধরনের নৌকোকে বলা হয় কেয়ারা নৌকো বা টাবুরে নৌকো। নৌকোর যাত্রীদের বলা হয় চড়নদার বা সওয়ারী।

কেয়ারা নৌকোর চেয়ে বড় নৌকোকে বলা



ক্যানো

হয় পানসী নৌকো। যদি তলাটা সমতল হয় তবে তার নাম ঘাসী নৌকো। এ সব নৌকোয় হাল, দাঁড় এবং পাল তোলার ব্যবস্থা থাকে। তা ছাড়া যাত্রীদের আরামের জন্যে ছই-এর ভেতরে অন্যান্য সুবন্দোবস্তও থাকে। নৌকোর সামনের দিক্‌টাকে বলা হয় গলুই এবং পেছনের দিক্‌টাকে বলা হয় পাছা। পাছা এবং গলুইতে থাকে নানা রকম কারুকার্য। ট্রাম-বাসের মত সময় মেনে নির্দিষ্ট ভাড়ায় সাধারণ যাত্রীবহনের কাজ করে গহনার নৌকো। এগুলি আকারে স্বভাবতই বড়। অল্প দূরত্বে যাতায়াত, হাট-বাজার প্রভৃতি করবার জন্যে ব্যবহৃত হয় ডিঙ্গি নৌকো। সুপারী গাছের সরু সরু কাঠ দিয়ে যে সব ডিঙ্গি নৌকো তৈরি করা হয় তা খুব হাল্‌কা বলে ব্যবহারের দিক্ দিয়ে সুবিধা-জনক। মনে পড়ে, স্কুল-জীবনে বাল্যবন্ধু মকবুলের ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকোটির কথা। সে বর্ষার ক'টা মাস ঐ নৌকো করেই স্কুলে যাতায়াত করত। বর্ষার সময় এক হাতে ছাতা ধরে, অন্য হাতে বৈঠা চালাতে সে ছিল ওস্তাদ্।

তোমরা হয়তো শুনেছ যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে পদ্মার বুকে সুন্দর একখানা পানসী নৌকোয় দিন কাটাতেন। অবশ্য সাধারণ পানসী নয়, আকারে অনেক বড় এবং তার ভিতরে দস্তুরমত ঘর থাকত। এগুলিকে আমরা বলি বজরা। যাঁরা কাশ্মীর বেড়াতে যান তাঁদের কাছে ডাল লেকে বা ঝিলাম নদীতে হাউস-বোটে বাস করা তো রীতিমত রোমাঞ্চকর ব্যাপার। হাউস-বোটও আসলে বড় বড় বজরা ছাড়া আর কিছু নয়। তাতে একাধিক কামরা, ড্রইং রুম, ডাইনিং রুম, বাথ রুম সবই থাকে।

এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরের শিকারার কথাও বলতে হয়। ছোট ছোট নৌকো, ৩।৪ জন লোক আরামে বসতে পারে। একজন মাঝিই বৈঠা দিয়ে তা চালায়। ভিতরে মোটর-কারের মত গদী-আঁটা, মাথায় ছইএর মত সুদৃশ্য কাপড়ের সামিয়ানা।

কত রকমেরই না নৌকোর প্রচলন আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে! মিশরের নীলনদের বুকে যে ধরনের পাল-তোলা নৌকো দেখা যাবে সে ধরনের নৌকো আমাদের গঙ্গা বা পদ্মার বুকে দেখা যাবে না। দ্রুতগামী নৌকোর মধ্যে 'ছিপ' নৌকোর কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। লম্বা সরু নৌকো, অনেকজন দাঁড়ি একসঙ্গে দাঁড় টেনে খুব জোরে চালাতে পারে। নৌকো চালনার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রচলিত রয়েছে বাইচের নৌকো। আধুনিক কালে যে ধরনের বাইচের নৌকো (?) শহুরে লোকেরা দেখে থাকে তা কিন্তু নিতান্তই বিদেশ থেকে আমদানী। তোমাদের মধ্যে যারা পুরী বেড়াতে গেছ তারা দেখেছ মাছ ধরার কাজে ওখানকার জেলেরা কি ধরনের নৌকো ব্যবহার করে থাকে।

কয়েকটা কাঠ যুড়ে সে নৌকো। উল্টে যায়, কিন্তু ডোবে না। তেমনি আবার আমাদের দেশের জেলেদের নৌকো তা থেকে কতই না আলাদা! ইতালি দেশের ভেনিসে রাস্তা বলতে বেশির ভাগই খাল। সেখানে চলে গণ্ডোলা। তেমনি ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আছে শাম্পান।



গণ্ডোলা

শুধু যাত্রী বহন করা নয়, নদীপ্রধান দেশে মালপত্তর আনা-নেওয়া, হাটবাজার করা প্রভৃতি সব কাজেই ব্যবহার করা হয় নৌকো।

পালতোলা জাহাজ

নৌকো সাধারণতঃ দেশের ভিতরকার নদী, খাল, বিল, হ্রদ প্রভৃতিতে যাতায়াত করে থাকে। কিন্তু উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে ঐ ধরনের নৌকো কোনমতেই ব্যবহার করা চলে না। সেকালে সমুদ্রপথে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাতায়াত এবং মালপত্তর বয়ে নেবার জন্যে তাই আকারে বড়, উঁচু এবং মজবুত ধরনের নৌকো ব্যবহার করা হ'ত। হাল, দাঁড় প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় পাল খাটাবার ব্যবস্থা রাখতে হ'ত ঐ সব নৌকোয়। দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের নৌকোয় বসবাস করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে এ ধরনের নৌকোর আকার ও আকৃতি হ'ত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। এ ধরনের বড় আকারের নৌকোই হচ্ছে জাহাজ।

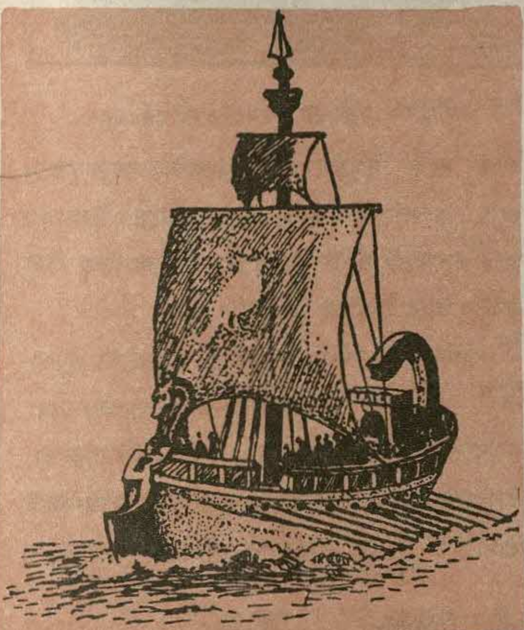
প্রাচীনকালের বহু দেশই এই ধরনের জাহাজ নির্মাণে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় মিশর দেশের। মিশরবাসীরা যীশু খৃষ্টের জন্মের চার হাজার বছর আগেও জাহাজ তৈরির কলা-কৌশল ভালো ভাবেই জানত। এরা কখনো কখনো তিনশ' ফুট লম্বা জাহাজও তৈরি করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। জাহাজের মাঝখানটাতে থাকত উঁচু একটা খুঁটি, যার



প্রাচীন মিশরীয় জাহাজ

সাহায্যে চৌকো আকারের পাল খাটানো হ'ত। বড় বড় জাহাজে একাধিক পাল খাটাবার ব্যবস্থা থাকত।

ক্রীট দ্বীপের অধিবাসীরা, ফিনিসীয়, গ্রীক এবং রোমানরাও জাহাজ তৈরির ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। এদের তৈরি জাহাজের মূল কাঠামোটি অনেকটা মিশরীয়দের



গ্রীক জাহাজ

মতই ছিল, তবে নিজ নিজ দেশের বৈশিষ্ট্যও তাদের জাহাজে ফুটিয়ে তুলতে কসুর করে নি ওই সব জাতি।

ক্রমে সমুদ্রগামী এই সব জাহাজের মধ্যে দু'ধরনের জাহাজ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে—ব্যবসায়ীদের জাহাজ এবং যুদ্ধজাহাজ। যুদ্ধ-জাহাজ চওড়ায় হ'ত ছোট এবং দ্রুতগামী। ব্যবসায়ীদের জাহাজগুলি চওড়ায় একটু বড় হ'ত। রোমান সভ্যতার শীর্ষসময়ে ওদেশের সমুদ্রগামী জাহাজের ছিল খুবই আধিপত্য। এ ছাড়া উত্তর ইয়োরোপেরও কোন কোন জাতি জাহাজ তৈরির কাজে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করেছিল। সেকালে যত রকমের জাহাজ তৈরি হ'ত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হ'ল ভাইকিং জাহাজ। এমনি ধরনের একটি জাহাজে চড়ে লিফ এরিকসন নামে এক নাবিক ১০০০ খৃষ্টাব্দে উত্তর আমেরিকা পৌঁছতে সমর্থ হয়েছিলেন। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের বহু আগেকারই ঘটনা এটি।

প্রাচীন কালে ভারতীয়েরাও জাহাজ নির্মাণে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। রোমের বাজারে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের, বিশেষ করে মসলিনের খুব নাম ছিল। ভারতীয় বণিক্‌রা এদেশে তৈরি জাহাজে চড়ে রোম এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-

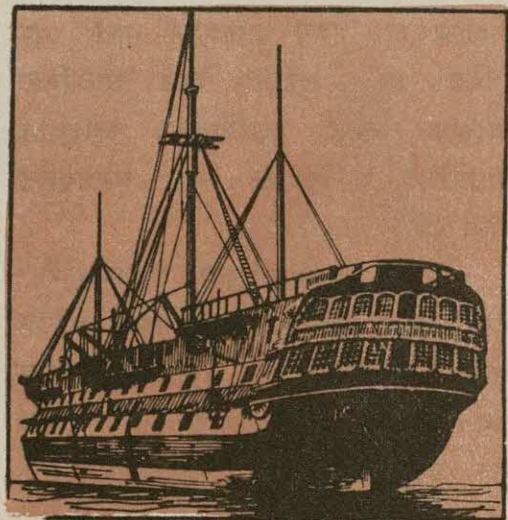


ভাইকিং জাহাজ

বাণিজ্য চালাতেন। বাঙ্গালী রাজপুত্র বিজয় সিংহের লঙ্কাজয়ের কথা তো প্রায় সকলেরই জানা। বাংলাদেশও এক সময় ছিল জাহাজ তৈরির একটি মস্ত ঘাঁটি।

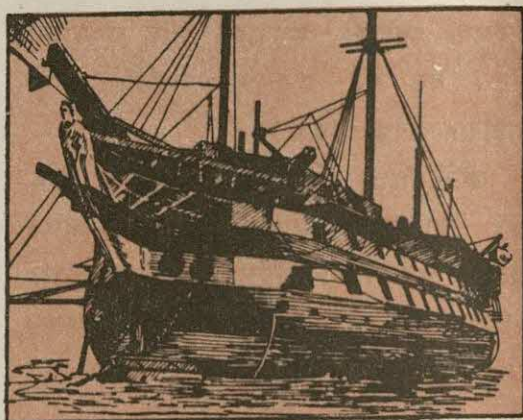
মধ্যযুগের জাহাজ

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের



মধ্যযুগীয় জাহাজ

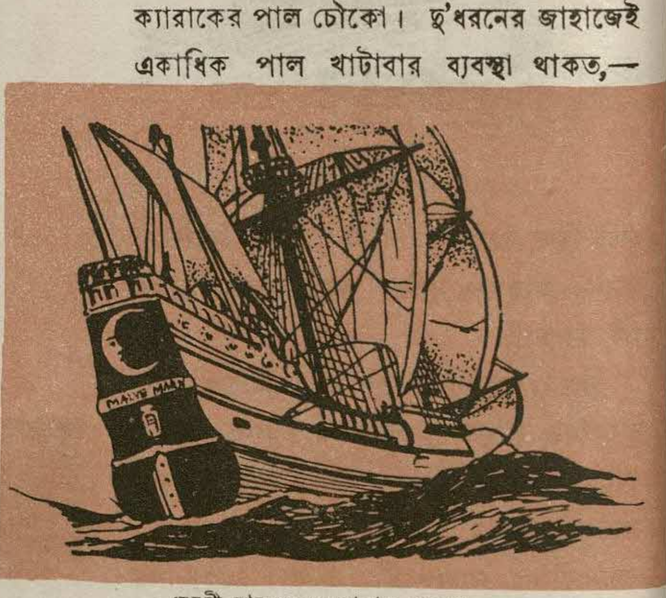
পতনের পর থেকে জাহাজ তৈরির ব্যাপারে ওদেশে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে ভারত এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগও হয়তো এর অন্যতম কারণ। এই পরিবর্তনের মধ্যে একটি হ'ল একাধিক পালের প্রবর্তন। এর আগে বেশির ভাগ জাহাজেই একটি মাত্র পালই ব্যবহার করা হ'ত জাহাজের মাঝখানটিতে। হাল এবং দাঁড়েরও নানা পরিবর্তন ঘটে। তা ছাড়া চুম্বকের সাহায্যে তৈরি কম্পাস্ আবিষ্কারের



মধ্যযুগের আর এক ধরনের জাহাজের নমুনা

সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে। কম্পাসের কাঁটা সব সময়ে উত্তরমুখ করে থাকে, তাই ঐ যন্ত্র সঙ্গে থাকলে দিক্ ঠিক করতে আর ভুল হয় না।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রধানত দু'ধরনের সমুদ্রগামী জাহাজ দেখা যেত—ক্যারাভেল এবং ক্যারাক। ক্যারাভেলের পাল তিনকোণা, ক্যারাকের পাল চৌকো। দু'ধরনের জাহাজেই একাধিক পাল খাটাবার ব্যবস্থা থাকত,—



হেন্‌রী হাড্‌সনের জাহাজ হাফমুন্



প্রাচীন ভারতীয় জাহাজ

সাধারণত তিনটি বা চারটি। পরবর্তীকালে অবশ্য এ দু'ধরনের জাহাজের মধ্যে পার্থক্য প্রায় উঠে গিয়েছিল।

১৪০০ সালে ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে এসে হাজির হন এই রকমই এক জাহাজে চড়ে। ১৪৯২-৯৮ সালে তিনখানা জাহাজ নিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেন কলম্বাস। এঁরা দু'জনেই ক্যারাভেল বা ক্যারাক জাতীয় জাহাজই ব্যবহার করেছিলেন।

বাষ্পীয় যানের আগে

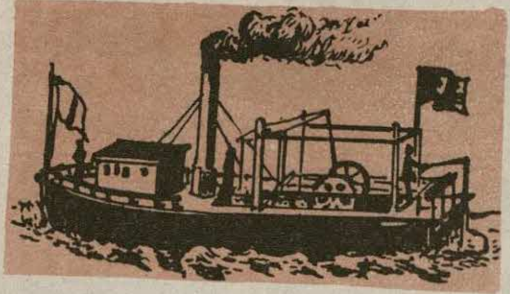
পাল-তোলা জাহাজশিল্পে যতই উন্নতি ঘটতে থাকে ইয়োরোপের নানা জাতিও সমুদ্র-গামী জাহাজ চালনার ব্যাপারে ততই কৃতিত্ব অর্জন করতে থাকে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই চলে তাদের অভিযান। কোন কোন জাতি তো পৃথিবীর নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে দস্তুরমত রাজা-উজির ব'নে যায়। তা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কখনো কখনো জলদস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেও তারা অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে বসে। আমাদের দেশে সে যুগে ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় জাতিরা যে কীর্তিকলাপ করে গেছে তা ইতিহাসের পাতায় কালো কালিতে লেখা থাকবে চিরকাল।

অবশ্য এই সব অপকীর্তির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী-বহন, ডাকবহন এবং অন্যান্য হিতকর কাজও যে এরা জাহাজের সাহায্য নিয়ে করে নি তা বললে ভুল বলা হবে। এ সব কাজে যে ধরনের জাহাজের সাহায্য নেওয়া হ'ত তাদের সাধারণ নাম ক্লিপার। এ জাতীয় জাহাজে পালের সংখ্যা থাকত চারটির চেয়েও বেশি। পালের আকার হ'ত চৌকো। তা ছাড়া জাহাজ চালাবার কাজে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও ব্যবহৃত হ'ত। এ সবের মধ্যে সেক্স্ট্যাণ্ট এবং ক্রোনোমিটার অন্যতম।

ক্লিপার যুগের শেষ পর্যায়ে বাষ্পীয় যানের আবির্ভাব ঘটে। তখন লেগে যায় প্রতিযোগিতা —সমুদ্রে আধিপত্য কার? এমনি ভাবে চলল বেশ কিছুদিন। এমন কি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই দু'ধরনের জাহাজই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধশেষে দেখা গেল যে বাষ্পীয় যানই পেয়ে গেছে সমুদ্রের আধিপত্য। তখন থেকে ক্লিপারের স্থান রইল শুধু ইতিহাসের পাতায়।

বাষ্পীয় জলযানের শুরু কবে থেকে

বাষ্পের শক্তি দিয়ে চাকা ঘোরানো যায়। তা হলে ঐ শক্তির সাহায্যে নৌকো বা জাহাজ

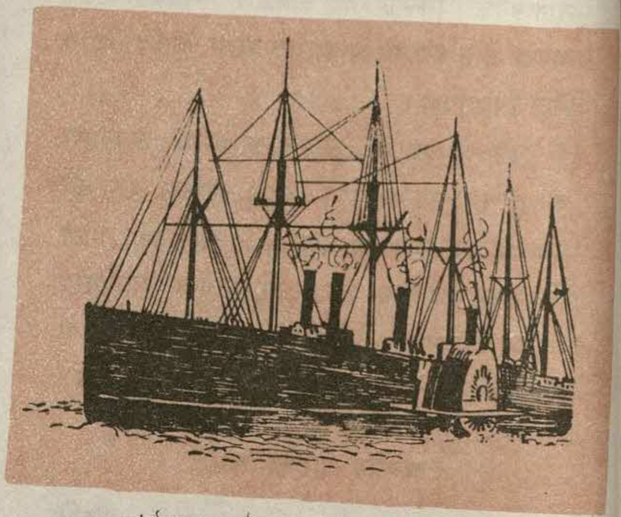


১৭৮৩ সালে এই নৌকোটি বাষ্পীয় শক্তিতে চালিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়া হয়।

চালানো যায় কিনা এ ভাবনাও অনেকের মাথায়ই আসে। ফরাসী দেশের এক ভদ্রলোক, নাম জুফ্রয় দ্য আব্বানস, ১৭৮৩ সালে প্রথম একটি নৌকো বাষ্পীয় শক্তিতে চালিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। আমেরিকার জন ফিচ্‌ও এ ব্যাপারে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। ১৭৯০ সালে তিনিও একটি বাষ্পীয় যান জলে নামিয়ে দিলেন।

এরপর ১৮০১ সালে উইলিয়ম সিমিংটন তৈরি করলেন 'শারলোট ডানডাস' নামে আর একটি বাষ্পীয় জলযান এবং ১৮০৩ সালে ফরাসী দেশের সীন নদীর বুকে চলল রবার্ট ফুলটনের বাষ্পীয় যানটি। ১৮০৭ সালে ফুলটনেরই আর একটি বাষ্পীয় যান—ক্লারমণ্ট তো রীতিমত যাত্রী-বহনের কাজই শুরু করে দিল। এর দৌড় ছিল নিউইয়র্ক শহর থেকে অ্যালবানি পর্যন্ত। ঐ পথটুকু যেতে সেটির সময় লাগত ত্রিশ ঘণ্টা, চলত হাডসন নদীর ওপর দিয়ে।

এর দু'বছর পর আমেরিকার জন স্টিভেনসনের 'ফিনিক্স' নদীর মায়া কাটিয়ে হাজির হল উন্মুক্ত সমুদ্রবক্ষে এবং তারও দশ বছর পরে আমেরিকার জলযান 'সাভানা' আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ডের লিভারপুল শহরে গিয়ে হাজির হ'ল। অবশ্য ঐ জাহাজটিতে পাল খাটাবার ব্যবস্থাও ছিল, কারণ বাষ্পীয় শক্তির ওপর তখনও পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারেন নি ওঁরা। প্রকৃত পক্ষে সাভানাকে মাঝে মাঝে পালের ওপরও নির্ভর করতে হয়েছিল।

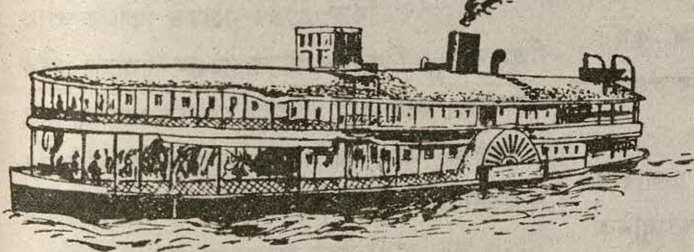


কাঠের বদলে ইস্পাতের ব্যবহার শুরু হয় ১৮৪৩ সালে

তারপর কেটে গেল বেশ কয়েকটি বছর। চলল অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। উন্নত ধরনের বয়লার তৈরি হ'ল, তৈরি হ'ল শক্তিশালী স্টীম-এঞ্জিন। ১৮৩৩ সালে ক্যানাডার স্টীমার 'রয়াল উইলিয়াম' কেবল মাত্র বাষ্পের শক্তিতেই পাড়ি দিল আটলান্টিক মহাসাগর। পাঁচ বছর পর ইংল্যাণ্ডের স্টীম-শিপ বা বাষ্পীয় যান 'সিরিয়াস' এবং 'গ্রেট ওয়েস্টার্ন' যথাক্রমে ১৮ এবং ১৫ দিনে ইংল্যাণ্ড

থেকে নিউইয়র্কে পৌঁছল। বাষ্প বা স্টীমের শক্তিতে চলত বলে এ সব জলযানকে এক কথায় বলা হ'ত স্টীমার বা স্টীম-শিপ্।

এ-যাবৎ কাল সমুদ্রগামী স্টীমার মূলতঃ কাঠ দিয়েই তৈরি করা হ'ত। যতই দিন যেতে লাগল, কাঠের বদলে স্টীমার তৈরির কাজে লোহা এবং ইস্পাতের ব্যবহার শুরু হ'ল। ১৮৪৩ সালের গ্রেট ব্রিটেন নামে স্টীমারটির বহু অংশই লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি। ১৮৫১ সালে তৈরি আমেরিকার স্টীমার 'আটলান্টিক' লম্বায় ছিল ২৭০ ফুটের মত। এর সাত বছর পরে তৈরি 'গ্রেট ইস্টার্ন' ছিল লম্বায় ৭০০ ফুট।



নদীতে যাত্রীবাহী স্টীমার

স্টীমারের এঞ্জিন

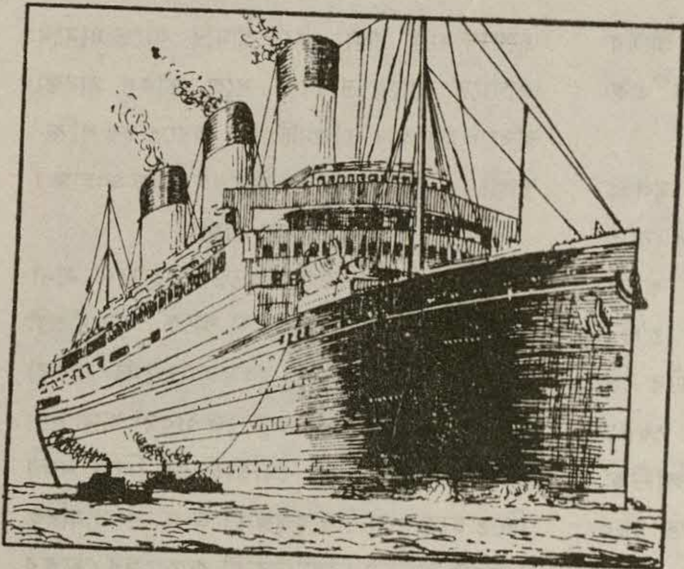
রেলগাড়ি চালাতে যে ধরনের স্টীম-এঞ্জিন ব্যবহার করা হয় এই সব স্টীমারের এঞ্জিনও তথ্যের দিক্ দিয়ে সেই একই ধরনের। সেই বয়লারে জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি করা, বাষ্পের শক্তি দিয়ে সিলিণ্ডারের ভিতরে পিস্টন চালানো, পিস্টনের রৈখিক গতিকে ঘূর্ণন গতিতে পরিণত করা, সেই চাকা ঘোরানো। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮০২) চাকা ঘোরাতে পারলেই রেলগাড়ি চলে। কিন্তু স্টীমারের বেলা চাকা ঘোরালেই স্টীমার সামনে এগোয় না। জল কেটে স্টীমার যাতে সামনে এগোতে পারে চাকার সঙ্গে তারও ব্যবস্থা রাখতে হয় আর এঞ্জিনটিকেও করতে হয় শক্তি-শালী। বড় আকারের স্টীমারই হচ্ছে জাহাজ।

নানা ধরনের জাহাজ

কাজের বিভিন্নতার জন্যে জাহাজও নানা আকারের ও আকৃতির হয়ে থাকে। যাত্রীবাহী জাহাজে যাত্রীদের সব রকম আরামের ব্যবস্থা রাখতে হয়। মালবাহী জাহাজে ব্যবস্থা আলাদা। সেখানে বেশি মাল বোঝাই-এর দিকে নজর দিতে হবে। আবার যুদ্ধজাহাজে থাকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বসানো। বিমানবাহী জাহাজের ডেকের ওপর থেকেই যাতে বিমান ওঠা-নামা করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকে। আবার জেলেদের জাহাজে ব্যবস্থা থাকে মাছ ধরার। আর এক ধরনের খুব শক্তিশালী এঞ্জিনযুক্ত জাহাজ আছে যার নাম টাগ-বোট। এগুলো আকারে খুব বড় হয় না। এদের কাজ হ'ল বড় বড় স্টীমারকে টেনে নেওয়া, কারণ বড় স্টীমারের এঞ্জিন খারাপ হয়ে গেলে তাদের মেরামতের জায়গায় বা ডকে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া আরও কত রকমের নামের কত যে জাহাজ আছে তা বলে শেষ করা যায় না।

ডিজেল এঞ্জিন

রেলগাড়ির বেলায় যে রকম, স্টীমারেও তেমনি আজকাল ডিজেল তেল দিয়েও এঞ্জিন চালাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ কাজের প্রধান সুবিধে হ'ল এতে বয়লার লাগে না। কাজেই এঞ্জিনের জন্যে জায়গা লাগে কম। তা ছাড়া



১৯২১ সালে নির্মিত যাত্রীবাহী ব্রিটিশ জাহাজ "ম্যাজেস্টিক্" ৯০০ ফুট লম্বা ও ১০০ ফুট চওড়া, ঘণ্টায় গতিবেগ ২৫ নট্।

স্টীমার চালাবার জন্যে নাবিকও লাগে কম। তবে ডিজেল এঞ্জিনে কিছু কিছু অসুবিধেও যে নেই তা নয়।

সম্প্রতি আবার বিদ্যুৎশক্তিও জাহাজ চালাবার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সর্বাধুনিক হ'ল পরমাণুর শক্তি দিয়ে জাহাজ চালানো।

আধুনিক যাত্রীবাহী জাহাজ

সমুদ্রগামী যাত্রীবাহী জাহাজে (যাকে বলা হয় লাইনার) আজকাল সব রকম সুখসুবিধের ব্যবস্থা থাকে। দূর দূর দেশ পাড়ি দিতে হ'লে যাত্রীদের বেশ কিছুদিন জাহাজে কাটাতে হয়। কাজেই জীবনযাত্রার সব রকম আধুনিক ব্যবস্থাদি না হলে চলে না। খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি সব রকম উপকরণেরই ব্যবস্থা থাকে জাহাজের মধ্যে।

সমুদ্রপথে জাহাজ নানা দুর্ঘটনার মধ্যে পড়তে পারে, যেমন পড়েছিল টাইটানিক নামে জাহাজটি। কাজেই সব রকম আরামের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য বিপদ্‌মুক্তির ব্যবস্থাও রাখা হয় আজকালকার জাহাজগুলিতে।

সব দিক্ দিয়েই অতি উন্নত ধরনের একটি আধুনিক লাইনার ছিল 'কুইন এলিজাবেথ'। জাহাজখানা লম্বায় এক হাজার ত্রিশ ফুট এবং চওড়ায় একশ' আঠারো ফুট। ২৩০০ যাত্রী বহনের বন্দোবস্ত ছিল এতে। চলত ঘণ্টায় প্রায় ৩২ নট্। কিছুদিন আগে আগুন লেগে এটির নিদারুণ ক্ষতি হয়ে গেছে। এমনি ধরনের আর একখানা আধুনিক লাইনার হ'ল আমেরিকার 'ইউনাইটেড স্টেট্‌স্'। এ জাহাজটি হচ্ছে লম্বায় ৯৯০ ফুট, যাত্রী বহন করতে পারে ১৯৮২ জন।

এই সব জাহাজে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যা ব্যবস্থা তা কল্পনাতীত। 'কুইন এলিজাবেথ' তৈরি হবার অল্প কিছু আগে 'কুইন মেরী' নামে যে জাহাজটি তৈরি হয়েছিল সেটির সম্বন্ধে বরঞ্চ একটু বলি। জাহাজটি কত বড় শুনবে?



কুইন মেরী

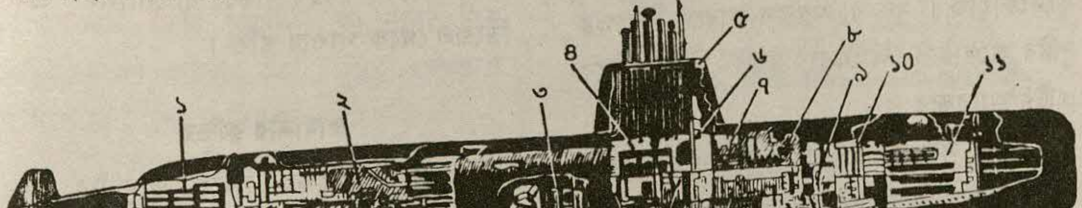
লম্বায় ১০২০ ফুট, আর জাহাজের টনেজ হচ্ছে ৮০৭৭৩। টনেজ কাকে বলে? মোটামুটি জেনে রাখ যে, যে-জাহাজের খোলের মাপ ১০০ ঘন ফুট তার টনেজ ধরা হয় ১। তা হ'লে কুইন মেরীর খোল কত বড়? জাহাজ না বলে ওকে একটা ভাসমান শহর বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়।

এই জাহাজটি তৈরি করতে কত হাজার টন ইস্পাত, কত লক্ষ লক্ষ নাট, বোল্ট, কাঠের টুকরো যে লেগেছিল তার হিসেব দেওয়াও কঠিন। ইলেকট্রিকের তারই ব্যবহার করা হয়েছিল বেশ কয়েক মাইল।

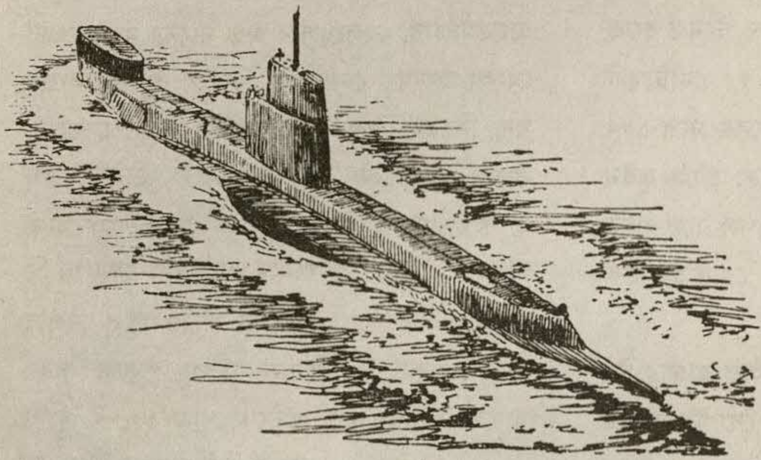
জাহাজে ছিল অগুণ্তি শোবার ঘর—তাতে পুরু নরম বিছানা পাতা, ইচ্ছেমত গরম হাওয়ার ব্যবস্থা, শীতে আগুন পোহাবার বৈদ্যুতিক চুল্লী। প্রত্যেক শোবার ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম বা স্নানাগার। তা ছাড়া বড় বড় হল্ ঘর—যাকে বলা যায় ড্রইং রুম। তার মেঝেতে গালচে পাতা। সমস্ত জাহাজে যে গালচে পাতা হয় তা পাশাপাশি যুড়লে ছ'মাইল জায়গা নেবে। শুধু শোবার ঘর আর ড্রইং রুমই নয়,—স্নানের জন্য সুইমিং পুল, ব্যায়ামাগার, খেলাধূলার জন্য মাঠের মত চওড়া খোলা জায়গা, বেড়াবার জন্য পার্ক, বল-নাচের ঘর, সিনেমা হল্, লাইব্রেরী, আর্ট গ্যালারী, বক্তৃতা দেবার হল্, কী ছিল না? ডাইনিং রুম্ বা খাবার ঘরে একসঙ্গে ৮০০ লোক বসে খেতে পারত। ছোট ছেলেমেয়েদের কথাও ভোলেন নি জাহাজের কর্তারা। তাদের জন্যও ছিল খেলার ঘর, দোলনা, ঢেঁকিকল, স্লীপ্, পুতুলের ঘর। আলো-ঝলমল জাহাজটিতে রোজ ৩০,০০০ বাতি জ্বলত। তাতে যে কারেন্ট খরচ হ'ত তা দিয়ে দেড় লক্ষ লোকের বসবাসের উপযোগী একটি শহরের যাবতীয় বৈদ্যুতিক কাজ সেরে ফেলা যায়।

পারমাণবিক শক্তি-চালিত জাহাজ

পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে পাওয়া যায় শক্তি। অ্যাটম্ বা পারমাণবিক বোমার কথা তোমাদের অজানা নয়। পরমাণুর ভিতরকার বিপুল শক্তিই অ্যাটম বোমার ধ্বংসশক্তির মূল। এই প্রচণ্ড শক্তিকে বিজ্ঞানী এখন জাহাজ চালাবার কাজেও লাগিয়েছেন। পারমাণবিক শক্তি-চালিত জাহাজ তৈরির ব্যাপারে রাশিয়াই প্রথম কৃতিত্বের অধিকারী। রাশিয়ায় তৈরি



পারমাণবিক শক্তি-চালিত ডুবোজাহাজ নটিলাসের বিভিন্ন অংশ
(১) নাবিকদের ঘর (২) এঞ্জিনের ঘর (৩) যেখানে পারমাণবিক শক্তি তৈরি হয় (৪) আক্রমণের যন্ত্র-ঘর (৫) ব্রিজ (৬) পেরিস্কোপ-ঘর (৭) ক্যাপটেনের ঘর (৮) অফিসারদের ঘর (৯) গ্যালি (১০) নাবিকদের ঘর (১১) টর্পেডোর ঘর (১২) কন্ট্রোল রুম (১৩) নাবিকদের খাবার ঘর (১৪) ব্যাটারি (১৫) গুদাম ঘর



আধুনিক সাবমেরিন

ব্যবহার করা হয়। ইতিমধ্যে আরও নানা লোক ডুবো-জাহাজ নিয়ে পরীক্ষা চালান। এঁদের মধ্যে নিউ ইয়র্কের বুশনেল, ফুলটন প্রভৃতি অনেকের নাম করা যেতে পারে। এর মধ্যে একজন ইংরেজ পাদ্রীর প্রদর্শিত পথে কাজ করে সুইডিস এঞ্জিনীয়ার নরডেনফেল্টের সাবমেরিন জলের তলায় চৌদ্দ মাইলের মত দূরত্ব অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল। এ সব সাবমেরিন চলত বাষ্পীয় শক্তিতে। এর পর বিদ্যুৎশক্তির সাহায্য নিয়ে সাবমেরিন চালাবার চেষ্টা চলে।

এমনি ধরনের প্রথম জাহাজটির নাম 'লেনিন'। লম্বায় এটি ৪৪০ ফুট, গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮ নট্।

১৯৬৪ সালে আমেরিকাও তৈরি করল 'স্যাভানা'। জাহাজটি ৫৯৫ ফুট লম্বা, ১০৯ জন নাবিক ছাড়া জাহাজটি যাত্রী বহন করতে পারে ৬০ জন। গতিবেগ ঘণ্টায় ২১ নট্।

সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ

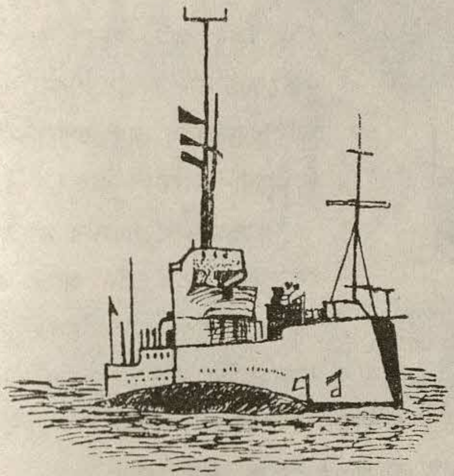
জলের ওপর দিয়ে যাতায়াত করার জন্য যেমন নানা ধরনের নৌকো, জাহাজ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তেমনি জলের তলা দিয়ে চলা-ফেরা করবার জন্যে তৈরি হয়েছে সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ। যুদ্ধ বা অনুরূপ কারণে বিপক্ষের দৃষ্টির অগোচরে চলাফেরার জন্যই বিশেষ করে এটির আবিষ্কার।

১৬২০ সালেই সর্বপ্রথম সাবমেরিন তৈরি করেন পর্তুগালের এক ডাক্তার, নাম কর্নেলিস ড্রেবেল। টেম্স্ নদীর বারো থেকে পনেরো ফুট জলের নীচে এই ডুবোজাহাজটি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকার বিপ্লবের সময়েই সর্বপ্রথম এই ধরনের ডুবোজাহাজ যুদ্ধের কাজে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েক বছরে সাবমেরিন তৈরির ক্ষেত্রে বহু উন্নতি দেখা যায়। সাবমেরিন যখন জলের তলায় চলাফেরা করবে তখন জলের ওপরের চারদিক্কার সব কিছু দেখার জন্যে আবিষ্কৃত হয় পেরিস্কোপ্ নামক যন্ত্রটির। তা ছাড়া ওকে চালাবার জন্যে ব্যবহৃত হতে থাকে বিদ্যুৎ-শক্তি, গ্যাসোলিন এবং ডিজেল থেকে পাওয়া শক্তি।

জার্মানীর কৃতিত্ব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানীর ইউ-বোটের আক্রমণে মিত্রশক্তির জাহাজ চলাচল একরকম দুষ্কর হয়ে পড়ে। জার্মান্দের তৈরি এইসব ইউ-বোট আসলে উঁচু-জাতের সাব-মেরিন ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) সময়েও জার্মান ইউ-বোট বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। পরে অবশ্য



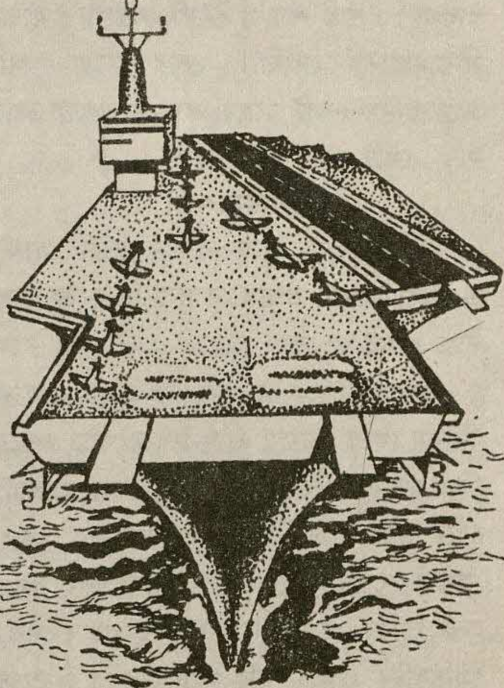
একখানি বড় আকারের বৃটিশ যুদ্ধ-সাবমেরিন

সাবমেরিন ঘায়েল করার অস্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে জার্মান্‌রা সাবমেরিনে ব্যবহারের জন্য যে ডিজেল এঞ্জিন আবিষ্কার করেছে তাই শেষ পর্যন্ত একটি প্রামাণ্য এঞ্জিনে পরিণত হয়েছে। আধুনিক সাবমেরিনেও এ ধরনের এঞ্জিন ব্যবহারের চলন আছে।

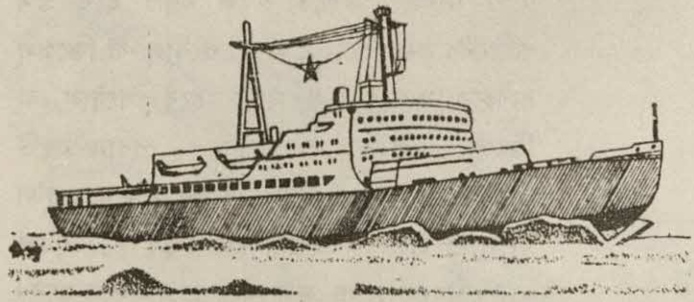
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরমাণুর শক্তির সাহায্যে সাবমেরিন চালানোর কাজও সুগম হয়েছে। আমেরিকাই এ কাজে অগ্রগণ্য। ১৯৫৪ সালে 'নটিলাস' নামে এ ধরনের যে সাবমেরিনটি তৈরি হয়েছিল তা নানা দিক্‌ দিয়েই উল্লেখ করবার মত। পরে রাশিয়াও এ ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়।

সাবমেরিনের যন্ত্রপাতি

স্টীম এঞ্জিন এবং পেট্রোল এঞ্জিনের কথা আগেই বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮০১-৮০৩ এবং ৮০৫-৮০৭)। সাবমেরিন চালাবার প্রধান যন্ত্রটি স্টীম বা পেট্রোল এঞ্জিনেরই মত। তবে প্রয়োজন-বোধে এখানে-সেখানে কিছু পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। জলীয় বাষ্প ব্যবহার করতে হ'লে যন্ত্রটি হবে স্টীম এঞ্জিনের সমগোত্রীয়, আর পেট্রোল বা ডিজেল ব্যবহার করতে হ'লে যন্ত্রটি হবে পেট্রোল বা ডিজেল এঞ্জিনের সমগোত্রীয়। প্রধান যন্ত্রটি ছাড়া থাকে অনেকগুলি চৌবাচ্চা, যার নাম হ'ল ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক। জলের তলায় ডুব দিতে হ'লে এই চৌবাচ্চাগুলো জল দিয়ে ভরে দিতে হবে। ফলে সাবমেরিনের ওজন বেড়ে সেটি জলের তলায় ডুবে যাবে। চৌবাচ্চার জল কমিয়ে-বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় গভীরতায় দাঁড় করানো চলে সাবমেরিনটিকে। তারপর এঞ্জিন চালিয়ে চলাফেরার কাজ চলতে থাকে। আবার, যখন জলের ওপরে ভেসে উঠতে হবে, তখন পাম্প চালিয়ে চৌবাচ্চাগুলো খালি করে দিতে হবে।



পারমাণবিক শক্তিচালিত আমেরিকার সুবৃহৎ বিমানবাহী জাহাজ এণ্টারপ্রাইজ



রাশিয়ার পারমাণবিক শক্তিচালিত বরফ-ভাঙ্গা জাহাজ

তা ছাড়া লোকজন যারা থাকবে তাদের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থাও রাখতে হবে সাবমেরিনের মধ্যে।

মোটামুটি এই-ই হ'ল সাবমেরিনের যন্ত্রপাতির কথা। তবে যত অল্প কথায় ব্যাপারটা বলা হ'ল তত সহজ যে নয় তা বলাই বাহুল্য। শত শত খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতি রয়েছে সাবমেরিনের মধ্যে। তার মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্রের কথা না বললে চলবে না। সেটি হ'ল পেরিস্‌কোপ্‌।

পেরিস্‌কোপ্‌

পেরিস্‌কোপ্‌ হচ্ছে সাবমেরিনের "চোখ"। এ দিয়ে জলের ওপরে কোথায় কি হচ্ছে জলের নীচে বসেই তা দেখা যায়। একটা লম্বা নলের ছু' মাথায় থাকে ছু'খানা প্রিজ্‌ম্‌। কোনও জিনিস থেকে আলো এসে প্রথমে পড়ে ওপরের প্রিজ্‌ম্‌খানার ওপর। সেখান থেকে আলোর রশ্মি বেঁকে এসে পড়ে নীচের প্রিজ্‌ম্‌খানার ওপর। সেখান থেকে আবার বেঁকে আলো যখন দর্শকদের চোখে এসে পড়ে তখন জলের ওপরকার জিনিসটির একটি ছবি ফুটে উঠে। লেন্সের সাহায্য নিয়ে ছবিটিকে ছোট-বড় করা যেতে পারে। পেরিস্‌কোপের মাথাটা জলের ওপর প্রায় তিন ফুট উঁচুতে থাকে। এটিকে চারদিকে ঘোরানো যায়, আবার দরকার মত ওপরে-নীচে নামানো-ওঠানোও যায়।

কলকাতার খেলার মাঠে যে পেরিস্‌কোপের চলন আছে তাও এই ধরনের পেরিস্‌কোপেরই সস্তা সংস্করণ। এতে প্রিজ্‌মের বদলে থাকে ছু'খানা সমান্তরাল আয়না। তা ছাড়া এতে লেন্সেরও ব্যবস্থা নেই।

পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন

পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে সাবমেরিন চালানোর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ ধরনের সাবমেরিনের যন্ত্রপাতির মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকে যাতে করে অক্সিজেন তৈরি হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বার করে দেওয়া যায়। শ্বাসকার্য চালানোর সময় অক্সিজেন না হ'লে চলে না; আবার ঐ সময়ে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় তাও বার করে না দিলে তো দম বন্ধ হয়ে যাবে!

১৯৬০ সালে রাশিয়া ট্রাইটন নামে যে সাবমেরিনটি তৈরি করেছিল সেটি জলের তলা দিয়ে গোটা পৃথিবী ঘুরে আসতে সমর্থ হয়েছিল। এ কাজের জন্যে সাবমেরিনটিকে ছত্রিশ হাজার মাইল ভ্রমণ করতে হয়েছে। জলের তলায় এটিকে থাকতে হয়েছে একাদিক্রমে ৮৪ দিন। আমেরিকায় তৈরি নটিলাস মেরুপ্রদেশের বরফের তলা দিয়ে যে অভিযান চালিয়েছিল তা নানা দিক্‌ দিয়েই উল্লেখ করবার মত। যুদ্ধের সময় ছাড়া এ ধরনের সাবমেরিন যাত্রী ও মাল বহনের কাজেও লাগানো যেতে পারে।



ধর্মের কথা

ভারতবর্ষের নানা ধর্ম

বড় বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ—বিচিত্র এর আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও রীতিনীতি। শুধু ধর্মের কথাই ধরা যাক না কেন। পৃথিবীর চারটে প্রধান ধর্মের মধ্যে (বৌদ্ধ, খৃষ্টান, হিন্দু ও মুসলমান) দু'টি ধর্মেরই জন্মস্থান ভারতবর্ষ। কবি বলেছেন, 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'। মহামানবের সাগরতীরই বটে! ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পারসিক প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকই বাস করে। আবার এই ধর্মসম্প্রদায়গুলির শাখা-প্রশাখারও অভাব নেই। যাই হোক, এবারে বৌদ্ধধর্ম দিয়েই শুরু করি।

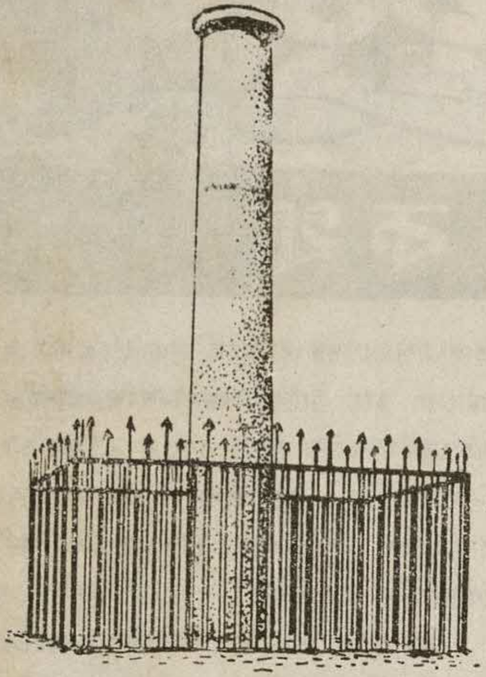
বৌদ্ধধর্ম

প্রায় ছাব্বিশ শ' বছর আগেকার কথা। ভারতের ধর্মজীবনে তখন চরম দুর্দিন। একদিকে উঁচুস্তরের মানুষ ভোগবিলাস আর লালসায় মত্ত, অন্যদিকে নীচুস্তরের মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের (পুরোনো হিন্দুধর্ম) আগেকার সমৃদ্ধি লুপ্ত হ'তে বসেছে; ধর্মাচরণ হয়ে উঠেছে অনুষ্ঠানসর্বস্ব, প্রাণহীন। এই চরম সংকটের মুহূর্তে এক নতুন যুগের ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহামানব সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধ, আর তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত।

হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে সে সময়ে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা শুদ্ধোদন ছিলেন সিদ্ধার্থের পিতা। আনুমানিক ৫৬৪ খৃঃ পূর্বাব্দের (তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে) বৈশাখী পূর্ণিমায় বর্তমান নেপালের লুম্বিনীতে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়।

ভোগবিলাসের মধ্যে থেকেও রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সুখী হ'তে পারেন নি। সারথির সঙ্গে রথে চড়ে নগর পরিভ্রমণে বেরিয়ে পথের ধারে মৃতদেহ, ব্যাধিগ্রস্ত লোক এবং এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখে তিনি বিচলিত হ'লেন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে মানুষ কি ভাবে নিষ্কৃতি পেতে পারে তাই তাঁর জীবনের একমাত্র চিন্তা হয়ে উঠল। অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও রাজ্যের মায়া

বিসর্জন দিয়ে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করলেন। দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার পর

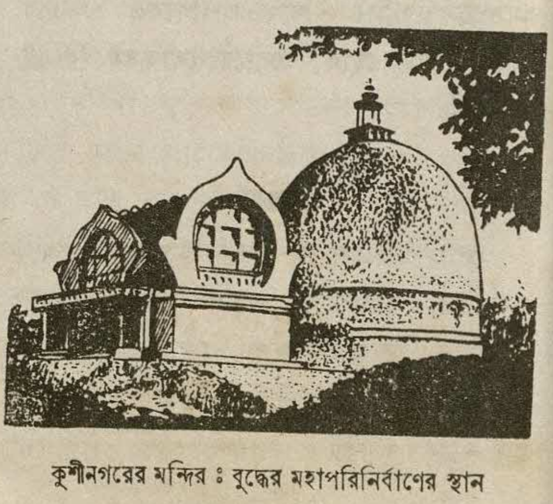


বুদ্ধদেবের জন্মস্থানে অশোকস্তম্ভ (লুম্বিনী)

৩৫ বছর বয়সে গয়ার অনতিদূরে বুদ্ধগয়ায় তাঁর পরম জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ হ'ল। তারপর ৪৫ বছর বয়সে তিনি তাঁর ধর্মমত প্রথম প্রচার করলেন কাশীর নিকটবর্তী সারনাথে। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হ'ল বৌদ্ধধর্ম। বুদ্ধদেব ৮০ বছর বয়সে গোরখপুর জেলার কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন (আনুমানিক খৃঃ পূর্ব ৪৮৬ বা ৪৮৩ অব্দ, কারো কারো মতে খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ)। বুদ্ধের মৃত্যুকে বলা হয় 'মহাপরিনির্বাণ'।

বৌদ্ধধর্মের সার কথা হ'ল মানুষ নিজের কর্মদোষে পৃথিবীতে বার বার জন্মায় আর দুঃখ পায়। ভালো কাজ করলেই মানুষ পুনর্জন্ম ও দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি বা নির্বাণ লাভ করতে পারে। এর জন্য বুদ্ধদেব আটটি রাস্তা (অষ্টমার্গ) অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সম্যক্ দৃষ্টি, সদ্‌বাক্য, সৎকর্ম, সৎসংকল্প, সৎ জীবন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি আর সম্যক্-সমাধি। বৌদ্ধধর্মে হিন্দুধর্মের মত উৎসব-অনুষ্ঠান এবং জৈনধর্মের মত কষ্টকর সাধন পরিত্যাগ করে মাঝামাঝি পথ নেবার কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যেরা পালি ভাষায় তাঁর বাণীগুলিকে 'ত্রিপিটক' গ্রন্থে সংকলিত করেন। বৌদ্ধধর্ম এশিয়ার এক বৃহত্তর অংশে—সিংহল, ব্রহ্ম, চীন, তিব্বত, ইরান, আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, কোরিয়া, জাপান, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ সব দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অপরিসীম।

পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্ম 'মহাযান' ও 'হীনযান' এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।



কুশীনগরের মন্দির : বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের স্থান



"এক রাখাল তপস্যারত মহাবীরকে তার হারানো গরুর কথা জিজ্ঞাসা করে"

ধর্মের কথা পৃঃ ১০৫১



বুদ্ধ ও সুজাতা

বুদ্ধদেবের জীবন সম্বন্ধে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। সিদ্ধার্থ যখন নৈরঞ্জনা নদীর কাছে বুদ্ধগয়ায় গাছের নীচে বসে সিদ্ধিলাভের জন্য কঠোর সাধনা করছিলেন তখন অনাহারে এবং তপস্যার কষ্টে তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে সেখানে এসে হাজির হয়েছিলেন সুজাতা। কাছাকাছি গ্রামের এক বধূ তিনি। পায়েসের বাটি আর পূজার উপচার থালায় সাজিয়ে নিয়ে দিনের পর দিন তিনি তপস্বী বুদ্ধের সামনে নিবেদন করতেন। সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভের আগে ও পরে তাঁর খাবার জোগানো সুজাতার ছিল এক পবিত্র ব্রত। বুদ্ধদেবের ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারে সুজাতার দান অসামান্য ছিল সন্দেহ নেই।

কোশল রাজ্যে অঙ্গুলিমাল নামে এক দুর্ধর্ষ দস্যুর অত্যাচারে প্রজারা বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন রাজা প্রসেনজিৎ। দস্যুর নাম অঙ্গুলিমাল। দস্যু-বৃত্তির পর নিহত লোকদের আঙ্গুল কেটে নিয়ে তা দিয়ে মালা গেঁথে সে-মালা সে গলায় পরত।

বুদ্ধদেব গভীর বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় অঙ্গুলিমালের সাক্ষাৎ পেলেন। অঙ্গুলি-মাল বুদ্ধকে থামার জন্য আদেশ দিল। কিন্তু এমনই ছিল সেই নিরস্ত্র সন্ন্যাসীর মনোবল আর ব্যক্তিত্ব যে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হ'ল সেই দস্যুকে। ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে, মাথা মুড়িয়ে বুদ্ধের শিষ্যত্ব বরণ করল অঙ্গুলিমাল। শোনা যায় রাজা প্রসেনজিৎ নাকি সেই ভয়ংকর দস্যুর রূপান্তর দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

জৈনধর্ম

এবারে জৈনধর্মের কথা কিছু বলি। বিভিন্ন কারণে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই সমসাময়িক ধর্মটি কিন্তু ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে আজও বেঁচে আছে।

শোনা যায় চব্বিশজন 'তীর্থঙ্কর' মহাপুরুষ জৈনধর্মের প্রবর্তন ও প্রচার করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম জন হলেন ঋষভদেব—কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তীর্থঙ্কর দলের তেরোজনের জন হলেন পার্শ্বনাথ আর চৌদ্দ জনের জন হলেন মহাবীর

(বর্ধমান)। শেষের এই দু'জনকেই সাধারণতঃ জৈনধর্মের প্রবর্তক বলা হয়।

পার্শ্বনাথ সম্ভবত কাশীর এক রাজবংশে খৃঃ পূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে জন্মেছিলেন। পার্শ্বনাথের উপদেশের মধ্যে ছিল চারটি সংযম বা চাতুর্যাম। সেগুলি হ'ল অহিংসা, সত্য, অচৌর্য এবং অপ্রতিগ্রহ। অর্থাৎ হিংসা না করা, সত্য পথে চলা, চুরি না করা আর অপ্রয়োজনীয় দান গ্রহণ না করা। পরেশনাথ পাহাড়ে তাঁর নির্বাণ হয়েছিল—এটি তাই জৈনদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান।

তীর্থঙ্কর মহাবীরের আসল নাম বর্ধমান। তিনি খৃঃ পূর্ব ৫ম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর বিহারের বৈশালীর কাছে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক। তাঁর পিতা ছিলেন 'জ্ঞাতৃক' নামে একটি ক্ষত্রিয়কুলের অধিনায়ক। কিন্তু সংসারের প্রতি মহাবীরের বিরাগ জন্মেছিল। ত্রিশ বছর বয়সে তাই তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং বারো বছর প্রচুর কষ্টকর সাধন করার পর তাঁর কৈবল্য বা পরম জ্ঞান লাভ হয়। তিনি সব ইন্দ্রিয়কে জয় করেছিলেন বলে তাঁর এক নাম হয় 'জিন' বা জিতেন্দ্রিয় এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম 'জৈনধর্ম' নামে পরিচিত হয়। মহাবীর পার্শ্বনাথের ধর্মমত মেনে চলতেন। তবে তিনি চারটি সংযমের সঙ্গে আরও একটি যোগ করেন—সেটি হ'ল ব্রহ্মচর্য। যাঁরা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম হয় 'নির্গ্রন্থ' অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত। মহাবীর তিরিশ বছর ধ'রে মগধ, মিথিলা, অঙ্গ, কোশল প্রভৃতি জায়গায় ধর্ম প্রচার করেছিলেন। পাটনা জেলার পাবায় (বর্তমান পাঁওপুরী) তিনি দেহত্যাগ করেন।

জৈনধর্মে যাগযজ্ঞ আর জীবহিংসাকে নিন্দা করা হয়েছে। এই ধর্ম অনুযায়ী প্রত্যেক **জিনিসের মধ্যেই আত্মা আছে এবং মানুষের মধ্যে আত্মা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলেই তাকে ভগবান্ বলা চলে। জৈনধর্ম অনুসারে মানুষ তার আপন কর্মফলের হাত থেকে নিস্তার পেলেই মুক্তি পায়। জৈনরা জীবে দয়া, নিজেকে পীড়ন করা এবং কষ্ট** করাকে ধর্মলাভের প্রধান উপায় বলে মনে করেন।

মহাবীরের উপদেশগুলি পরে বারোটি ভাগে সংকলিত হয়েছিল। এগুলির নাম 'অঙ্গ'। এ ছাড়া উপাঙ্গ, মূলসূত্র প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রও জৈনধর্মে আছে। খৃঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জৈন ধর্মাবলম্বীরা দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান—'দিগম্বর' আর 'শ্বেতাম্বর'। জৈনধর্ম পূর্ব ভারত থেকে আস্তে আস্তে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু ভারতের বাইরে এ ধর্ম প্রচারিত হয় নি। আজও রাজস্থান ও গুজরাতের বহু অধিবাসী জৈনধর্মাবলম্বী।

মহাবীরের জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। শোনা যায় একবার মৌনী অবস্থায় বেড়াতে বেড়াতে তিনি একটি রাজ্যে এসে পড়েন। চোর সন্দেহে নগররক্ষীরা তাঁকে নগরপালের কাছে ধরে নিয়ে যায় কিন্তু মহাবীরের মুখ থেকে মৌনী অবস্থায় একটি কথাও বার হয় না। উত্তেজিত নগরপাল তাঁকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলে সেই উদ্দেশ্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হয় মহাবীরকে। কিন্তু



গুরু নানক (প্রাচীন চিত্র থেকে)

পর পর সাতবারের চেষ্টাতেও মহাবীরের কোন ক্ষতি করাই সম্ভব হ'ল না। তখন চৈতন্যোদয় হ'ল রাজকর্মচারীদের। তাঁরা বুঝলেন ইনি একজন অসাধারণ শক্তিশালী সাধক—যার জন্য এই অলৌকিক ঘটনা ঘটছে। মহাবীর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পেলেন।

মহাবীরের প্রচণ্ড সহ্যশক্তির একটি গল্প শোনা যায়। একবার এক রাখাল তপস্যারত মহাবীরকে তিনি তার হারানো গরুর সন্ধান রাখেন কিনা জিজ্ঞাসা করে। মহাবীর তখন তপস্যায় জ্ঞানশূন্য হয়ে ছিলেন। উত্তর না পেয়ে রাখাল ক্রুদ্ধ হয়ে দু'টি তীক্ষ্ণ গাছের ডাল মহাবীরের দুই কানের গর্তে ঢুকিয়ে দেয়। ঝর্ ঝর্ করে রক্ত ঝরতে থাকে। কিন্তু মহাবীর এই পাশবিক নির্যাতন এবং যন্ত্রণাকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি—কোন বেদনাও টের পান নি তিনি। রাখালকে তিনি সেদিন ক্ষমা করেছিলেন।

শিখধর্ম

শিখধর্মকে হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা বলে ধরা হয়। ভারতবর্ষের পাঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশে এই ধর্ম বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

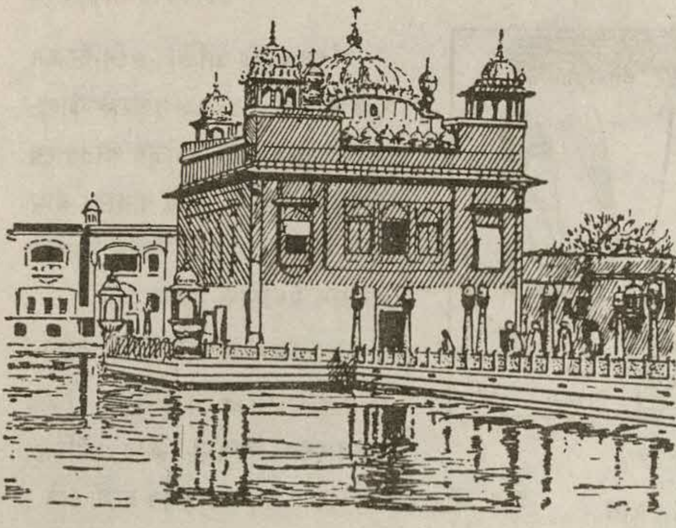
শিখধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গুরু নানক। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে তাল-বন্দী গ্রামে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল কালু বেদী। তিনি ছিলেন একজন মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী।

নানকের প্রথম জীবন ব্যবসা আর রাজকাজে কেটেছিল। কিন্তু ভগবানের সাধনা আর ধর্মচিন্তা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়ে ওঠে। শোনা যায় নিজের ব্যবসার টাকা বহুবার তিনি গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন।



গুরু গোবিন্দসিংহ

এর পর নানক ধর্মচিন্তায় বিভোর হয়ে মক্কা, বাগ্দাদ এবং ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। তাঁর প্রচারিত নতুন ধর্মের নাম হয় শিখধর্ম। তাঁর শিষ্যরা 'শিখ' নামে পরিচিত—কথাটার অর্থ হ'ল 'শিষ্য'। নানক জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন —বিশেষতঃ জাঠ সম্প্রদায়ের কৃষকেরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল খুব বেশি সংখ্যায়।



স্বর্ণমন্দির : অমৃতসর

নানক তাঁর শিষ্যদের সৎ গুরুর (যে গুরু ভগবান্‌কে পাবার জন্য সাহায্য করেন) ওপর নির্ভর করতে বলেছেন। নানকের ধর্মমত অনুসারে ভগবান্ এক। তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই—তাঁর কোন আকারও নেই। নানক হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। সব ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তবে হিন্দুধর্মের জাতি-ভেদ, মূর্তিপূজা ইত্যাদি তিনি বিশ্বাস করতেন না। নানক ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৬৯ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। নানকের মতবাদ এমন একটা বিপুল আলোড়ন তুলেছিল যে এক শতাব্দীর মধ্যেই এই ধর্ম থেকে এক বিরাট শিখ জাতির জন্ম হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দিল্লী অবধি এই ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষে। শিখদের সব চেয়ে পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থের নাম 'গ্রন্থসাহেব'। শিখদের পঞ্চম গুরু শ্রীঅর্জুনজী (অর্জুনসিংহ) আগেকার গুরুদের অমূল্য বাণী নিয়ে এটির সংকলন করেন। **শিখদের** দশম এবং শেষ **গুরুর নাম গোবিন্দসিংহ**। তিনিই **শিখজাতিকে সর্বপ্রথম একটি** সামরিক জাতিতে (**খালসা**) পরিণত করেন।

নানকের **জীবন সম্বন্ধেও** অনেক চিত্তাকর্ষক গল্প আছে। যেমন, একবার তিনি লালু ছুতোর নামে এক গরীবের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। মালিক ভগো ছিলেন সেখানকার বিত্তশালী দেওয়ান। দেওয়ানের অতিথিশালায় যেতে রাজী হন নি নানক।—দেওয়ান সাহেবের এতে সম্মানে আঘাত লাগে। নানক তখন দেওয়ানের সামনে তাঁর আনা খাবারগুলি নিঙ্‌ড়াতে থাকেন। খাবার থেকে বেরিয়ে আসে টাটকা রক্তের ধারা। কিন্তু লালু ছুতোরের রুটির টুক্‌রো নিঙ্‌ড়িয়ে বেরিয়ে আসে সাদা দুধের ধারা। তখন দেওয়ান সাহেব নানকের পায়ে পড়ে তাঁর কৃপাভিক্ষা করেন।

শিখদের একটি প্রধান ভজনালয় হচ্ছে অমৃতসরের 'স্বর্ণমন্দির'।

মুসলমান আমলে ধর্মপ্রচার

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজাদের আমলে হিন্দু ও ইসলামধর্ম পাশাপাশি থাকায় তাদের পরস্পরের মধ্যে মিলের প্রভাব বেড়ে ওঠে। তার ফলে ধর্মপ্রচারের কতকগুলি নতুন দিক্ খুলে যায়, জন্ম হয় হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদ এবং ইসলামধর্মের সুফীবাদের। ভগবানের সঙ্গে মানুষের মিলন, ভক্তি দিয়ে ভগবান্‌কে পাওয়া এবং ভগবানের চোখে সব ধর্মের লোক সমান—এগুলিই হ'ল ভক্তিবাদ ও সুফীবাদের শিক্ষা।

হিন্দুদের ভাগবত ধর্ম ও ভক্তিবাদকে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বৈষ্ণব সাধক এবং কবিরা নতুন করে তুলে ধরেছিলেন। জাতিভেদকে উপেক্ষা এবং অন্য ধর্মের প্রতি উদারতা ছিল বৈষ্ণব ধর্মের একটি লক্ষণ। দক্ষিণ ভারতে এই ভক্তিবাদের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন ধর্ম-সাধক রামানুজ। এর পর রামানন্দ, নামদেব (মহারাষ্ট্র), কবীর, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ প্রভৃতি সাধকদের হাতে ভাগবত ধর্ম এবং ভক্তিবাদ আরও পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছিল।

সুফীসাধকদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আউলিয়া (দিল্লী) এবং মুইনুদ্দিন চিশ্‌তির (আজমীর) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমস্ত মানুষের মধ্যে সমতার বাণী এঁদের দর্শনে ফুটে উঠেছিল।

বৈষ্ণব ধর্ম

বাংলাদেশের শ্রীচৈতন্য ছিলেন নানকের সমসাময়িক। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর বাবার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মায়ের নাম শচীদেবী। বাংলাদেশে তিনি নিমাই বা গৌরাঙ্গ নামেও সুপরিচিত। অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন নিমাই, কিন্তু মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গয়ায় পিতৃকার্য করতে গিয়ে বিষ্ণুপাদ মন্দিরে তাঁর যে ভাবান্তর হয় তাই তাঁকে এই পথে টেনে আনে। শ্রীচৈতন্যদেব উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারত, বৃন্দাবন প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে বেড়ান এবং তাঁর ভক্তিভাবের নতুন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং ভালবাসা, জীবে দয়া এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সব মানুষকে সমান ভাবে দেখবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। পূজা-অনুষ্ঠানের আড়ম্বরের চাইতে ভগবানের নামকীর্তন তিনি সাধনার একটি বড় অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ মানেন নি—অনেক মুসলমানও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রও তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। যবন হরিদাস (জাতিতে মুসলমান) তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে একজন। ১৫৩৩



শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে দেহত্যাগ করেন।

নিমাইএর জীবনের বহু কাহিনী ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। একবার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবাচার্য নিমাইকে নবদ্বীপে এসে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। নিমাই তখন অল্প-বয়সী যুবক। কেশবাচার্যকে তিনি গঙ্গার স্তোত্রটি পাঠের অনুরোধ জানান এবং তারপর কেশবাচার্যের বহু ভুল ধরে দেন। তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে কেশবাচার্যের দর্প সেদিন চূর্ণ

হয়েছিল। অসাধারণ প্রতিভাবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে এই রকম নানা আকর্ষণীয় গল্প শুনতে পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম বাংলার ধর্মীয় ধারাকে নতুন রূপ দিয়েছে এবং পরবর্তী যুগের বহু ধর্মসাধককে প্রেরণা জুগিয়েছে। বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যকে আকর্ষণীয় এবং প্লাবিত করেছে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিরস। পরবর্তী যুগের বহু সাধক ও সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের ধর্মমতের অনুগামী ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে ইদানীং কালের যুগপ্রবর্তক ধর্মসাধক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম করা যেতে পারে। গোসাঁইজী শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ এবং জীবনী থেকেই তাঁর ভক্তিধর্ম প্রচারের প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শকেই অবলম্বন করা হয়েছে। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের একজন গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। তারপর বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং তিনি ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তাঁর নতুন মতবাদের প্রচার আরম্ভ করেন।

ব্রাহ্মধর্ম

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা আর খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব এসে পড়ায় অনেক হিন্দু হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করছিলেন বহু লোক। তাই দরকার হয়ে পড়ল হিন্দুধর্মের সংস্কার। হিন্দুধর্মের এই সময়োচিত সংস্কারের ভার নিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নতুন মতবাদের নাম ব্রাহ্মধর্ম। ভগবান্ এক—তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই, তাঁর কোন আকারও নেই। এই **'ব্রহ্মের' অর্থাৎ ভগবানের উপাসনাই হ'ল ব্রাহ্ম**ধর্মের আসল কথা। রামমোহন রায় ছিলেন নানা ভাষায় সুপণ্ডিত—উপনিষদ্, কোরান ও বাইবেল তাঁর ভালোভাবে পড়া ছিল। তাই এই তিনটি গ্রন্থের মূল আদর্শ,—এক ভগবানের এই মতবাদ তাঁর ধর্মে ফুটে উঠেছিল।

রামমোহন রায়ের গড়ে-তোলা ব্রাহ্মসমাজ


কেশবচন্দ্র সেন

'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সমাজের একজন ভক্ত ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু জাতিভেদ প্রথা মানতেন। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে পুরোনো ব্রাহ্মসমাজ দু'ভাগ হয়ে যায়। নতুন দলের নাম হয় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। এই সমাজ জাতিভেদের বিরোধিতা করতেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল লোকেরা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে আরও একটি নতুন সমাজ গঠন করলেন।

এঁদের মতবাদ আরও আধুনিক ছিল। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধিতা এবং স্ত্রী-শিক্ষা আর স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ছিল এই নতুন সমাজের মতবাদের অঙ্গ। এক কথায় বলা যায় ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীই হিন্দুধর্মকে অনেকটা রক্ষা করেছে।

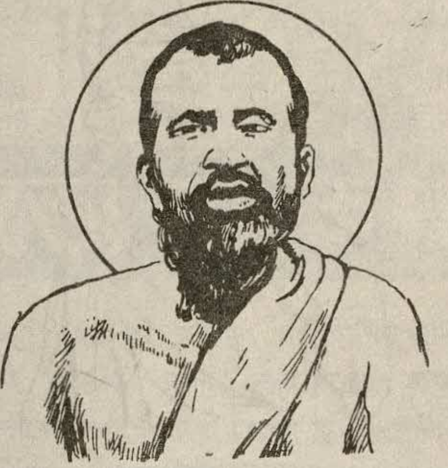
আর্যসমাজ

বাংলাদেশে যেমন ব্রাহ্মসমাজ, তেমনি পশ্চিম ভারতে, বিশেষ করে পাঞ্জাব অঞ্চলে আর্যসমাজও অনুরূপ সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের ভার নিয়ে গড়ে ওঠে। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা।

দয়ানন্দের আসল নাম মূলশঙ্কর। ইনি কিন্তু পাঞ্জাবী ন'ন, গুজরাতি। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কাথিওয়াড় অঞ্চলে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এঁর জন্ম। যৌবনেই গৃহত্যাগ করে ইনি সন্ন্যাসী হয়ে যান এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইএ এসে 'আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পাঞ্জাবেই এই ধর্মমতের প্রচলন হয় বেশি এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লাহোরেই স্থাপিত হয় আর্যসমাজের প্রধান কেন্দ্র। দয়ানন্দ বলতেন, বেদ হচ্ছে অভ্রান্ত এবং বৈদিক ধর্মই আসল হিন্দুধর্ম—তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে, কিছুটা সময়োপযোগী সংস্কার করে।

আর্যসমাজীরা ব্রাহ্মদের মতই মূর্তিপূজার বিরোধী এবং জাতিভেদ প্রথাও মানেন না। শুধু ধর্মসংস্কারই নয়, ভারতের এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের বিবাহের আদান-প্রদানেও এঁরা উৎসাহ দিয়েছেন।

আর্যসমাজীদের মধ্যে আর একজন বিশিষ্ট



শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

সন্ন্যাসী হচ্ছেন দয়ানন্দের শিষ্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (পূর্বনাম লালা মুন্সীরাম)। জাতিচ্যুত হিন্দু এবং বিশেষ করে অন্য সম্প্রদায়ের লোককে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য ইনি "শুদ্ধি" প্রথার প্রচলন করেন এবং তার ফলে বহু অহিন্দু হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিলেন। প্রধানত এই জন্যেই এক ধর্মান্ধ যুবকের হাতে ইনি নিহত হন।

হিন্দুধর্মের নবজাগরণ

১৮৩৩ সালে হুগলী জেলার কামারপুকুরে গদাধর চট্টোপাধ্যায় নামে একটি শিশুর আবির্ভাব হয়। যৌবনে তিনি রাণী রাসমণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পুরোহিতের পদে নিযুক্ত হন এবং সেখানেই কালীসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে পরিচিত হন। কালী এঁর ইষ্টদেবী হলেও ইনি সমস্ত রকম ধর্মীয় মতেই উপাসনা করে প্রমাণ করেন যে, যে-কোন মতেই সাধনা করা যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত সেই এক ভগবান্‌কেই পাওয়া যাবে। এই সর্বধর্মসমন্বয়ই শ্রীরামকৃষ্ণের একটি



স্বামী বিবেকানন্দ

বড় অবদান। শ্রীরামকৃষ্ণ তথাকথিত উচ্চশিক্ষা লাভ করেন নি, কিন্তু আশ্চর্য ঐশ্বরিক শক্তি ছিল তাঁর। ধর্মের অতি কঠিন তত্ত্বও তিনি সাদা কথায় জলের মত সহজ করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত শিষ্য হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এঁর পূর্বনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। এমন প্রতিভাবান্ পুরুষ এ যুগে বেশি জন্মগ্রহণ করেন নি। কলেজে পড়ার সময় পাশ্চাত্য দর্শন পড়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ জাগে, পরে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসে সে ভাব দূর হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক তৃপ্তি হয় না। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে এঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটল। সেই গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি হলেন সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। ছ' বছর হিমালয়ে কাটিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ালেন এবং তখনই দরিদ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগ দেন এবং হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অপূর্ব বক্তৃতায় বিশ্ববাসীকে চমকে দেন। শুরু হয় আমেরিকায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রচণ্ড আগ্রহ। এর পর ইংল্যাণ্ডে গিয়েও ঐ ভাবে হিন্দুধর্মের মহান্ আদর্শ ব্যাখ্যা করে তিনি সবাইকে মুগ্ধ করেন। এখানেই মার্গারেট নোবল নামে এক মহীয়সী মহিলা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ইনিই পরবর্তী যুগে সিস্টার (ভগিনী) নিবেদিতা নামে ভারতের সঙ্গে একপ্রাণ হয়ে যান।

স্বামীজীই বেলুড়ে প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন, যা আজ সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। জীবে দয়া, দরিদ্রের সেবা, অহিংসা, ত্যাগ এবং বিশেষ করে কর্মযোগের ভিতর দিয়ে তিনি নতুন মন্ত্রে দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করে তোলেন, প্রচার করেন তাঁর অমর বাণী:

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর।"

বিবেকানন্দ শুধু কর্মযোগী এবং ধর্ম-সংস্কারকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরম পণ্ডিত এবং সুলেখক। তিনি এমন কতকগুলি বইও লিখে গেছেন যা শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, সাহিত্য হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে।

পরবর্তী খণ্ডে আমরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ধর্মযোগীদের কথাও কিছু কিছু বলব।



বাংলা সাহিত্যের কথা

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ

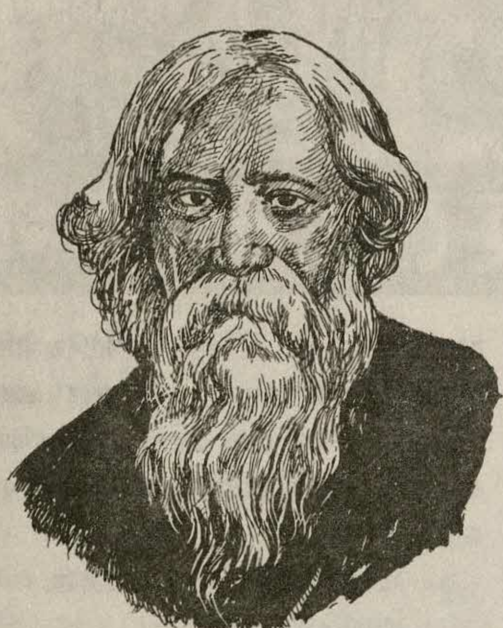
রবীন্দ্রনাথ বাংলার,—শুধু বাংলার কেন, সারা ভারতের সাহিত্য-গগনে রবিই বটে,—সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে রয়েছেন কেন্দ্রস্থলে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ যুগের নাম—ভারতীয় সাহিত্যে একটি অপূর্ব বিস্ময়ের নাম—বিশ্বসাহিত্যে একটি অসামান্য প্রতিভার নাম। নোবেল পুরস্কার দিয়ে সমগ্র পৃথিবী এই প্রতিভাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে মর্যাদার আসন দিয়েছে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে।

শুধু বাংলা বা ভারত নয়, সমস্ত এশিয়া মহাদেশের মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত হন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এই সম্মান পেয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিত হবার আগেই তিনি জীবনের অর্ধশতাব্দী পার হয়ে এসেছেন আর ইতিপূর্বেই স্বদেশে পূজিত হয়েছেন কবিগুরু রূপে। কিশোর বয়স থেকেই অসংখ্য বিচিত্র রচনায় তিনি সজ্জিত, সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের সাহিত্যকে। বঙ্কিম-প্রতিভার উজ্জ্বল আভায় বাংলা দেশ যখন সমাচ্ছন্ন তখন কী অভিনব, অপ্রত্যাশিত দীপ্তি নিয়েই না তিনি এলেন! বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আলোকের স্পর্শে বাংলা দেশের ঘুম ভেঙেছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রখর দীপ্তিতে চোখ মেলে সে মুগ্ধ হয়ে গেল—

> "ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
> তোমারি হউক জয়।"

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনার পরিধি অতি-বিস্তৃত—বৈচিত্র্যও অতুলনীয়। তাঁর সৃষ্টির যথাযথ পরিচয় দেওয়া সহজসাধ্য নয়, আভাস দেওয়া যেতে পারে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের শত-বার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৫ খণ্ডে যে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে তাঁর সমস্ত রচনা সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত এবং মূলত কবি, তাই তাঁকে আমরা কবিগুরু বলেই জানি। কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও তাঁর অবদান অসামান্য। এমন কি অনেক নতুন নতুন ধারাও সৃষ্টি করেছেন তিনি। আলোচনার সুবিধার জন্যে এখানে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকে কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ ক'রে একে একে তাদের পরিচয় দেব। প্রথমেই বলব কাব্যধারার কথা।



রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা

অতি শৈশবেই কি ভাবে কাব্যরচনায় তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল সে গল্প হয়তো অনেকেরই জানা আছে। সে সময়ে বালক-কবি অনেক ছড়া ও কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। তার কিছু কিছু নমুনা—যেমন 'আমসত্ত দুধে ফেলি···' বা 'এক যে ছিল বাঘ···' ইত্যাদি তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। এরপর আর একটু বেশি বয়সে তিনি লিখেছিলেন একটি দীর্ঘ কাব্য—'পৃথ্বীরাজ-পরাজয়', যার পাণ্ডুলিপি আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু রচনা প্রথম প্রকাশিত হয় বিনা নামে। যেমন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'অভিলাষ' নামে একটি কবিতা, 'ভারতী' পত্রিকায় ম্যাকবেথ নাটকের অনুবাদের কিছুটা অংশ, দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'সরোজিনী' নাটকে 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ···' গান বা কবিতাটি। নিজের নামে প্রকাশিত বালক-কবির প্রথম কবিতা হচ্ছে 'হিন্দুমেলার উপহার'। এরপর বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় 'প্রকৃতির খেদ' নামে একটি কবিতা, 'বনফুল' নামে একটি ধারাবাহিক দীর্ঘ কাব্য এবং 'কবিকাহিনী' নামে কাব্যনাট্য প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় সর্বপ্রথমে 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮) এবং পরে 'বনফুল' (১৮৮০)।

দশম বার্ষিক হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ একটি উল্লেখযোগ্য স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। সেইখানেই কবি নবীনচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এ সময়েই তিনি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-র কবিতাগুলি রচনা করেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামে কাব্যনাট্য এবং 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড' নামে দু'খানি কাব্য এরপর রচিত ও প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতার বই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'। এই কবিতাগুলির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তারপর একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, কণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা প্রভৃতি। এই সব কাব্যের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি ও মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালবাসা বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠে।

খেয়া কাব্য থেকেই রবীন্দ্রনাথের রচনায় আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায় এবং তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয় গীতাঞ্জলি কাব্য-গ্রন্থে—যে গ্রন্থখানি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান



রবীন্দ্রনাথ (বাল্যে)

নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে জড়িত। কবির এই আধ্যাত্মিক ভাবধারা গীতাঞ্জলির পরবর্তী গীতিমাল্য এবং গীতালি কাব্যেও প্রবাহিত।

কিন্তু আশ্চর্য, এর পরেই সম্পূর্ণ এক নতুন সুর, নতুন উদ্দীপনা নিয়ে জেগে উঠল তাঁর পরবর্তী কবিতাগুলি, যার পরিচয় পাওয়া গেল 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে। 'বলাকা'র কবিতা পড়লে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে কবির মন চিরনবীন,—চিরতরুণের জয়গান তাঁর কণ্ঠে। সমস্ত জরাজীর্ণতাকে ছিন্ন ক'রে ধ্বনিত হ'ল তাঁর দীপ্ত বাণী—

"ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধ-মরাদের
ঘা মেরে তুই বাঁচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা!"

কবির কাব্য-ভাণ্ডার অফুরন্ত। একে একে প্রকাশিত হ'তে থাকে আরো বহু কাব্যগ্রন্থ —শিশু ভোলানাথ, পূরবী, মহুয়া, বনবাণী, পরিশেষ। না, এখানেই পরিশেষ নয় তাঁর সৃষ্টির। কবি হয়তো তাই ভেবেছিলেন, কিন্তু "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?" আবার 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ দিয়ে শুরু করে একে একে রচনা ক'রে চললেন বিচিত্রিতা, বীথিকা, শেষসপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী ইত্যাদি। উল্লিখিত শেষ তিনখানি গ্রন্থ গদ্যকাব্য। রবীন্দ্রনাথের চিরনবীন প্রতিভার আর এক প্রকাশ এই গদ্যছন্দ।

গতানুগতিকতাকে পরিহার ক'রে তিনি লিখেছিলেন অজস্র ছড়া। তাই নিয়ে প্রকাশিত হয় 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি'। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবি লিখলেন 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থ। তবু লেখার বিরাম নেই। প্রকাশিত হয়ে চলেছে সেঁজুতি, প্রহাসিনী, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে। কবির জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ 'জন্মদিনে'। কিন্তু কবিতা রচনা তখনও বন্ধ হয় নি। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও রচনা করেছেন কবিতা। তাঁর সর্বশেষ কবিতা "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি···"। এই সব কবিতা নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'শেষ লেখা' কাব্যগ্রন্থ।

যে-সব কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হ'ল তা ছাড়াও অনেক কবিতা-সংকলন কবির মৃত্যুর পূর্বে ও পরে প্রকাশিত হয়েছে। অজস্র গানও রচনা করেছিলেন তিনি, যার সংখ্যা দু'হাজারের ওপরে। এইসব গান তাঁর 'গীতবিতান' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। এত সহজ ভাষায় এমন গভীর ভাব আর কোন রচনায় প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারা

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাসের নাম 'করুণা'। ভারতী পত্রিকায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। 'করুণা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। দ্বিতীয় উপন্যাস 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' এবং তৃতীয় উপন্যাস 'রাজর্ষি' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই দু'খানা উপন্যাসের রচনাভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু চতুর্থ উপন্যাস 'চোখের বালি' বাংলা



কিশোর রবীন্দ্রনাথ

উপন্যাস-ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করল। বাংলা সাহিত্যে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের সূত্রপাত 'চোখের বালি' থেকেই। চেখের বালির প্রভাব শরৎচন্দ্রের রচনায় সুস্পষ্ট। এর পর রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ', ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। বহু সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হচ্ছে 'গোরা' এবং সমস্ত বাংলা উপন্যাসের মধ্যেই এখানা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মানবতাবোধকে জাতিধর্মের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে প্রকৃত দেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমের বিরোধী নয়।

'শেষের কবিতা' উপন্যাসের রচনারীতিও বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব। সংস্কৃতে গদ্য-পদ্য মেশানো এক ধরনের সাহিত্য ছিল, যাকে বলা হ'ত চম্পূকাব্য। শেষের কবিতাকেও সেই ধরনের বাংলা রচনা বলা চলে, তবে এর বৈশিষ্ট্য আরও বেশি।

'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাস দু'খানা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি-কায় রচিত হয়েছে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসখানিও রচনানৈপুণ্যের জন্য সমালোচকদের কাছ থেকে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।

মোট কথা, রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা উপন্যাস ভাবে ও ভাষায়, মাধুর্যে ও চরিত্র-চিত্রণে—সব দিক্ থেকেই একটা বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য লাভ করল।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারা

বাংলা সাহিত্য আজ ছোটগল্পের দৌলতে বিশেষ ভাবেই সমৃদ্ধ। কিন্তু বাংলা ভাষায় ছোট-গল্প রচনায় প্রথম হস্তক্ষেপ করেন রবীন্দ্রনাথই। সমালোচকদের মতে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রথম ছোটগল্প লেখকই ন'ন, শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প-লেখকও বটে। সুতরাং ছোটগল্পের মধ্যে দিয়েও তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন। সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে

রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য ছোটগল্প রচনা করে গেছেন। এই সব গল্পের সংগ্রহ 'গল্পগুচ্ছ' নামে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিয়ালা' গল্পটি অতি প্রসিদ্ধ। ভগিনী নিবেদিতা এই গল্পের একটি ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং সেটি মডার্ন রিভিউ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি পড়েই ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত শিল্পী ও মনীষী রোদেনস্টাইন সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হন। এ থেকেই ক্রমে কবির সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় পরিচয় ঘটে এবং পাশ্চাত্য জগতে কবির পরিচিতির সূত্রপাত হয়।

কতকগুলি গল্পের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় নারী-জাগরণের প্রথম প্রেরণা জুগিয়েছেন। 'স্ত্রীর পত্র', 'হৈমন্তী', 'পয়লা নম্বর' ইত্যাদি এর উদাহরণ। তাঁর অন্যান্য অসংখ্য ছোটগল্পের মধ্যে 'পোষ্টমাষ্টার', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'শুভা', 'নষ্টনীড়', 'কঙ্কাল', 'মধ্যবর্তিনী' প্রভৃতি গল্প বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ্।

রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্প এক একটি লিরিক কবিতার মত। 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' ইত্যাদি পাঠ করলেই তা বোঝা যায়। পল্লীবাংলার প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে কবির হৃদয়ের যোগ যে কতখানি ছিল তার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই ছোটগল্পগুলি। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখকদের সঙ্গে সমান আসন পেতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের ধারা

রবীন্দ্রনাথ নাটকের ক্ষেত্রেও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বহু ধরনের বহু নাটক রচনা করেছেন তিনি। তাঁর এই নাটকগুলিকে প্রধান প্রধান কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) মঞ্চনাট্য—যে-সব নাটক সাধারণ নাটকের মত মঞ্চে অভিনয় করার উপযোগী। যেমন, 'বিসর্জন', 'রাজা ও রাণী', 'চিরকুমার সভা' ইত্যাদি। (২) প্রতীকনাট্য—যে-সব নাটকের ঘটনা বা চরিত্র কোনও একটি গভীর বক্তব্যের সঙ্কেত বা ইঙ্গিত মাত্র। যেমন, 'ডাকঘর', 'রাজা', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' ইত্যাদি। (৩) গীতিনাট্য—যে নাটকে গানেরই প্রাধান্য। যেমন—'মায়ার খেলা', 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ইত্যাদি। (৪) নৃত্যনাট্য—যে-নাটকে নৃত্যেরই প্রাধান্য। উদাহরণ—'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' ইত্যাদি।

প্রথম জীবনে তিনি 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি গীতিনাট্য রচনা করেন। সে সময়ে এ সব নাটক খুব প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল এবং বহুবার বহুস্থানে অভিনীত হয়েছিল। এর পর 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথম অংশ অবলম্বন করে 'বিসর্জন' নামে নাটক রচনা করেন। এ নাটকে প্রেম ও সংস্কারের দ্বন্দ্বকে কবি অপূর্ব রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'রাজা ও রাণী' তাঁর আর একখানি বিখ্যাত নাটক। পরবর্তী যুগে এই নাটকটিকে নতুন করে লিখে তিনি প্রকাশ করেন। নতুন নাম দেওয়া হয় 'তপতী'।

ক্রমে তাঁর নাটকগুলি ভাবপ্রধান হয়ে ওঠে। তাতে নাটকীয় গুণের চেয়ে সাহিত্যগুণের প্রাধান্য দেখা যায়। 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'রাজা', 'তাসের দেশ', 'শারদোৎসব' প্রভৃতি এই শ্রেণীর নাটক। তবুও

এ সব নাটকও যে সার্থক ভাবে অভিনীত হ'তে পারে তা প্রমাণিত হয়েছে।

'অচলায়তন' ও 'তাসের দেশ' এই দু'খানি নাটকের ভিতর দিয়ে তিনি এদেশের পুঞ্জীভূত বিচারহীন সংস্কারকে আঘাত করেছেন। 'তাসের দেশ' নাটকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ কবি সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন। 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকে তিনি যন্ত্রসভ্যতার নিষ্ঠুর দিক্‌টিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

এরই ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু উচ্চ-শ্রেণীর হাসির নাটকও রচনা করেন। যেমন, 'চিরকুমার সভা', 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'মুক্তির উপায়', 'শেষরক্ষা' প্রভৃতি।

এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত নাটক 'বাঁশরী', 'পরিত্রাণ', 'শোধবোধ', 'গৃহপ্রবেশ', 'মুকুট' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবন্ধের ধারা

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বনে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। তাঁর বহু প্রবন্ধই বিদেশভ্রমণ-কালে লিখিত। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের যে দেশেই যখন তিনি গিয়েছেন সেখানেই জন-সাধারণ তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তাদের দাবী মেটাবার জন্যে প্রত্যেক সভাসমিতিতে যে-সব প্রবন্ধ বা ভাষণ পাঠ করেছেন তার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। এ ছাড়া দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা পরিস্থিতি উপলক্ষে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন যেগুলিকে এইভাবে ভাগ করা যায়ঃ

(১) সাহিত্যিক, (২) সামাজিক, (৩) রাজ-নৈতিক, (৪) আধ্যাত্মিক ইত্যাদি। তাঁর সাহিত্যের বিরুদ্ধ সমালোচনার জবাবেও তিনি অনেক প্রবন্ধ লেখেন। তা ছাড়া তাঁর সুললিত ভ্রমণ-কাহিনী, জীবনস্মৃতি, ডায়েরি, চিঠিপত্র ইত্যাদিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলে ধরা যেতে পারে। সাধারণ একখানা চিঠির মধ্যেও যে কি রকম সাহিত্যরস পরিবেশন করা যায় তা তিনিই প্রথম দেখিয়ে গেছেন। বিভিন্ন লোককে লেখা তাঁর অজস্র চিঠি 'চিঠিপত্র' নাম দিয়ে পরবর্তী কালে কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলিও বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ বলে ধরা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ— 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' ইত্যাদি অতি বিখ্যাত রসপূর্ণ রচনা। প্রবন্ধও যে কতখানি সরস ও সুখপাঠ্য হ'তে পারে তা বোঝা যায় এই সব প্রবন্ধ-সংকলন পাঠ করলে।

স্বদেশীযুগে বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখে তিনি বাঙ্গালীর অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। বিদেশেও তাঁর বহু বক্তৃতা ও প্রবন্ধ বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'মন্ত্রি-অভিষেক', 'স্বরাজ-সাধন', 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রভৃতি প্রবন্ধ এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বহু প্রবন্ধে নির্ভীক্ ভাবে অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করে কবি অনেক নিন্দা এবং তিরস্কারও সহ্য করেছেন। এ জাতীয় প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে 'সমূহ', 'স্বদেশ', 'সমাজ', 'শিক্ষা', 'কালান্তর', 'রাজাপ্রজা' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

আধ্যাত্মিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও দর্শনের বহু জটিল ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিয়ে অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করে তার তাৎপর্য পরিস্ফুট করেছেন। এ জাতীয় প্রবন্ধ-সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ধর্ম', 'মানুষের ধর্ম', 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম', 'পঞ্চভূত' প্রভৃতি গ্রন্থ।

বহু মহাপুরুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এমন অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন যা একাধারে জীবন ও দর্শনের সারাংশ। এই সব প্রবন্ধপুস্তকের মধ্যে আছে 'বুদ্ধদেব,' 'খৃষ্ট', 'মহাত্মা গান্ধী', 'ভারতপথিক রামমোহন রায়', 'বিদ্যাসাগর-চরিত', 'চারিত্রপূজা' প্রভৃতি। আত্মজীবনী-মূলক রচনার মধ্যে আছে 'আত্মপরিচয়', 'জীবন-স্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'।

রবীন্দ্রনাথ দেশে-বিদেশে বহুবার বহুভাবে পরিভ্রমণ করেছেন। তাঁর এই ভ্রমণকথা অনেক প্রবন্ধ, ডায়েরি ও চিঠিপত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে,—যথা, 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি', 'জাপানে-পারস্যে', 'যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পথের সঞ্চয়' ইত্যাদি।

এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে তিনি বহু প্রবন্ধপুস্তক রচনা করেন। যেমন, বিজ্ঞান বিষয়ে 'বিশ্ব-পরিচয়', ইতিহাস বিষয়ে 'ইতিহাস', ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে 'বাংলাভাষা পরিচয়', 'শব্দতত্ত্ব', ছন্দ বিষয়ে 'ছন্দ', সঙ্গীত বিষয়ে 'সুর ও সঙ্গতি' ইত্যাদি।

এই সব প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলার গদ্য-সাহিত্য এক বিশেষ উন্নত স্তরে এসে পৌঁছেছে এবং যে-কোনও বক্তব্য প্রকাশের উপযুক্ত বাহন হয়ে উঠেছে। বাংলাভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে-কোনও বিষয় শিক্ষা দেওয়া যে সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার দ্বারাই প্রমাণ ক'রে গেছেন। বাংলা গদ্যের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী যে কত চিত্তাকর্ষক ও সুষমামণ্ডিত হ'তে পারে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে। অনেক সমালোচকের মতে 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সংগ্রহ 'চিঠিপত্র', 'ছিন্ন-পত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' প্রভৃতিও বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ্। মৃত্যুর পরও আজ পর্যন্ত তাঁর বহু অপ্রকাশিত পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

বাঁকুড়ায় ছাত্রসমাজের কাছে প্রদত্ত রবীন্দ্র-নাথের ভাষণের একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। যে-কথা তিনি বহুদিন আগে বলেছিলেন তা আজকের দিনেও প্রযোজ্য।

"যারা অকুণ্ঠিত মনে নিয়ম ভাঙতে চায় তারা নিয়ম গড়তে কোনও দিন পারে না। এই ভাঙন-ধরানো মন সাংঘাতিক ভাবে বিস্তার লাভ করছে······দলাদলিতে ক্রমাগতই ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে আশ্রয়সৌধকে···সভা-ভাঙা, দল-ভাঙা, ইস্কুল-ভাঙা, মাথা-ভাঙা, সমস্ত এর অন্তর্ভুক্ত।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষা সম্পর্কে বিখ্যাত পণ্ডিত ও সমালোচক সুকুমার সেন বলেছেন— "রবীন্দ্রনাথের ভাষা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি। নিজের হাতে ভাষা তৈয়ারী করিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টিকার্যে এমন দক্ষতা দেখান আর কোন দেশে কোন কবির ভাগ্যে ঘটে নাই।"

এর পর আবার লিখেছেন—

"...কবিতার ছন্দে, রীতিতে ও ভাবে, গানের

কথায় ও সুরে, গদ্যের প্রকাশক্ষমতায় এবং লালিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার ফলে বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আধুনিক ভারতবর্ষের মধ্যে তো বটেই, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।"

তাঁর মতে আর কোন লেখক এমন একাকী কোন ভাষায় এমন ভাবে শক্তি এবং মাধুর্য সঞ্চারিত করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের মত অসামান্য প্রতিভা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। তিনি স্বদেশপ্রেমিক হয়েও বিশ্বকবি, কারণ তাঁর মতে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম বিশ্বপ্রেমের বিরোধী হ'তে পারে না। মহাকবি হয়েও তিনি শিশুদের কবি; শিশু-মনের অতি কাছাকাছি তাঁর বাসা।

আবার, অলৌকিক ভাব-সৌন্দর্যের পূজারী হ'লেও, প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অপরিসীম তাই তিনি বলেন—

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক।"

রবীন্দ্রসাহিত্যে এত বৈচিত্র্য কি করে সম্ভব হ'ল তার উত্তর দিতে গিয়ে অনেক সমালোচক বলেছেন যে এর কারণ, সীমা থেকে অসীম পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মনের ছিল অবাধ গতি-বিধি, তাই এই দু'য়েরই অফুরন্ত সুর তাঁর রচনার পরিধি সৃষ্টি করেছে। কবি নিজেও বলেছেন—

"আমার কাব্যে একটিমাত্র পালা, তা হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের সঙ্গে মিলনসাধনের পালা।"

রবীন্দ্রযুগে অন্যান্য সাহিত্যিক

রবীন্দ্রযুগে বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব প্রাণের জোয়ার এসেছিল এবং তারই অনু-প্রেরণায় ছোট বড় বহু সাহিত্যিক সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সূর্যের আলোকে অন্যান্য জ্যোতিষ্ক যেমন ম্লান হয়ে যায়, ঠিক তেমনি অবস্থা ঘটেছিল সে-যুগের অন্যান্য সাহিত্যিক-দের। তবু তারই মধ্যে কিছু কিছু প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক নিজেদের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে



প্রমথ চৌধুরী

নিয়েছিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় তাঁদের অবদান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

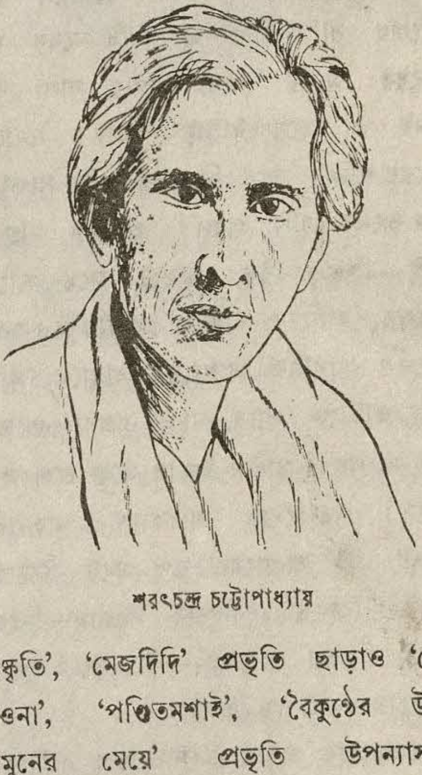
রবীন্দ্রযুগের উপন্যাস: শরৎচন্দ্র

এ যুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই শরৎচন্দ্রের নাম করতে হয়। একই আকাশে একসঙ্গে চন্দ্রসূর্যের উদয় অপ্রত্যাশিত, কিন্তু বাংলার সাহিত্যগগনে এমনি আশ্চর্য সমন্বয়

সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের একত্র উদয়ে। রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় বিরাট প্রতিভার জ্যোতিঃতেও ম্লান হয়ে না গিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিভার জ্যোতিঃ প্রকাশ করা বড় সহজ কথা নয়। উপন্যাস রচনায় শরৎচন্দ্র যে অভাবিত খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমন একটা ধারার প্রবর্তন করে গেছেন যা সম্পূর্ণই বিচিত্র এবং অভিনব।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এত সূক্ষ্ম কারুকার্যময় এবং এত গভীর ভাবপূর্ণ যে সাধারণ মনের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে যে সব চিত্র এঁকেছেন এবং যে কথা বলেছেন তা প্রতিটি বাঙ্গালীর কাছেই অতি পরিচিত। বাংলার অন্তর ও বাইরের রূপটি শরৎসাহিত্যে যেমন ভাবে জেগে উঠেছে তেমন আর কোথাও বড় দেখা যায় না। সে রূপ যেমনি অনাড়ম্বর তেমনি সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রস জুগিয়েছে প্রধানত উচ্চশিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান্ পাঠককে, আর শরৎচন্দ্রের উপন্যাস রস জুগিয়েছে বাংলার শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত, ছোটবড়, স্ত্রীপুরুষ—সকল পাঠককে। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্রের সর্বপ্রথম উপন্যাস 'শুভদা' তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর তিনি 'বড়দিদি' উপন্যাস এবং 'বিন্দুর ছেলে' ও 'রামের সুমতি' নামে বড় গল্প রচনা করেন। সমস্ত জীবনে তিনি বহু ধরনের অসংখ্য উপন্যাস রচনা করেছেন। 'দত্তা', 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি তাঁর প্রধান মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, 'শেষ প্রশ্ন', 'পথের দাবী', 'বিপ্রদাস' প্রভৃতিকে সমস্যামূলক উপন্যাস বলা যেতে পারে। 'দেবদাস', 'বিরাজ বৌ', 'অরক্ষণীয়া', 'পল্লীসমাজ' প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাস—যার মধ্যে জীবনের অতি করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'স্বামী', 'পরিণীতা',



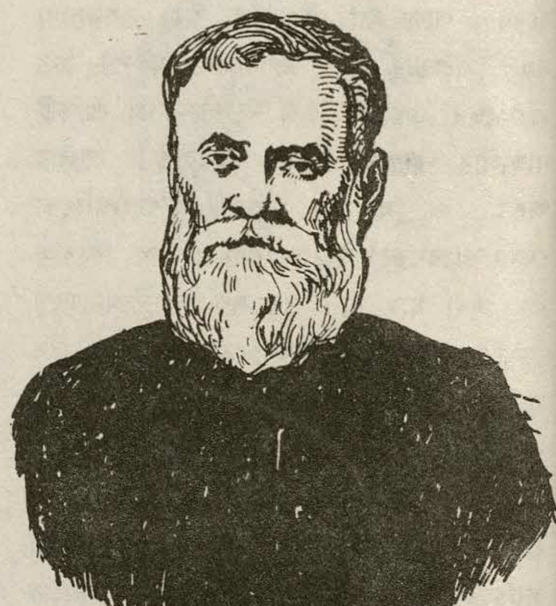
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'নিষ্কৃতি', 'মেজদিদি' প্রভৃতি ছাড়াও 'দেনা-পাওনা', 'পণ্ডিতমশাই', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'বামুনের মেয়ে' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি খুবই জনপ্রিয়।

শরৎচন্দ্রের রচনায় বাংলার সমাজ এবং বাঙ্গালীর নিজস্বতা ও আদর্শ যেমন সুস্পষ্ট ভাবে জেগে উঠেছে তেমন আর কারও রচনায় দেখা যায় না। এজন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় শরৎচন্দ্র আচ্ছন্ন হয়ে যান নি।

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে বাংলা-সমাজকে দু'দিক্ থেকে দেখিয়েছেন। প্রথমত, সমাজ-প্রকৃতি অর্থাৎ সমাজের বাইরের রূপ, দ্বিতীয়ত, সমাজ-সংস্কার অর্থাৎ মানুষের মনের মধ্যে সমাজের প্রভাব। সমাজের বাইরের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, অভাব-অভিযোগ, দলাদলি ইত্যাদির চিত্র 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে', 'পণ্ডিতমশাই', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাবে আঁকা হয়েছে। কিন্তু সমাজের রীতি-নীতি ও বিধি-নিষেধ যখন মানুষের মনের মধ্যে গিয়ে বাসা বাঁধে তখনই তা হয়ে দাঁড়ায় সংস্কার। সমাজের বাইরের শক্তির চেয়ে ভিতরের এই সংস্কারের শক্তি অনেক বেশি প্রবল। প্রত্যেক মানুষের মনেই কিছু-না-কিছু সংস্কার জমে আছে। সমাজের বাইরের বাধাকে অস্বীকার করতে পারলেও মানসিক সংস্কারের বাধাকে মানুষ সহজে কাটাতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক মনেই সংস্কার ও স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে চলে সূক্ষ্ম সংগ্রাম। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নরনারীর চরিত্রেই এই সংগ্রামের রূপ ফুটে উঠেছে। নিজের বিরুদ্ধেই নিজের সংগ্রাম—নিজের কাছেই নিজের পরাজয়—এই হচ্ছে শরৎ-সাহিত্যের একটা বড় বৈশিষ্ট্য।

শরৎচন্দ্রের অদ্ভুত নৈপুণ্য ছিল নারীচরিত্র অঙ্কনে। পুরুষের চেয়ে নারীর সংস্কার অনেক বেশি প্রবল এবং সেজন্য তাদের অন্তরে দ্বন্দ্বও বেশি। তা ছাড়া রমণীর সার্থকতা স্নেহ, প্রেম, দয়া, ক্ষমা ও সহনশীলতায়। বাংলাদেশের নারীদের মধ্যে এ সব গুণের অভাব কোনদিনই ঘটে নি, তাই তাদের চিত্র হয়ে উঠেছে যেমনি স্বাভাবিক তেমনি সুন্দর। অন্য দিকে পুরুষের সার্থকতা হচ্ছে শক্তি, সামর্থ্য ও সাহসে এবং বাইরেকার বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগে। কিন্তু বাংলার পুরুষদের মধ্যে এ সব গুণের অভাব অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে বলে শরৎসাহিত্যে তাদের চরিত্র কিছুটা নিষ্প্রভ। যে দু'-একটি পুরুষচরিত্র শরৎসাহিত্যে কর্মে, দৃঢ়তায় ও বীরত্বে উজ্জ্বল হয়ে জেগে উঠেছে,—যেমন ইন্দ্রনাথ, সব্যসাচী, রমেশ ইত্যাদি—তাদের ঠিক এ কারণেই সম্পূর্ণ বাস্তব বলে মনে হয় না। পৃথিবীতে যে শুধু দেবদেবীই নেই, দানবদানবীও আছে, সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন।



ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

তাঁর সৃষ্ট নরনারীরা প্রায় কেউই অবিমিশ্র ভালো বা মন্দ নয়, তারা দোষে-গুণে গড়া মাটির মানুষ। এজন্যেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি

আমাদের কাছে এত স্বাভাবিক ও পরিচিত বলে মনে হয়।

বাংলাদেশের দীন-দুঃখী ও উৎপীড়িত মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের মনে ছিল গভীর ও আন্তরিক সহানুভূতি, আর এই সহানুভূতি এবং সমবেদনাই শরৎসাহিত্যের মূল কথা।

রবীন্দ্রযুগের আর কয়েকজন কথাসাহিত্যিক

রবীন্দ্রযুগে অন্যান্য যে সব ঔপন্যাসিক বা কথাসাহিত্যিক গোড়ার দিকে কলম ধরে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।



রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অদ্ভুতরসের প্রবর্তন করে খ্যাতিলাভ করে-ছেন। অদ্ভুত ও অসম্ভব বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি যে ভাবে ব্যঙ্গকৌতুকের সৃষ্টি করেছেন সে রকমটি বাংলা সাহিত্যে আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর রচিত 'কঙ্কাবতী', 'ভূত ও



প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

মানুষ', 'ডমরুচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে হাস্য, করুণ ও অদ্ভুতরসের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাঁর উপন্যাসে প্রধানত বাংলার গ্রামজীবনের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এদিক্ দিয়ে তাঁর 'শক্তিকানন', 'ফুলজানি', 'বিশ্বনাথ' প্রভৃতি উপন্যাসের নাম করা যেতে পারে,—যদিও এখন আর এগুলি তেমন জনপ্রিয় নয়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বড় ঐতি-হাসিক, তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায়ই বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের সত্যকে যথাসম্ভব বজায় রেখে তিনি রচনা করেছেন 'করুণা', 'শশাঙ্ক,' 'ধর্মপাল' ও 'ময়ূখ' নামক উপন্যাস। রাখালদাসের রচনানৈপুণ্যে অতীত ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে জলধর সেন ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। প্রভাতকুমার উপন্যাসের চাইতে ছোটগল্প রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

এদিক্ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁর সমকক্ষ বিরল। তবুও তাঁর 'নবীন সন্ন্যাসী', 'সিন্দুর কৌটা', 'মনের মানুষ', 'রমাসুন্দরী', 'জীবনের মূল্য', 'রত্নদীপ' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বেশ জনপ্রিয়।

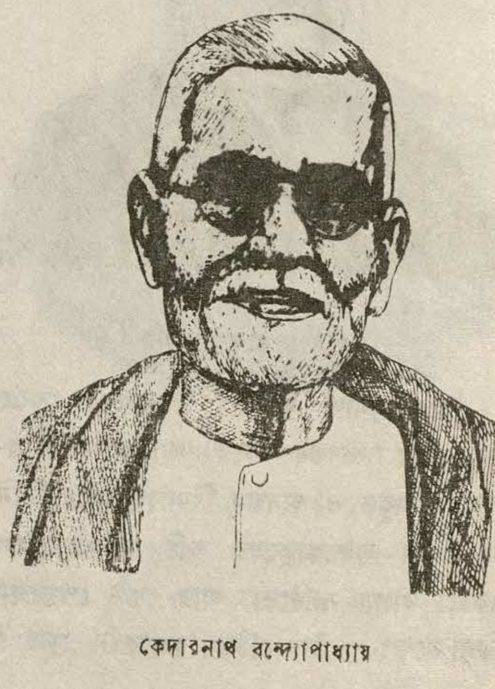


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ যুগের পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনিই প্রথম বাংলা উপন্যাসে অতি-আধুনিকতা এবং অতি-বাস্তবতা নিয়ে আসেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কিছু বাদানুবাদও হয়েছিল। ইনি বহু উপন্যাস রচনা করেছিলেন, যেমন 'অভয়ের বিয়ে', 'তারপর', 'ব্রতী', 'বিপর্যয়', 'শুভা', 'রবীন মাষ্টার', 'রাজগী' এবং আরও অনেক।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী', 'চোরকাঁটা' প্রভৃতি এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ', 'অমূল তরু', দিক্-শূল,' 'অস্তরাগ' প্রভৃতি উপন্যাসও বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ যুগের বাংলা সাহিত্যে দু'টি অসামান্য প্রতিভা। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' এক যুগান্তকারী উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হচ্ছে ছোট্ট দু'টি ছেলে-মেয়ে—দুর্গা আর তার ভাই অপু। পল্লীপ্রকৃতির পটভূমিকায় শিশুমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাব-কল্পনাকে তিনি অপরূপ দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন, যা বিশ্বসাহিত্যের আসরে স্থান পাবার যোগ্য। তাঁর রচিত 'আরণ্যক' গ্রন্থখানি সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা চলে। এ দু'খানি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ্। তা ছাড়া 'অপরাজিত', দৃষ্টিপ্রদীপ', 'দেবযান', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'ইছামতী' প্রভৃতি বিভূতিভূষণের বহু বিখ্যাত উপন্যাস আছে।

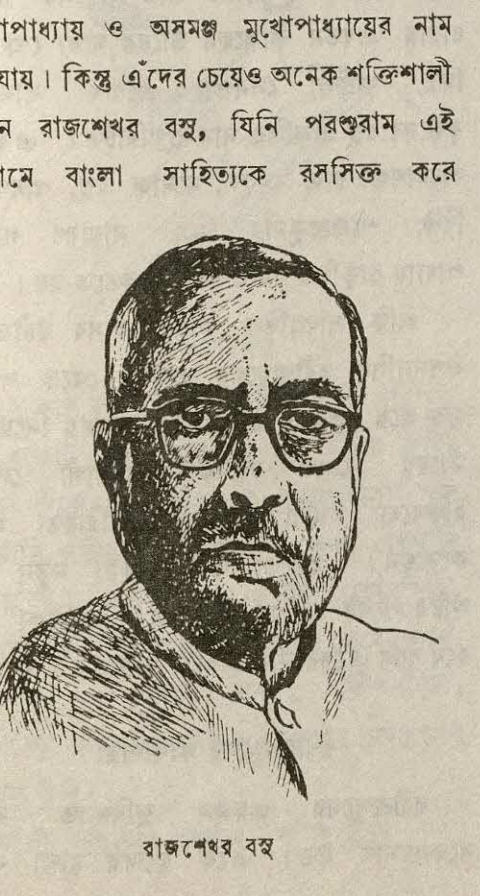


কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সূক্ষ্ম জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে অদ্বিতীয়। তাঁর উপন্যাসের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। 'পদ্মানদীর মাঝি' বাংলা সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'চতুষ্কোণ' প্রভৃতি উপন্যাসও রসিক ও সমালোচকদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রশংসিত।

বাংলা উপন্যাসে যাঁরা সমাজের নীচুতলার মানুষদের প্রথম স্থান দিলেন তাঁদের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ই বোধ হয় সর্বপ্রধান।

ব্যঙ্গরসাত্মক গল্প-উপন্যাস রচনায় যাঁরা কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের নাম করা যায়। কিন্তু এঁদের চেয়েও অনেক শক্তিশালী হচ্ছেন রাজশেখর বসু, যিনি পরশুরাম এই ছদ্মনামে বাংলা সাহিত্যকে রসসিক্ত করে গেছেন। অবশ্য ইনি উপন্যাস রচনা করেন নি, ছোটগল্প ও রস-রচনাই এঁর বৈশিষ্ট্য।



রাজশেখর বসু



শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাস-আশ্রয়ী কাহিনী ও গোয়েন্দা-কাহিনী অবলম্বনে বহু সার্থক উপন্যাস রচনা করেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহিলা-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর। পরবর্তী যুগে অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী ও নিরুপমা দেবীর নাম সুবিখ্যাত। অনুরূপা দেবীর লেখায় বঙ্কিমচন্দ্রের এবং নিরুপমা দেবীর লেখায় শরৎচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি', 'মহা-নিশা', 'পোষ্যপুত্র', 'মা' ইত্যাদি এবং নিরুপমা



অনুরূপা দেবী

দেবীর 'দিদি', 'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি' ও 'প্রত্যাবর্তন'ও উল্লেখযোগ্য।

সীতা দেবী ও শান্তা দেবী দুই বোন। দু'জনেই উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। সীতা দেবীর 'রজনীগন্ধা', 'পরভৃতিকা', 'বন্যা' এবং শান্তা দেবীর 'জীবনদোলা', 'চিরন্তনী' প্রভৃতি উপন্যাস প্রসিদ্ধ।



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এঁরা দু'জনে একসঙ্গেও লিখেছেন সংযুক্তা দেবী নাম দিয়ে। তার মধ্যে 'উদ্যানলতা' উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শৈলবালা ঘোষজায়া, আশালতা সিংহ প্রভৃতি এবং বর্তমান কালে বাণী রায়, প্রতিভা বসু, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী প্রভৃতি লেখিকারা গল্প-উপন্যাস রচনায় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আশাপূর্ণা দেবী ভারতীয় সাহিত্যের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও পেয়েছেন।

বর্তমান যুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি বহু সার্থক উপন্যাস রচনা করেছেন এবং ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক রূপে সর্বপ্রথম 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'রাইকমল', 'ধাত্রীদেবতা', 'কবি', 'আরোগ্য-নিকেতন,' 'কালিন্দী' প্রভৃতি তাঁর বহু উপন্যাস প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে কল্পনা ও আদর্শের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা মিলিত হয়েছে। ফলে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি বৈচিত্র্যময়, জীবন্ত ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাঁরা বাংলা উপন্যাসে অতি-আধুনিক চিন্তা-ধারার প্রবর্তন করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির নাম সুপরিচিত। এ ছাড়া অন্নদাশঙ্কর রায়, বনফুল, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায় প্রভৃতির নামও অবশ্যই করতে হয়।

অতি সাম্প্রতিক কালে যে-সব উদীয়মান ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রযুগের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নতুনতর রচনারীতির আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের মধ্যেও অনেক শক্তিশালী লেখক ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। হয়তো তাঁরা একটা নতুন যুগ সৃষ্টির পথেই এগিয়ে চলেছেন। তালিকা দীর্ঘ হবে বলে এঁদের নাম এখানে দেওয়া হ'ল না।

রবীন্দ্রযুগের কাব্যধারা

রবীন্দ্রযুগের একজন সুবিখ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এঁকে ছন্দের রাজা বলা

যেতে পারে। ছন্দের ওপর এঁর দখল ছিল অসাধারণ। বাংলা কবিতায় ইনি অনেক অপূর্ব নতুন ছন্দের প্রবর্তন করেছেন। তা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা ইনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তবে ছন্দের দিকে অত্যধিক নজর দেবার ফলে সময় সময় তাঁর কবিতায় ভাবের গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোক



সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখেছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় যে এই নবীন কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল কতখানি গভীর। এঁর 'কুহু ও কেকা' একখানি সুন্দর বই। এ ছাড়া 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'অভ্রআবীর', 'বিদায় আরতি', 'বেলাশেষের গান', 'হসন্তিকা', 'তুলির লিখন', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' ইত্যাদি অনেক কবিতা-গ্রন্থ রচনা করে গেছেন ইনি।

কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রযুগের আর



কাজী নজরুল ইসলাম

একজন বিশিষ্ট কবি। এঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় বিদ্রোহের সুরে কবিতা রচনা করা। এজন্য এঁকে বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি বলা হয়। 'অগ্নিবীণা' এঁর বিশেষ বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এ ছাড়া লিখেছেন 'দোলনচাঁপা', 'বিষের বাঁশী', 'ফণিমনসা', 'গানের মালা' প্রভৃতি, আর সেই সঙ্গে লিখেছেন অজস্র গান। এঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা-সংকলনের নাম 'সঞ্চিতা'।

রবীন্দ্রযুগেও তাঁর কাব্যের প্রভাব যাঁদের রচনায় খুবই কম তাঁদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বতঃস্ফূর্ততাই এঁর কাব্যের প্রধান গুণ। তাই এঁকে বলা হয় 'স্বভাবকবি'। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'কস্তুরী', 'চন্দন', 'কুঙ্কুম', 'বৈজয়ন্তী' প্রভৃতি অন্যতম। এই ধরনের আর একজন কবি হচ্ছেন রজনীকান্ত সেন, যাঁকে বলা হয় কান্তকবি। কবিতা ছাড়া গানও ইনি রচনা করেছেন প্রচুর। 'বাণী' ও 'কল্যাণী' এর বিখ্যাত গ্রন্থ।

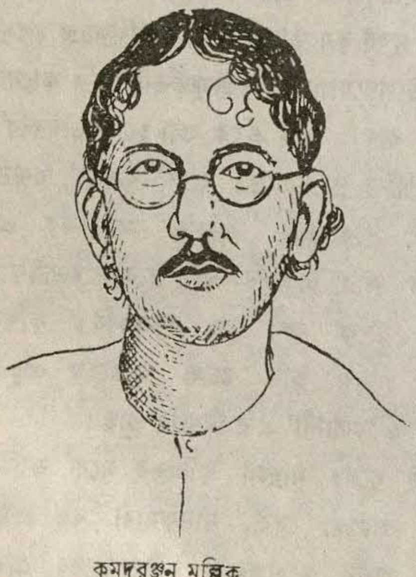
ঐ যুগের মহিলা কবিদের মধ্যে কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, মানকুমারী বসু প্রভৃতি খ্যাতি অর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব



কামিনী রায়

থেকে মুক্ত না হলেও কাব্যরচনায় এঁরাও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর নাটকের মত কবিতা এবং গানেও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন,—বিশেষ করে তাঁর হাসির ও স্বদেশী গানগুলির জন্য। স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা নিয়ে লেখা তাঁর রচিত 'বঙ্গ আমার জননী আমার'



কুমুদরঞ্জন মল্লিক

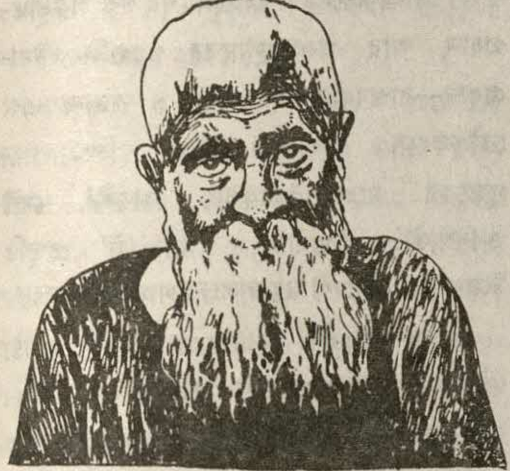
অথবা 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' বা 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী অবদান। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'আর্যগাথা', 'মন্দ্র,' 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী', 'হাসির গান' ইত্যাদি।

জসীমউদ্দিন বাংলা কাব্যক্ষেত্রে একটি নতুন জিনিস দিয়েছেন, যা বোধ হয় কুমুদরঞ্জন ছাড়া আর কেউ তেমন দিতে পারেন নি। তা হচ্ছে পল্লী-কবিতা। পল্লী-প্রকৃতির স্বাভাবিক ছবি, পল্লীর ঘর-সংসারের নিপুণ বর্ণনা এবং পল্লীবাসীদের সরল হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-ভালোবাসার প্রকাশ তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। 'নক্সীকাঁথার মাঠ', 'বলুচর', 'রাখালী' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।



অতুলপ্রসাদ সেন

রবীন্দ্রযুগের অন্যান্য প্রতিভাবান্ কবি ও সুর-কারদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী,



করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

কল্লোল পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীকে নিয়ে যে কবিচক্র গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, মণীশ ঘটক প্রভৃতি প্রতিভাবান্ কবি।

প্রায় একই সময়ে কাব্যজগতে সম্পূর্ণ নতুন ভাবধারা নিয়ে আবির্ভূত হন জীবনানন্দ দাশ। সাম্প্রতিক কালে বাংলা কাব্যে যে পালাবদলের আয়োজন চলছে তার সূত্রপাত হয়েছে জীবনানন্দ থেকেই। এ বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করেন আর একজন প্রতিভাবান্ কবি—বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা নতুন-কবিতা-আন্দোলনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কতকটা এই পত্রিকার মাধ্যমেই জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতার আসরে অবতীর্ণ হন। অবশ্য কল্লোল পত্রিকার ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনার অভিনবত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং রবীন্দ্রনাথেরও সস্নেহ প্রশংসা অর্জন করে। 'বনলতা সেন' তাঁর বহু-পঠিত ও বহু-আলোচিত কাব্যগ্রন্থ। তা ছাড়া তাঁর 'রূপসী বাংলা', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রভৃতি কাব্যও ইদানীং কালে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তও বাংলা কাব্যজগতে একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর রচনার মধ্যে একটি অদ্ভুত গাম্ভীর্য আছে, যা তাঁর কবিতাকে অন্য সব কবির কবিতা থেকে একটি স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' প্রভৃতি তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ। এই সূত্রে একটি তরুণ কবির নাম অবশ্যই করতে হবে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। অত্যন্ত অপরিণত বয়সে ইনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু তারই মধ্যে বাংলা কবিতায় একটি বিশিষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছেন।



জীবনানন্দ দাশ

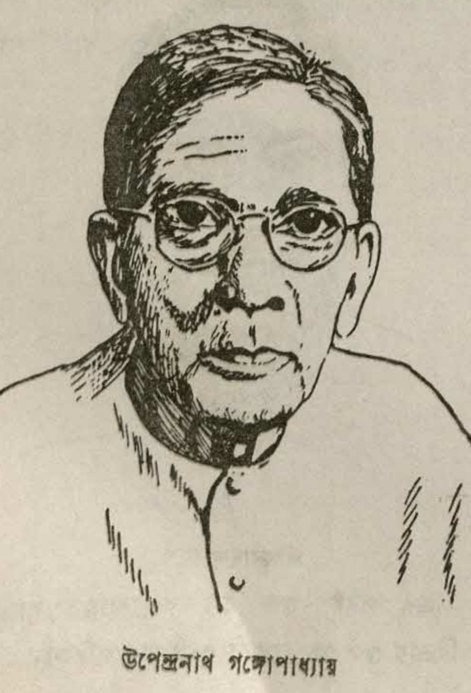
এর পরই শুরু হয় রবীন্দ্রোত্তর যুগ—কবিতায় শুরু হয় একেবারে আমূল পরিবর্তন।

এখনকার প্রায় সমস্ত নতুন কবিই এই নতুন পথের যাত্রী।

বর্তমান কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং বিষ্ণু দে নিঃসন্দেহে উচ্চস্থান অধিকার করে আছেন এবং পরবর্তী বহু তরুণ কবিকে প্রভাবিত করেছেন। সাম্প্রতিক কালে বহু প্রতিভাবান্ তরুণ কবি সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত কবিতা রচনায় সচেষ্ট। এঁদের নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনার সময় হয়তো এইবার শুরু হবে।

রবীন্দ্রযুগের ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলার বিভিন্ন লেখকের হাতে ছোটগল্প যে ক্রমোন্নতি লাভ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম করতে হয়। এঁর গল্পগুলো রবীন্দ্রনাথের গল্পের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। রবীন্দ্রনাথের গল্প অনুভূতি-প্রধান, আর প্রভাতকুমারের গল্পগুলি ঘটনা-প্রধান—বাস্তবধর্মী, ভাষা সরল ও স্বচ্ছন্দ এবং কৌতুকরসে মেশানো। তাঁর রচিত গল্প-পুস্তকের মধ্যে 'নবকথা', 'ষোড়শী', 'দেশী ও বিলাতী', 'গল্পবীথি', 'গল্পাঞ্জলি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনের গল্পগুলি অনবদ্য



উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এর বিষয়বস্তু সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। দেশ-বিদেশের বহু চরিত্র ও প্রসঙ্গ এঁর গল্প-গুলিকে সরস ও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী ও সুক্ষ্ম মার্জিত হাস্যরস উপভোগ্য। এঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'বীরবল'। সে যুগেও কথ্য ভাষায় সাহিত্যরচনা এঁর একটি প্রধান কীর্তি।

হাসির গল্প রচনায় বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছেন রাজশেখর বসু, যাঁর সাহিত্যের ছদ্মনাম 'পরশুরাম'। তাঁর 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' প্রভৃতি গল্প-পুস্তকগুলি বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব সৃষ্টি।

ছোটগল্পকার হিসেবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও খ্যাতিমান্। এঁর 'রানুর প্রথম ভাগ', 'রানুর কথামালা' এবং হাসির গল্প 'বরযাত্রী' উল্লেখযোগ্য। 'নীলাঙ্গুরীয়' প্রভৃতি উপন্যাস লিখেও ইনি যশস্বী হয়েছেন।

এ যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই কিছু কিছু সার্থক ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলিতে মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। ভাষার মধ্যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস খুবই সংযত এবং যুক্তি ও বুদ্ধি বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত। তাঁর

'বেনামী বন্দর', 'পুতুল ও প্রতিমা' প্রভৃতির নাম বিশেষ করে মনে পড়ে।

বনফুলের আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। এঁর গল্পরচনার ভঙ্গী সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। অতি অল্প কথায় ক্ষুদ্রতম পরিসরের মধ্যে তিনি অপূর্ব সুন্দর ও পরিপূর্ণ ছোটগল্প রচনা করে গেছেন। এঁর অধিকাংশ গল্পই অপ্রত্যাশিত পরিণতির দ্বারা আমাদের বিস্মিত ও আনন্দিত করে। এঁর ছোটগল্প-সংগ্রহ 'বনফুলের গল্প' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

তা ছাড়া অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সুবোধ বসু প্রভৃতি বহু লেখককে একাধারে ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার রূপে আমরা পেয়েছি।

বর্তমান সময়ে তরুণ লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ছোটগল্প লেখার একটা প্রয়াস দেখা যাচ্ছে, যাকে বলা যায় গল্প লেখার পালাবদল। এঁদের মধ্যেও বহু শক্তিশালী লেখক দেখা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রযুগের নাটক

রবীন্দ্রনাথের পরে সাহিত্যের দিক্ দিয়ে তেমন কোনো উচ্চশ্রেণীর নাটকের আবির্ভাব হয় নি বাংলা সাহিত্যে। তবু যাঁরা নাটক রচনায় এ যুগে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, মহেন্দ্র গুপ্ত, উৎপল দত্ত, তরুণ রায়, বাদল সরকার প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এ যুগের নাট্যকারগণ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনার চেয়ে সামাজিক ও পারিবারিক নাটক রচনার দিকেই নজর দিয়েছেন বেশি, যদিও বাংলা সমাজ ও সংসারের যথাযথ রূপ খুব কম নাটকেই ফুটে উঠেছে। কিছু কিছু নাটকে পৌরাণিক কাহিনীর রূপকের আড়ালে আধুনিক কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকখানি এর উদাহরণ। এখানে কংসের অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে পরাধীন ভারতে ইংরেজ সরকারের পীড়নের রূপটিই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' পৌরাণিক নাটক হলেও তার প্রকাশভঙ্গী আধুনিক। তাঁর লেখা 'ইরাণের রাণী' নাটকটিও জনপ্রিয়।

মন্মথ রায়ের 'মীরকাশেম', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'চাঁদ সদাগর', 'মুক্তির ডাক' এবং শচীন সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজউদ্দৌলা' ও 'তটিনীর বিচার' নামে সামাজিক নাটকটি একদা বহুল পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

বনফুলের জীবনীমূলক নাটক 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর'ও একদিক্ দিয়ে একটি নতুন পরীক্ষা বলা যেতে পারে।

বিধায়কের 'মাটির ঘর', 'মেঘমুক্তি', 'বিশ বছর আগে', যোগেশ চৌধুরীর 'পরিণীতা', 'সীতা', 'মাকড়সার জাল', মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'টিপু সুলতান', 'শতবর্ষ আগে' প্রভৃতি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছে। নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা'ও এই রকম একটি রঙ্গমঞ্চপ্রিয় নাটক।

পরবর্তীকালে বাংলা নাটকে আমূল পরিবর্তনের জন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে এবং

বহু তরুণ নাট্যকার নতুন বিষয়বস্তু ও নূতনতর আঙ্গিক নিয়ে বাংলা নাটক রচনা করেছেন। কেউ কেউ নাটকে সমাজচেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে নীচুতলার মানুষদের জীবন-সংগ্রামের বাস্তব ছবি এঁকেছেন, আবার কেউ কেউ শিল্প-চেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতীক-নাটক, কাব্য-নাটক, কিমিতিবাদী-নাটক প্রভৃতি নানা রসের নাটক রচনা করে চলেছেন। এই সব নাটকের উপর বিদেশী নাটকের প্রভাব খুব বেশি। এগুলি নিয়মিত মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে এবং দর্শক সাধারণকে ক্রমশই অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করছে।

সমালোচনা-সাহিত্য

এ যুগের সমালোচনা-সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের পর প্রথমেই প্রমথ চৌধুরীর নাম করতে হয়। এঁর প্রতিষ্ঠিত 'সবুজপত্র' বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে **একটা নতুন যুগ** নিয়ে এসেছিল। **সবুজপত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল** কথ্য-ভাষা প্রচার ও সাহিত্যে তার ব্যবহার—যাতে করে সাহিত্যের ভাষা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এ জিনিসটি রবীন্দ্রনাথেরও ভালো লেগেছিল এবং তিনিও সর্বান্তঃকরণে এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে কথ্যভাষায় যে-সব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা যে সবুজপত্রেরই প্রভাবের ফল সে কথা অস্বীকার করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্য 'বলাকা'র কবিতা-গুলিও সবুজপত্রের প্রেরণায় লেখা হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর আলোচনা ও প্রবন্ধগুলি এত উচ্চস্তরের ছিল যে তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল।

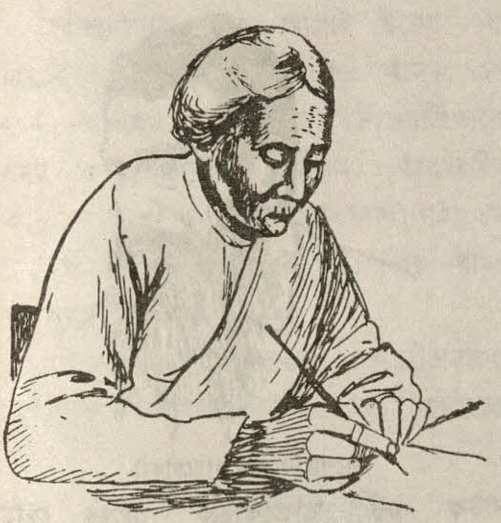
সমালোচনা-সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,



শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরেশচন্দ্র সামাজপতি, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুল চন্দ্র গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুকুমার সেন প্রভৃতিও খ্যাতি অর্জন করেছেন।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনও কোনও প্রবন্ধে করেছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা সর্বপ্রথমে করেন দীনেশচন্দ্র সেন। এঁর লেখা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থখানি শুধু যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার ভাণ্ডার তাই নয়, এর ভাষাও অতি কবিত্বপূর্ণ এবং সুখপাঠ্য। এ গ্রন্থখানি রচনার জন্যে তাঁকে যে কি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। পরবর্তীকালে যে-সব সাহিত্যিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই মূলতঃ দীনেশ বাবুকে অনুসরণ করেছেন।



দীনেশচন্দ্র সেন

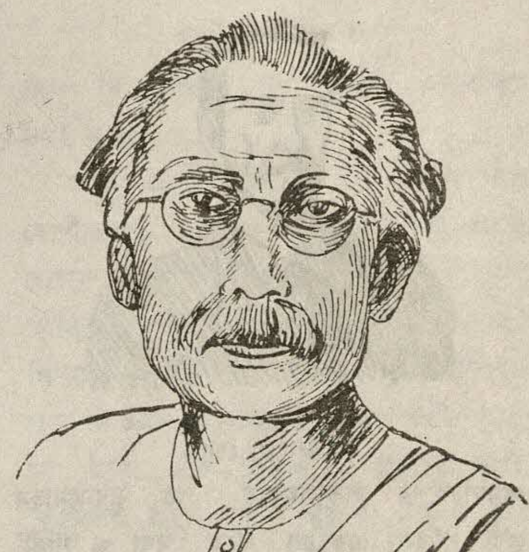
রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনায় খ্যাতিলাভ করেছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্র-জীবনী' একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। কেউ কেউ আত্মজীবনী এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কেউ কেউ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখেও বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। এ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে সাময়িক পত্রের ভূমিকাও যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এ কথা মানতেই হবে।

শিশুসাহিত্য

বর্তমানে বাংলার শিশুসাহিত্যও একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সাহিত্যধারা রূপে গড়ে উঠেছে। এখন ৫ থেকে ১৬ বছরের শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত সমস্ত সাহিত্যকেই সাধারণত শিশুসাহিত্য বলা হয়।

শিশুসাহিত্য বলতেই রূপকথার কথা আগে মনে পড়ে। যদিও প্রাচীন যুগেই শিশুদের জন্য ছড়া, রূপকথা, উপকথা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তা মুখে-মুখেই বলা হ'ত, লিখিত রূপ তার তখনও কিছু ছিল না। বর্তমান যুগেই অনেকগুলি রূপকথা-উপকথা অবলম্বন করে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ঠাকু'মার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'দাদামশায়ের থলে', 'ঠান্‌দিদির থলে' প্রভৃতি রচনা করেন।

কিন্তু এ হ'ল পরের যুগের কথা। এর আগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীরা 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করে ছোটদের জন্য পুস্তক প্রকাশ শুরু করেন। কিন্তু সে সব ছিল শিক্ষামূলক পাঠ্য-



দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

পুস্তক, ঠিক সাহিত্যগ্রন্থ তাদের বলা চলে না। তবে স্কুল বুক সোসাইটির পরিপূরক হিসেবে 'বঙ্গভাষানুবাদ সমাজ' নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল সেখান থেকে বিভিন্ন ভাষার কিছু কিছু সাহিত্যপুস্তক বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছিল

—যেমন 'রবিন্‌সন্ ক্রুশোর ভ্রমণবৃত্তান্ত', 'বৃহৎ-কথা' ইত্যাদি।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রচেষ্টায়ই প্রথম প্রকৃত শিশুসাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'বালকবন্ধু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আদর্শ শিশুপত্রিকা এটিকেই বলা যেতে পারে।

এরপর ছোটদের জন্য ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় 'সখা' পত্রিকা—সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন, এবং পরে 'সাথী'—সম্পাদক ভুবনমোহন রায়।



প্রমদাচরণ সেন

প্রমদাচরণের অকালমৃত্যুর পর ভুবনমোহন দু'টি পত্রিকা একত্রিত করে 'সখা ও সাথী' নামে প্রকাশিত করতে থাকেন। শিশুসাহিত্যে প্রমদাচরণ ছিলেন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী লেখক, তাঁর 'সখা'ও ছিল চমৎকার পত্রিকা।

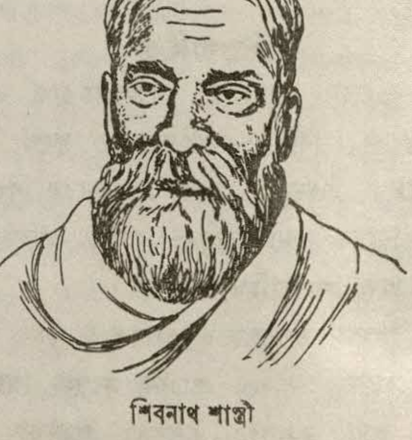
জোড়াসাঁকো থেকে প্রকাশিত 'বালক' পত্রিকাটিও শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এর সম্পাদনা করতেন রবীন্দ্রনাথের বৌঠান (বৌদি) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'রাজর্ষি' উপন্যাস, 'মুকুট'



উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

নাটক এবং 'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থের ছোট ছোট মজার নাটিকাগুলি প্রথমে 'বালক' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

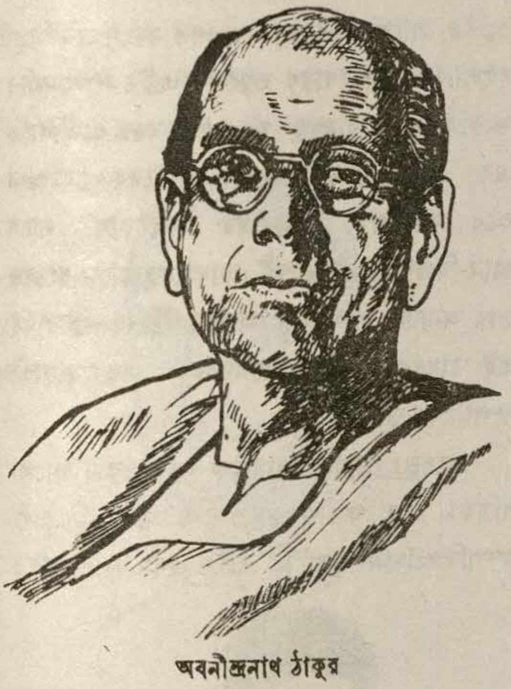
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত আরো অনেক ছোটদের পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে বিশেষ প্রশংসনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল'। এই সমস্ত পত্রিকার লেখকদের মধ্যে অনেকের নামই অতি-পরিচিত এবং শিশুসাহিত্যে তাঁদের দানও অপরিসীম।



শিবনাথ শাস্ত্রী

রবীন্দ্রনাথের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছোটদের জন্যও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বাংলার শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ', গল্পপুস্তক 'সে' ও 'গল্পসল্প' সকলেরই অতি প্রিয়—যদিও ওর সবটুকুই শিশুসাহিত্য নয়।

শিশুসাহিত্যে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অবদানও অসামান্য। শিশু ও কিশোরদের



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্য তিনি অপরূপ ভাষা ও রচনাশৈলীতে রচনা করেছেন 'নালক', 'ক্ষীরের পুতুল', 'শকুন্তলা', 'বুড়ো আংলা', 'ভূতপত্রীর দেশ', 'খাতাঞ্চির খাতা', 'রাজকাহিনী' প্রভৃতি।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী শিশুসাহিত্যে আর একটি নাম। তাঁর লেখা 'ছোটদের রামায়ণ', 'ছেলেদের রামায়ণ', 'টুনটুনির বই'



যোগীন্দ্রনাথ সরকার

পড়ে নি বাংলা দেশে এমন ছেলেমেয়ে কমই আছে।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম যোগীন্দ্রনাথ সরকার। অনবদ্য ছড়া-কবিতা লেখার হাত ছিল তাঁর। ইনি 'হাসিখুসি', 'হাসিরাশি', 'হাসি ও খেলা' প্রভৃতি বই লিখে শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। হাসিখুসি পড়ে নি এমন ছেলেমেয়েও এদেশে কমই আছে। তা ছাড়া এঁর 'রাঙাছবি', 'খেলার সাথী', 'খুকুমণির ছড়া', 'বনে জঙ্গলে' প্রভৃতি গ্রন্থও বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এ-সময়কার অন্যান্য শিশুসাহিত্যিকদের মধ্যে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ বসু, মনোমোহন সেন প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান শতাব্দীর শিশু-পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় 'সন্দেশ'-এর। উপেন্দ্রকিশোরই ছিলেন এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক, আর এই পত্রিকারই অন্যতম লেখক ছিলেন তাঁর পুত্র সুবিখ্যাত সুকুমার

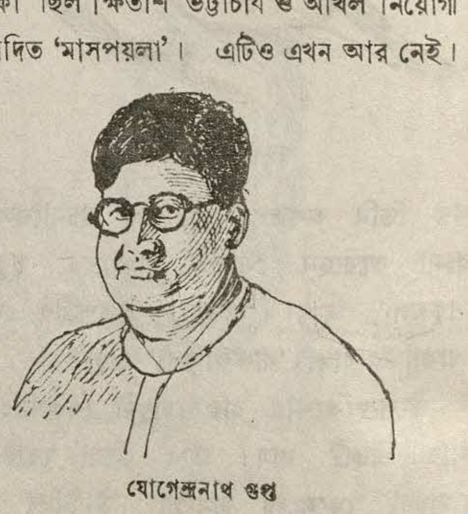


সুকুমার রায়

রায়। সুকুমার রায়ের লেখা 'আবোল তাবোল', 'হ য ব র ল', 'পাগলা দাশু', 'খাই খাই', ইত্যাদি বই বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্। উপেন্দ্রকিশোরের পরে সুকুমার রায় ও তার পর তাঁর ভাই সুবিনয় রায়ের সম্পাদনার পর সন্দেশ বন্ধ হয়ে যায়। কুলদারঞ্জন রায়, সুখলতা রাও এঁরাও ছিলেন সন্দেশের নিয়মিত লেখক। এর পর আর একবার সন্দেশ কিছুদিন বেরিয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়। সেবার সম্পাদক ছিলেন সুবিনয় রায় ও সুধাসিন্ধু বিশ্বাস। সুখের বিষয় পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হয়েছে লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায়ের সম্পাদনায়। সন্দেশের যুগে আর একখানি ভালো পত্রিকা ছিল 'শিশু',—সম্পাদক বরদাকান্ত মজুমদার।

এর পরই নাম করতে হয় 'মৌচাক' পত্রিকার। সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে আজও এটি চলছে। বর্তমান সম্পাদক হচ্ছেন সুপ্রিয় সরকার। বর্তমানে প্রচলিত শিশু-পত্রিকার মধ্যে এটিই সর্বপুরাতন। তারপর আশুতোষ ধরের সম্পাদনায় 'শিশুসাথী' এবং নিশিকান্ত সেনের সম্পাদনায় 'খোকাখুকু' নামে আরও ছ'টি উল্লেযোগ্য পত্রিকা অনেকদিন চলে বন্ধ হয়ে যায়। এর অল্প পরেই প্রকাশিত হয় ছোটদের আর একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা 'রামধনু'। রামধনুর প্রথম সম্পাদক ছিলেন বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। তার পর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। মনোরঞ্জন অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত হুকাকাশির রহস্যগল্প-উপন্যাস ও হাসির গল্পগুলি বাংলা শিশুসাহিত্যের সম্পদ্। ১৯৩৯ সালে অত্যন্ত অপরিণত বয়সে এঁর মৃত্যু হ'লে ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এটির সম্পাদনার ভার নেন। রামধনু গত ৫৭ বছর ধরে চলছে এবং এখনও নিয়মিত ভাবে ছোটদের মনোরঞ্জন করে আসছে। "ছোটদের বিশ্বকোষ" নামে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে-গ্রন্থটি তোমাদের হাতে রয়েছে তার অন্যতম সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যই এই 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদক। এর সহযোগী সম্পাদিকা সুচেতা মিত্র।

রামধনুর প্রায় সমসাময়িক আর একটি ভালো পত্রিকা ছিল ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য ও অখিল নিয়োগী সম্পাদিত 'মাসপয়লা'। এটিও এখন আর নেই।



যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বর্তমানে বিলুপ্ত আর একটি কিশোর-পত্রিকা 'কৈশোরক'। এর সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছোটদের জন্য অনেক ভালো ভালো বই লিখে গেছেন। বাংলাভাষায় ছোটদের প্রথম এনসাইক্লোপিডিয়া জাতীয় গ্রন্থ 'শিশুভারতী'র সম্পাদনা এঁর একটি স্মরণীয় কীর্তি।

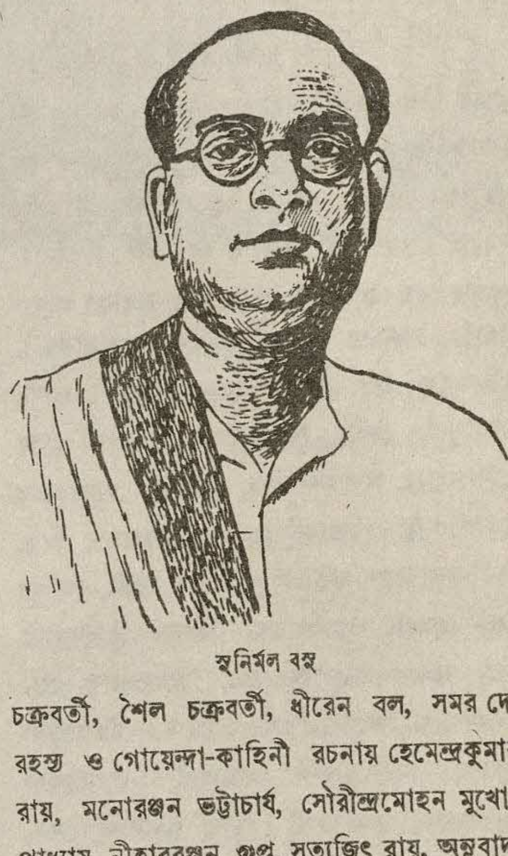
গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে আরও বহু শিশু ও কিশোর-মাসিক বাংলা শিশুসাহিত্যকে কিছুদিন ধরে সমৃদ্ধ করে বন্ধ হয়ে গেছে। এদের মধ্যে রংমশাল, পাঠশালা, কৈশোরিকা, মোহন বেণু, সাজি, জলছবি, ভাইবোন, রোশনাই ইত্যাদির নাম করা যায়। প্রথম দু'টি অনেক বছর চলেছিল।



নরেন্দ্র দেব

বর্তমানে মৌচাক, রামধনু, সন্দেশ (৩য় পর্ব) ছাড়াও 'শুকতারা', 'কিশোর ভারতী', 'কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান', 'তেপান্তর', 'আনন্দমেলা', 'বিজ্ঞান-মেলা', 'চাঁদমামা', 'কিশোর মন' প্রভৃতি ছোটদের পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

ইতিমধ্যে আরও বহু শক্তিশালী প্রতিভা সম্পন্ন লেখক-লেখিকা এসে শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। সকলের নাম এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, অল্প কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। এঁদের মধ্যে আছেন রূপকথা ও পৌরাণিক গল্প রচনায় শিবরতন মিত্র, বরদাকান্ত মজুমদার, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, কুলদারঞ্জন রায়, শৈলেন ঘোষ, ছবির বই রচনায় পূর্ণচন্দ্র



সুনির্মল বসু

চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী, ধীরেন বল, সমর দে, রহস্য ও গোয়েন্দা-কাহিনী রচনায় হেমেন্দ্রকুমার রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সত্যজিৎ রায়, অনুবাদ-গ্রন্থ-রচনায় কুলদারঞ্জন রায়, সুখলতা রাও, সত্যচরণ চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ছড়া-কবিতা রচনায় কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, সুনির্মল বসু, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, সুকমল দাশগুপ্ত, জ্যোতিভূষণ চাকী, পলাশ মিত্র,



নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সুচেতা মিত্র, ভবানী মজুমদার, বিভিন্ন রকমের গল্প ও নাটক রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু, অখিল নিয়োগী, শিবরাম চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, লীলা মজুমদার, সুকুমার দে সরকার, রবীন্দ্রলাল রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (ছদ্মনাম জরাসন্ধ), অজিতকৃষ্ণ বসু, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, বিমল দত্ত, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ গুহ, কুমারেশ ঘোষ, সমর চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞাননির্ভর গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অদ্রীশ বর্ধন, শিশির কুমার মজুমদার, সংকর্ষণ রায়, বিজ্ঞান ও রকমারি প্রবন্ধ রচনায় জগদানন্দ রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, সুবিনয় রায়. ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, ননীগোপাল মজুমদার, ননীগোপাল চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী পাল, অমলেন্দু সেন, অমরনাথ রায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শিশুসাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত 'শিশু-সাহিত্য পরিষদ্' একালের একটি অভিনন্দন-যোগ্য প্রতিষ্ঠান। এ যুগের শিশুসাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই কোনো-না-কোনো ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

রবীন্দ্রযুগ কি এখনও চলছে ?

বাংলা সাহিত্যে এখনও রবীন্দ্রযুগ চলছে কিনা—এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে প্রাণশক্তি ও গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন মূলত তাই অবলম্বন করে এখনও সে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য বর্তমানের পরিবর্তিত সমাজ-পরিবেশে বর্তমান সাহিত্যেও একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত দেখা যাচ্ছে। নবীন সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রযুগ ছেড়ে রবীন্দ্রোত্তর যুগের দিকে পা বাড়িয়েছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়েছিল তারই প্রভাবে বাংলা সাহিত্যেও এসেছে পালাবদলের ডাক। বহু নবীন সাহিত্যিকই এ ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং তাঁদের রচনায়ও দেখা যায় তার আভাস। কিন্তু রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগের প্রভাব কাটাতে প্রয়োজন হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিরাট প্রতিভার; আবার বঙ্কিমযুগের প্রভাবমুক্ত হয়ে নতুন যুগের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই। ঠিক তেমনি আর এক অসামান্য প্রতিভার প্রয়োজন রবীন্দ্রোত্তর যুগকে পরিপূর্ণতা দেবার জন্যে। তার পূর্ব পর্যন্ত বলা যেতে পারে, বাংলা সাহিত্য এখন একটা যুগ-সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাই এই বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের যাঁরা অনুরাগী তাঁদের সকলের মনেই আজ জেগে উঠেছে একটি প্রশ্ন—

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর ?"



পৃথিবীর কথা

ক্রমাগত অদলবদল

পৃথিবীর চেহারা ক্রমাগতই অদলবদল হচ্ছে সে কথা আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি। আজ যেখানে সমুদ্র, কাল সেখানে গজিয়ে উঠছে পাহাড় কিংবা ডাঙ্গা, আজ যেখানে পাহাড়, কাল সেখানে দেখা দিচ্ছে সমুদ্র। আজ যেটা শস্যশ্যামলা বনভূমি, কাল হয়তো সেটা হয়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত মরুভূমি কিংবা ঠাণ্ডা বরফের নীচে ঢাকা নির্জন প্রান্তর। অবশ্য এখানে "আজ" আর "কাল" বলতে একদিন দু'দিন পরের কথা বলছি না—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বছরের ব্যবধানে ঘটছে এই পরিবর্তন। কিন্তু ভূবিজ্ঞানীদের কাছে এই দীর্ঘ সময়টাও আজ আর কাল ছাড়া কিছু নয়।

কেন এই পরিবর্তন? কারণ অসংখ্য। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়ার পাল্লায় পড়ে কি ভাবে পৃথিবী বদলায় সে কথা আমরা আগেই বলেছি। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১-৪০৯)। কিন্তু পৃথিবীর চেহারার বেশির ভাগ অদলবদলের কারণ হচ্ছে তার ভিতরকার উত্তাপ, নানান্ রকমের চাপ—এক কথায় পৃথিবীর ভিতরকার বিচিত্র শক্তির খেলা।

পৃথিবীর ভিতরটা ভীষণ গরম

পৃথিবীর ভিতরটা কি রকম তার একটা মোটামুটি বিবরণ আমরা এই বইএর গোড়ার দিকে দিয়েছি। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫১-৫৬)। পৃথিবীর ব্যাস হচ্ছে ৮০০০ মাইল, তা হ'লে তার কেন্দ্র হচ্ছে ডাঙ্গা থেকে ৪০০০ মাইল নীচে। কিন্তু এ পর্যন্ত ডাঙ্গা থেকে মাত্র ৪ মাইল পর্যন্ত নীচেকার জায়গার সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া গেছে। তাও সশরীরে নেমে নয়, তেলের খনিতে যে নলকূপ বসানো হয় তাই বসিয়ে। অসম্ভব গরম সেই জায়গাটা। তোমরা কখনও কোন খনির মধ্যে নেমেছ কি? আমি একবার ৮০০ ফুট নীচে এক খনির মধ্যে

নেমেছিলাম। ভাপসা গরমে প্রাণ আইঢাই করে উঠেছিল আমার। অবশ্য অনভ্যাসের জন্য আমার যতটা কষ্ট হয়েছিল ওখানে যারা প্রতিদিন কাজ করে তাদের তা হয় নি, তারা অনেকে আরও গভীর খনিতে নেমে কাজ করে। কিন্তু হিসেব করে দেখা গেছে প্রতি ৬০ ফুট অন্তর তাপমাত্রা এক ডিগ্রী ফারেনহাইট করে বাড়তে থাকে। তা হলে চার মাইল নীচে কতটা গরম হবে আন্দাজ করা গেলেও ৪০০০ মাইল নীচে কতটা গরম হবে তা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। ৩০ মাইল নীচে যে উত্তাপ তাতে যে কোন পাথরই গলে যেতে পারে, আরও নীচে নামলে তো কথাই নেই! তা হলে সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হবে ওখান থেকে শুরু করে ওর নীচেকার সমস্ত পাথরই তরল— হয়তো আরও নীচে তা গ্যাসের আকারে রয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ ঐ সব পাথর এমন গাদাগাদি করে রয়েছে যে চারদিক্ থেকে তাদের ওপর পড়ছে প্রচণ্ড চাপ। ফলে সে চাপ ঠেলে তাদের তরল বা গ্যাস হবার উপায় নেই। বরঞ্চ মনে হয় না-তরল, না-কঠিন একটা কিম্ভূতকিমাকার রূপ নিয়ে তারা সেখানে জমে আছে—যে রূপের সঙ্গে আমাদের কোনও চাক্ষুষ পরিচয় নেই।

পৃথিবী ক্রমাগত ঠাণ্ডা হতে হতে তার ওপর দিক্‌টা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কিন্তু ভিতরটা এখনও ঠাণ্ডা হবার সুযোগ না পাওয়ায় ঐ রকম গরম রয়েছে—পণ্ডিতেরা এতদিন এ কথাই বলে আসছিলেন। এখন একদল পণ্ডিত বলছেন, পৃথিবী বা অন্য গ্রহগুলোর সৃষ্টি যে সূর্য থেকেই হয়েছে এমন না-ও হতে পারে। একদলের ধারণা, মহাকাশের ধুলো আর গ্যাসের অণুগুলো একত্র জমাট বেঁধে সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহগুলো প্রায় একই সঙ্গে তৈরি হয়েছিল। কাজেই পৃথিবী যে এক সময় জ্বলন্ত



১৯২৩ সালে জাপানের ইয়োকোহামার ভূমিকম্প: পথঘাট ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

ছিল এবং তার ভিতরটা এখনও তেমন ঠাণ্ডা হতে না পারার জন্যই যে সেটা আজও অমন গরম হয়ে রয়েছে—এ মতবাদেও তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তাঁদের অনুমান, যে জিনিস জমাট বেঁধে পৃথিবীর জন্ম হ'ল তার মধ্যে ছিল নানা তেজস্ক্রিয় পদার্থ। পৃথিবীর তলায় পাথরের ভাঁজে ভাঁজে এখনও সেগুলো ছড়িয়ে রয়েছে এবং তাদের ভিতর থেকে প্রতিনিয়ত তেজস্ক্রিয় রশ্মি বেরিয়ে আসছে। আর, তারই ফলে, পৃথিবীর ভিতরটা অমন গরম হয়ে আছে। পৃথিবীর ভিতরটা গরম থাকবার এটা যে একটা কারণ সে কথা সব পণ্ডিতই মোটামুটি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। সে যাই হোক, এটা ঠিক যে এই তাপের বেশির ভাগই পৃথিবীর ভিতরেই রয়ে গেছে—ঠেলে ডাঙ্গার দিকে উঠে আসছে না।

প্রবল চাপ আর গুঁতোগুঁতি

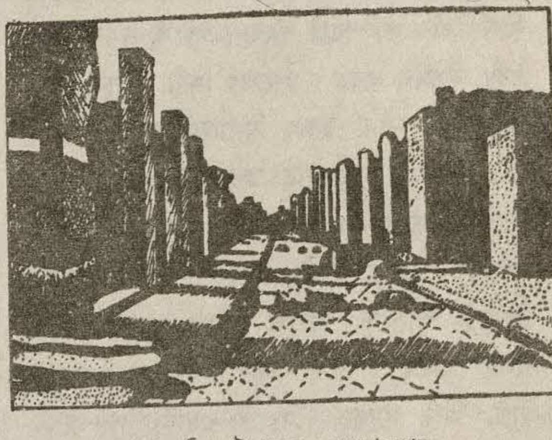
শুধু তাপই নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে প্রবল চাপও। পৃথিবীর ভিতরে, ঠিক মাঝখানে এই চাপ কতখানি? পণ্ডিতেরা হিসেব করে বলছেন, আমাদের মাথার ওপর বাতাসের যে চাপ তার ৪০ লক্ষ গুণ বেশি।

পৃথিবীর ভিতরকার এই প্রচণ্ড তাপ আর চাপের মধ্যে যে সেখানকার উপাদানগুলো নির্জীবের মত স্থির হয়ে আছে এ মনে করলে ভুল হবে। সেখানে ক্রমাগত চলছে ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি, ধাক্কাধাক্কি। পণ্ডিতেরা এর কয়েকটা কারণও বার করেছেন। যেমন ধর, প্রথমত, পৃথিবীর ওপরের দিক্‌টা যত ঠাণ্ডা হচ্ছে ততই সে শক্ত হয়ে ভিতরটাকে চেপে ধরছে। ভিতরটাও আবার তাপ ছেড়ে দিয়ে কুঁকড়ে ছোট হবার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর ভিতরে যে তাপ ছিল তা কিন্তু কমছে না, বরঞ্চ বাড়ছেই। কারণ, আগেই বলেছি, সেখানে রয়েছে নানা রকম তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যারা রশ্মি ছড়িয়ে ক্রমাগত নতুন নতুন তাপের সৃষ্টি করছে। ফলে সেই জায়গাটা ক্রমাগত ফুলে ফেঁপে উঠবার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ একই সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে পৃথিবীর ভিতরটা যেমন কুঁকড়ে ছোট হবার চেষ্টা করছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠবার চেষ্টারও ত্রুটী নেই তার। এই টানাপোড়েনে তার পক্ষে স্থির হয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

এ ছাড়া আরও একটা কারণের কথা বলছেন পণ্ডিতেরা। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি,—যাকে বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তার বাইরেটাকে ভিতরের দিকে টানছে, আবার পৃথিবী ঘুরছে বলে আর একটা শক্তি, যাকে বলা হয় কেন্দ্রাতিগ শক্তি বা সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স,—ভিতরটাকে বাইরের দিকে ছিটকে দেবার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ এখানেও দু'টি বিপরীত শক্তি কাজ করছে পৃথিবীর ওপর। বল তো, এমন অবস্থায় পৃথিবীর ভিতরটা টলমল করবে না তো কি করবে? যতক্ষণ পৃথিবী তা কোন রকমে সামলে নিতে পারবে ততক্ষণই বাঁচোয়া, আর না হলেই শুরু হবে তার ভিতর কাঁপুনি—যাকে আমরা বলি ভূমিকম্প।

ভূমিকম্প

ছোটবড় ভূমিকম্প আমরা অনেকবার দেখেছি, কিন্তু অনেক ভূমিকম্পই আমরা টের পাই না—কেবল সূক্ষ্ম যন্ত্রেই তা ধরা পড়ে। এ ভাবে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা প্রতি বছর



পম্পিয়াই শহরের ধ্বংসাবশেষ
দু' হাজার বছর পরে মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে।

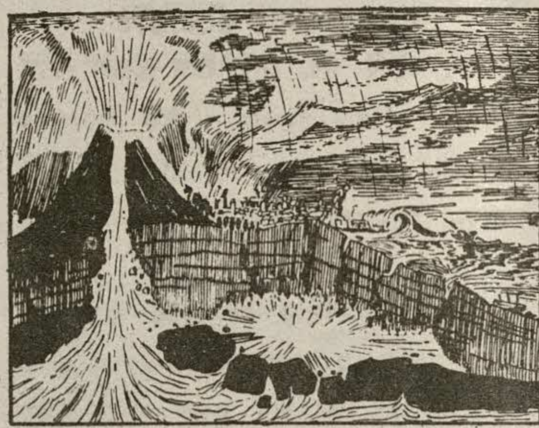
গোটা পৃথিবীতে কম করে ৯।১০ লক্ষ ভূমিকম্পের সন্ধান পান। তবে এর মধ্যে বড় দরের ভূমিকম্প হয় কালেভদ্রে। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে ১৯৩৪ সালে বিহারে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল—বহু

ঘরবাড়ি পড়ে গিয়েছিল, বহু লোক মারা গিয়েছিল, পথঘাট, মাঠ-ময়দান ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। এর কিছু পরেই বেলুচিস্তানেও ঐ রকম একটা বড় ভূমিকম্প হয়েছিল।

জাপানের একটা ভূমিকম্পের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। এই ভূমিকম্প টিকে ছিল মাত্র আধ মিনিট, কিন্তু তাতেই অর্ধেক টোকিও শহর আর গোটা ইয়োকোহামা বন্দরটি ধ্বংস হয়ে যায়। লোক মারা পড়ে এক লক্ষেরও ওপর। জায়গায় জায়গায় মাটি ফেটে দাউ দাউ করে বেরিয়ে আসে ভিতরকার আগুন। তার পরেও কত দেশে কত ভূমিকম্প হয়েছে।

ঐতিহাসিক যুগেও এ রকম বড় বড় ভূমিকম্প অনেকবার হয়েছে। তোমরা "লাস্ট্ ডেজ্ অব্ পম্পিয়াই" বইখানা অনেকে পড়ে থাকবে। ভিসুভিয়াস্ আগ্নেয়গিরির পাশেই ছিল এই পম্পিয়াই শহর—ঐশ্বর্যে, জাঁকজমকে সর্বদা ঝলমল করত। শহরে ধনী লোক ছিল প্রচুর আর নানা রকম বিলাসের মধ্যে তাদের দিন কাটত। তারপর হঠাৎ একদিন ভিসুভিয়াস্ থেকে গলগল্ করে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। তার পরই আগুন আর ছাই। গড়িয়ে আসতে লাগল জ্বলন্ত লাভা অর্থাৎ গলা পাথর। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে লাগল মাটি আর দেখতে দেখতে গোটা পম্পিয়াই শহরকে শহর সেই গলা পাথর আর ছাইয়ের নীচে চাপা পড়ে গেল। শুধু পম্পিয়াই-ই নয়, হারকিউলেনিয়াম শহরও ঠিক এইভাবে চাপা পড়ে গেল ছাইয়ের নীচে।

এ প্রায় ২০০০ বছর আগের কথা। ১৯০০ বছর পরে সেই ছাই সরিয়ে, লাভার আস্তর



পাতালপুরী থেকে সুড়ঙ্গ-পথে ঠেলে উঠছে জ্বলন্ত গ্যাস আর গলন্ত লাভা। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প—জলেস্থলে।

চেঁছে প্রথমে পম্পিয়াই এবং তার পর হারকিউলেনিয়াম—দু'টি শহরই খুঁড়ে বার করা হয়েছে। ঠিক ২০০০ বছর আগে যে অবস্থায় পম্পিয়াই শহরটি চাপা পড়ে যায় ঠিক সেই অবস্থায়ই আস্ত শহরটি যেন বেরিয়ে পড়েছে মাটির তলা থেকে। দেখলে সত্যি অবাক্ লাগে। হারকিউলেনিয়ামকেও প্রায় সেই ভাবেই পাওয়া গেছে।

ক্রাকাটোয়ার ভূমিকম্প

কিন্তু এর চেয়েও বড় ভূমিকম্প বোধ হয় ক্রাকাটোয়ার ভূমিকম্প—যেটা হয়েছিল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। ঐতিহাসিক যুগে এত বড় ভূমিকম্পের কথা বড় একটা শোনা যায় না।

ক্রাকাটোয়া হচ্ছে জাভার পাশে ছোট্ট একটা দ্বীপ, এখন এই জায়গাটাকে বলে ইন্দোনেশিয়া। এই দ্বীপে ছিল একটা আগ্নেয়গিরি। হঠাৎ একদিন সেটা গর্জে উঠল। ঝলকে ঝলকে আগুন, ধোঁয়া আর ছাই বেরুতে লাগল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে। এত ভয়ঙ্কর ছিল সেই

বিস্ফোরণ যে তার ধোঁয়া, ধুলো আর ছাই মাথার ওপর ২৫।৩০ মাইল উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। আকাশে উঠে সেই ছাই আর ধুলো ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর চারদিকে। সে ধুলো সরে যেতে লেগেছিল বেশ কয়েকটা বছর—যার ফলে ঐ সময়টা পৃথিবীর নানা জায়গায় সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় আকাশ অস্বাভাবিক রকম লাল হয়ে থাকত।

শুধু কি ওই? বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ তিন হাজার মাইল দূরে অস্ট্রেলিয়ার লোকেরাও শুনতে পেয়েছিল। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল ভূমিকম্প—শুধু ডাঙ্গায় নয়, সমুদ্রের জলেও। সমুদ্রের জলে বান ডাকল। সেই বানে ভেসে গেল আশ-পাশের যত দ্বীপ—একেবারে ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জ পর্যন্ত। পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে সমুদ্রের ঢেউ ঢুকে পড়ল দ্বীপে। হাজার হাজার লোক তাতে ডুবে ভেসে গেল। সমুদ্রে যে জাহাজ চলছিল তার কোন কোনটা মাইল খানেক ছিটকে এসে পড়ল ডাঙ্গায়। দ্বীপের অর্ধেকটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল এদিক্ ওদিক্। তার একটা টুকরো ছিল এক মাইল লম্বা, এক মাইল চওড়া, আর পুরুও প্রায় ঐ রকম।

আদিম যুগের ভূমিকম্প

এ তো গেল ঐতিহাসিক যুগের ভূমিকম্প। ভূবিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর আদিম যুগে যে সব বিরাট বিরাট ভূমিকম্প হয়ে গেছে তাদের সঙ্গে এগুলোর তুলনাই হয় না।

তখন পৃথিবীর ভিতরটা ছিল একেবারেই অশান্ত। ঝড়ঝাপ্টা, ভূমিকম্প ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। একবার শুরু হলে সহজে থামতে চাইত না। বছরের পর বছর—সময় সময় হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলত তার জের। এমনি এক একটা ভূমিকম্পের ফলেই নাকি পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে গড়ে উঠেছে এক একটা নতুন মহাদেশ।

জার্মান পণ্ডিত হ্বেগনারের মতে এই যে একদিকে ইয়োরোপ আর আফ্রিকা আর অন্য দিকে উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকা, আর তার মাঝখানে বিরাট আটলান্টিক মহাসাগর, এও পৃথিবীর শৈশবে এক বিরাট ভূমিকম্পের ফল। আগে ওর সমস্তটাই ছিল যোড়া, অর্থাৎ দক্ষিণ আর উত্তর আমেরিকা থেকে শুরু করে ইংল্যাণ্ড সমেত গোটা ইয়োরোপ আর তলাকার আফ্রিকা মহাদেশ সমস্তটাই জড়িয়ে ছিল এক বিরাট ভূখণ্ড। তারপর একদিন এক বিরাট ভূমিকম্পে পৃথিবী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল—ছু'টি আমেরিকা তারই পাল্লায় পড়ে ভেঙ্গে, ছিটকে ভেসে চলে গেল হাজার হাজার মাইল দূরে, আর ছু'-এর মাঝখানে দেখা দিল এক বিরাট মহাসাগর—যাকে আমরা এখন বলি আট-লান্টিক। এ রকম ঘটনাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে মহীসঞ্চরণ বা কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট্। কতদিন ধরে এই ভূমিকম্প চলেছিল সে কথা কেউ জানে না। তার ভয়াবহতা সম্বন্ধেও কারো কোনও ধারণা নেই। তবে এই ঘটনা, যা নাকি হ্বেগনার সাহেব খুব জোর দিয়ে বলেছেন এবং অনেক বিজ্ঞানী যাকে সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন, তা যদি সত্যিই ঘটে থাকে তা হলে তার সঙ্গে তুলনা করব কিসের?

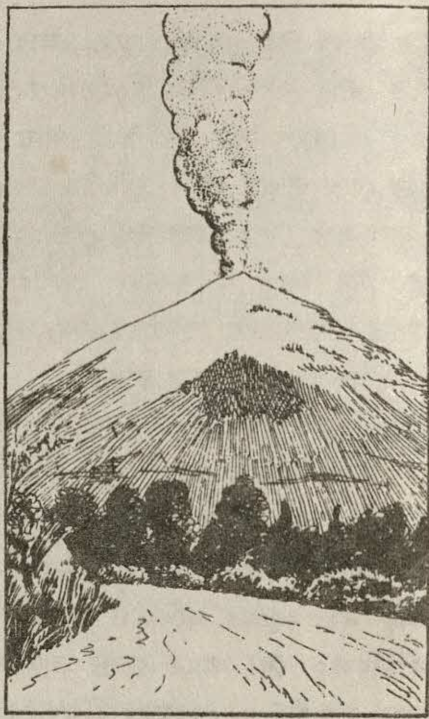
হ্বেগনারের কথার প্রমাণ হিসেবে তিনি একটা চমৎকার নজিরের উল্লেখ করেছেন।

পৃথিবীর ম্যাপটা ভালো করে খুলে দেখ আর লক্ষ কর এদিকে ইয়োরোপ ও আফ্রিকার আর ওদিকে উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল রেখা। মনে হবে যদি গোটা উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকাকে জলে ভাসিয়ে ঠেলতে ঠেলতে এদিকে নিয়ে আসা যায় তা হলে তা এদিক্‌কার ভূখণ্ডের গায়ে খাঁজে খাঁজে বসে যাবে। অর্থাৎ একটা জিনিসই যে ছিঁড়ে দু'টো হয়েছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকবে না।

আটলান্টিক মহাসাগরের নামকরণের মধ্যেও যেন এই মতবাদের একটু মিল আছে। প্রবাদ, অতি প্রাচীন কালে ওখানে কোন সাগর ছিল না—ছিল একটা বিরাট রাজ্য বা মহাদেশ আর তার নাম ছিল আটলান্টিস। ক্রমে এই মহাদেশ ধীরে ধীরে নীচে বসে যেতে থাকে এবং সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যায়। সেই জন্য মহাসাগরটার নামও ঐ মহাদেশের নাম অনুযায়ী হয়েছে আটলান্টিক।

ঠিক এই রকম একটা বিরাট ভূমিকম্প নাকি ঘটেছিল আমাদেরই দেশের দক্ষিণ দিক্‌ ঘেঁষে। তবে সুখের বিষয় তাতেও কোন লোক-ক্ষয় হয় নি, কারণ পৃথিবীতে তখন একটি মানুষও আসে নি। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ৪ কোটি থেকে ৫ কোটি বছর আগে এই ভূমিকম্পটা হয়েছিল।

সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ ভারত, দক্ষিণ এশিয়া আর দক্ষিণ আমেরিকার নীচের অংশ যুড়ে ছিল এক মহাদেশ—যার নাম দেওয়া হয়েছে গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ড। এখন রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যে কয়লার খনি দেখা যায় সেই সব কয়লা তখনও কয়লা হয়



মেক্সিকোর পপুকাটিপেটেল পাহাড় থেকে গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

নি—তারা ছিল এই গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ডেরই গহন অরণ্যের একটি অংশ। ঐ সব কয়লার মধ্যে যে সব প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে তারা ছিল সে যুগের অধিবাসী। দশ হাজার মাইল লম্বা এই গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ড ঐ ভূমিকম্পে খান্‌ খান্‌ হয়ে ভেঙ্গে নানা ভাগে ভাগ হয়ে গেল। কতক গেল ভেসে, কতক তলিয়ে। ভারত মহা-সাগরের জল এসে তার খানিকটা যুড়ে বসল।

আমাদের হিমালয় পাহাড় আজ যেখানে মাথা উঁচু করে কবি কালিদাসের ভাষায় "স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ" অর্থাৎ মানদণ্ডের মতই যেন পৃথিবীকে মাপবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে—সেখানে যে এক সময়ে পাহাড় দূরে থাক, ডাঙ্গাও ছিল না,—টলটল করত সমুদ্রের জল,

সে কথাও হয়তো অনেকে শুনেছ। কি ক'রে ওখানে অত বড় একটা পাহাড় গজিয়ে উঠল তার গোড়া খুঁজলেও দেখা যাবে ঐ ভূমিকম্প।

ভূমিকম্পের কথা বলতে গেলে আরও কয়েকটি জিনিসের কথা স্বতঃই মনে আসে যাদের সঙ্গে ওর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

আগুনে পাহাড় বা আগ্নেয়গিরি

প্রথমেই ধর আগুনে পাহাড় বা আগ্নেয়-গিরির কথা। পম্পিয়াই আর হারকিউলেনিয়াম্ ধ্বংসের সময় ভিসুভিয়াসের অগ্নি-উদ্‌গীরণ এবং ক্রাকাটোয়ার ভূমিকম্পের সময় সেখানকার আগ্নেয়গিরির ফুঁসে ওঠার কথা আগেই বলেছি। পাহাড় হলেও আগুনে পাহাড়ের চেহারা অন্য সব পাহাড় থেকে আলাদা। সাধারণত চূড়োটা ছুঁচলো হলেও সেখানে থাকে একটা বিরাট গর্ত—যাকে বলা হয় জ্বালামুখ বা ক্রেটার। পাহাড়ের গা-টা চারদিকে প্রায় সমান ঢালু হয়ে নেমে যায়। জ্বালামুখ থেকে একটা লম্বা সুড়ঙ্গ চলে যায় পৃথিবীর ভিতরে পাতালপুরীর দিকে। এই পথ দিয়ে জ্বলন্ত গ্যাস, লাভা, কাদা, ছাই, জমাট পাথরের টুকরো জ্বালামুখ বা ক্রেটারের মুখে চলে আসে, তার পর ছিটকে বেরিয়ে যায়। এ যেন কারখানার গায়ে একটা চিমনি!

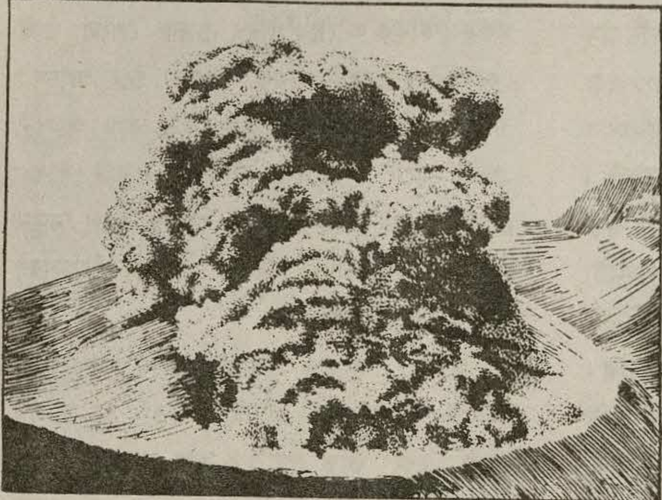
লাভা বলতে বোঝায় গলা পাথর। এর উত্তাপ ২২০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের কম নয়। মাটির নীচে প্রচণ্ড চাপের ফলে এই লাভার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস মিশে থাকে। সে অবস্থায় তাকে বলা হয় ম্যাগ্‌মা। এই গ্যাসের চাপই ম্যাগ্‌মাকে ঠেলে উঠতে সাহায্য করে। ম্যাগ্‌মা যদি কোন রকমে ওপরের চাপ এড়িয়ে ঠেলে উঠবার পথ করে নিতে পারে তা হলে ওপরে উঠে এলেই তার ভিতরকার গ্যাসগুলো ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে যায়। তখন শুধু থাকে তরল পাথর—যাকে বলা হয় লাভা। ওপরে উঠবার সময় তার প্রচণ্ড তাপে আশপাশের পাথরগুলোও গলে গিয়ে ম্যাগ্‌মার কলেবর বাড়িয়ে দেয়। কোথাও জল জমে থাকলে সে জলও বাষ্প হয়ে তার সঙ্গী হয়। তারপর ঐ রকম কোনও আগ্নেয়গিরির সুড়ঙ্গ পেলে তাই বেয়ে ঐ ম্যাগ্‌মা আরও ওপরে উঠে আসে। ওপরের দিকে উঠতে উঠতে কিন্তু তার তাপটা একটু কমে যায়, তার খানিকটা জমাট বেঁধেও যেতে পারে। কিন্তু সেই বাধার ফলে নতুন করে যে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয় তাইতেই বিস্ফোরণ ঘটে আগ্নেয়গিরিতে।

লাভা আবার সাধারণত দু'রকমের। বেসল্ট পাথর গলে যে লাভা তৈরি হয় তা খুব তরল এবং তার স্রোতও খুব প্রবল। কিন্তু গ্র্যানাইট জাতের পাথর গলে গিয়ে যে লাভা তৈরি হয় তা অত তরল নয়, তার স্রোতও অত তীব্র নয়। ক্রেটারের মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ার সময়ে এই জাতীয় লাভা বেশি দূর নামতে পারে না, তার আগেই জমে যেতে থাকে এবং তারই ফলে আগ্নেয়গিরির চেহারাটা ঐ রকম শঙ্কুর মত (ইংরেজীতে যাকে বলে কনিক্যাল্) হয়ে দাঁড়ায়। ক্রেটার কতটা উঁচু তাই দেখেই বলে দেওয়া যায় বেরুবার সময় তার লাভা কতটা ঠেলে উঠেছিল।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় জ্বলন্ত লাভা ছাড়াও কাদা, ছাই, জমাট পাথর এবং

নানা রকম গ্যাস বেরুতে থাকে। এই গ্যাসের মধ্যে জলীয় বাষ্প তো থাকেই, তা ছাড়া গন্ধক, অঙ্গার, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, ফ্লুওরিন প্রভৃতি নানা রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হরেক রকম যৌগিক পদার্থও থাকে।

আগ্নেয়গিরিগুলির মধ্যে অ্যাণ্ডেজ পর্বত হচ্ছে ২০ হাজার ফুট উঁচু। তার অর্থ, ওর লাভা এক সময়ে ২০ হাজার ফুট ওপরে ঠেলে উঠেছিল। ভিসুভিয়াস ১১ হাজার ফুট উঁচু। ও থেকে এখনও মাঝে মাঝে ধোঁয়া বেরোয়। আজকাল এর ক্রেটারের ভিতর দিয়ে নীচে খানিকটা নামবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে— পর্যটকদের আকৃষ্ট করবার জন্য। সেখানে নামলে দেখা যায় তলায় লাভা টগ্‌বগ্ করে ফুটছে।



ভিসুভিয়াস থেকে এখনও মাঝে মাঝে ধোঁয়া বেরোয়।

বড় বড় আগুনে পাহাড় আরও কিছু কিছু আছে, কিন্তু হাওয়াই দ্বীপের কিলাউইয়া পাহাড়টির বোধ হয় তুলনা নেই। এর ক্রেটার অর্থাৎ জ্বালামুখটা চওড়ায় তিন মাইল।

ম্যাগ্‌মা যে সব সময়েই পাহাড়ের চেহারা তৈরি করে বেরিয়ে আসবে এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় ফাটলের ভিতর দিয়েও বেরিয়ে আসতে পারে। এগুলিকে ইংরেজিতে বলা হয় ফিশার ইরাপ্‌শন্—ফাটল দিয়ে উদ্‌গীরণ। আবার সময় সময় লাভাও বোরোয় না, শুধু কাদা বা গরম জলও বেরোতে পারে। ইন্দোনেশিয়ায় এমন কাদা-বেরুনো ফাটল এবং পাহাড় দুই-ই আছে অনেক। আলাস্কায় একটা উপত্যকা আছে যেখানে শত শত ফাটলের ভিতর দিয়ে প্রবল চাপে অতি-গরম জলীয় বাষ্প-মেশানো গ্যাস সর্বক্ষণ বেরিয়ে আসছে। এত গরম যে তার মধ্যে এক টুকরো কাঠ ফেলে দিলে তা জ্বলে উঠবে। জাপানের বিখ্যাত ফুজিয়ামা পাহাড়ও এক সময়ে আগ্নেয়গিরি ছিল, এখন নাকি তার মধ্যে জল ছাড়া আর কিছু নেই। সেই জল ছিটকে ওপরে উঠে ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে আছে।

আগ্নেয়গিরি কোথায় সবচেয়ে বেশি? পৃথিবীর যে সব জায়গা এখনও তেমন শক্ত হয় নি সেখানেই এদের উপদ্রব। প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে একটা রেখা টানলে দেখা যাবে পৃথিবীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ আগুনে পাহাড়ই এই অঞ্চলে রয়েছে। ইংরেজিতে তাই একে বলে সিজ্‌মেটিক্ বেল্ট্ (ভূকম্পনের বন্ধনী)। অ্যাণ্ডেজ থেকে শুরু



নকল জ্বালামুখ : আরিজোনা অঞ্চলের এক পাহাড়ের মাথায় এই অতিকায় গর্তটিকেও অনেকে জ্বালামুখ মনে করতেন। এটির সৃষ্টি কিন্তু উল্কাপাতের ফলে।

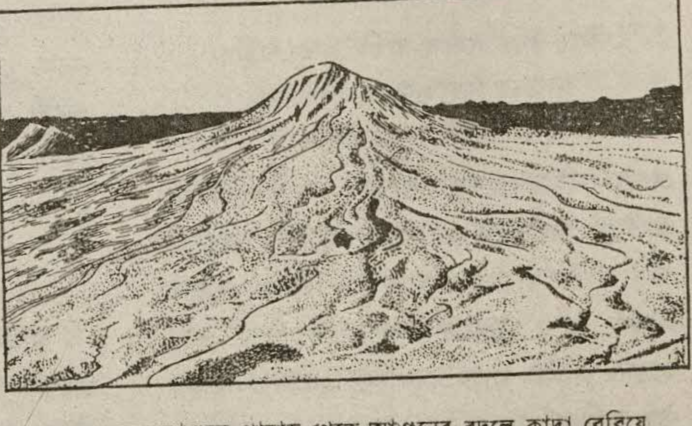
করে জাপান এবং ইস্ট ইণ্ডিজের যত আগুনে পাহাড় সব এই বন্ধনী বা বেল্টের মধ্যে পড়ে। আমাদের হিমালয়ের দক্ষিণ দিক্‌টারও নাম করা যেতে পারে এই সম্পর্কে। তবে প্রশান্ত মহাসাগরের মত অত বেশি নয়।

ভূমিকম্পের আর একটা কারণ

ভূমিকম্পের আর একটা কারণ ডাঙ্গার টাল সামলানো। ব্যাপারটা কি রকম জান? জলে বরফ ভাসালে দেখবে বরফটা সঙ্গে সঙ্গেই স্থির হয়ে থাকে না, খানিকটা গলে গিয়ে বরফের চাঁইটা একটু নড়ে-চড়ে টাল সামলে নিয়ে তবেই স্থির হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর অনেক জায়গায় ডাঙ্গারও এখন অনেকটা সেই অবস্থা। তাদের তলাগুলো এখনও তেমন শক্ত হয় নি, ডাঙ্গাগুলো যেন সেই থলথলে জমিনের ওপর ভাসছে। মাঝে মাঝে টাল সামলানোর জন্য বরফের চাঁইয়ের মতই তাদেরকেও তাই একটু নড়েচড়ে ভারসাম্য রাখতে হয় আর ঐ নড়া-চড়া হলেই হয় ভূমিকম্প। হিমালয়ের দক্ষিণ দিক্‌টাও কতকটা ঐ রকম। ১৯৩৪ সালের বিহারের ভূমিকম্পের কারণও নাকি এই।

মেক্সিকোয় একটি আশ্চর্য ঘটনা

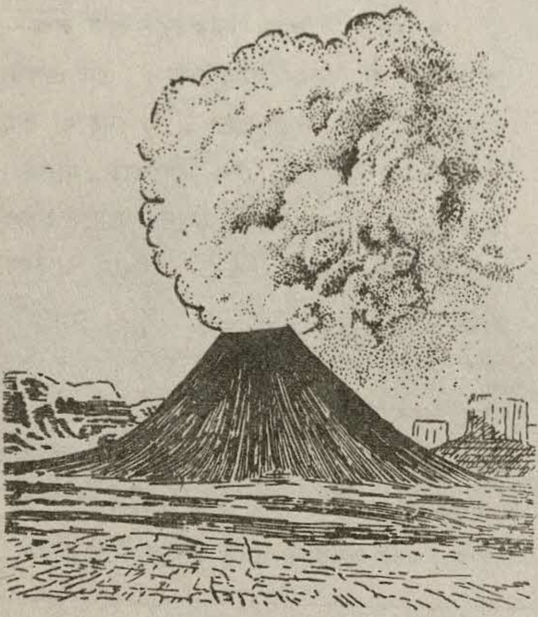
এক একটা পাহাড় তৈরি হতে লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি বছর লেগে যায়। এক একটা আগুনে পাহাড় তৈরি হতেও যে নেহাৎ কম সময় লাগে না তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু একেবারে মানুষের চোখের সামনে হঠাৎ কয়েকদিনের মধ্যে একটা আগুনে পাহাড় গজিয়ে উঠল এ কথা কি বিশ্বাস করবে? কিন্তু সত্যি, এমন কাণ্ডও ঘটেছে। মেক্সিকো শহর থেকে ২০০ মাইল দূরে পারিকুটিন বলে একটা জায়গা আছে। ১৯৪৩ সালে হঠাৎ ওখানে কয়েকদিন পর পর ভূমিকম্প হতে লাগল। তার পরই একদিন এক চাষী তার জমি



অনেক সময় আগুনে পাহাড় থেকে আগুনের বদলে কাদা বেরিয়ে আসে। এটি ব্রহ্মদেশের সেই রকম একটি পাহাড়।

চষতে গিয়ে দেখে জমি ফেটে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী এঁকেবেঁকে আকাশে উঠে যাচ্ছে। আর, ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই, দেখা গেল সেই চাষের জমির ওপর একদিনেই একটা তিনকোণা পাথুরে টিলা তৈরি হয়ে গেছে—১২০ ফুট উঁচু।

তার পরই শুরু হ'ল সেই টিলার ভিতর থেকে লাভা, ধুলো আর পাথর উদ্গীরণ।



পাহাড় ফুঁড়ে বেরুচ্ছে আগুন, লাভা গড়িয়ে পাহাড়ের আকৃতি হয়েছে তিনকোণা, নীচেও জমাট লাভার ময়দান।

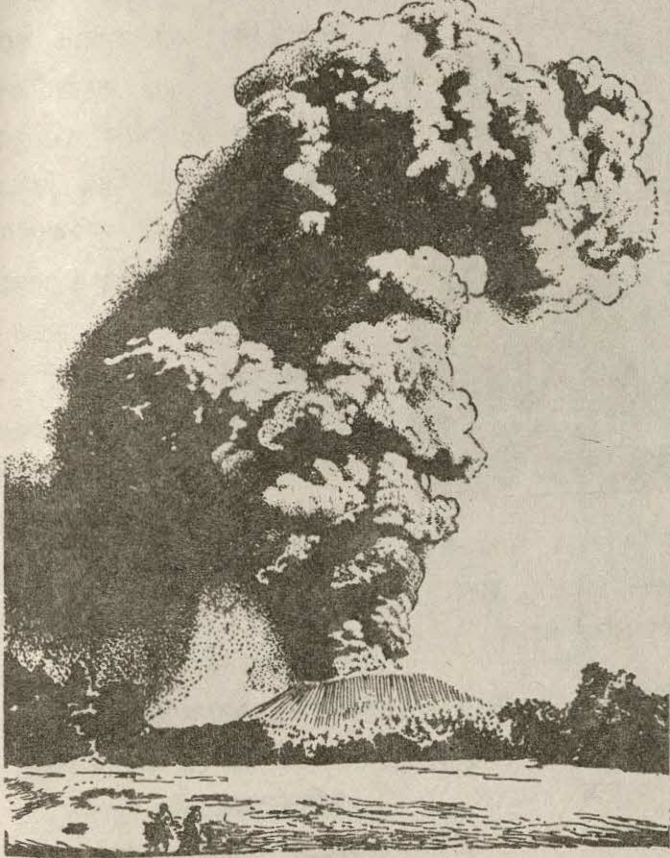
প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে জ্বলন্ত লাভা আর পাথরের টুকরো প্রায় মাইল খানেক উঁচুতে উঠে ছিটকে পড়তে লাগল, আর দেখতে দেখতে সে লাভা জমে মাত্র ৬ দিনের মধ্যে সেখানে একটা ৫০০ ফুট উঁচু আগ্নেয়গিরি গজিয়ে উঠল। আশপাশের বনজঙ্গল সেই জ্বলন্ত লাভার নীচে চাপা পড়ে গেল,—ধ্বংস হয়ে গেল গোটা পারিকুটিন আর তার আশপাশের যত গ্রাম। এক বছর পরে পাহাড়টা হ'ল ১৪০০ ফুট উঁচু। তার পর সেটা আরও বাড়তে লাগল উঁচু দিকে। ১৯৫১ সালে তার উচ্চতা হ'ল ২১২০ ফুট। তখন সে একটি বিরাট পাহাড়—পারিকুটিন আগ্নেয়-গিরি। তার লাভাস্রোত কিন্তু তখনও সমানে বয়ে চলেছে। এই ভাবে ন'বছর ক্রমান্বয়ে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়ে পারিকুটিন শেষে শান্ত হয়েছে। তার লাভা উদ্গীরণ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এ যুগের পরম বিস্ময় রূপে আজও সে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেক্সিকোর প্রান্তরে।

আগ্নেয়গিরির মাথায় জল : ক্যালডেরা

আগ্নেয়গিরির মাথায় আগুনই থাকে তোমরা জান, কিন্তু কখনও কখনও এমনও দেখা গেছে যে ছুঁচলো মাথাটা ভেঙ্গে গিয়ে ক্রেটারের মুখটা খুব চওড়া হয়ে গেছে। তিন মাইল চওড়া হাওয়াই দ্বীপের সেই আগ্নেয়গিরির ক্রেটারের কথা তো আগেই বলেছি। এগুলোকে বলে ক্যালডেরা। দশ মাইল চওড়া ক্যালডেরার কথাও শোনা গেছে। আমেরিকায় আজামা নামে যে আগ্নেয়গিরি, সেখানে এই রকম একটা ক্যালডেরার মধ্যে জল জমে একটা বিরাট গভীর হ্রদ হয়ে আছে। আগ্নেয়গিরির মাথায় এ রকম হ্রদের সন্ধান আরও পাওয়া গেছে।

ফল্ট্ বা চ্যুতি

ভূমিকম্পের আর একটি কারণ হচ্ছে ফল্ট্। কথাটা ইংরেজি, তবে ওর একটা বাংলা পরিভাষাও আছে—চ্যুতি। কেউ কেউ বলেন স্রংস। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই : পৃথিবীর



একটি আগুনে পাহাড়ের জন্ম
মেক্সিকোর পারিকুটিনে হঠাৎ এই পাহাড়টি মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠে।
(১৯৪৩, এপ্রিল মাসে পাহাড়ের জন্মের দু' সপ্তাহ পরের দৃশ্য)

ওপর জমে রয়েছে নানা রকম পাথর আর তার ওপর নিয়তই নানা ধরনের চাপ পড়ছে। শুধু ওপর থেকে নয়,—নীচ থেকে, পাশ থেকে—সব দিক্ থেকেই। এর ফলে বিভিন্ন পাথরের স্তর অনেক সময় একটা আর একটার গা ঘেঁষে উল্টো দিকে নড়াচড়া শুরু করে দেয়। তারপর চাপ যখন খুব বেশি হয়ে পড়ে তখন আর সামলাতে না পেরে একটা লাইন ধরে ভেঙ্গে যায়। একেই বলে ফল্ট্ বা চ্যুতি বা স্রংস। এটা যখন ঘটতে থাকে তখন যে মাটিও কাঁপতে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? বিজ্ঞানীরা শিলাস্তরগুলোকে একটা স্প্রিংএর সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্প্রিং যদি হঠাৎ ভেঙ্গে যায় তা হলে অনেকক্ষণ ধরে থর থর করে কাঁপে। এও সেই রকম আর কি!

এই রকম একটা ফল্ট্ বা চ্যুতি বছর পঞ্চাশেক আগে দেখা দিয়েছিল কচ্ছের রান অঞ্চলে। কিছুর মধ্যে কিছু না, হঠাৎ এক দিকের পাথর ২০ ফুট খাড়া উঠে গেল, আর তার পাশের পাথরগুলি নেমে গেল ১০ ফুট নীচুতে। অর্থাৎ যেখানটা ছিল প্রায় সমতল সেখানটায় হঠাৎ ৩০ ফুট উঁচু খাড়া পাহাড়ের মত হয়ে গেল। এই ব্যাপার ঘটবার সময় মাটি কি রকম কেঁপেছিল আন্দাজ করা হয়তো কঠিন নয়।

অনেক সময় এই ফল্ট্ বা চ্যুতি ওপরে নীচে না হয়ে কোণাকুণি বা পাশাপাশি ভাবেও ঘটতে পারে। এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল অল্প কয়েক বছর আগে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো শহরের পাশে। ব্যাপারটা বেশ মজার। বহুদিন ধরেই সেখানে পাথরের মধ্যে একটা ফাটল তৈরি হয়ে ছিল, সেই ফাটলের ওপর সাঁকো বেঁধে রাস্তাও তৈরি হয়েছিল একটা। হঠাৎ একদিন সেখানে হ'ল প্রচণ্ড ভূমিকম্প। কাঁপুনি থামলে লোকেরা এসে দেখে, অবাক্



ওরগনের একটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় ক্যালডেরা: আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ একটি হ্রদে পরিণত হয়েছে। হ্রদের মাঝখান থেকে উইজার্ড দ্বীপের মাথা বেরিয়ে পড়েছে।

কাণ্ড! রেলিং সমেত ফাটলের ওপরকার সাঁকোটা একেবারে পিছলে ১৫ ফুট সরে এসেছে। পশ্চিম দিকের মাটি সরে এসেছে উত্তর দিকে, পূবের মাটি সরে এসেছে দক্ষিণ দিকে। সাঁকোটা মাঝখানে চিরে গেছে বটে, কিন্তু পিছলে সরে আসা ছাড়া আর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি তার। এটাকে পাথরের পাশাপাশি চ্যুতি বলা যেতে পারে।

সমুদ্রের তলায় ভূমিকম্প

ডাঙ্গায় যেমন ভূমিকম্প হয়, সমুদ্রেও তেমনি হয়, বরঞ্চ আরও বেশি হয়। কারণ পৃথিবীতে সমুদ্রের ভাগটাই তো বেশি। এই সব ভূমিকম্প সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না; কিন্তু সে ভূমিকম্প যদি উপকূলের কাছাকাছি হয় তবে অনেক অঘটন ঘটাতে পারে। সমুদ্রের জল হঠাৎ ডাঙ্গা থেকে সরে যেতে আরম্ভ করে, তারপর পর্বতপ্রমাণ উঁচু হয়ে ফিরে এসে আঘাত করে বেলাভূমিকে। সে সময়ে এক একটা ঢেউ ৫০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। ক্রাকাটোয়ার ভূমিকম্পের সময়ে এই রকম কাণ্ডই হয়েছিল, জাপানের ভূমিকম্পেও হয়েছিল। শ' দুই বছর আগে পর্তুগালের লিস্‌বন্‌ শহরও এই রকম এক সামুদ্রিক ভূমিকম্পের খপ্পরে পড়েছিল। প্রচুর লোক মারা গিয়েছিল তাতে। কম করে ৬০ হাজার। সমুদ্রের জল প্রচণ্ড বেগে উঁচু হয়ে এসে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গোটা বন্দরকে বন্দর। এ রকম সামুদ্রিক ভূমিকম্পকে বলা হয় ৎসুনামি।

ভূমিকম্পের ঢেউ

ভূমিকম্প সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন এবং এজন্য যন্ত্রপাতিও

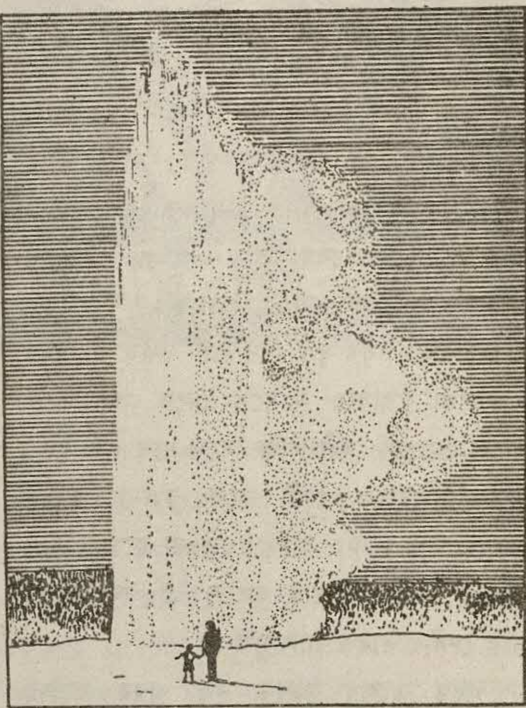


সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো শহরের পাশে ফল্ট্ বা চ্যুতির ফলে একটা সাঁকো পিছলে ১৫ ফুট সরে এসেছে।

তৈরি করেছেন নানা রকম। জানা গেছে যে ভূমিকম্পের ঢেউ বা তরঙ্গ হচ্ছে দু'জাতের। একটা চলে লম্বালম্বি ভাবে—যেমন করে বাতাসে শব্দের ঢেউ ওঠে, অনেকটা সেই রকম। এই ঢেউ কঠিন কিংবা তরল যে কোন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে ছুটতে পারে এবং বেশ জোরেই ছোটে—সেকেণ্ডে ৫ থেকে ৮ মাইল বা তারও কিছু বেশি। এদের বলা হয় প্রাথমিক তরঙ্গ বা প্রাইমারী ওয়েভ, সংক্ষেপে পি ওয়েভ। আর এক রকম ভূমিকম্পের ঢেউ আছে যা চলবার সময় ওপর নীচে বা আড়াআড়ি কাঁপতে কাঁপতে চলে। এদের গতিবেগ প্রথমটির তুলনায় কম—সেকেণ্ডে তিন থেকে চার মাইল বা আর একটু বেশি। তা ছাড়া এরা শুধু কঠিন পদার্থের মধ্যে দিয়েই ছুটতে পারে। এদের বলা হয় মাধ্যমিক তরঙ্গ বা সেকেণ্ডারী ওয়েভ, সংক্ষেপে এস্. ওয়েভ। সিস্মোগ্রাফ যন্ত্রে এই সব ঢেউ ধরা পড়ে আর তাই দেখেই বিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।

গরম জলের ঝরণা আর ফোয়ারা

মাটির ফাটলের ভিতর দিয়ে জল ঢুকে অনেকটা গভীরে গিয়ে যদি কোন গরম পাথরের স্তরে এসে পড়ে তা হলে সে জলও গরম হয়ে যায় এবং তাতে সেখানকার নানা খনিজ পদার্থ গুলে যেতে পারে। তারপর সেই জল যদি কোন রকমে ওপরে উঠে আসবার পথ করে নিতে পারে তা হলেই গরম জলের ঝরণার সৃষ্টি হবে। ভালো বাংলায় আমরা একে বলি উষ্ণপ্রস্রবণ। আমাদের দেশে বক্রেশ্বর, রাজগির, মুঙ্গের প্রভৃতি জায়গায় এ রকম গরম জলের ঝরণা



ইয়োলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে ওল্ড ফেথফুল গাইজার থেকে জল ছিটকে বেরুচ্ছে ১৭০ ফুট উঁচু হয়ে।

আছে। ওর মধ্যে নানা খনিজ পদার্থ মিশে থাকায় নানা রকম অসুখের দাওয়াই হিসেবেও ওগুলোর খ্যাতি আছে। যেমন রাজগিরের জল বাতের ওষুধ। কখনও কখনও এই ঝরণার জল এত গরম হয় যে তার মধ্যে পোঁটলা বেঁধে চাল ফেলে দিলে তা সিদ্ধ হয়ে আপনিই ভাত হয়ে যেতে পারে। আবার অনেক সময় গরম জলের বদলে পাহাড়ের ফাটল দিয়ে আগুনের শিখাও বেরুতে দেখা যায়,—যেমন আছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে, হরিদ্বারের কাছে জ্বালামুখীতে। সীতাকুণ্ডের এই আগুন পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেগুলো আসলে জ্বলন্ত কোল্ গ্যাস এবং গন্ধক ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সাধারণ লোকে তো অত-শত বোঝে না, তারা এই আশ্চর্য পাতাল-

থেকে-ওঠা আগুন দেখে সেটাকে কোন দৈব ব্যাপার ভেবে নেয় আর সম্ভ্রমে মাথা নত করে।

জ্বালামুখীর ব্যাপারটাও বিজ্ঞানীদের মতে ঐ রকম ধরনেরই একটি ব্যাপার। মাটির নীচে থেকে কোন দাহ্য গ্যাস ক্রমাগত ওপরে উঠে আসছে আর সেখানকার প্রচণ্ড উত্তাপে অবিরাম দপ্ দপ্ করে জ্বলছে! পাহাড়ের ফাটল দিয়ে যুগ যুগ ধরে এই রকম রহস্যময় অগ্নিশিখা বেরিয়ে আসতে দেখে স্বভাবতই তাকে আশ্চর্য দৈবী শক্তি বলে মনে করা হয়। ঐ অগ্নিশিখাকে দেবী রূপে কল্পনা করেই ওখানে তাঁর মন্দির বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ মন্দিরে দেবীর বিগ্রহ বলতে ঐ অগ্নিশিখা, আর দেবীর নামও জ্বালামুখী।

গরম জলের ঝরণার মত গরম জলের ফোয়ারাও প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল। এই ফোয়ারাগুলোকে বলে গাইজার (বা গিজার)। গাইজারগুলো সাধারণত লম্বা সুড়ঙ্গ দিয়ে কোন গরম পাথরের স্তরের সঙ্গে যোড়া থাকে। যখন ঐ গরম পাথরের স্তরে কোন জায়গা থেকে জল এসে জমে তখন তা বাষ্প হয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে ওপরের জলের ওপর প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকে—যার ফলে সে জল বাষ্পের সঙ্গে ফিনকি দিয়ে ফোয়ারার মত আকাশে উঠে যায়। খানিকটা জল বেরিয়ে গেলে সুড়ঙ্গটা খানিকক্ষণের জন্য খালি হয়ে যায়, তখন ফোয়ারাও বন্ধ থাকে। খানিক পরে আবার কিছু জল আর বাষ্প জমলে সে জল আবার ফিনকি দিয়ে বেরুতে থাকে।

আইস্ল্যাণ্ডে এই ধরনের গাইজার প্রচুর দেখা যায়, নিউজীল্যাণ্ডেও আছে। কিন্তু গাইজারের খেলা দেখতে হলে আসতে হবে আমেরিকার ইয়োলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে। এখানে হরেক রকম গাইজার চোখে পড়বে। কোনওটা থেকে বেরুচ্ছে কাকচক্ষু জল, কোনওটা থেকে কাদা-গোলা জল, আবার কোনওটা থেকে রঙিন জল। সে রংও আবার থেকে থেকে বদলে যেতে পারে। এই হয়তো দেখা গেল নীল জল, পরক্ষণেই হয়ে গেল বেগুনী, তার পরে কমলা কিংবা লাল। ওখানে একটা গাইজার আছে—আদর করে তার নাম দেওয়া হয়েছে "ওল্ড ফেথ্ফুল" অর্থাৎ "বিশ্বস্ত প্রবীণ"। বিশ্বস্ত নাম দেওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই যে ওর চাল-চলনে কোন হেরফের নেই। যারা ওকে দেখতে ওই পার্কে যায় তারা কখনও ঠকে না, কারণ ঠিক ঠিক নির্দিষ্ট সময় পর পর ও ওর ভেল্কীবাজি দেখাবেই দেখাবে। ভেল্কীবাজিটা এই রকম: প্রতি ৬৫ মিনিট পর পর একবার করে এটি থেকে ফিনকি দিয়ে জল উঠবে; আর, উঠবি তো ওঠ্, একেবার ১৭০ ফুট উঁচু হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। অর্থাৎ প্রায় আমাদের কলকাতার মনুমেণ্ট বা শহীদ মিনারের মত উঁচু হয়ে। চার মিনিট এইভাবে উঠেই আবার জল ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। ফের ৬৫ মিনিট পরে আবার দেখা যাবে তার খেলা। এইভাবে চলছে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস— বছরের পর বছর। অবশ্য এর চেয়েও উঁচু গাইজারও আছে—ওখানকারই জায়াণ্ট গাইজার। তবে এটি ওঠার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, কিন্তু যখন উঠবে তখন একেবারে ২৫০ ফুট উঁচুতে ঠেলে উঠবে।



সংস্কৃত সাহিত্যের কথা

পুরাণ সাহিত্য ও তার বৈশিষ্ট্য

বৈদিক এবং রামায়ণ-মহাভারতের যুগের পর সংস্কৃত সাহিত্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এল পুরাণ সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। পুরাণ অর্থ প্রাচীন কথা, আর এই প্রাচীন কাহিনী-সম্বলিত পুরাণকে বলা হ'ল পঞ্চম বেদ।

বেদের সময় থেকে রামায়ণ-মহাভারতের যুগ পর্যন্ত বৈদিক বা আর্যধর্ম একই প্রবাহে চলে আসছিল। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের প্রভাবে সেই ধারাবাহিকতা ভেঙ্গে পড়ল। দেশের মধ্যে ধর্মক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে গ্রীক, পারসিক, শক, হূণ, কুষাণ প্রভৃতি জাতির আক্রমণের ফলে আর্যধর্ম খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়ল। কিন্তু মৌর্যযুগের পরই আবার হিন্দুসমাজে নবজাগরণের সূত্রপাত হ'ল। সুঙ্গ, কণ্ব, শাতবাহন এবং গুপ্ত সম্রাট্‌-দের চেষ্টায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বৈদিক ধর্ম আবার সগৌরবে প্রতিষ্ঠালাভ করল।

এই নবজাগরণ শুরু হ'ল পুরাণ সাহিত্যকেই কেন্দ্র করে এবং পুরাণ থেকেই মালমশলা নিয়ে লেখা চলতে লাগল কাব্য-নাটক ইত্যাদি। বৈদিক যুগের অনেক দেবদেবীর পরিবর্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচলিত হ'ল। আবার এ সমস্ত নতুন দেবদেবীদের পূজা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক রাজা, রাজবংশ এবং তাদের কীর্তিকলাপও কীর্তিত হতে লাগল পুরাণগুলিতে। বেদের মন্ত্রগুলির সঠিক তাৎপর্য সাধারণ লোকে বুঝতে পারত না। পুরাণগুলিতে এই সমস্ত তত্ত্ব সহজ ও সুললিত সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ জীবনকাহিনীর মত করে গল্পের মাধ্যমে জনসমাজে প্রচার করা হ'ল। পরবর্তী কালে সংস্কৃত ভাষায় যত সাহিত্য রচিত হয়েছে তার উপাদান প্রধানত পুরাণ থেকেই নেওয়া হয়েছে। শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, গীতগোবিন্দ—সব কিছুরই মূল উৎস হচ্ছে পুরাণ।

পুরাণ কত রকম

প্রধান পুরাণগুলিকে বলা হয় মহাপুরাণ আর অপ্রধানগুলিকে বলা হয় উপপুরাণ। উভয় শ্রেণীর পুরাণের সংখ্যাই ১৮। পুরাণ

বেদকে অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বেদকে অনুসরণ করেছে বলা চলে। পুরাণগুলিতে বিশেষ করে পাঁচটি লক্ষণ দেখা যায়—স্বর্গ, প্রলয়ের পর নতুন সৃষ্টি, দেবতা ও ঋষিদের বংশবর্ণনা, মনুদের শাসনকাল ও রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস। এ ছাড়াও আছে বর্ণাশ্রম, দানধর্ম-মাহাত্ম্য ইত্যাদি। এমন কি ভূগোল, জ্যোতিষ, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসা ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনাও বাদ যায় নি।

পুরাণগুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে :—

(১) রাজস—যাতে ব্রহ্মাই প্রধান উপাস্য। যেমন—ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন পুরাণ ইত্যাদি।

(২) সাত্ত্বিক—যাতে বিষ্ণুই প্রধান। যেমন—বিষ্ণু, ভাগবত, পদ্ম, নারদ ইত্যাদি।

(৩) তামস—যাতে শিবই প্রধান। যেমন—মৎস্য, অগ্নি, স্কন্দ, শিব প্রভৃতি।

(৪) সংকীর্ণ—যাতে সরস্বতী এবং পিতৃগণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

পুরাণ কবে লেখা হ'ল

গৌতম ধর্মসূত্র এবং আপস্তম্ব ধর্মসূত্র নামে দু'খানা ধর্মগ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৫ম শতাব্দীতেও বর্তমান ছিল। তাতে এবং মহাভারতেও পুরাণের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীরও আগে থেকে পরবর্তী দ্বাদশ-ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল। এর আগে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৪) 'সূত' নামে এক জাতের লোকের কথা বলা হয়েছে যারা মুখে মুখে পুরাণকাহিনী প্রচার করে বেড়াত। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মপুরাণ সম্ভবত প্রাচীনতম। নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিগণের অনুরোধে সূত লোমহর্ষণ এই পুরাণকাহিনী বর্ণনা করেন। এতে বিশ্বের উৎপত্তি, দেবতাদের কাহিনী, চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজাদের কথা, মনু ও তাঁর বংশধরদের কীর্তিকলাপ, বর্ণধর্ম, তীর্থমাহাত্ম্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে বলা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণ বৈষ্ণবদের মূলগ্রন্থ। এতে রয়েছে সৃষ্টির বিবরণ, পাতাল ও নরক বর্ণনা, বর্ণাশ্রম ধর্ম, ধ্রুবচরিত্র, কৃষ্ণের জীবনলীলা, অর্থশাস্ত্র, জ্যোতিষ ইত্যাদির বিবরণ। এ পুরাণটি থেকে মৌর্যবংশের ইতিহাসও জানা যায়।

মৎস্যপুরাণ মনু ও মৎস্যের কথোপকথন নিয়ে লেখা। প্রবল বন্যায় পৃথিবী প্লাবিত হলে বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধরে মনু আর পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। এই পুরাণেই বলা হয়েছে পৃথিবী ৭টি ভূখণ্ড বা দ্বীপ নিয়ে গঠিত। তাদের মাঝখানে মেরুপর্বতকে ঘিরে রয়েছে জম্বুদ্বীপ। আর আমাদের ভারতবর্ষ হচ্ছে এই জম্বুদ্বীপেরই একটি অংশ।

বায়ুপুরাণের প্রধান উপাস্য দেবতা শিব। শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এতে রয়েছে গয়াসুর-কাহিনী, মাসগুলির মাহাত্ম্য, দানধর্ম, রাজধর্ম, নর্মদাতীর্থ-মাহাত্ম্য ইত্যাদি। এ থেকে গুপ্ত রাজবংশেরও অনেক তথ্য পাওয়া গেছে।

ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব লীলা-কাহিনী নিয়ে লেখা ভাগবতপুরাণ ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এতে গায়ত্রীকে অবলম্বন করে ধর্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। আর আছে বিষ্ণুমাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের

জীবনী, বৃত্রাসুর, দক্ষযজ্ঞ, প্রহ্লাদ-চরিত্র, সমুদ্র-মন্থন প্রভৃতির কাহিনী। এই পুরাণের ভাষা, রীতি ও ছন্দ অতি সুন্দর।

উপপুরাণগুলির মধ্যে ভাগবত, কালিকা, নরসিংহ, নারদীয়, কপিল ও শিবপুরাণের উল্লেখ করা যেতে পারে। উপপুরাণগুলি থেকে বাংলা ও কামরূপের প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

পুরাণের গল্প

পুরাণের গল্পসম্ভার অতুলনীয়। গল্পগুলির ভিতর দিয়ে কাহিনীর ছলে নানা গভীর তত্ত্ব পরিবেশন করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি গল্প সংক্ষেপে বলছি।

অযোধ্যার রাজা সগর বহু বছর তপস্যা করে ভৃগু মুনির বরে ষাট হাজার পুত্রলাভ করেন। পুত্ররা বড় হয়ে উঠলে রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে উদ্যত হলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হ'ত সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। একটি ঘোড়ার কপালে জয়পত্র বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হ'ত, আর এক বছর ধরে সে পৃথিবীর সর্বত্র যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াত। অশ্বের রক্ষণের জন্য রাজা সসৈন্যে তার অনুসরণ করতেন। ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করলে সেই দেশের রাজাকে হয় বশ্যতা স্বীকার করতে হ'ত, নয়তো যুদ্ধ করে বাধা দিতে হ'ত। এই-ভাবে সমস্ত রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারলে ঘোড়ার মালিক রাজা রাজচক্রবর্তী উপাধি লাভ করতেন। অশ্ব ফিরে এলে তাকে বলি দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ হ'ত।

সগরের যজ্ঞের ঘোড়া পৃথিবী পর্যটনে বেরুলে ইন্দ্র রাক্ষসরূপ ধারণ করে সেই ঘোড়া চুরি করে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে লুকিয়ে রেখে দিলেন। সগরের আদেশে তাঁর ষাট হাজার পুত্র অনেক খোঁজাখুঁজি করে কপিল মুনির আশ্রমে এসে ঘোড়াটির দেখা পেল। কপিলই ঘোড়া চুরি করেছেন মনে করে উদ্ধত সগরসন্তানগণ মুনিকে শাস্তি দিতে এগিয়ে গেল। মুনির তপস্যাভঙ্গ হ'ল। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। তাঁর দৃষ্টির তেজে ষাট হাজার সগরপুত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এদিকে সগরের পৌত্র অংশুমান পিতৃব্যদের অনুসন্ধান করতে বেরিয়ে কপিল মুনির আশ্রমে



মুনির দৃষ্টির তেজে ষাট হাজার সগরপুত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এসে সমস্ত বিবরণ জানতে পারলেন। মুনিকে প্রসন্ন করে আরও জানলেন যে স্বর্গ থেকে যদি গঙ্গার জল এনে সগরপুত্রদের ভস্মের উপর দিয়ে প্রবাহিত করা যায় তবেই কেবল তাদের পুনর্জীবন লাভ এবং মুক্তি হবে। অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে ফিরে এলেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল। কিন্তু সগর-সন্তানদের উদ্ধার করবে কে? অবশেষে অংশুমানের পৌত্র দিলীপের পুত্র ভগীরথ এ কাজে এগিয়ে এলেন।

ভগীরথ বাল্যকালে ছিলেন একটি মাংস-পিণ্ড মাত্র। শরীরের হাড়গোড় শক্ত না থাকায় তিনি সোজা ভাবে দাঁড়াতে পারতেন না। একদিন অষ্টাবক্র মুনিকে সম্মান দেখাতে গিয়ে তিনি দাঁড়াবার বৃথা চেষ্টা করাতে মুনি ভাবলেন তাঁকে বিদ্রূপ করার জন্যই হয়তো ভগীরথ ও-রকম করেছেন। তিনি শাপ দিলেন যদি ভগীরথের মনে বিদ্রূপ করার ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে তিনি বিকলাঙ্গ হবেন, আর তা না হ'লে তাঁর উত্তমাঙ্গ হবে। ভগীরথের ছিল নির্মল মন, তাই তিনি সুস্থ ও উত্তমাঙ্গ হ'লেন।

কপিলের শাপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য এর পর তিনি উগ্র তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর আদায় করে নিলেন যে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনতে পারবেন। কিন্তু দেখা গেল গঙ্গার অবতরণ-কালে তাঁর পতনবেগ এক মহাদেব ছাড়া আর কারুর ধারণ করার ক্ষমতা নেই। আবার শুরু হ'ল ভগীরথের কঠোর তপস্যা। তার ফলে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গার স্রোত মাথায় ধারণ করতে রাজী হলেন। গঙ্গা অবতরণ-কালে ভীষণ বেগে মহাদেবের মাথার ওপর পড়তে লাগলেন এবং তাঁকে পাতালে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে তাঁর জটারাশির মধ্যে দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ করে রাখলেন। ভগীরথ আবার তপস্যা করে মহাদেবকে তুষ্ট করলে মহাদেব গঙ্গাকে জটার বাঁধন থেকে ছেড়ে দেন। গঙ্গার একটি প্রবাহ ভগীরথের অনুসরণ করে প্রবাহিত হ'তে লাগল। ভগীরথের নির্দেশিত পথে গিয়েছিলেন বলে গঙ্গার এই প্রবাহের নাম হ'ল ভাগীরথী। কিন্তু পথে হ'ল আবার এক বিপদ্‌। পথে যেতে যেতে জহ্নু মুনির আশ্রম ভাসিয়ে নেওয়াতে মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে এক গণ্ডূষে গঙ্গার সমস্ত জল পান করে ফেললেন। আবার তপস্যা করে ভগীরথ মুনিকে তুষ্ট করলে মুনি গঙ্গাকে তাঁর হাঁটু অর্থাৎ জানুদেশ (কারো কারো মতে কান) দিয়ে মুক্ত করে দিলেন। সেই থেকে গঙ্গা মুনির কন্যা জাহ্নবী বলে পরিচিতা হ'লেন। এর পরে গঙ্গাদেবী সহজ সরল গতিতে ভগীরথকে অনুসরণ করে প্রথমে সমুদ্র পর্যন্ত, তারপর পাতালে প্রবাহিত হয়ে সগরের ষাট হাজার সন্তানের ভস্মরাশি প্লাবিত করে দিলেন। তাদের মুক্তি হ'ল।

গয়াসুরের গল্প

পুরাণে বর্ণিত গয়াসুরের কাহিনীও ভারি মর্মস্পর্শী। বিষ্ণুভক্ত গায়াসুর বিষ্ণুর কৃপা-লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করছেন। স্বর্গের দেবতাদের ভয় হ'ল বুঝি স্বর্গরাজ্য লাভের জন্যই এই তপস্যা। তপস্যার ফলে তাঁর দেহ-মন এত পবিত্র হয়ে পড়ল যে তাঁকে দেখামাত্র সবার বৈকুণ্ঠে গতি হ'তে লাগল। ফলে যমপুরীতে আর কেউ যায় না, সে দেশ জনশূন্য হ'তে আরম্ভ করল। যম ও অন্যান্য দেবতারা তখন বিষ্ণুর শরণাপন্ন

হ'লেন। বিষ্ণু গয়াসুরের কাছে গিয়ে দেবতাদের স্বার্থে তাঁকে আত্মবিসর্জন দিতে বললেন। বিষ্ণু-ভক্ত গয়াসুর তৎক্ষণাৎ রাজী হ'লেন, কিন্তু এই সর্তে যে স্বয়ং বিষ্ণুকে এসে তাঁর দেহের ওপর পদাঘাত করে তাঁকে বধ করতে হবে আর নিয়ম করে দিতে হবে যে তাঁর শিলীভূত



গয়াসুর বধ

দেহের ওপর বিষ্ণুর পাদপদ্ম বন্দনা করে চিরকাল ধরে প্রতিদিন পুজো হবে—যাতে তাঁর আত্মার শান্তি হয়। একদিন পুজো বন্ধ হ'লে তিনি আবার উঠে জগৎ ধ্বংস করে দেবেন। বিষ্ণু বর দিলেন—তথাস্তু। গয়াসুরের নামানুসারেই ঐ তীর্থের নাম হ'ল গয়া-তীর্থ, আর গয়াতে পিণ্ড দিতে এসে প্রতিদিন বহু লোক যে পাথরের ওপর পুজো দেয় তাতে আঁকা দেখা যায় বিষ্ণুর পাদপদ্ম।

প্রহ্লাদের কাহিনী

ভাগবত পুরাণে বর্ণিত প্রহ্লাদের কাহিনীর মধ্যে রয়েছে অপূর্ব ভক্তিরস। যুগ যুগ ধরে এই কাহিনী সর্বশ্রেণীর নরনারীকে ভগবদ্ভক্তিতে অনুপ্রাণিত করেছে।

প্রহ্লাদ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র। শৈশব কাল থেকেই সে শ্রীহরির পরম ভক্ত,—দিবারাত্র হরিনাম নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে, আর কোন দিকেই খেয়াল নেই। অপর দিকে পিতা হিরণ্যকশিপু ঘোরতর হরিবিদ্বেষী। হিরণ্য-কশিপু ছিলেন পূর্বজন্মে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর অন্যতম দ্বাররক্ষক,—ঋষিদের অভিশাপে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর মা দিতি পিতা কশ্যপের কাছে প্রার্থনা করে বর চেয়ে নিয়েছিলেন যে তাঁর পুত্র একমাত্র বিষ্ণুর হাতেই নিহত হতে পারবে।

হিরণ্যকশিপুর ছোট ভাই ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হয়ে স্বর্গরাজ্য জয় করে নেবার পর বিষ্ণুর বরাহরূপী অবতারের হাতে পাতালে নিহত হন। সেই থেকে হিরণ্যকশিপু হয়ে উঠলেন হরির পরম শত্রু। কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার বরলাভ করে তিনি ত্রিলোকে অজেয় হয়ে উঠলেন। তাঁর ভয়ে স্বর্গে মর্ত্যে দেবগণ সব ত্রস্ত। পরম শত্রু হরির প্রতি নিজ-পুত্রের ভক্তি দেখে তিনি অপরিসীম বিরক্ত। তাকে হরিভক্তি থেকে বিরত করবার জন্য ভালো-মন্দ সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন

তিনি। তাকে কত বোঝালেন। কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুই শুনলেন না। হিরণ্যকশিপুর রাগ বেড়ে গেল, তিনি ছেলেকে বধ করার আদেশ দিলেন। তাকে খড়্গ দিয়ে কাটবার চেষ্টা করা হ'ল, হাতির পায়ের তলে, অগ্নিকুণ্ডে, সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করা হ'ল, সর্পবিষ প্রয়োগ করা হ'ল। কিন্তু হরির প্রসাদে প্রহ্লাদের কোনও কিছুতেই ক্ষতি হ'ল না। তাকে মারবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

পরিশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলা পুত্রকে সামনে এনে পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোকে সব বিপদ্ থেকে রক্ষা করছে? প্রহ্লাদ বলল, তার আরাধ্য দেবতা হরিই তাকে নিয়ত রক্ষা করছেন এবং তিনি সর্বভূতে সর্বত্র বিদ্যমান্। হিরণ্যকশিপু ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন, সামনের একটি স্ফটিকস্তম্ভের মধ্যেও তার হরি আছেন কিনা। প্রহ্লাদ বললে, হরি যখন সর্বত্রই বিদ্যমান তখন ঐ স্তম্ভের ভিতরেও নিশ্চয়ই আছেন। ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু হাতের কাছে শত্রুকে পাওয়া যাবে মনে করে সেই স্তম্ভে পদাঘাত করলেন। ভেঙ্গে-পড়া স্তম্ভের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন অপরূপ নৃসিংহ মূর্তি। সেই নরসিংহ হিরণ্যকশিপুকে নিজের হাঁটুর ওপর স্থাপন করে দুই হাতের নখ দিয়ে তার বুক চিরে তাকে বধ করলেন। ব্রহ্মার বর ছিল হিরণ্যকশিপুকে কোন জীব বা জন্তু কোন অস্ত্র দ্বারা নিহত করতে পারবে না। জলে, স্থলে বা আকাশে, দিনে বা রাত্রিতে তার মৃত্যু হবে না। তাই হরি মানুষও নয়, জন্তুও নয় এরকম অপরূপ নৃসিংহমূর্তি ধারণ করে জল-স্থল-আকাশের বাইরে নিজের হাঁটুর ওপর রেখে, কোনও অস্ত্রসাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র নখাঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ করে দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন। হরির কৃপাতে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে ভক্ত প্রহ্লাদের জয় হ'ল। শাপভ্রষ্ট হিরণ্যকশিপুও শাপমুক্ত হ'ল।



নখাঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ করে··· ··হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ

পুরাণের মত বহু কাব্য, নাটক, গীতিকাব্য, গদ্য, ছোট গল্প প্রভৃতিতেও সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে আছে। খৃষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাট্দের রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্য চরম

উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ঐ যুগের মধ্যমণি কবি কালিদাস পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁর কথা পরে বলব।

কালিদাসের পূর্বে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবের ফলে পালি এবং প্রাকৃত ভাষার বহুল প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য সংস্কৃত তার গৌরব হারায় নি। বৌদ্ধযুগে কবি অশ্বঘোষের সংস্কৃত রচনা সুপরিচিত। অশ্বঘোষ ছিলেন রাজা কণিষ্কের সভাকবি। তাঁর বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, সারিপুত্র-প্রকরণ সংস্কৃত সাহিত্যে বুদ্ধের জীবনী ও ধর্ম সম্বন্ধে অমূল্য সম্পদ্। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বুদ্ধের বাণী ও কাহিনী নিয়ে লেখা আর্যশূরের জাতকমালাও ঐ যুগের আর একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি। অজন্তার গুহা-চিত্রে এই জাতকমালার কিছু কাহিনী জীবন্ত রূপ নিয়েছে।

পঞ্চতন্ত্র ও অন্যান্য গল্পগ্রন্থ

বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে জাতক ও অবদান সাহিত্যের গল্পগুলি প্রধানত ধর্মনীতিমূলক—জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতে নিছক গল্প-সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি হ'ল পঞ্চতন্ত্র। মহিলা-রোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তি পুত্রদের রাজার মত করে গড়ে তুলতে চান, কিন্তু ছেলেদের কিছুতেই মন নেই। তখন বিষ্ণুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সুনাম শুনে রাজা তাঁকে অনুরোধ জানালেন রাজপুত্রদের শিক্ষার ভার নেবার জন্য। বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্র রচনা করে ছোট ছোট রসসমৃদ্ধ গল্পের মাধ্যমে রাজপুত্র-দের রাজনীতি, সাম, দান, ভেদ, জ্যোতিষ—সব রকম শাস্ত্রের সার শিক্ষা দিলেন। দুরন্ত রাজপুত্রেরা গল্পের মাধ্যমে অতি কঠিন বিষয়-গুলিও অতি সহজে শিখে ফেললেন। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে এই বইটি লেখা হয়েছিল। বইটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা আছে বলে এর নাম পঞ্চতন্ত্র।

সরস গল্প-সাহিত্যের আকর্ষণ চিরন্তন। তাই বিভিন্ন সময়েই সংস্কৃত সাহিত্যকারেরা ছোট গল্প রচনা করেছেন। যেমন ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধস্বামীর লেখা বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ, একাদশ খৃষ্টাব্দে ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎ কথামঞ্জরী, সোমদেবের কথা-সরিৎসাগর, ত্রয়োদশ শতাব্দীর সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকা, চিন্তামণি ভট্টের শুকসপ্ততিকথা এবং শিবদাসের বেতাল পঞ্চবিংশতির নাম করা যেতে পারে। নারায়ণ পণ্ডিতের হিতোপদেশও জ্ঞানগর্ভ শ্লোকের সমষ্টি। হিতোপদেশের একটি চমৎকার শ্লোকে বলা হয়েছে—

"প্রিয়বাক্য-সহ দান, জ্ঞান গর্বহীন,
দান-সহ ধন,
শৌর্য্য-সহ ক্ষমাগুণ—জগতে এ চারি
দুর্লভ মিলন।"

কিংবা—

"এক হাতে তালি নাহি বাজে,
যে কাজ উদ্যমহীন
ফলোদয় না হয় সে কাজে।"

পঞ্চতন্ত্রের গল্পের নমুনা: বন্ধুবিচ্ছেদ

পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্প বলা যাক্। গল্পটির নাম বন্ধুবিচ্ছেদ। এক নগরে এক ধনবান্ বণিক্ বাস করত। সে ভাবল অর্থ প্রচুর হ'লেও তাকে আরো না বাড়ালে একদিন তাও শেষ

হয়ে যাবে। এই ভেবে সে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে মথুরা শহরের দিকে রওনা হ'ল। পথে বনের মধ্যে তার গাড়িতে যোতা একটি ষাঁড় অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাকে বনে ছেড়ে দিয়েই বণিক্‌কে চলে যেতে হ'ল।

এদিকে সেই ষাঁড় বনের মুক্ত বাতাসে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল এবং সবুজ তাজা ঘাস খেয়ে শিবের ষাঁড়ের মতই বলিষ্ঠ হয়ে উঠল। ষাঁড়টির নাম ছিল সঞ্জীবক। ঐ বনের রাজা ছিল পিঙ্গলবর্ণ নামে এক সিংহ। একদিন সে তার জন্তু-জানোয়ার পারিষদ্‌দের নিয়ে যমুনা নদীতে জলপান করতে এসে ঐ ষাঁড়ের গম্ভীর গলার আওয়াজ শুনে বড় চিন্তিত এবং ভীত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে, শেষে জলপান না করেই সে ধীরে ধীরে ফিরে গেল। দূর থেকে দুই শেয়াল্ তা দেখে এক মতলব ঠাওরাল। এক শেয়াল বলল, "দেখ, এখন আমাদের বেকার অবস্থা। যদি আমরা সিংহের কাছে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে পারি তা হলে রাজকৃপায় একটা সুরাহা হয়ে যাবে।" এই বলে সে ধীরে গম্ভীর ভাবে রাজার গুহায় এসে হাজির হ'ল। তার পর সিংহকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে বলল, "প্রভু, আপনার কোন অসুবিধা হলে আমাকে আদেশ করবেন, আমি সামান্য শৃগাল বলে অবহেলা করবেন না। আজ আপনাকে জলপান না করেই ফিরতে দেখে তার কারণ জানতে এসেছি।"

পিঙ্গলবর্ণ বলল, "ভেবেছি এ বন ছেড়ে চলে যাব, কারণ এই বনে একটি নতুন প্রবল জন্তু এসেছে। তার গম্ভীর ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনে মনে হ'ল আমি তাকে এঁটে উঠতে পারব না।"

শৃগাল বলল, "প্রভু, হঠাৎ কোন কাজ করবেন না। আমি আগে ভালো করে খবরা-খবর করে দেখি নতুন আগন্তুকটি কে।" রাজা বললেন, "তথাস্তু।" শৃগাল আওয়াজ লক্ষ করে এগিয়ে দেখল যে বৃহদাকার জন্তুটি একটি ষাঁড় মাত্র। তখন সে মনে মনে খুব খুশি হয়ে ভাবল



প্রভু, হঠাৎ কোন কাজ করবেন না।

যে এবার পিঙ্গলবর্ণকে সে হাতের মুঠোয় রাখবে। ফিরে এসে পিঙ্গলবর্ণকে জানাল যে নতুন আগন্তুকটি এক বিশালকায় হিংস্র জীবই বটে, তবে সে তাকে মিষ্টি কথায় বশ করে সিংহ-রাজের সঙ্গে দেখা করতে রাজী করিয়েছে। রাজা শুনে খুব খুশি। ইতিমধ্যে শেয়াল ষাঁড়ের সঙ্গে দেখা করে খুব ক্রুদ্ধভাবে তাকে বললে, "ধর্মের ষাঁড় হয়ে তোর কি সাহস যে তুই এ বনের রাজা পিঙ্গলের অনুমতি ছাড়াই বনের সজীব ঘাসপাতা সব খেয়ে যাচ্ছিস?"

বেচারা ষাঁড় ভয়েই আধমরা। অতি করুণ ভাবে সে অনুনয় করে বলল, "মহাশয়, আপনি অতি সজ্জন ব্যক্তি; দয়া করে আমায় রাজার কাছে নিয়ে চলুন এবং একটা বিহিত করুন।"

শেয়াল পুনরায় সিংহের কাছে এসে জানাল

যে, এ বড় যে-সে পাত্র নয়। এ স্বয়ং শিবের বাহন। তবু সে তাকে সিংহরাজের কাছে আসতে রাজী করিয়েছে। সিংহ আরও খুশি হয়ে বললে, "তোমার মত হিতাকাঙ্ক্ষী আমার আর কেউ নেই।"

কিছুদিনের মধ্যেই সিংহ এবং ষাঁড়ে প্রচণ্ড বন্ধুত্ব হয়ে গেল। শেষে দেখা গেল সিংহ বেশি সময় সঞ্জীবকের সঙ্গেই ঘোরে-ফেরে, শেয়াল বন্ধুদের বিশেষ আমল দেয় না।

তাই দেখে দুই শেয়াল আবার মন্ত্রণায় বসল কেমন করে এদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। রাজসিংহ কিনা শেষ পর্যন্ত একটা নিরামিষাশী ষাঁড়কে নিয়ে মেতে উঠল!

অতঃপর এক শেয়াল ভালোমানুষের মত মুখ করে সিংহের কাছে গিয়ে যোড়হাতে দাঁড়িয়ে বললে, "প্রভু, অভয় দেন তো বলি। আপনার মত এমন প্রজাপালক মহৎ রাজা আর কোথাও নেই। এত বড় রাজা হয়েও সামান্য একটি ষাঁড়কে আপনি সমপদস্থ বন্ধুর সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু সে এমন অকৃতজ্ঞ যে ঠিক করেছে আপনাকে হত্যা করে সে-ই এ রাজ্যে রাজা হয়ে বসবে।"

সিংহ অবাক্ হয়ে বললে, "সে কেমন করে হয়? ও তো আমাকে ভীষণ ভালবাসে।"

শেয়াল বললে, "প্রভু, আপনি সরল, তাই ঐ ভেবে নিশ্চিন্ত আছেন। যাই হোক, আপনি সতর্ক থাকবেন। যদি দেখেন সে শিং নীচু করে দূর থেকে আপনাকে লক্ষ করছে তখনই বুঝবেন তার উদ্দেশ্য ভালো নয়।"

এরপর সে ষাঁড়ের কাছে গিয়ে বলল, "বন্ধু, কি বলব, তুমি এত সরল যে তোমার কোন দিকে খেয়াল নেই। সিংহের মতলব তুমি বোঝ না? সে ঠিক করেছে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করে শেষে তোমাকে মেরে সে তার বশংবদ প্রাণীদের ভোজ দেবে।"

এ কথা শুনে ষাঁড় ভীত হয়ে বললে, "আমি তবে কি করব বল?" শেয়াল বললে, "তুমি সিংহের সঙ্গে দেখা করে তোমার কথা বুঝিয়ে বল। তবে যদি দেখ যে সিংহ রোজকার মত বসে নেই, তোমায় দেখে দাঁড়িয়ে উঠে গরগর করছে, তবে তুমিই আগে শিং বাগিয়ে ওকে আক্রমণ করবে।"

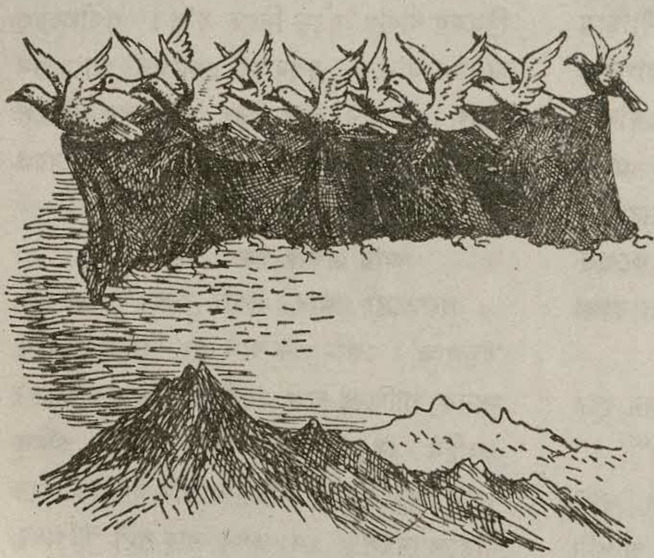
তারপর? তারপর এই ভাবে শেয়ালের কথা মত দু'জনে দু'জনকে ওভাবে দেখে ভুল বুঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিংহের থাবায় ষাঁড় নিহত হ'ল। শৃগালদ্বয়ও মনের আনন্দে ষণ্ডমাংস ভোজের আয়োজন করল। এমনি করে চতুর শেয়ালের বুদ্ধিবলে সিংহ ও ষাঁড়ের বন্ধুত্ব নষ্ট হ'ল এবং তাদেরও স্বার্থসিদ্ধি হ'ল।

আর একটি গল্প: বন্ধুলাভ

পঞ্চতন্ত্রের আর একটি সুন্দর গল্প হ'ল 'বন্ধুলাভ'। কোন এক বনে এক বিশাল বটবৃক্ষে অনেক পাখিদের সঙ্গে একটি কাকও বাস করত। একদিন সে খাবারের সন্ধানে এদিক্ ওদিক্ ঘুরতে ঘুরতে এক ভীষণ-আকৃতি ব্যাধকে ফাঁদ পাততে দেখল। সে তখন তার সঙ্গী পাখিদের সাবধান করে দিল। কিন্তু ধূসরগ্রীব নামে এক কবুতর ব্যাধের ছড়ানো তণ্ডুলকণার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। সে ছিল একদল কবুতরের রাজা। সঙ্গীদের নিয়ে চাল খেতে গিয়ে সে ফাঁদের মধ্যে আটকা পড়ল। এতগুলি পাখী

একসঙ্গে দেখে ব্যাধের আনন্দ তো আর ধরে না।

ধূসরগ্রীব ছিল খুব বুদ্ধিমান্। সে অন্য কবুতরদের বলল, "তোমরা ভয় পেও না। প্রাণ বাঁচাতে হলে সর্বপ্রথমে আমাদের এক-যোগে কাজ করতে হবে। চল, আমরা সবাই একসঙ্গে চলে যাই। খানিকটা দূরে আমার এক ইঁদুর বন্ধু বাস করে। সে তার ধারাল দাঁত দিয়ে আমাদের ফাঁদ কেটে আমাদের মুক্ত করবে।" এই কথায় সব কবুতর একযোগে ফাঁদ নিয়ে উড়ে গেল আর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ইঁদুরের গর্তের কাছে এসে ইঁদুরের সাহায্যে মুক্ত হ'ল। বটবৃক্ষবাসী কাক সব ঘটনা আদ্যোপান্ত লক্ষ করছিল। সে ভাবল, বন্ধুর



সব কবুতর একযোগে ফাঁদ নিয়ে উড়ে গেল।

সাহায্যে যখন এত বড় উপকার হয় তখন যেমন করেই হোক্ এই ইঁদুরের সঙ্গে আমায় বন্ধুত্ব পাতাতে হবে। এই ভেবে সে ইঁদুরের গর্তের কাছে গিয়ে তাকে ডেকে মনের কথা বলল। ইঁদুর বলল, "দেখুন, আপনার কথা খুবই ভালো। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, সুতরাং আমাদের দূরে থাকাই ভালো।" কাক বলল, "তুমি যদি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব না কর তবে তোমার এই ঘরের সামনে আমি অনশনেই প্রাণত্যাগ করব।" অগত্যা ইঁদুর বেরিয়ে এসে কাকের বন্ধু হ'ল।

ইতিমধ্যে দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে ইঁদুর এবং কাক দেশ ছেড়ে আর এক দেশে চলে গেল। সেখানে এক হরিণ ও এক কচ্ছপের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হ'ল। সেখানে আবার আর এক ব্যাধের কবলে পড়ার পর কাক এবং ইঁদুরের বুদ্ধিতে হরিণ ও কচ্ছপ রক্ষা পেল। এই ভাবে পবিত্র প্রেমের ফলে সামান্য প্রাণীরা পরস্পরের কত উপকার করতে পারে দেখা গেল। এর থেকে শেখা যায় মানুষ যদি একযোগে পরস্পর পরস্পরের সুখসুবিধা দেখে চলে তবে জীবন কতই না মধুর হয়!

এই রকম নানা গল্পের ছলে বিষ্ণুশর্মা রাজকুমারদের রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সুন্দর শ্লোক রচনা করে তাঁর বক্তব্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এ সব শ্লোক এখন প্রবাদ বাক্যের মত হয়ে আছে।



চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা *

প্রথম মেটেরিয়া মেডিকা

ইতিপূর্বে আমরা পড়েছি কি ভাবে হিপোক্রেটিস আধুনিক চিকিৎসা-ধারার প্রবর্তন করলেন (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম ও ২য় খণ্ড)। কিন্তু হিপোক্রেটিস্ বেশি ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেন নি। যেমন যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা করতে হ'লে তিনি এই রকম ব্যবস্থা দিয়েছেন: একটি গরু কেন, তাকে নিয়ে চলে যাও পাহাড়ে। সেখানে গিয়ে বিশ্রাম কর আর গরুর দুধ খাও। অর্থাৎ যক্ষ্মার চিকিৎসা হচ্ছে খোলা হাওয়া, আলো, পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু সাধারণ লোকের ওতে মন উঠবে কেন? তাদের ওষুধ চাই। কাজেই টোটকা এবং নানা রকম অবৈজ্ঞানিক ওষুধপত্রের চল হ'ল।

এ সময়ে রোমের জয় জয়কার। ইয়োরোপের সকলকারই মনের ইচ্ছা—রোমে গিয়ে বসবাস করব, সেখানে গিয়েই ব্যবসা করব। ডাক্তারদেরও তাই। কাজেই এ সময়ে রোম শহরে গ্রীস, আলেকজান্দ্রিয়া আর রোম এই তিন দেশের তিন ধরনের চিকিৎসকদের হ'ল সমাবেশ। সুতরাং রোমে শুরু হয়ে গেল ওষুধপত্রের ছড়াছড়ি। অর্থাৎ রোমের লোকেদের অবস্থা হ'ল সাংঘাতিক। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ বোঝবার কোন উপায় নেই—এক এক ডাক্তারের এক এক মত। কাজেই তখন দরকার হয়ে পড়ল রোমে যে সব ওষুধপত্র চালু ছিল তাদের একত্র করে বিধিবদ্ধ করা। এ কাজ প্রথম করলেন রোমের রাজা নিরোর সামরিক সার্জন ডিয়োসকরিডিস্। তিনিই লেখেন পৃথিবীর প্রথম ওষুধের বই বা 'মেটেরিয়া মেডিকা'। এ বইটাতে তখনকার চলতি সব ওষুধের গুণাগুণ লেখা ছিল। এর খুঁতগুলি দূর করলেন গ্যালেন।

প্যারাসেলসুস

গ্যালেনের সব কথা যে সত্যি নয় সে সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন তোলেন বাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্যারাসেলসুস। তাঁর পুরো নাম হ'ল অরিওলুস থিওফ্রাস্টুস বম্বাস্টুস ফন হোহেনহাইম। তাঁর কথাবার্তা ছিল বেশ কড়া কড়া, আর তাঁরই নাম আর চরিত্র থেকেই ইংরেজি ভাষায় এসেছে "বোম্বাস্ট" কথাটা। যাঁরা কথায় কথায় রাজা উজীর মারেন তাঁদের

নামই হ'ল বোম্বাস্ট। প্যারাসেলসুস অত্যন্ত অহঙ্কারী লোক ছিলেন। গ্যালেনের সব বই তিনি পুড়িয়ে ফেললেন। আবার নতুন করে বললেন যে প্রত্যেক ব্যায়রামেরই একটা কারণ আছে। ভূত-প্রেত হয়তো ভয় দেখাতে পারে, কিন্তু কোন রোগের কারণ হ'তে পারে না। তা ছাড়া তিনিই প্রথম রোগীর চিকিৎসায় রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেন। তাঁর



প্যারাসেলসুস

সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হ'ল পারা, যা তিনি নানা ব্যাধিতে ব্যবহার করেছেন।

যাতে ব্যায়রাম তাতেই সারে

গ্যালেন চিকিৎসা করতে গিয়ে এ তথ্যে পৌঁছেছিলেন যে যদি কোন ওষুধ খেয়ে কারও পেটের অসুখ হয় তা হলে কোষ্ঠ-কাঠিন্যের সেটাই হবে সব চেয়ে ভালো ওষুধ। প্যারাসেলসুস কিন্তু বিশ্বাস করতেন ঠিক এর উল্টোটা। তাঁর বিশ্বাস ছিল—যে ওষুধে জ্বর হয় তাতেই সারবে জ্বর—যদিও প্যারাসেলসুস এ মতবাদে কখনও চিকিৎসা করেন নি। তাঁর এ মতবাদ নিয়ে নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতি শুরু করে দিলেন হ্যানিম্যান। এর নাম দিলেন তিনি হোমিওপ্যাথি। এতে পারাসেলসুসের কাছ থেকে হু'টো মত নেওয়া হ'ল। এক—যাতে যে ব্যায়রাম হয় তাতেই সেটা সারে—"সিমিলিয়া সিমিলিবস্ কুরানটার"। আর দ্বিতীয় হ'ল "ডক্ট্রিন অব সিগনেচার্স্"। এর অর্থ হ'ল আকাশের সব তারা সমস্ত রোগের চিহ্ন ওষুধের ওপরে দিয়ে দেয়। যেমন অর্কিডের শেকড় শরীরের যে প্রত্যঙ্গের মত দেখতে, অর্কিড সেই প্রত্যঙ্গের ব্যাধিতেই হবে অব্যর্থ। হ্যানিম্যানের তৃতীয় পন্থা হ'ল "ডোসিমেট্রি" অর্থাৎ ওষুধের মাত্রা যত কম হবে তার কাজ হবে তত বেশি।

ফার্মাকোলজির সূত্রপাত

সাধারণ ডাক্তারেরা (যাঁদেরকে হ্যানিম্যান বলতেন অ্যালোপ্যাথ) যখন দেখলেন যে হ্যানিম্যানের এই ওষুধ,—যাকে তাঁরা জল ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না,—তাতেও রোগ সেরে যাচ্ছে, তখন তাঁদের মনে এই প্রশ্নই জাগল, তা হ'লে তাঁরা যে প্রচুর ওষুধ দিচ্ছেন তার দরকার আছে কিনা। সেদিন থেকেই হ'ল "ফার্মাকোলজির" সূত্রপাত। অর্থাৎ কতখানি ওষুধ মানুষের সত্যি প্রয়োজন আর কতখানি দিলে তা হয়ে ওঠে ক্ষতিকর।

জীবাণুর কথা

এ সময়ে ডাক্তারেরা আর একটা জিনিস লক্ষ করলেন—একজনের কাছে থেকে অন্য লোকের ভেতর রোগ ছড়ায়। প্রশ্ন উঠল—কেন? কি করে ছড়ায়? এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হ'ল সে সময়েই যখন ডেনমার্কের এক চশমা-ওয়ালা, লুয়েনহোয়েক বের করলেন মাইক্রস্কোপ বা অণুবীক্ষণ। তিনি দেখালেন এক ফোঁটা জল মাইক্রস্কোপের তলায় রাখলে



লুয়েনহোয়েক

দেখা যাবে তার ভিতর কিলবিল করছে রাশি রাশি পোকা।

লুয়েনহোয়েকের কাজের গুরুত্ব বুঝতে কিন্তু কেটে গেল প্রায় একশ' বছর। ফ্রান্সের লিল শহরের রসায়নের অধ্যাপক লুই পাস্ত্যর কাজ শুরু করলেন ঈস্ট নিয়ে। ঈস্ট আমাদের চেনা জিনিস—পাঁউরুটি ফুলে ওঠে ঐ ঈস্টেরই জন্য। আবার মদ তৈরি করতেও লাগে ঈস্ট। পরীক্ষা করে পাস্ত্যর দেখালেন যে ঈস্ট একটা জীবন্ত জিনিস। চিনিতে ঈস্ট দিলে ঈস্ট বংশবৃদ্ধি করতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে চিনি বদলে গিয়ে হয় মদ। এর থেকে পাস্ত্যরের মনে আর একটা সন্দেহ এসে উঁকি মারতে লাগল। তা হ'লে কোন জিনিস হাওয়ায় ফেলে রাখলে যে পচে যায় তারও কি কারণ এই? বাতাসের ভিতর যে সব অদৃশ্য জীবাণু আছে তারাই কি বংশবৃদ্ধি করতে গিয়ে খাবারদাবার সব পচিয়ে দেয়?

এ জিনিসটা প্রমাণ করবার জন্য তিনি দু'টো বোতল নিলেন, তাতে ভরা ছিল সুরুয়া। একটার মুখ তিনি খানিকক্ষণ খুলে রেখে বন্ধ করে দিলেন, আর একটাকে রাখলেন গোড়া থেকেই বন্ধ করে। দেখা গেল, প্রথম বোতলের সুরুয়া ঘোলা হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টার হয় নি। তা হ'লে নিশ্চয়ই আমাদের চারিদিকের হাওয়ায় জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারাই সুরুয়ায় ঢুকে, বাসা বেঁধে, বংশবৃদ্ধি করতে পেরেছে। কিন্তু পাস্ত্যর তো ডাক্তার ছিলেন না, কাজেই চিকিৎসায় কি করে এ তথ্য লাগানো যেতে পারে তা তাঁর খেয়ালে না আসারই কথা। কিন্তু তাঁর কাছে এ সময়ে একটি পত্র এল গ্লাস্‌গোর

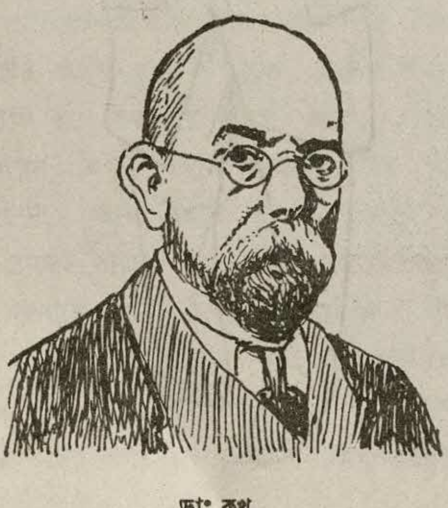


লুই পাস্ত্যর

সার্জারীর অধ্যাপক লিস্টারের কাছ থেকে। তিনি পাস্ত্যরের লেখা পড়ে বুঝতে পেরেছেন কেন তাঁর রোগীরা অপারেশনের পরে "পচন" রোগে মারা যায়। তিনি দেখালেন যে কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে জীবাণু মেরে দিতে পারলে অনেক—অনেক রোগী বেঁচে যায় পচনের হাত থেকে। আজ অবশ্য অপারেশন পদ্ধতি অনেক এগিয়ে গেছে—এগিয়ে গেছে নির্জীবাণু করার উপায়ও। যাই হোক, লিস্টারের পত্র কিন্তু পাস্ত্যরকে রসায়নের গবেষণা থেকে নিয়ে গেল চিকিৎসার রাজ্যে। তিনি বার করলেন মুরগীর কলেরার জীবাণু, বার করলেন জলাতঙ্কের এবং অ্যান্থ্রাক্স রোগের প্রতিষেধক। সেজন্য আজও জলাতঙ্কের চিকিৎসা-কেন্দ্রের নাম দেওয়া হয় "পাস্ত্যর ইন্‌ষ্টিট্যুট"।

রবার্ট কখ্

পাস্ত্যর যখন জীবাণু নিয়ে ফ্রান্সে পরীক্ষা করছিলেন তখন জার্মানীর এক গ্রামে বসে জীবাণু নিয়ে কাজ করছিলেন এক গ্রাম্য ডাক্তার—রবার্ট কখ্। তিনি বার করেছিলেন



ডাঃ কখ্

আলাদা ভাবে অ্যান্থ্রাক্সের জীবাণু। তারপর তিনি বার করলেন যক্ষ্মার জীবাণু আর কলেরার জীবাণু। কলেরার জীবাণু তিনি বার করেন আমাদেরই কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের প্যাথোলজি বিভাগে, আর আজও লোকেরা যক্ষ্মার জীবাণুকে বলে কখ্ ব্যাসিলি এবং যক্ষ্মাকে বলে কখ্ ব্যায়রাম।

পাস্ত্যর বা লিস্টারের কাজ না জেনেও কিন্তু কয়েকজন ডাক্তার জীবাণুমুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করে রোগীদের বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার ইগ্‌নাজ সেমেলভাইস ও আমেরিকার অলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্‌সের নাম করা যেতে পারে। সেকালে ছেলেপুলে হবার সময়ে কত মায়ের প্রাণ সংশয় হ'ত তার ঠিক নেই। এরা দু'জন দেখিয়েছিলেন যে ডাক্তারদের অপরিচ্ছন্নতাই এর জন্য দায়ী। অবশ্য এ কথা সবার পক্ষে স্বীকার করা খুব সহজ হয় নি। সেমেলভাইসের পেছনে তাঁর সহকর্মীরাই তো এমন ভাবে লেগেছিলেন যে মারা যাবার আগে তিনি বদ্ধ পাগল হয়ে যান।

নতুন ওষুধের গোড়াপত্তন

পাস্ত্যরের এক সহকারী জুটলেন—পল এর্লিখ্। পল ছিলেন কখের ঠিক উলটো,—হাসিখুশি, ফুর্তিবাজ; সুতরাং কোন কাজেই তিনি পেছ-পা হওয়ার লোক ন'ন, অথবা ব্যর্থতা তাঁকে কখনও কাবু করতে পারে নি।

এর্লিখের প্রধান কাজ হ'ল জীবাণুকে দেখবার জন্যে নানান্ রংএ রাঙ্গিয়ে তোলা, যাতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে তাদের চিনতে কোন অসুবিধা না হয়। এই সঙ্গে তিনি আরও

দেখলেন, যে, সব রং সব জীবাণুর গায়ে লাগে না, অর্থাৎ জীবাণুদের সঙ্গে রঙের যেন একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। তাই যদি সত্যি হয় তা হ'লে, তিনি বললেন, এমন কোন রং যদি বার করা যায় যা জীবাণুর দেহে ঢুকে তাকে খতম্ করে দেবে অথচ মানুষের শরীরের কোন ক্ষতি করবে না, তা হ'লে তো রোগজয় এসে যাবে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। তিনি সিফিলিসের জীবাণুকে ঘায়েল করতে সফল হলেন ৬০৫ বার পরীক্ষা করে নিষ্ফল হয়ে; তাই এই ওষুধের নাম দিলেন ৬০৬,—ম্যাজিক বুলেট "স্যালভারসন"।

আমাদের ডঃ ব্রহ্মচারী

এবার আমাদের দেশের একজন ডাক্তারের কথা বলি যিনি এর্লিখের কাজে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নাম উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

আমাদের দেশে তখন দু'টি ব্যায়রাম বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে দেশকে—ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর। ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনিন বেরিয়েছে কিন্তু কালাজ্বরের কোনও ভালো ওষুধ তখনও বেরোয় নি। এ রোগে অ্যান্টিমনি টারটারেট ইনজেকশন দেওয়া হ'ত সেকালে, কিন্তু সেটাও রোগীর শরীরে নানারকম অসুবিধা ঘটাতে লাগল।

উপেন্দ্রনাথ তখন ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যাপক। কাজেই সারাদিন তাঁর কেটে যেত হাসপাতালে আর নিজের রোগীদের দেখতে। কেবল রাত্রেই তিনি কাজ করতে পারতেন। অনেকদিন সারারাতই তাঁর কেটে গেছে ল্যাবরেটরীতে। সামান্য সামান্য জিনিস নিয়ে তিনি কাজ করেছেন বৈজ্ঞানিক রামনের মত; লাখ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার



উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

মত সামর্থ্য তাঁর ছিল না। কিন্তু তা হ'লে কি হয়? তিনি প্রথমে বের করলেন সোডিয়াম এ্যান্টিমনিল টারটারেট, তারপর ইউরিয়া স্টিবামাইন। এ ওষুধ কালাজ্বরের চিকিৎসায় নিয়ে এল যুগান্তর। ১৯২৫ সালে আসামে কালাজ্বরে মারা গিয়েছিল ৬,৩৬৫ জন আর ১৯৬৫ সালে মারা গেল মাত্র ৮৪৫ জন।

সাল্ফা ড্রাগ্স্

এদিকে ইয়োরোপেও ডাক্তাররা বসেছিলেন না। এর্লিখের রং নিয়ে জার্মানীতে পরীক্ষা চলছিল এবং ডাঃ গারহার্ড ডোমাগ তৈরি করলেন "প্রোন্টসিল"—একটা লাল রং থেকে। এই হ'ল "সাল্ফা" জাতীয় ওষুধের শুরু। প্রোন্টসিল মানুষের নানারকম ব্যাধির ওপর কাজ করতে থাকল। বিশেষ করে স্ট্রেপ্টোকক্কাস্ জাতীয় জীবাণুর ওপর। কিন্তু প্রোন্টসিল শরীরের ওপর অনেক সময় বিষের মত কাজ করত, তাই তাকে বদলে তৈরি করা



আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

হ'ল সাল্‌ফাপিরিডিন (এম. বি. ৬৯৩), সাল্‌ফাডায়াজিন, সাল্‌ফাগোয়ানিডিন ইত্যাদি।

পেনিসিলিন আবিষ্কার

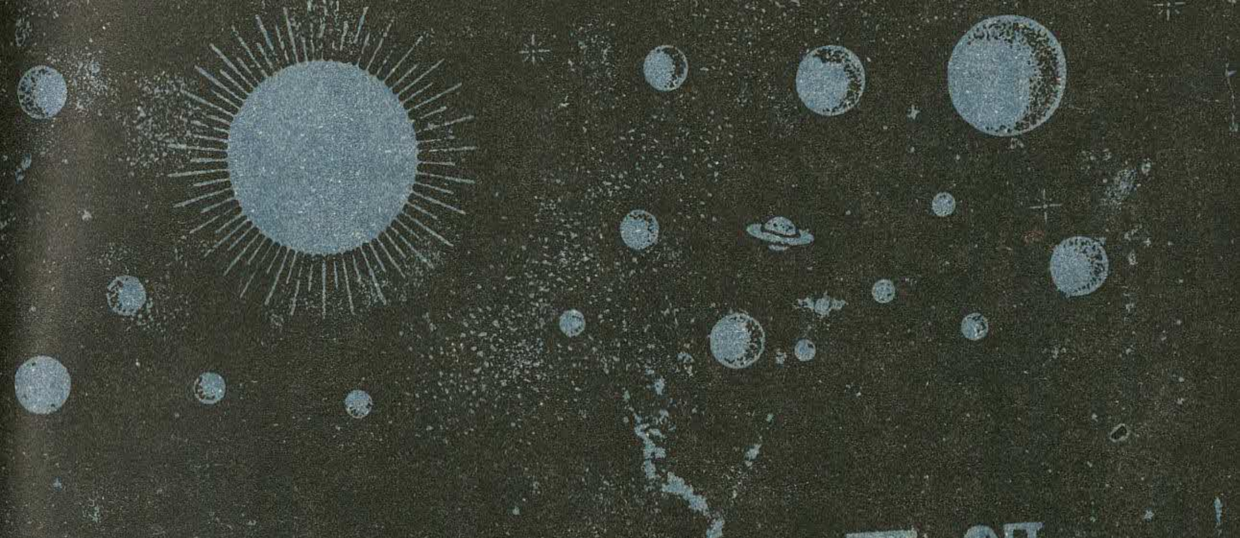
ডোমাগের আবিষ্কারের প্রায় সাত বছর আগে অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং একবার ছুটী থেকে ফিরে এসে দেখেন যে তাঁর জীবাণু জন্মাবার প্লেটে কি রকম একটা তুলোর মত জিনিস জন্মেছে। ফেলে দেবার আগে ভালো করে দেখতে গিয়ে তিনি অবাক্ হয়ে দেখলেন যে এ তুলোর চারদিকে একটা জায়গা একেবারে খালি হয়ে গেছে, সেখানে কোন জীবাণু জন্মাতে পারে নি। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে ঐ তুলোর মত জিনিসটা একটা ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ্—নাম পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। তিনি বুঝলেন, এই ছত্রাক নিজেদের বাঁচাবার জন্য একটা জিনিস তৈরি করছে যার কাজ হ'ল জীবাণুদের ধ্বংস করা। তিনি তার নাম দিলেন পেনিসিলিন। তিনি এ জিনিসটা রোগীদের ঘায়ে ব্যবহার করে খুব ভালো কাজ পেতে লাগলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ফ্লোরি ও চেন দু'জনে এই পেনিসিলিন নিয়ে কাজ করে বিশুদ্ধ ভাবে পেনিসিলিন তৈরি করলেন আর দেখালেন যে এ এক অদ্ভুত ওষুধ। কত রকম অসুখেই যে এ ওষুধ কার্যকরী হয় তার হিসেব নেই, অথচ মানুষের কোন ক্ষতিই এ করে না। অবশ্য একটু অসুবিধা ছিল, এ ওষুধ তখন পর্যন্ত কেবল দেওয়া যেত ইনজেকশন করে।

আরো—আরো অ্যান্টিবায়োটিক

পেনিসিলিনের নাম দেওয়া হ'ল অ্যান্টিবায়োটিক। কারণ, জীবন্ত জীবাণুকে এ মারতে পারে। এ থেকে অনেকেই চিন্তা করতে লাগলেন, ছত্রাকদের মত জীবাণুরাও নিজেদের বাঁচাবার জন্য কোনও জিনিস কি তৈরি করে? দেখা গেল, হ্যাঁ, করে। আর নানান্ রকম জীবাণু থেকে বেরুল স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন (যা এখন যক্ষ্মার একটি অমোঘ ওষুধ হয়ে দাঁড়িয়েছে-), বেরুল ক্লোরেমফেনিকল (টাইফয়েডের আশ্চর্য ওষুধ)। এইভাবে জীবাণুদের কাছ থেকেই নিত্য নতুন ওষুধ বেরুতে লাগল।

যক্ষ্মার জন্য স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ছাড়া বেরুল পি-অ্যামাইনো স্যালিসিলিক অ্যাসিড, বেরুল আইসোনিয়াজাইড। আজ এই তিন ওষুধ জয় করেছে যক্ষ্মাকে। আজ যক্ষ্মারোগীকে ভালো করা ডাক্তারের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে।



মহাকাশের কথা

অজানা গ্রহ এক্স

মহাকাশে আমাদের সূর্যকে ঘিরে যে গ্রহ-গুলো অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছে তাদের সকলের গল্পই একে একে বলেছি। বুধ থেকে প্লুটো পর্যন্ত। অবশ্য আমাদের পৃথিবীও একটি গ্রহ, কিন্তু সে আমাদের একান্তই নিজস্ব, তাই তার কাহিনী পৃথক্ করে বলা হচ্ছে "পৃথিবীর কথায়"। এ ছাড়া খুদে গ্রহ ভালক্যানেরও নামোল্লেখ করেছি কিন্তু তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলি নি। তেমন কিছু বলবারও নেই— যতক্ষণ না পণ্ডিতেরা আরও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে তার সাহায্যে ওর বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করেন। কিন্তু আর একটি নতুন গ্রহের কথা বলা দরকার যেটি এখনও খুঁজে বার করা যায় নি কিন্তু যেটি আছে বলেই অনেক বিজ্ঞানীই সন্দেহ করছেন। আরও বলা দরকার এই জন্য, যে, অনেক পণ্ডিতের ধারণা এটি মোটেই খুদে নয়, বরঞ্চ উল্টো—গ্রহরাজ্যে এক বৃহস্পতি ছাড়া তার যুড়ি আর একটিও নেই।

অঙ্কে কোন অজানা রাশিকে ইংরেজী এক্স (x) অক্ষরটি দিয়ে বোঝানো হয়; তাই এই অজানা গ্রহটিরও নাম আপাততঃ রাখা হয়েছে এক্স গ্রহ।

প্লুটোর আবিষ্কার কি ভাবে হয়েছিল তা হয়তো তোমাদের মনে আছে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯:৪)। ইউরেনাস আবিষ্কৃত হবার পর তার গতিবিধি হিসেব করতে গিয়ে যে গরমিল দেখা যায় তা থেকেই প্রথমটা নেপচুনের আবিষ্কার হয়। কিন্তু নেপচুন আবিষ্কারের পরও ইউরেনাসের চলাফেরার হিসেবে একটু গরমিল থেকেই যায়, গরমিল দেখা দেয় নেপচুনের চলাফেরার হিসেবেও। তা থেকেই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, অন্য কোনও অজানা গ্রহ নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে থেকে ওদেরকে টানাটানি করছে এবং গরমিলটা হচ্ছে

তারই জন্য। খোঁজাখুঁজি করে সেই অজানা গ্রহ প্লুটোকে খুঁজে পাওয়া যায় বেশ কিছুদিন পরে।

প্লুটোর হালচালও বার করে ফেললেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু এখানেও দেখা গেল, সব কিছু নিখুঁত ভাবে মিলছে না,—মাঝে মাঝে প্লুটোর চলাফেরা ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত তেমনটা হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, প্লুটোর টানের জন্য নেপচুনের চলার পথ যতটা সরে যাবার কথা সেটা হিসেবে ধরলেও সে পথও নিয়মমাফিক হচ্ছে না, খুঁত রয়েই যাচ্ছে। এটা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন প্লুটো ছাড়া আরও কোন গ্রহ এই টানাপোড়েনে অংশ নেয়। কাজেই আকাশে সে রকম আরও একটা গ্রহ নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে যাকে আজও খুঁজে বার করা যায় নি। সেই অজানা গ্রহটিই হচ্ছে "এক্স" গ্রহ।



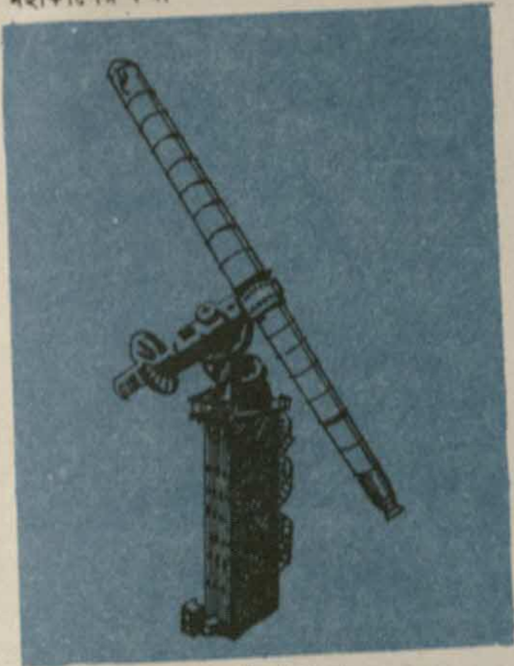
রেডিও-টেলিস্কোপ

এক্স গ্রহকে খুঁজে বার করার অনেক চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিশেষতঃ রেডিও-টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হবার পর অনেকে ভেবেছিলেন এ কাজটা হয়তো এবারে সহজ হবে, কিন্তু তা হয় নি। ফলে সত্যিই এক্স গ্রহ আছে কিনা সে বিষয়েও আবার অনেক পণ্ডিত নতুন করে সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

কিন্তু সম্প্রতি এ বিষয়ে নতুন যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় এক্স গ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাঁরা এতদিন সন্দেহ করছিলেন তাঁরা হয়তো এবার তাঁদের মত বদলাবেন। এই সব তথ্য যিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর নাম যোসেফ ব্র্যাডি, লরেন্স লিভারমোর অবজারভেটারীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী তিনি।

বৃহস্পতির পরেই

ব্র্যাডির গবেষণার পেছনে রয়েছে একটি ধূমকেতু। এই ধূমকেতুর কথা আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখি যে হেলির ধূমকেতু নামে একটি বিশেষ ধূমকেতু ৭৫।৭৬ বছর পর পর আমাদের আকাশে এসে দেখা দেয়। প্রায় ২ হাজার বছর ধরে বিভিন্ন যুগের জ্যোতির্বিদ্‌রা এটির আবির্ভাবের যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তা খুঁটিনাটি পরীক্ষা করেই এটি আসবার একটা নিখুঁত সময় পণ্ডিতেরা বার করে ফেলেছিলেন। ব্র্যাডি লক্ষ করলেন, এই ধূমকেতুটি কিন্তু ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে দেখা দেয় না, কোন কোন বার দিন চারেক আগেই এর দেখা পাওয়া যায়, কোন কোন বার দেখা পাওয়া যায় দিন চারেক পরে। তা হলে নেপচুন বা প্লুটোর বেলায় যেমন ঘটছে তেমনি কোনও অজানা জ্যোতিষ্ক এই ধূমকেতুটিকে ধরেও টানাটানি করছে বলে মনে করা যেতে পারে এবং



রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপ

ত্র্যাডির মতে সেই জ্যোতিষ্ক পদার্থটি আর কেউ নয়,—সে এই এক্স গ্রহটি—যাকে খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রান হয়ে গেছি। কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে নানা রকম আঁকজোঁক কষে তিনি এই অজানা গ্রহটির অবস্থিতি, আয়তন, ভর, দূরত্ব এবং গতিবেগ অনেক কিছুই বার করে ফেলেছেন। তাঁর মতে গ্রহটির ওজন, বা আরও ঠিক করে বললে বলা যায় ভর,—শনির চেয়েও তিনগুণ বেশি, এবং বৃহস্পতি ছাড়া এত বড় গ্রহ আর সূর্যের রাজত্বে নেই। অর্থাৎ এক কথায় এটি হচ্ছে সৌর জগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে এর-দূরত্ব ৬০০ কোটি মাইলের কম নয়, আর সূর্যের চারদিকে একবার পাক খেয়ে আসতে তার লাগে, আমাদের বছরের হিসেবে, প্রায় ৪৬৪ বছর কিংবা আর একটু বেশি। শুধু তাই নয়, অন্যান্য গ্রহেরা সূর্যকে পাক খাওয়ার সময় যেদিকে মুখ করে ঘোরে এক্স গ্রহ ঘোরে তার উল্টো দিকে মুখ করে।

ত্র্যাডি বলছেন, এই গ্রহটি এখন ক্যাসিওপিয়া নামে যে তারাপুঞ্জ আছে তারই কাছাকাছি জায়গায় আকাশে রয়েছে। ওখানে অনেক তারার ভিড়, আর এক্স গ্রহের উজ্জ্বলতা সেই সব তারার তুলনায় অনেক কম বলে ওকে খুঁজে বার করা যাচ্ছে না। কিন্তু ওটি যে একদিন ধরা দেবেই সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই। লাওয়েল যখন ১৯১৫ সনে প্লুটো সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখনও ঠিক এই রকম হয়েছিল, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তখন তাকে পাওয়া যায় নি। পাওয়া গিয়েছিল পনেরো বছর পরে, ১৯৩০ সালে, আর ঠিক লাওয়েলের হিসেব মত নির্দিষ্ট জায়গাটিতেই। ত্র্যাডি বলছেন, এক্স গ্রহ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ রকমই ঘটবে। ভবিষ্যতে যখন আরও ভালো—আরও



রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ

সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি হবে তখন আর এগ্ন গ্রহ ধরা না দিয়ে পারবে না।

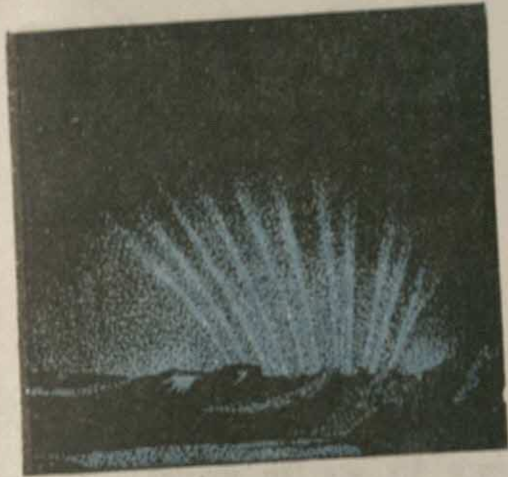
ভবিষ্যৎই বলে দেবে ব্র্যাডির এই অনুমান ঠিক কিনা।

ধূমকেতুর কথা

সূর্যের রাজত্বের সবচেয়ে বিচিত্র বস্তু বোধ হয় ধূমকেতু। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ কোথা থেকে এসে হাজির হবে, আবার তেমনি হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যাবে। দেখলে মনে হয় ওর যেন আসা-যাওয়ার কোনও নিয়ম নেই—একেবারে যাকে বলে ভবঘুরে বাউণ্ডুলে স্বভাব। আগেকার দিনে তো ধূমকেতুকে অত্যন্ত .অলক্ষুণে বলে মনে করা হ'ত। আকাশে ধূমকেতুর উদয় হলেই যে একটা কোন বিপর্যয় কাণ্ড ঘটবে এ বিষয়ে প্রায় সকলেই ছিলএকমত—তা সে মহামারীই হোক, বন্যা বা দুর্ভিক্ষই হোক, কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রবিপ্লব গোছের একটা কিছু উপলক্ষ করে প্রচুর লোকক্ষয়ই হোক। বিশেষ করে মধ্য-যুগে ইয়োরোপের লোকেরা তো এ বিষয়ে ছিল অসম্ভব কুসংস্কারাপন্ন। আকাশে বড় আকৃতির ধূমকেতু দেখা দিলেই গীর্জায় গীর্জায় প্রার্থনা শুরু হয়ে যেত—"হে ঈশ্বর, আমাদের বাঁচাও। এই অলক্ষুণে ধূমকেতুটাকে তাড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর।" ১৪৫১ সালে এই রকম একটা বিরাট ধূমকেতু দেখে স্বয়ং রোমের পোপ পর্যন্ত কি রকম বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন সে কথা হয়তো ইতিহাসের ছাত্রেরাও জানে। অবশ্য দুর্ঘটনা, মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ—এ তো পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও লেগেই আছে, কাজেই ধূমকেতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সেগুলির সময় মিলে যাওয়া খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়, এবং তাই থেকেই যে কুসংস্কারটা প্রশ্রয় পেয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধূমকেতুই যে ঐ সব দৈবদুর্বিপাকের কারণ তা সে যুগের লোকেরা বিশ্বাস করলেও এ যুগের মানুষ নিশ্চয়ই প্রমাণ ছাড়া মেনে নেবে না, এবং তা যে সত্যিই নয় তাও প্রমাণ করে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ধূমকেতুর ভিতরকার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবার পর সে বিশ্বাস আপনা থেকেই ভেঙ্গে গেছে।

ধূমকেতু দেখতে কেমন

বাস্তবিক ধূমকেতুর স্বরূপ জানবার পর সত্যিই তাকে ভয় করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য, স্বীকার করতেই হবে, চেহারাটা তার একটু কিম্ভূতকিমাকার। শরীরের একদিকে জলজলে ছোট্ট একটু তারার মত ঘন অংশ, তাকে ঘিরে রেখেছে ঝাঁকড়া চুলের মত খানিকটা ধোঁয়াটে পদার্থ, আর তার পেছনে রয়েছে ঝাঁটার মত এক যোজন-যোড়া পুচ্ছ বা লেজ। যেমন পুরু তেমনি লম্বা। সে কি সোজা লম্বা! পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। কোন কোন ধূমকেতুর লেজ তার থেকেও লম্বা। ৯।১০ কোটি মাইল লম্বা লেজ তো হামেশাই দেখা যায়, ৩০।৪০ কোটি মাইল লম্বা লেজ নিয়েও কোন কোন ধূমকেতুকে আসতে দেখা গেছে। চওড়ায়ও সেগুলো লক্ষ লক্ষ মাইল। কোন কোন ধূম-কেতুর আবার একটি লেজে মন ওঠে না, সেই "হুঁকো-মুখো হ্যাংলার" মত তাদের একসঙ্গে দু'টি লেজ—দু'টিই বা বলি কেন,—তিনটে,

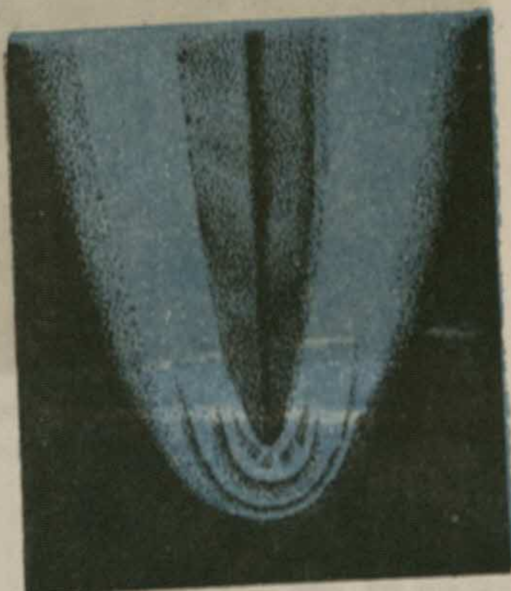


একসঙ্গে ছয়টি পুচ্ছযুক্ত অতিকায় ধূমকেতু
১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে সুইটজারল্যাণ্ড থেকে এটি এইভাবে
দেখা গিয়েছিল।

চারটে, এমন কি পাঁচ-ছ'টা পর্যন্ত লেজ থাকতে দেখা গেছে। মনে পড়ে, বছর কয়েক আগে এই রকম একটা পাঁচ-লেজওয়ালা ধূমকেতু এসে হাজির হয়েছিল আমাদেরও আকাশে। তাকে দেখবার জন্য আমরা শেষ রাত থেকে জেগে বসেছিলাম। তারপর ভোরের দিকে সূর্যোদয়ের একটু আগে পশ্চিম আকাশে খালি চোখেই সেই বিরাট পঞ্চপুচ্ছ বা পাঁচ-লেজ-ওয়ালা ধূমকেতু দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু বিরাট হলে কি হবে, ধূমকেতুর দেহটা অসম্ভব হাল্কা। এত হাল্কা যে তা প্রায় কল্পনাই করা যায় না। ঐ যে কোটি কোটি মাইল লম্বা লেজটি, ওটি আগাগোড়াই অসম্ভব পাৎলা গ্যাস দিয়ে তৈরি। এত পাৎলা যে ঐ কোটি কোটি মাইল জিনিসটিকে তেমন করে ঘন করে নিতে পারলে তা হয়তো একটা এক লিটার মাপের দুধের বোতলের মধ্যেই ভরে ফেলা যায়। আমরা যাকে বায়ুশূন্য পাত্র বলি তা তো আর সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য হয় না, অতি সূক্ষ্ম খানিকটা বাতাস থেকেই যায়। বিজ্ঞানীর ল্যাবোরেটরীর সবচেয়ে বায়ুশূন্য পাত্রে যেটুকু বাতাস থেকে যায় ধূমকেতুর ঐ লেজে তার চেয়েও কয়েক লক্ষ ভাগ কম গ্যাস থাকতে পারে। তার ভিতর দিয়ে দূর আকাশের তারা-গুলোও স্পষ্ট দেখতে কোন অসুবিধে হয় না।

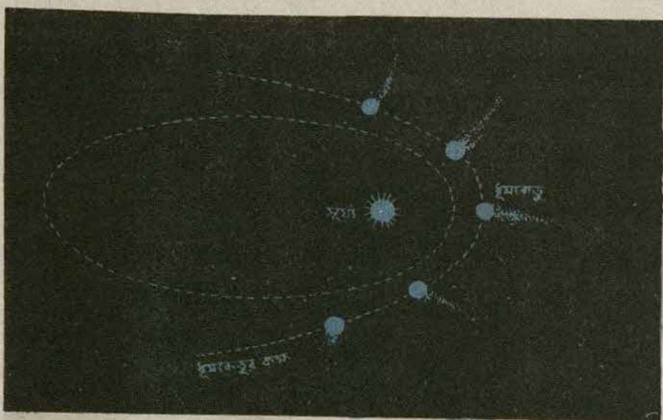
ধূমকেতুর আসল যা বস্তু তা থাকে ওর ওই তারার মত উজ্জ্বল অংশটুকুর মধ্যে, যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন। কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা, এটি সম্ভবতঃ অসংখ্য ছোট ছোট নিরেট পদার্থ দিয়ে তৈরি যা একসঙ্গে স্তূপাকার হয়ে ওখানে জমে রয়েছে। এই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রয়েছে



একটি অতিকায় ধূমকেতুর মাথা : নিউক্লিয়াসকে
ঘিরে রেখেছে কোমা।

ঝাঁকড়া চলের মত খানিকটা ধোয়াটে জিনিস —যাকে বলা হয় 'কোমা'। গ্রীক ভাষায় কোমা মানে লম্বা বা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। দেখতে চুলের মত বলেই ঐ নাম—যা থেকে ইংরেজীতে ধূমকেতুর নামই হয়ে গেছে "কোমেট"। বাংলাতেও ধূম মানে ধোঁয়া আর কেতু মানে নিশান। তা হলে ধূমকেতু হ'ল ধোঁয়ার নিশান।

ধূমকেতুর ঐ লেজটা কিন্তু সব সময়ে থাকে না। ধূমকেতু যখন সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়ে তখনই এটি গজিয়ে ওঠে, তারপর আবার যখন ধূমকেতু সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে লেজটিও আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে এক সময়ে মিলিয়ে যায়।



ধূমকেতু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যের যত কাছে আসছে তার পুচ্ছটি তত বড় হচ্ছে, আবার দূরে সরে যেতেই ছোট হয়ে আসছে।

হেলির আবিষ্কার

যখন তখন এসে হাজির হয় আর যখন তখন চলে যায় দেখে আগে লোকের ধারণা ছিল ধূমকেতুর চলাফেরার বুঝি কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। আকাশের রাজ্যে ওরা বুঝি এক ধরনের সৃষ্টিছাড়া বাসিন্দা। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। এডম্যাণ্ড হেলি নামে এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ প্রথম এই সত্যটি আবিষ্কার করেন।

সে প্রায় তিনশ' বছরেরও আগেকার কথা। নিউটন তখন ইংল্যাণ্ডে তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞান-জগতে এক নতুন আলোড়ন এনেছেন। হেলি ছিলেন এই নিউটনেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু। শুধু বন্ধু ন'ন, তিনিও ছিলেন মস্ত বড় বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। হেলির আগে যে সব বড় বড় জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত গ্রহ-তারা সম্বন্ধে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন হেলি সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন এবং নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। ধূমকেতু সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা দারুণ কৌতূহল ছিল। হেলির সময়ে, ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে, হঠাৎ আকাশে একটি বড় আকারের ধূমকেতু দেখা দিল। হেলি ঠিক করলেন নিউ-টনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে এই ধূমকেতুটির গতিবিধি তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন। পরীক্ষা করতে করতে তিনি বুঝতে পারলেন এই ধূমকেতুটিও মাধ্যকর্ষণ তত্ত্ব মেনে নিয়েই ঘুরছে। হেলির আগে পুরোনো যুগের জ্যোতির্বিদ্‌রা ধূমকেতু সম্বন্ধে যে সব তথ্য লিখে রেখে গেয়েছিলেন হেলির তা জানা ছিল। তিনি দেখলেন ১৬০৭, ১৫৩১ এবং

১৪৫৬ সালেও অনুরূপ একটি ধূমকেতু আকাশে দেখা দিয়েছিল এবং এই ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে আসা ধূমকেতুটিকে আকাশের যে জায়গায় দেখা যাচ্ছে সেগুলোও ঠিক সেই জায়গায়ই দেখা দিয়েছিল। তা হলে এগুলি কি সব আসলে একই ধূমকেতু—৭৫।৭৬ বছর পর পর ফিরে আসছে? নিশ্চয়ই তাই। আর তাই যদি হয় তা হলে ধূমকেতুদেরও ঘুরবার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে, একটা বাঁধাধরা নির্দিষ্ট পথও আছে এবং এই বিশেষ ধূমকেতুটির বেলা দেখা যাচ্ছে সেই পথটি পার হতে তার ৭৫।৭৬ বছর লাগে। এ কথা যদি সত্যি হয় তা হলে ১৭৫৭ কিংবা ১৭৫৮ সালে ধূমকেতুটি নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসবে।

৭৫ বছর পরে যখন ধূমকেতুটির ফিরে আসবার সময় হ'ল তখন পণ্ডিতেরা হিসেব করে অঙ্কটঙ্ক কষে বললেন, এবারে বৃহস্পতি আর শনির টানে পড়ে ধূমকেতুটির আসতে এক-আধ বছর দেরি হতে পারে। কিন্তু হেলির ধারণা যদি সত্যি হয়, তা হলে ১৭৫৯ সালে সেটি নিশ্চয়ই দেখা দেবে। আর, আশ্চর্য কাণ্ড, সত্যিই তাই হ'ল। ১৭৫৯ সালে আবার ধূমকেতুটিকে দেখা গেল, আকাশের ঠিক সেই জায়গাটিতেই। অর্থাৎ হেলির ধারণা নির্ভুল। ধূমকেতুরাও আকাশ রাজ্যের বেহিসেবী বাসিন্দা নয়, তাদেরও ঘুরবার একটা করে নির্দিষ্ট নিয়ম আছে।

হেলির জয় জয়কার পড়ে গেল। মহাকাশের একটা মস্ত বড় রহস্যের সমাধানও হয়ে গেল। হেলির নাম থেকেই ঐ বিশেষ ধূমকেতুটির নাম রাখা হ'ল 'হেলির ধূমকেতু'।



হেলির ধূমকেতু
(১৯১০ সালে যেমনটা দেখা গিয়েছিল)

হেলির ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৭৫।৭৬ বছর পর পর ঐ ধূমকেতুটির আবার ফিরে ফিরে আসার কথা। তা সে এসেছেও। একবার ১৮৩৫ সালে। আর একবার ১৯১০ সালে। এরপর ১৯৮৬ সালে আবার তাকে দেখা যাবে।

ধূমকেতুর চলাফেরা

বড় বড় ধূমকেতুগুলি খালি চোখেই স্পষ্ট দেখা যায় এবং ওদের চালচলন যাঁদের জানা নেই তাঁরা সহজেই ওদের দেখে ভয় পান কিংবা, ভয় না পেলেও, খুবই অবাক্ হয়ে যান। কিন্তু ধূমকেতু আকাশে অজস্র আছে, তেমন তেমন শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখলে হামেশাই তাদের দেখা পাওয়া যেতে পারে। যেগুলো বড় এবং উজ্জ্বল সেগুলোর তো কথাই নেই, যেগুলো খুব অস্পষ্ট এবং ছোট সেগুলোও ধরা পড়ে এবং প্রতি বছরই বিজ্ঞানীরা এ রকম কিছু কিছু নতুন নতুন ধূমকেতু আবিষ্কার করে চলেছেন। যাঁরা সত্যিকার বিজ্ঞানী ন'ন, অনেকটা শখ করে বিজ্ঞান চর্চা করেন, তাঁরাও অনেকে নতুন নতুন ধূমকেতু আবিষ্কার করতে ছাড়েন নি। তবে সব ধূমকেতুর ঘুরবার পথ তো এক রকম নয় এবং ঘুরবার নিয়মও এক একটার এক এক রকম। কোনটা হয় তো ৩।৪ বছর পর পরই ফিরে আসে (এ পর্যন্ত ৩·৩ বছরের কম সময়ে কাউকে ফিরে আসতে দেখা যায় নি), কোন কোনটা কয়েকশ' বা কয়েক হাজার বছর পর পর দেখা দিতে পারে, আবার কোনটা বা লক্ষ লক্ষ কিংবা কোটি কোটি বছর পরে ফিরে আসে। ১৯১৪ সালে এ রকম একটা ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল। পণ্ডিতেরা আঁকজোঁক কষে বলছেন এটি আবার একবার ফিরে আসতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ বছর লেগে যাবে। আবার এমন ধূমকেতুর কথাও জানা গেছে যা আর কোন কালেই ফিরে আসবে না। পৃথিবী থেকে ৪ আলোক বর্ষ অর্থাৎ ২৪ লক্ষ কোটি মাইল দূরেও কোন কোন ধূমকেতুর কক্ষপথ আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

গ্রহদের মত ধূমকেতুও সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে, কিন্তু সূর্য থেকে সমান দূরত্ব রেখে নয়। বেশির ভাগ ধূমকেতু, যারা ফিরে আসে, তারা ডিমের মত পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে—অঙ্কের ভাষায় যে পথকে বলে উপবৃত্ত বা ইলিপ্‌টিক্যাল। ঘুরবার সময় কিন্তু সূর্য ঐ ডিম্বাকৃতি পথের মাঝখানে থাকে না, থাকে একটু কোণের দিকে। ধূমকেতু বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে না, তার কারণ সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহদের টানে ওর বৃত্তাকার পথও ডিমের মত চ্যাপ্টা হয়ে যায়। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ধূমকেতু সূর্যের খুব কাছাকাছি চলে আসে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই জায়গাটিকে বলা হয় ধূমকেতুর পেরিহিলিয়ন। আবার যখন ঘুরতে ঘুরতে সে সূর্যের কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে চলে যায় তখন তার সেই জায়গাটিকে বলা হয় অ্যাপ্‌হিলিয়ন। তোমরা অঙ্কের বইএ প্যারাবোলা বা হাইপার-বোলার কথা পড়ে থাকবে। ধূমকেতুর কক্ষপথ যদি কোন কারণে প্যারাবোলা বা হাইপার বোলার মত হয়ে যায় তা হলে সে একবার সূর্যের কাছ বরাবর ঘেঁষে সেই যে চলে যাবে আর তার কোন দিন ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

ধূমকেতুর লেজটি আসলে কি

আগেই বলেছি ধূমকেতু যখন ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে তখনই তার লেজটি গজিয়ে ওঠে। এই সময় ধূমকেতুর গতিবেগ খুব বেড়ে যায়—ভাবখানা যেন কোন রকমে সূর্যের হাত থেকে লেজটি বাঁচিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসতে পারলেই হয়।

ধূমকেতুর এই লেজ কেন গজায়, কেনই বা খসে পড়ে তার কারণ এখন বিজ্ঞানীরা বার করেছেন। ধূমকেতু যখন ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে (কাছাকাছি বলতে ১০ কোটি মাইল বা ঐ রকম) তখন সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে তার নিউক্লিয়াসের ওপরের দিক্‌টা গ্যাস হয়ে বেরিয়ে আসে আর ঐ ঝাঁকড়া চুলের মত ধোঁয়াটে কোমার মধ্যে গিয়ে জড় হয়। নিউক্লিয়াসের গুঁড়ো বা ধুলোও হয়তো তার মধ্যে খানিকটা থাকে। তার পর ধূমকেতু যখন সূর্যের আরও কাছে চলে আসে তখন সূর্যের আলো আর তাপ ঐ গ্যাসের ওপর চাপ দিতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই চাপকে বলে রেডিয়েশন প্রেশার। এই রেডিয়েশন প্রেশারের ফলেই সেই পাৎলা গ্যাস লেজের চেহারা নিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসে ধূমকেতুর যেদিকে সূর্য তার ঠিক উল্টো দিকে। সূর্যের তাপও যেমন প্রচণ্ড, আলোও তেমনি। কাজেই ঠেলা খেয়ে অনেক সময়েই সেই গ্যাস লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি মাইল লম্বা ঝাঁটার মত চেহারা ধারণ করে। ধূমকেতুর নিউ-ক্লিয়াস আর কোমা একত্র ধরে তাকে বলা হয় ধূমকেতুর মাথা, আর লেজটি থাকে তার ঠিক পেছন দিকে। সূর্য থেকে দূরে চলে এলে ধূমকেতুর গতিবেগ কমতে থাকে, যে গ্যাস দিয়ে ওর লেজটি তৈরি হয়েছিল সেটিও আস্তে আস্তে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে আর আমরা দেখি লেজটি আস্তে আস্তে খসে যাচ্ছে।

কি গ্যাস আছে ধূমকেতুর এই লেজে? ধূমকেতুর আলো পরীক্ষা করে জানা গেছে ওর মধ্যে সায়ানোজেন, কার্বন মোনোক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি নানা রকম গ্যাস আছে। কতক ভেঙ্গে গিয়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আকারেও আছে। এর মধ্যে প্রথমটি খুবই বিষাক্ত, কার্বন মোনোক্সাইডও কম যায় না। পৃথিবীর আকাশ ছুঁয়ে যাবার সময় ঐ বিষাক্ত গ্যাস কি পৃথিবীর কোন ক্ষতি করতে পারে? নিশ্চয়ই না। কারণ, আগেই বলেছি, ঐ গ্যাস এত পাৎলা যে ওর মধ্যে বস্তু বলতে এত সামান্য পরিমাণ আছে যে তা আমরা টেরও পাব না।

ধূমকেতুর আলো

ধূমকেতুকে উজ্জ্বল বলেছি। ধূমকেতুর উজ্জ্বলতার প্রধান কারণ সূর্যের আলো। সূর্যের আলোই ধূমকেতুর গায়ে পড়ে ঠিকরে আসে, তাই ওকে ওই রকম জ্বলজ্বলে মনে হয়। তবে ধূমকেতু সূর্যের অদৃশ্য আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনী রশ্মিও শুষে নিতে পারে এবং তার পর সে রশ্মি দৃশ্য আলোয় রূপান্তরিত করতে পারে। ধূমকেতুর উজ্জ্বলতার এও খানিকটা কারণ। সূর্যের কাছে গেলে স্বভাবতঃই ধূমকেতু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু তার চেয়েও উজ্জ্বল হয় যখন সে পৃথিবীর কাছে এসে পড়ে।

ধূমকেতুর লেজের তুলনায় মাথাটা অনেক ছোট হলেও সেটিও নেহাৎ কম নয়—পৃথিবীর ব্যাসের চাইতে বেশির ভাগ ধূমকেতুরই মাথার ব্যাস বড়। কোন কোনটা সূর্যের চাইতেও বড়। তবে মাথার ঠিক ভিতরে যে নিউক্লিয়াস অংশ, সেটি কিন্তু খুব ছোট। দশ-বারো কোটি মাইল লম্বা যার লেজ তার নিউক্লিয়াসের ব্যাস হয়তো ১০০ মাইলও হবে না। যেটির লেজ

কয়েক লক্ষ মাইল সেটির নিউক্লিয়াসের ব্যাস হয়তো মাত্র ২ মাইল। পৃথিবীর আকাশে চলে-আসা ধূমকেতু পরীক্ষা করেই পণ্ডিতেরা এ সব তথ্য বার করেছেন।

ধূমকেতুও ভেঙ্গে যায়

সূর্যের কাছে এসে পড়লে ধূমকেতুকে সূর্য প্রবল ভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। যতবার সে সূর্যের কাছে যায় ততবারই এই কাণ্ডটি ঘটে। ফলে সেই টানের চোটে কখনও কখনও ধূমকেতুর দেহ ভেঙ্গে বা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয় এবং এ রকম হয়ও। বিয়েলা নামে এক বিজ্ঞানী একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করেছিলেন যেটি প্রতি সাড়ে ছ'বছর অন্তর একবার করে ফিরে আসত। ১৮৪৫-৪৬ সালে হঠাৎ দেখা গেল ধূমকেতুটি ভেঙ্গে দু'টি টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু দু'ভাগ হয়ে গেলেও তারা একে অপরের সঙ্গ ছাড়ল না, একই সঙ্গে দু'টি পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল এবং পরের বার, অর্থাৎ ১৮৫২ সালে, যখন ধূমকেতুটির আসবার কথা তখন দেখা গেল একটি টুকরো অপরটির ঠিক পেছনে পেছনে সেই একই পুরোনো কক্ষপথে ছুটে চলেছে। এর পরে দু'-দু'বার অর্থাৎ ১৮৫৯ ও ১৮৬৬ সালে তাদের আর দেখা গেল না; কিন্তু ১৮৭২ সালে ঠিক তাদের আসবার সময়টিতে খানিকক্ষণ প্রবল উল্কাবৃষ্টি হ'ল। পণ্ডিতেরা এবার বুঝতে পারলেন, বিয়েলার সেই ধূমকেতুটি আরও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে উল্কায়। সেই উল্কাগুলোই একসঙ্গে বৃষ্টির মত ঝরে পড়ে ঐ কাণ্ড ঘটিয়েছে। বিয়েলার ধূমকেতুর মত আরও বহু ধূমকেতু এইভাবেই ভেঙ্গে গিয়ে উল্কায় পরিণত হয়েছে এবং যখন তাদের আসবার কথা তখন পূর্ব-শরীরে না এসে উল্কাবৃষ্টির রূপ ধরে দেখা দিয়েছে।

পারিবারিক ধূমকেতু

সময় সময় অতিকায় গ্রহদের পাল্লায় পড়ে ধূমকেতুদের গতিপথ বদলে যায় সে কথা আগেই বলেছি। বৃহস্পতির এ গুণটি খুব বেশি। বহু ধূমকেতুই তার পাল্লায় পড়ে কক্ষভ্রষ্ট হয়ে ছোট ছোট ডিম্বাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই ধূমকেতুগুলোকে তাই বৃহস্পতি—পরিবারের ধূমকেতু বলা হয়। এ রকম শনি, নেপচুন প্রভৃতি গ্রহেরও নিজস্ব পারিবারিক ধূমকেতু আছে। হেলির সেই বিখ্যাত ধূমকেতুটি নেপচুনের পরিবারভুক্ত বলে জানা গেছে।

এই প্রসঙ্গে ধূমকেতু কি ভাবে জন্মায় সে প্রশ্নও মনে জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ মনে করেন ধূমকেতু গ্রহ থেকেই তৈরি হয়,- গ্রহের হাল্‌কা বস্তুকণা থেকে। কারো কারো মতে বড় বড় গ্রহাণুরা পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করার সময় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গিয়ে ধূমকেতুর জন্ম। কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে সূর্য আর তার নিকটতম নক্ষত্রের মাঝখানেই ধূমকেতুর উৎপত্তিস্থান। কয়েক শ' কোটি ধূমকেতুর আস্তানা ওখানে।

উল্কার কথা

ধূমকেতু ভেঙ্গে যাবার ফলে উল্কার সৃষ্টি হতে পারে একটু আগেই এ কথা বলেছি।

এই উল্কা জিনিসটি কি? চলতি কথায় লোকে ওকে বলে তারা খসে পড়া। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ হুশ্ করে আকাশের গায়ে হাউই বাজির মত কি একটা আলোর ঝলক দিয়ে ছুটে গেল—এ দৃশ্য হয়তো অনেকেরই চোখে পড়েছে। মনে হয় সত্যি বুঝি আকাশের ওই অনন্ত নক্ষত্ররাজির একটি নক্ষত্র তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে খসে পড়ল এবং এক ঝলক আলো দিয়ে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সত্যি তা সম্ভব নয়। কারণ নক্ষত্রগুলি নিজেরাই এক একটা সূর্য, আকারেও বেশির ভাগই আমাদের সূর্যের চাইতে অনেক বড়। তার কোনটা যদি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে তা হলে তা এখানে পৌঁছবার অনেক আগেই সমস্ত পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ছাই কেন, একেবারে বাষ্পীভূত হয়ে মহাশূন্যে মিশেও যেতে পারে। তা ছাড়া তারাগুলো এত দূরে রয়েছে যে তাদের পক্ষে ওভাবে পৃথিবীর আকাশে ছুটে আসা মোটেই সম্ভব নয়। আমাদের সবচেয়ে যে কাছের তারাটি সেটিরই দূরত্ব পৃথিবী থেকে প্রায় ২৬ লক্ষ কোটি মাইল।

তা হলে ওগুলো যে আকাশের খসে-পড়া তারা নয় সে বিষয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। ওগুলোই উল্কা।

গ্রহেরা আমাদের সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, ঘুরছে ধূমকেতুরাও অনেকে, কিন্তু ওরাই কেবল সৌর জগতের বাসিন্দা নয়। বাসিন্দা আরও আছে। লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি জড়পিণ্ড সারা সৌর জগতে ছিটিয়ে রয়েছে এবং সবাই একই নিয়মে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এদের কোন কোনটা হয়তো এত ছোট যে একটা ধুলোর কণাও তাদের চাইতে বড় বলে মনে হবে। আবার কোন কোনটা এত বড় যে তাদেরকে ছোটখাট গ্রহ না বললেও গ্রহকণা বললে একটুও ভুল বলা হবে না। তাদের কোন কোনটা ওজনে দশ-বিশ টন তো বটেই—এমন কি লক্ষ লক্ষ টন হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। এদের সকলকেই বলা হয় উল্কা।

উল্কাপাত কি করে হয়

এখন, সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময়েই উল্কাদের কতকগুলি পৃথিবীর রাস্তায় এসে হাজির হয়। সে রকম হ'লে আর রক্ষা নেই, পৃথিবী সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধরে এমন জোরে টানতে শুরু করে দেবে যে তখন আসল রাস্তা ছেড়ে তাদের পৃথিবীর আকাশে নেমে না এসে উপায় নেই। আর এই নামা শুরু হবে প্রচণ্ড বেগে। সে কি যেমন তেমন বেগ! একটা বন্দুকের গুলি যত জোরে ছুটে যায় এক একটা উল্কার গতিবেগ সময় সময় তার ১০।১২ গুণও ছাড়িয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ সেকেণ্ডে ২০।২৫ মাইল বেগে সে নামতে শুরু করে। আবার, পৃথিবীকে চারদিকে ঘিরে রেখেছে একটা পুরু বাতাসের পর্দা, কয়েক শ' মাইল পুরু—যাকে আমরা বলি বায়ুমণ্ডল। নামতে নামতে উল্কা যখন এই বাতাসের রাজ্যে ঢুকে পড়ে তখন বাতাসের অণুগুলির সঙ্গে তার হয় প্রচণ্ড সংঘর্ষ। ফলে সে উল্কা মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড রকম উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। তার ভিতরকার যাবতীয় পদার্থ গলে গিয়ে দেখতে দেখতে গ্যাস বা বাষ্পাকারে পরিণত হয়। আর সেই গ্যাস

তখন দপ্ করে জ্বলে ওঠে। সেই আলোটাই আমরা দেখতে পাই আর মনে করি বুঝি আকাশ থেকে কোন নক্ষত্র খসে পড়ল।

উল্কাপাতের পরে

উল্কা পুড়ে গেলেও তার ছাইগুলো কিন্তু আকাশে ভাসতে থাকে এবং ক্রমে আস্তে আস্তে পৃথিবীর গায়ে ঝরে পড়ে। খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উল্কাকণাগুলো অবশ্য না জ্বলেও সোজা বাতাসের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর ওপর ঝরে পড়তে পারে। এই উল্কা-পোড়া ছাই বা সূক্ষ্ম উল্কার কণা আমাদের চারদিকে ক্রমাগতই ঝরে পড়ছে। আমাদের আশেপাশে—মাঠে-ময়দানে, ঘরে-দুয়ারে, মেঝেতে প্রতিনিয়ত যে ধুলো এসে জমছে তার মধ্যে এই উল্কার ছাই ও কণা প্রচুর পরিমাণে মিশে থাকে। চোখে দেখে আমরা সেগুলোকে চিনতে পারি না কিন্তু বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে ঠিক বলে দিতে পারেন—কোন্‌টা উল্কার ধুলো, কোন্‌টা অন্য জিনিসের গুঁড়ো থেকে তৈরি ধুলো। তাঁদের মতে প্রত্যহ অন্ততঃ দু' কোটি উল্কা এই ভাবে পুড়ে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছে। তাদের মোট ওজন অন্ততঃ পক্ষে দশ হাজার টনের কম হবে না। দশ হাজার টন মানে মণের হিসাবে প্রায় পৌণে তিন লক্ষ মণ। মণের হিসেব অবশ্য উঠে গেছে, কিন্তু এখনও সঠিক ওজন বুঝতে আমরা মণের হিসেব পেলেই চট্‌পট্ বুঝে নিতে পারি। এক মণ প্রায় ৩৭ কিলোগ্রামের সমান।

উল্কাপিণ্ড

সব উল্কাই কিন্তু পুড়ে আকাশের গায়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। বড় বড় উল্কাগুলি পুড়তে পুড়তেও তাদের শরীরের খানিকটা অংশ থেকে যায় আর সেগুলি তখন ভীষণ বেগে এসে পড়ে পৃথিবীর মাটিতে। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়, উল্কা তা ভেদ করে প্রায়ই অনেকটা গভীরে ঢুকে যায়। উল্কার এই টুকরোকে আমরা বলি উল্কাপিণ্ড।

কাজেই দেখা যাচ্ছে উল্কাপিণ্ডগুলো হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর অতিথি, যা মহাশূন্য থেকে ছিটকে এসে পড়ছে। ওদের সবগুলোই ধূমকেতুর টুকরো নয়, হয়তো কোন বিরাট গ্রহ-কণারই ভাঙ্গা অংশ সেগুলি, আর মহাকাশের প্রতিনিধি হিসেবে এ-যাবৎ কাল এরাই সাক্ষাৎ ভাবে আমাদের নানা রকম তথ্য যুগিয়ে আসছে। উল্কার উপাদান পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে নানা খবর নির্ভুল ভাবে জানতে পেরেছেন।

উল্কার উপাদানের মধ্যে অক্সিজেন ছাড়া বেশির ভাগই পাওয়া গেছে লোহা। এ ছাড়া নিকেল, কোবাল্ট, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতু এবং সিলিকন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস্ প্রভৃতি অন্যান্য মৌলিক পদার্থও পাওয়া গেছে। কোন কোন উল্কায় তেজস্ক্রিয় পদার্থও পাওয়া গেছে, আর পাওয়া গেছে কার্বন। কোন কোন বিজ্ঞানী কার্বন পরীক্ষা করে উল্কার মধ্যে অন্য লোকের ফসিল উদ্ভিদ্ বা জীবকোষ পেয়েছেন বলেও দাবী করেছেন। তবে সে সম্বন্ধে সকলে একমত ন'ন। যাই হোক, উল্কার এই সব উপাদান পরীক্ষা করে মনে হয় যে পৃথিবী যা দিয়ে তৈরি মহাকাশের অন্যান্য বাসিন্দারাও মোটামুটি সেই সব জিনিস দিয়েই

তৈরি। কারণ ওপরে বর্ণিত ঐ সমস্ত জিনিসই আমাদের পৃথিবীতেও রয়েছে। তবে তাদের পরিমাণ হয়তো সময় বিশেষে একটু আলাদা।

নানা ধরনের উল্কাপিণ্ড

উপাদান অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা উল্কাপিণ্ডদের নানা শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়ে তাদের কয়েক রকম নামকরণও করেছেন। যেমন লোহা-উল্কা, পাথুরে উল্কা ইত্যাদি। লোহা-উল্কায় শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি থাকে লোহা, বাকিটা নিকেল। সামান্য কিছু কোবাল্ট্, ফস্‌ফরাস্—এ সবও থাকতে পারে। পাথুরে উল্কায় লোহার ভাগ অনেক কম—শতকরা ১৫।১৬ ভাগ। এখানে অক্সিজেন আর সিলিকনের ভাগ বেশি। অর্থাৎ এগুলিকে বেলে পাথরের অনুকরণে বেলে-উল্কাও বলা চলে। লোহা-পাথুরে উল্কা যেন প্রথম দু'টি মিশিয়ে তৈরি। উল্কার মধ্যে যে লোহা থাকে তা প্রায় খাঁটি লোহা। প্রাচীন কালে, যখন মানুষ খনি থেকে লোহা বার করার পদ্ধতি জানত না, তখন কোন কোন দেশে এই উল্কা-থেকে-পাওয়া লোহাই ছিল একমাত্র লোহার ভাণ্ডার। অ্যাডমিরাল পেরি গ্রীনল্যাণ্ডে একবার একটি বিরাট উল্কাপিণ্ড আবিষ্কার করেছিলেন যার ওজন ছিল ৩৬ টনেরও বেশি। শত শত বছর ধরে ঐ অঞ্চলের লোকেরা তাদের দরকারের যাবতীয় লোহা ঐ উল্কাপিণ্ডটি থেকে সংগ্রহ করে আনত। তা হলে বোঝা যাচ্ছে আগে ঐ উল্কাপিণ্ডে আরও কত বেশি লোহা ছিল।

উল্কা ছোটবড় নানা রকম হতে পারে বলেছি। বড় উল্কাগুলো আকাশে নিঃশেষ না হয়ে মাটিতে এসে পড়ে তাও বলেছি। বড় বলতে কত বড় সে প্রশ্ন সহজেই মনে আসবে। তোমরা, যারা কলকাতার যাদুঘর দেখেছ, তারা নিশ্চয়ই এ রকম উল্কাপিণ্ড অনেক দেখেছ। ওর জন্য যাদুঘরে একটা আলাদা ঘরই আছে। যারা দেখ নি, সুযোগ পেলেই দেখে নিও। পাঁচ কে.জি. দশ কে.জি., বিশ কে.জি.—নানা ওজনের, নানা আকারের উল্কাপিণ্ড সাজানো আছে সেখানে। কিন্তু তেমন বড় বড় উল্কাপিণ্ডের তুলনায় এগুলি কিছুই নয়।

অতিকায় উল্কাপিণ্ড

বড় উল্কা বলতে ১৯০৮ সালে সাইবেরিয়ায় যে উল্কাটি পড়েছিল তার কথা বলা যেতে পারে। সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা ওই উল্কাপাতের চমৎকার বিবরণ দিয়ে গেছেন। প্রথমে তো সকলে ভেবেছিলেন মাটি ফুঁড়ে বুঝি কোন নতুন আগুনে পাহাড় গজিয়ে উঠল। কারণ আগুনে পাহাড় থেকে আগুন বেরোবার সময় যেমন আকাশ লালে লাল হয়ে যায়, মাটি থর থর করে কাঁপতে থাকে—সেদিনও সেই রকম কাণ্ড হয়েছিল। অবশ্য ঠিক তখনই বিজ্ঞানীরা কারণটা জানতে পারেন নি, অনুমানও করতে পারেন নি। জানা গেল বেশ কিছু দিন পরে যখন উল্কাপাতের জায়গাটা খুঁজে পাওয়া গেল। ভাগ্যিস উল্কাটা পড়েছিল একটা জঙ্গলের মধ্যে, তাই লোকক্ষয় তেমন হয় নি। কিন্তু বুনো জানোয়ার যে কত মারা পড়েছিল তার যেন সীমা-সংখ্যা নেই! সমস্ত বনভূমি হাজার হাজার মৃত জন্তুর কঙ্কালে ছেয়ে গিয়েছিল।

আশপাশের সত্তর মাইল জায়গা জুড়ে একটি গাছও রেহাই পায় নি—সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। এমন কি ঐ জায়গা থেকে ৫০।৬০ মাইল দূরে যে সব গ্রাম ছিল সেখানকারও অনেক ঘরবাড়ি জ্বলে গিয়েছিল। ওখানে কাছাকাছি কোন বড় শহর থাকলে তার কি ভয়াবহ অবস্থা হ'ত তা কল্পনা করাই কঠিন।

অত বড় অগ্নিকাণ্ডের কারণ কিন্তু শুধু জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডটিই নয়। উল্কা যখন প্রচণ্ড বেগে নেমে আসে তখন তার তলাকার বাতাসটায়ও প্রচণ্ড চাপ পড়ে। ফলে সেখানটাও প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তার পর মাইলের পর মাইল জুড়ে চলতে থাকে আগুনের সেই তাণ্ডব লীলা।

এ রকম বড় উল্কাপাতের ঘটনা আরও শোনা গেছে। গ্রীনল্যাণ্ডের উল্কাটির কথা তো আগেই বলেছি। কিন্তু সে তো বহুদিন আগের কথা। গত ২০।২৫ বছরের মধ্যেও পৃথিবীর নানা জায়গায় অতিকায় উল্কাপিণ্ড-পাতের খবর জানা গেছে। রুশ বিজ্ঞানীরা ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে এ রকম ৩৭ টন উল্কাপিণ্ডের টুকরো সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে একটি টুকরো ছিল ১৭৪৫ কিলোগ্রাম। তার সবটাই প্রায় লোহা। এত বড় ধাতব উল্কাপিণ্ড এ যুগে বড় একটা পড়তে দেখা যায় নি। তবে হ্যাঁ, ১৯৪৭ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভ্লাডিভস্টকের কাছে উসুরি টাইগা নামে একটা জায়গায় ঐ রকম একটা অতিকায় উল্কাপাত ঘটেছিল বটে! পড়বার সময় সেটা টুকরো টুকরো হয়ে জ্বলন্ত লোহার রূপ নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে আশপাশ জুড়ে শতাধিক বড় বড় গহ্বর তৈরি হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলেছেন ঐ উল্কাটা বায়ুমণ্ডলের ওপর এসে পড়বার আগে ওজনে একশ' টনেরও বেশি ছিল। একশ' টন হচ্ছে প্রায় ২৮০০ মণ, অর্থাৎ ২৮০০ × ৩৭ কে.জি।

আদ্যিকালের উল্কাপাত

কিন্তু পুরোনো আমলে, অর্থাৎ আদ্যিকালে, —যাকে আমরা ভালো বাংলায় বলি প্রাগৈতিহাসিক বা ভূতাত্ত্বিক যুগ,– যে সব উল্কাপাত পৃথিবীতে ঘটেছে তাদের তুলনায় এ সব উল্কাপাত কিছুই না। আমেরিকার আরিজোনা অঞ্চলে একটা বিরাট গহ্বর খুঁজে পাওয়া গেছে। এই গহ্বরটির বেড় প্রায় তিন মাইল। গহ্বরটি বালি পাথরে এখন অনেকটা ভরাট হয়ে গেছে, কিন্তু তার আগে এটি ১৩০০ ফুটেরও বেশি গভীর ছিল। বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানতে পেরেছেন যে এই অতিকায় গহ্বরটির সৃষ্টি হয়েছিল একটি অতিকায় উল্কাপাতের ফলে। হিসেব করে জানা গেছে যে এই উল্কাপাতটি ঘটেছিল আজ থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এবং যে উল্কাপিণ্ডটি পড়েছিল তা ওজনে ২৬ লক্ষ টনের কম তো নয়ই,—এমন কি ৭৮ লক্ষ টন পর্যন্ত হওয়াও অসম্ভব নয়।

এই রকম আর একটা অতিকায় গহ্বর পাওয়া গেছে ওডেসা অঞ্চলে। এই গহ্বরটির ব্যাস ৫০০ ফুট। এটিও তৈরি হয়েছে উল্কাপাতের ফলে এবং পণ্ডিতদের ধারণা সেই ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে। ওখানকার কয়েকটি ফসিল পরীক্ষা করে এই সময়টি জানা গেছে।

এর চাইতেও বড় উল্কাপাত যে ঘটে নি এমন নয়। আফ্রিকার ঘানা অঞ্চলে বোস্মুমটট্ই হ্রদ নামে একটি বিরাট হ্রদ আছে। জার্মেনীতেও স্টেইনহাইম্ অঞ্চলে আছে অনুরূপ আর একটি বিরাট হ্রদ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ দু'টি হ্রদই সৃষ্টি হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে দু'টি অতিকায় উল্কাপিণ্ডপাতের ফলে। হ্রদের আকৃতি থেকেই আন্দাজ করা যায় না-জানি কী ভয়াবহ আকারের ছিল সেই উল্কাপিণ্ড দু'টি! আরিজোনা বা ওডেসার উল্কাপিণ্ডকে যদি অতিকায় উল্কাপিণ্ড বলা হয়, তবে এ দু'টিকে নিশ্চয়ই বলতে হবে অতি-অতিকায় উল্কাপিণ্ড।

আজকালকার পণ্ডিতেরা উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করে তার সঠিক বয়স বলে দিতে পারেন। তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন মাপবার উপায় বার হবার পরই এটা সম্ভব হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭০০ কোটি বছরের পুরোনো একটি উল্কাপিণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে বলা হয়েছে। তবে কি পৃথিবীর জন্মেরও আগে এটির জন্ম হয়েছিল।

উল্কাবৃষ্টি

ধূমকেতু ভেঙ্গে উল্কা হয় এ কথা আমরা আগেই বলেছি। আর ধূমকেতু সম্বন্ধে আমাদের যা খবর তাতে ধূমকেতুর লেজ ছিঁড়ে উল্কা তৈরি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ধূমকেতুর মাথাটা,—বিশেষ করে নিউক্লিয়াস্‌টা যদি কোন কারণে ভেঙ্গে যায়, তা হলেই উল্কা বা উল্কাবৃষ্টির সৃষ্টি হতে পারে। উল্কাবৃষ্টি বলতে একসঙ্গে ক্রমাগত উল্কাপাত বোঝায়। ঘণ্টায় ৫।৭টা থেকে শুরু করে হাজার হাজার উল্কাপাত ঘটতে পারে।

১৮৩৫ সালে একবার এক জায়গা থেকে এক ঘণ্টায় ৩৫ হাজার উল্কাপাত দেখা গিয়েছিল। এ যেন বৃষ্টি নয়—অতিবৃষ্টি! যাঁরা সে দৃশ্য দেখেছিলেন তাঁরা অনেকেই ভেবেছিলেন এইবার বুঝি সত্যি সত্যিই



১৮৩৫ সালের একটি উল্কাবৃষ্টি, যা নাকি গ্রেট লিওনিড উল্কাবৃষ্টি নামে পরিচিত।
(সমসাময়িক এক শিল্পীর আঁকা ছবি থেকে)

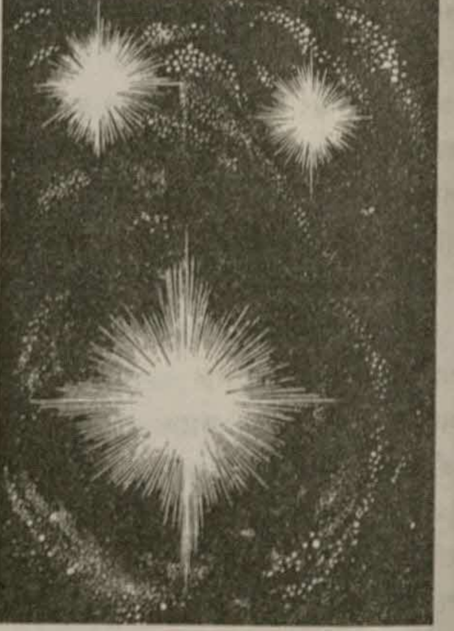
প্রলয় এল—পৃথিবী ধ্বংস হতে আর দেরি নেই। এর কাছাকাছি রকমের উল্কাবৃষ্টি এর পরেও অনেকবার ঘটেছে। ঘটেছে ১৯৩৩ সালে ইয়োরোপে, ১৯৪৬ সালে উত্তর

আমেরিকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা সে দৃশ্য দেখে কি রকম ভয় পেয়েছিলেন সে কথাও তখন কাগজে বেরিয়েছিল।

উল্কাপাত যদি দেখতে চাও

বছরের কোন একটা বিশেষ বিশেষ সময়ে একটু বেশি রকম উল্কাপাত দেখা যায়। তোমরা **যদি দেখতে চাও** তবে এই এই তারিখগুলো মনে রেখ। ২১শে এপ্রিল, অগাস্টের ৯ থেকে ১১ তারিখ আর নভেম্বরের ২৭ তারিখ। ঐ তারিখের দিনগুলিতে একটু বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থেকে যদি ধৈর্য ধরে আকাশের দিকে লক্ষ রাখতে পার তবে তোমরাও এ রকম উল্কাপাত অনেক দেখতে পাবে। অবশ্য আকাশ পরিষ্কার থাকা চাই। আমি ও-রকম অনেকবার দেখেছি এবং এখনও প্রতি বছর ঐ দিনগুলির জন্য অপেক্ষা করি। বিশেষ করে ২৭শে নভেম্বর তারিখটির জন্য। ৩৩ বছর পর পর ঐ তারিখটিতে উল্কাবৃষ্টিও হয়, তবে তা দেখার সৌভাগ্য আমার এখনও হয় নি।

তোমরা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে বিশেষ করে ঐ ক'টা তারিখের কথা কেন আমি উল্লেখ করছি। কারণটা বলি। উল্কাগুলি অনেক সময়েই অনেকগুলি একত্র হয়ে ঝাঁক বেঁধে ঘোরে। পৃথিবীও নিজের পথে ঘুরছে। ওপরের ঐ তারিখগুলিতে পৃথিবী কতকগুলি উল্কার ঝাঁকের ওপর এসে পড়ে, তাই ঐ সময় একসঙ্গে অনেকগুলি উল্কাপাত হবার সম্ভাবনা এবং হয়ও তাই। এর আগে আমরা বলেছি বিয়েলার আবিষ্কৃত একটি ধূমকেতু ১৮৪৫-৪৬ সালে ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যায় এবং তার পর কিছুদিন দু'টি টুকরোই একসঙ্গে ঘুরতে থাকে। এর পর ১৮৭২ সাল থেকে যে দিনটিতে ঐ ধূমকেতুটি পৃথিবীর আকাশে দেখা দিত, সেদিনটিতে আর পৃথিবীর সঙ্গে তার মোলাকাৎ হয় না কিন্তু তার বদলে সেদিন খানিটা উল্কাবৃষ্টি হতে দেখা যায়,—যা আগে কখনও হ'ত না। এ থেকেই বোঝা যায় বিয়েলার ধূমকেতুটিই ভেঙ্গে ক্রমে অনেকগুলো উল্কায় পরিণত হয়েছে কিন্তু ভাঙ্গা টুকরোগুলো দলছাড়া হয় নি, ঝাঁক বেঁধেই ঘুরছে। ঝাঁক বেঁধে ঘুরলেও এর পর কিন্তু সবগুলো টুকরোই সমান ভাবে টাল সামলাতে পারল না, কতক আগে পিছে পড়ে গেল। ফলে ধূমকেতুর



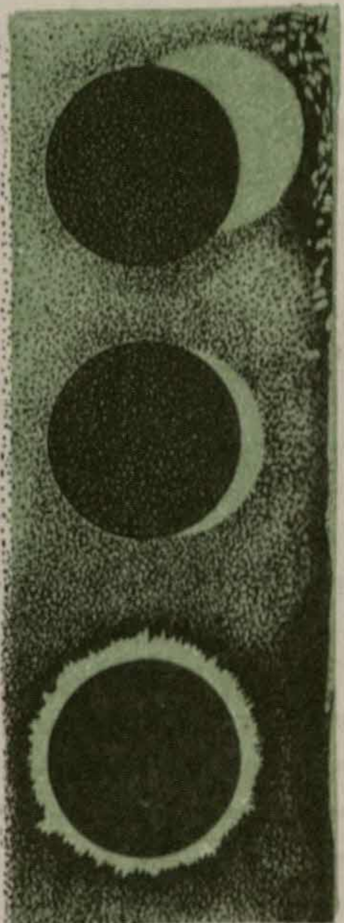
দূরবীনের লেন্সে ধরা পড়েছে কয়েকটি উজ্জ্বল কাছের তারা। এরা সকলেই এক একটি সূর্য—আমাদের সূর্যের চাইতেও বড়।

গোটা রাস্তাটা জুড়েই ছড়িয়ে পড়ল তারা—যদিও মূল ঝাঁকটা প্রায় একসঙ্গেই রইল। পণ্ডিতেরা বলেন, প্রতি বছর ২৭শে নভেম্বর পৃথিবী বিয়েলার ধূমকেতুর রাস্তা ভেদ করে চলে যায়, তাই ঐ দিন খানিকটা উল্কাপাত হয়। কিন্তু ৩৩ বছর পর পর পৃথিবীর সংঘর্ষ ঘটে আসল ঝাঁকটির সঙ্গে। তাই সেদিন উল্কাগুলি বৃষ্টির মত ঝরতে থাকে।

সৌর জগতের বাইরে

এবারে আমরা ধীরে ধীরে সৌর জগতের বাইরে চলে আসছি। অর্থাৎ সূর্যের রাজত্ব পেরিয়ে এবার আমরা মহাকাশের আরও দূরপ্রান্তে চলে যাব। গোটা মহাকাশের তুলনায় সূর্যের এলাকা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বিরাট সাহারা মরুভূমির তুলনায় এ যেন এক কণা বালি। আমাদের সৌর জগতের মত কত অসংখ্য সৌর জগৎ এই মহাকাশে ছড়িয়ে আছে কে তার খবর রাখে ?

সৌর জগতের বাইরে এলে প্রথমেই আমাদের সঙ্গে দেখা হবে আকাশের অগণিত নক্ষত্রের সঙ্গে। একটি নয়, দু'টি নয়—খালি চোখেই হাজার হাজার নক্ষত্র আমরা পৃথিবীতে বসেই দেখতে পাচ্ছি। সংখ্যায় কত ? সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাও গুণতে ছাড়েন নি। গুণে গুণে অনেকেই মোটামুটি প্রায় তিন হাজার নক্ষত্রের কথা বলেছেন। আমরা এক সঙ্গে আকাশের একটা দিক্‌ই দেখতে পাই। পৃথিবীর ও-পিঠেও সমসংখ্যক নক্ষত্র আছে ধরে নিলে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৬ হাজার। দূরবীন আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এদের কথাই কেবল জানতেন। তার পর



নক্ষত্র যখন ঢাকা পড়ে
আমাদের সূর্যও আসলে একটি বিরাট নক্ষত্র। চাঁদের ছায়া সূর্যকে ঢেকে ফেললে হয় সূর্যগ্রহণ। খানিকটা ঢাকা পড়লে হয় আংশিক গ্রহণ, সবটা ঢাকা পড়লে হয় পূর্ণগ্রহণ। পূর্ণগ্রহণের সময়েও সূর্যের একটা জ্যোতিঃ তাকে বালার মত ঘিরে থাকে—তাই এর নাম বলয়গ্রাস। এখানে সূর্যগ্রহণের তিনটি ধাপ দেখানো হয়েছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন নতুন নতুন যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশ চষে বেড়াবার ব্যবস্থা হ'ল তখন দেখা গেল ওদের সংখ্যা হাজার নয়, লক্ষ নয়, কয়েক কোটিও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ২০০ ইঞ্চি দূরবীনের সাহায্যে পণ্ডিতেরা ২০০ কোটি নক্ষত্রের ফটো তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু ওখানেই নিশ্চয় দাঁড়ি টানা যাবে না। ওরও বহু—বহুগুণ নক্ষত্র যে মহাকাশের দূরদিগন্তে ছড়িয়ে আছে সে বিষয়েও পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ। আমাদের ছায়াপথেই কোটি কোটি নক্ষত্র আছে বলে মনে হয়। আর আমাদের ছায়াপথটাই মহাকাশের একমাত্র ছায়াপথ নয়—এ রকম আরও অসংখ্য ছায়াপথ আছে মহাকাশে।

গ্যালিলিও যখন তাঁর ছোট্ট দূরবীনটি তৈরি করে মহাকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন তখন সেখানকার নতুন নতুন রহস্য তাঁকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তুলেছিল। তারপর সাড়ে তিনশ' বছরেরও ওপর পার হয়ে গেছে, দূরবীনের চেহারাও বদলেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দু'টি বড় হাতিয়ার আধুনিক প্রতিসরক (রিফ্র্যাক্টিং) দূরবীন আর প্রতিফলক (রিফ্লেক্টিং) দূরবীন অনেক অজানা রহস্যের সন্ধান দিয়েছে। শেষেরটি আবিষ্কার করেছিলেন নিউটন। তারই একটি নতুন সংস্করণ হচ্ছে পালোমার পাহাড়ের মানমন্দিরে বসানো ২০০ ইঞ্চি মাপের অতিকায় দূরবীন। ২০০ ইঞ্চি মাপ বলতে দূরবীনের কাচখানার ব্যাস বোঝাচ্ছে। ঐ কাচখানার ওজনই ১৪ টনের ওপর। সমস্ত দূরবীনটার ওজন ৫৩০ টন। আমাদের চোখের তুলনায় এর দেখবার শক্তি দশ লক্ষ গুণ বেশি। কিন্তু সম্প্রতি এর চেয়েও কার্যকরী এক ধরনের দূরবীন আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা, যা নাকি দূর মহাকাশ থেকে আসা বেতার-তরঙ্গও ধরে দিতে পারে। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে বেতার-দূরবীন বা রেডিও-টেলিস্কোপ। মহাকাশ পর্যবেক্ষণের কাজে এই দূরবীনই এখন বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। আরও একটা বড় কথা, এ দূরবীন শুধু রাতের আকাশই দেখে না, দিনের বেলাও এর কাজ সমানে চলতে পারে। ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রকম একটি বেতার দূরবীন আছে যার ব্যাস হচ্ছে ২৫০ ফুট।

নক্ষত্রেরা কত দূরে আছে?

নক্ষত্রদের মধ্যে যেটি আমাদের নিকটতম সেটির কথা তোমাদের আগেই বলেছি। কোন্‌টা? কেন, আমাদের সূর্য! সূর্যও তো একটা নক্ষত্র। তবে অন্যদের তুলনায় বেশ ছোটই বলতে হবে। দূরের নক্ষত্রগুলির কোনটা যদি আমাদের কাছে আসত কিংবা আমরা যদি তাদের কাছে যেতে পারতাম তা হলে সূর্যের মতই,—না, তার চেয়েও অনেক প্রচণ্ড উত্তপ্ত একটি অগ্নিগোলকের দেখা পেতাম আমরা। সূর্য সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জেনেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০-২৪)। তাই থেকে নক্ষত্রদের সম্বন্ধেও একটু-আধটু আন্দাজ করা চলে।

সূর্য আমাদের কাছ থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে। সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট। আর সূর্য ছাড়া যে নক্ষত্রটি আমাদের সবচেয়ে কাছে

সেটির দূরত্ব হচ্ছে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের ২ লক্ষ ৭২ হাজার গুণ। সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রই যদি এই রকম হয় তা হলে দূরের নক্ষত্র না জানি কত দূরে! সাধারণ মাইলের হিসেবে সে দূরত্ব মাপতে গেলে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই বিজ্ঞানীরা ওদের দূরত্ব মাপবার একটা সহজ উপায় বার করে নিয়েছেন। আলোর গতিবেগ হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। ১ মাইল হচ্ছে প্রায় ১·৬৭ কিলোমিটার। ঐ বেগে ছুটে চলে এক বছরে আলো যতটা পথ পাড়ি দিতে পারে তার নাম দেওয়া হয়েছে এক আলোকবর্ষ। নক্ষত্রদের দূরত্ব এই আলোকবর্ষ দিয়েই মাপা হয়। সবচেয়ে কাছের যে নক্ষত্রটির কথা বলছিলাম সেই আল্‌ফা সেন্টরাইএর দূরত্ব হচ্ছে পৃথিবী থেকে সওয়া চার আলোকবর্ষ। মনে রাখতে হবে, সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রই হচ্ছে ঐ রকম দূরে, আর আকাশে এমন বহু নক্ষত্র আছে যাদের দূরত্ব শত শত—হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ—এমন কি কোটি কোটি আলোকবর্ষও হতে পারে।

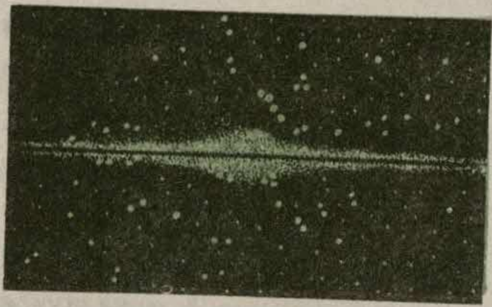
নক্ষত্রকে আমরা চলতি কথায় তারা বলি। তা হলে বলব আজ যে তারাটিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি—অর্থাৎ যার আলো আজ আমাদের চোখে এসে পড়ছে—সে আলোটা কিন্তু তার আজকের আলো নয়, দূরত্ব অনুসারে সে আলোর বয়স ঠিক করতে হবে। যে আলো লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের তারা থেকে আসছে তাকে আমরা আজই দেখছি বটে কিন্তু সত্যি বলতে গেলে সেটা হচ্ছে ঐ তারার গা থেকে বেরুনো লক্ষ বছর আগেকার আলো। ভাবতে ভারি অবাক্ লাগে, তাই না? অত দূরে আছে বলেই ঐ তারাটিকে একটা আলোকবিন্দু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কিন্তু ওরই চারদিকে হয় তো আমাদের সৌর জগতের মত কত গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরপাক খাচ্ছে। নিকটতম তারা অ্যালফা সেন্টরাইটাই যদি তুলে এনে সূর্যের কাছে বসিয়ে দেওয়া যেত তা হলে সে সূর্যের চাইতেও তিন হাজার গুণ বেশি আলো আর উত্তাপ আমাদের দিতে পারত। বড় তারাদের বেলা না জানি সে আলো আর তাপের পরিমাণ কত হ'ত!



ছায়াপথ

নক্ষত্রের আলো, তাপ, রং

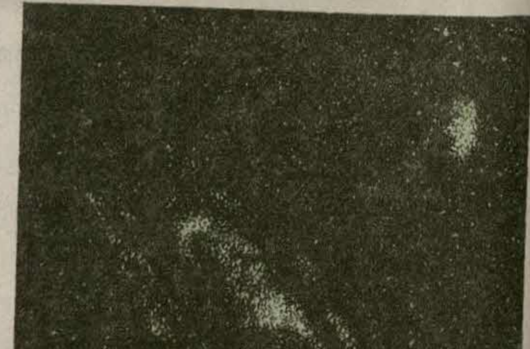
উজ্জ্বলতার কম-বেশি অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা তারাগুলিকে ২৩টি মাত্রায় বা মানে ভাগ



মহাকাশের গায়ে যেন দুধের ধারার মত চলে গিয়েছে ছায়াপথ। ভিতরে অসংখ্য তারার সমারোহ। মাঝখানের সরল রেখার ঠিক ওপরে বাঁ-দিকের প্রথম বিন্দুটিই হচ্ছে আমাদের সূর্য।

করে নিয়েছেন। যে তারা সবচেয়ে উজ্জ্বল তাকে বলা হয় এক মাত্রার বা প্রথম মানের তারা। ইংরেজীতে ওকে বলা হয় ফার্স্ট ম্যাগ্‌নিচুডের তারা। তার চাইতে সামান্য কম উজ্জ্বল হলে তা হ'ল দুই মাত্রা বা দ্বিতীয় মানের তারা। এইভাবে পর পর ২৩ মাত্রা পর্যন্ত যাবার পর সে তারা এত নিষ্প্রভ হয়ে যায় যে তখন আর তাকে তেমন বোঝা যায় না। খালি চোখে আমরা ৬ মাত্রার অর্থাৎ ৬ষ্ঠ মানের তারা পর্যন্ত দেখতে পাই—যদিও সে তারার আলো খুবই মিটমিটে। এক মাত্রার চেয়ে উজ্জ্বল তারাও কয়েকটি আছে। যেমন লুব্ধক, ইংরেজীতে যাকে বলে সিরিয়াস,—এই নামের তারাটি। বলা বাহুল্য সূর্যও এই রকম একমাত্রার চেয়ে অনেক উজ্জ্বল তারা। কিন্তু সব তারা তো সমান দূরে বসে নেই, কাজেই এই ভাবে উজ্জ্বলতা মাপা হলেও তা তারাটির আসল উজ্জ্বলতার মাপকাঠি বলা চলে না। এজন্য এখন বিজ্ঞানীরা সব নক্ষত্রকেই, সেগুলি যদি ৩৩ আলোকবর্ষ দূরে থাকত তা হ'লে যতটা উজ্জ্বল হ'ত,—কল্পনায় তারই হিসেব করে ওদের মাত্রা ঠিক করছেন। এই ভাবে ধরলে সূর্যের উজ্জ্বলতাও বেশ কয়েক মাত্রা পিছিয়ে যাবে। আবার সূর্যকে যদি আমরা ১ম মানের তারা বলে ধরতাম তা হলে যাদের এখন ১ম মানের তারা বলি তারা চলে যেত ২৭তম মানে।

আরও এক ভাবে নক্ষত্রদের ভাগ করা যেতে পারে—তাদের উত্তাপ অনুযায়ী। উত্তাপ বলতে অবশ্য এখানে তাদের গায়ের ওপরটার উত্তাপই ধরতে হবে। সব চেয়ে বেশি উত্তাপের নক্ষত্রদের বলা হয় ও-নক্ষত্র (O)। এদের উত্তাপ ২৮০০০ থেকে ৩৫০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সবচেয়ে কম উত্তাপ হচ্ছে এন্‌-নক্ষত্রদের (N)। এদের



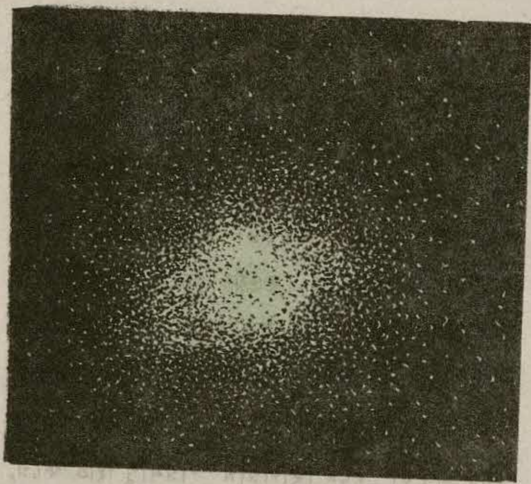
অ্যানড্রোমিডা রাশির নীহারিকা বা নেবুলা। এই নীহারিকা থেকেই জন্ম নেয় নতুন তারা।

উত্তাপ ২০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশি নয়। ও-র পরে পর পর বি, এ, এফ্, জি, কে, এম, এন্—এইভাবে নাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের সূর্য হচ্ছে জি-নক্ষত্র (G)। ওর বাইরের দিকের উত্তাপ ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

নক্ষত্রদের রংও আবার সব এক রকম নয়। যদিও খালি চোখে তা ঠিক বোঝা যায় না কিন্তু দূরবীন দিয়ে দেখলে সাদা, লাল, হলদে, সবুজ—নানা রঙের নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যাবে। পণ্ডিতেরা মনে করেন এই রং দেখেই নক্ষত্রদের বয়স কিছুটা আন্দাজ করা যায়। সাদার চাইতে লাল কিংবা হলদে নক্ষত্রগুলো বয়সে প্রাচীন। সাদাগুলো এখনও জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু লাল বা হলদে নক্ষত্রের ভিতরের দিক্‌টা সম্ভবতঃ আরও জমাট বেঁধে গিয়ে থাকবে। হয়তো কতক তরল, এমন কি জমে কঠিন হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। অবশ্য পুরোনো নক্ষত্র ফেটে গিয়েও নতুন নক্ষত্র জন্মায়। এই নক্ষত্রগুলোই সাদা। নতুন করে তৈরি হলেও এরা কিন্তু তারা-জীবনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে।

নক্ষত্রদের ভিতরকার রহস্য কিছু কিছু জানা গেছে স্পেকট্রোগ্রাফের সাহায্যে। নক্ষত্রদের রাসায়নিক উপাদান কি, গতিবেগ কি রকম, এবং সে নক্ষত্র আমাদের দিকে আসছে না আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—সবই বলে দেওয়া যেতে পারে। তারারা আকাশে কোনটাই স্থির হয়ে নেই—সব তারাই ছুটে চলেছে। এমন কি যাদের আমরা স্থির নক্ষত্র বলে ভাবি তাদেরও গতি আছে। বহুদূরে থাকায় এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তির পরিধি ছোট বলে ওদেরকে আমরা স্থির বলে মনে করি। কোন কোন তারা সেকেণ্ডে শত শত মাইল বেগে মহাকাশে ছুটে বেড়াচ্ছে।

নক্ষত্রেরা অত আলো—অত তাপ কি করে পায় সে সম্বন্ধেও কতকটা জানা গেছে সূর্যের আলো আর তাপ দেওয়া দেখে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্যের গায়ে রয়েছে অজস্র হাইড্রোজেন পরমাণু। সূর্যদেহের প্রচণ্ড উত্তাপে এই হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির চারটে একত্র হয়ে একটা করে হিলিয়াম পরমাণু সৃষ্টি করে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাজার ভাগের সাত ভাগ বস্তুকণা রূপান্তরিত হয়ে যায় শক্তিতে—যা আলো আর তাপের রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে। সূর্যদেহে নাকি প্রতি সেকেণ্ডে ৫ হাজার লক্ষ টন হাইড্রোজেন এই ভাবে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। তার মানে প্রতি সেকেণ্ডে সেখানে ৪০ লক্ষ টনের মত হাইড্রোজেন বস্তু-কণা থেকে আলো আর তাপে পরিবর্তিত হচ্ছে। কাজেই সূর্য যে ও-ভাবে জ্বলবে তাতে আর আশ্চর্য কি! নক্ষত্রদের বেলাও ঠিক এই ব্যাপারই চলছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এমন অনেক নক্ষত্র আছে যেখানে তাপ এত বেশি যে সেখানকার সমস্ত হাইড্রোজেনই হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, আবার সে হিলিয়াম পরমাণু-গুলোও একত্র হয়ে নতুন নতুন মৌলিক পদার্থের পরমাণু গড়ে তুলছে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় অ্যাটমিক ফিউশন বা পরমাণু সংযোজন। সূর্যের শক্তির আসল উৎস নাকি এইখানে। তারাদেরও তাই।



অসংখ্য বিন্দুর মত ঝাঁক-বাঁধা তারা। এ রকম অসংখ্য ঝাঁক ছায়াপথের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

চার জাতের নক্ষত্র

পণ্ডিতেরা আবার নক্ষত্রকে চারটি জাতে ভাগ করেছেন। খুব বড় আকারের তারাকে বলা হয় অতিদানব,—ইংরেজীতে সুপারজায়ান্ট। আকারে বড় হলেও এদের ঘনত্ব কিন্তু অন্য জাতের তারাদের চাইতে কম। আর একটা কথা, এদের মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো এত বেশি হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে যে যে-কোন সময়ে এদের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে বাইরের অংশটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। বলা বাহুল্য সে অবস্থায় তারাটি হঠাৎ ভীষণ ভাবে জ্বলে উঠবে—তার দীপ্তি সূর্যের তুলনায় ১০ কোটি গুণ বেড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এই অবস্থায় তাকে বলা হয় সুপার-নোভা। নোভা মানে নতুন তারা।

শোনা যায় আজ থেকে প্রায় ৯২০ বছর আগে এই রকম একটি ঘটনা মানুষের চোখের সামনেই ঘটেছিল। একটি সুপারনোভা তারা ২১ দিন ধরে আকাশের সমস্ত তারার তুলনায় এত বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে সাধারণ মানুষ তাকে প্রলয়ের অগ্রদূত বলে মনে করেছিল। তবে সুপারনোভা তারার সংখ্যা অনেক কম এবং এ রকম বিস্ফোরণও ঘটে ২০০ বছরে বড় জোর একবার।

অতিদানবদের চাইতে অল্প ছোট তারা হচ্ছে রেড জায়ান্ট বা লাল দানব। তার চেয়েও ছোট হচ্ছে মেন সিকোয়েন্স তারা—যাদের মধ্যে আমাদের সূর্যও একটি। তার চেয়েও ছোট তারাকে বলা হয় সাদা বামন বা হোয়াইট ডোয়ার্ফ। পণ্ডিতদের মতে এই সাদা বামনই হচ্ছে তারাদের নক্ষত্র-জীবনের শেষ ধাপ। এরা আকারে ছোট হলেও অসম্ভব ঘন। এত ঘন যে আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। যেমন ধর, লুব্ধক বা সিরিয়াসের পাশে



মহাকাশের বিস্ময়ঃ ঘূর্ণ্যমান পেঁচালো নীহারিকা। আসলে এটিও আমাদের ছায়াপথের মতই আর একটি ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি।



সাদা মেঘ নয়, ইয়র্ক স্ মানমন্দিরের শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে তোলা দূর মহাকাশে কোটি কোটি মাইল লম্বা একটি জ্বলন্ত গ্যাসপুঞ্জের ছবি

এই রকম একটা তারা আছে যার এক চামচে তুলে আনতে পারলে তার ওজন হবে প্রায় এক টন। অর্থাৎ ওটি জলের চাইতে ৫৫ হাজার গুণ ভারী। নক্ষত্র-জগতে তারার এই রূপান্তর প্রায়ই ঘটছে। পণ্ডিতেরা হিসেব করে বলছেন আমাদের সূর্যও একদিন লাল দানবের দলে চলে যাবে। তখন সেটা এত ফেঁপে উঠবে যে আমাদের পৃথিবীটাও হয়তো সে গ্রাস করে ফেলবে। তবে তার দেরী আছে। সূর্যের এই অবস্থায় আসতে এখনও প্রায় ১০০ কোটি বছর বাকি।

দানব তারারা যখন ফুলে ফেঁপে ফেটে যায় তখনও দেখা দেয় একটি নতুন তারা, যাকে বলা হয় নোভা। যে তারা-জগতে আমরা বাস করছি সেখানে বছরে অন্ততঃ পঞ্চাশটি তারা এই ভাবে ফেটে নোভায় রূপান্তরিত হচ্ছে। নামে নতুন তারা হলেও নোভা কিন্তু পুরোনো তারা ফেটেই তৈরি হয়। সুপারনোভারা বিস্ফোরণের ফলে ভেঙ্গে গিয়ে যে ছোট অংশ পড়ে থাকে তারাই হচ্ছে সাদা বামন। ছোট্ট হলেও, আগেই বলেছি, এরা অসম্ভব ভারী। এদের ভিতরকার পরমাণুগুলো এত ঠাসা-ঠাসি করে থাকে যে তাদের ইলেক্‌ট্রনগুলো, যাদের নাকি অনেকটা দূরে থেকে ঘুরবার কথা, তারা পরমাণু-কেন্দ্রের অনেক কাছে চলে আসে। এরই ফলে ওরা এত ঘন ও ভারী হয়ে পড়ে।

আগেই বলেছি, সাদা বামন তারাগুলো হচ্ছে তারাদের নক্ষত্র-জীবনের শেষ ধাপ। লাল দানবরাও এক সময়ে সাদা বামন হয়ে যায়। আমাদের সূর্যও একদিন তাই হবে। লাল দানব হবার পরবর্তী ধাপে সে হবে সাদা বামন। কিন্তু তারপর? তারাকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য যা যা দরকার তা আর তার থাকবে না। ফলে একদিন তার শরীরের সমস্ত উত্তাপ শেষ হয়ে আসবে। তখন আর সে জ্বলবে না—দূর দূরান্তরে বসে কেউ তার আলোও দেখতে পাবে না।

নক্ষত্রেরা যখন এই অবস্থায় এসে দাঁড়ায় তখন তাদের নক্ষত্র না বলে নক্ষত্রের কঙ্কাল বললেই ঠিক বলা হবে। কিন্তু, কঙ্কাল হলেও, তাদের নড়াচড়া বন্ধ হয় না। ঐ নিভন্ত, নিরুত্তাপ, জ্যোতিঃহীন, তেজোহীন কঙ্কালের মত শরীরটা নিয়েই তারা মহাকাশে ঘুরে বেড়ায়। কেউ কেউ তাই এদের নাম দিয়েছেন কালো বামন। সূর্যকেও একদিন এ অবস্থায় আসতে হবে।

যমজ নক্ষত্র

দূরবীন দিয়ে নক্ষত্রগুলি ভালো করে লক্ষ করলে আকাশে মাঝে মাঝে এক একটা মজার দৃশ্য দেখা যায়। দু'টি নক্ষত্র এমন ঘেঁষা-ঘেঁষি করে থাকে যে মনে হয় ওরা বুঝি যমজ। অবশ্য একটা অন্যটার লক্ষ লক্ষ মাইল পেছনে থাকলেও চোখের ভুলে এ রকমটা মনে হ'তে পারে। কিন্তু যোড়া নক্ষত্রেরও অভাব নেই আকাশে। এদের একটিকে আবার অপরটির চারদিকে পাক খেতেও দেখা যায়। খালি চোখেও এ জিনিসটা দেখা যায়। মনে কর একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র তুমি রোজ আকাশের এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছিলে। হঠাৎ একদিন দেখবে সেটি আর তেমন উজ্জ্বল নেই, তার আলো অনেক ম্লান হয়ে গেছে। কিংবা হয়তো নক্ষত্রটা আর দেখাই যাচ্ছে না। কিন্তু ভালো করে যদি প্রত্যহ লক্ষ করে যাও তবে দেখবে কিছুদিন পরেই আবার সেটা ধীরে ধীরে আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে। প্রথমে হয়তো কিছুটা ম্লান, তার পরেই আবার তেমনি উজ্জ্বল। কেন এমনটা হয়? পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যে-সব নক্ষত্রের আলো বাড়ে কমে তারা সবই এই রকম যমজ তারা বা যোড়া নক্ষত্র, আর তাদের মধ্যে একটি জ্যান্ত, অর্থাৎ আলোয় উজ্জ্বল, অপরটি মরা, অর্থাৎ আলোহীন, তেজোহীন নক্ষত্রের কঙ্কাল। ঘুরতে ঘুরতে মরা তারাটা যখন জ্যান্ত তারাটাকে ঢেকে ফেলে তখনই সেটা ম্লান হয়ে যায় কিংবা একেবারেই অদৃশ্য হয়ে পড়ে। আবার যখন সেটা ঘুরে পেছন দিকে চলে যায় তখনই জ্যান্ত নক্ষত্রটি তার উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে। অবশ্য এই ঘুরপাক খাবার সময়টা স্বভাবতঃই সব নক্ষত্রের সমান নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ২।৪ দিন পর পরই এ রকম হতে পারে—আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বহু বছর পর পরও ব্যাপারটা ঘটতে পারে।

ছায়াপথ : গ্যালাক্সি

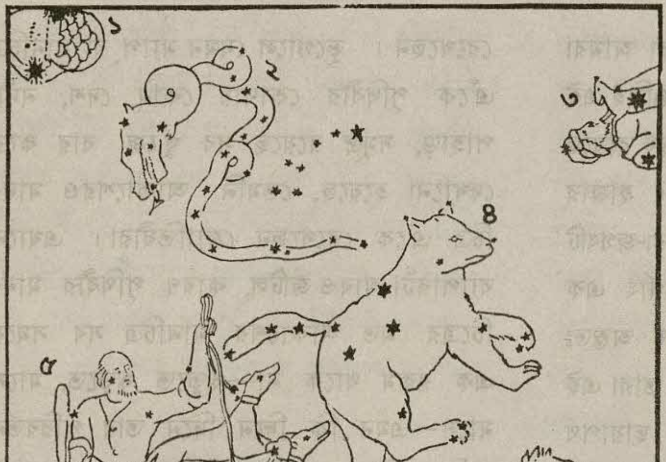
পরিষ্কার আকাশে একটা অদ্ভুত জিনিস অনেকেরই নজরে পড়ে থাকবে। বিশেষ করে শরৎকালের নির্মল আকাশে জিনিসটা বেশি করে চোখে পড়ে। আকাশের এপার ওপার যুড়ে একটা সাদা মত জিনিস চলে গেছে—ঠিক নদীর মত কিংবা চওড়া রাস্তার মত। তার আগাগোড়া যেন তৈরি হয়েছে তারার গুঁড়ো দিয়ে। অগুণ্‌তি ছোট ছোট তারা ভিড় করে আছে এই সারা পথ যুড়ে। আমরা ওর নাম দিয়েছি ছায়াপথ এবং ওর সম্বন্ধে অনেক গল্পকাহিনীও রচনা করেছি। আসলে এই ছায়াপথকে আমরা তারা-জগৎও বলতে পারি। বিজ্ঞানীরা ওকে বলেন গ্যালাক্সি। ইংরেজীতে মিল্কিওয়ে বা দুধের রাস্তাও বলা হয়। এ রকম ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি আকাশে হাজার হাজার আছে কিন্তু আমরা, আমাদের

সৌরজগৎ এবং আশপাশে যত তারা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই সেগুলির সবগুলিই এই একটি তারা-জগতেরই বাসিন্দা। সূর্য রয়েছে এই তারা-জগতের কেন্দ্র থেকে ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। বিরাট এই তারা-জগৎটি আকারে এত বড় যে ওর ব্যাস, অর্থাৎ এক কোণ থেকে আর এক কোণের দূরত্ব অন্ততঃ ১ লক্ষ আলোকবর্ষ। কোটি কোটি তারা এই তারা-জগতের মধ্যে ঠাসা রয়েছে। ছায়াপথ সম্পর্কে এখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আরও নানা রহস্য উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন।

তারাপুঞ্জ বা রাশি

নক্ষত্রেরা অনেকেই একসঙ্গে চাক বেঁধে থাকে এবং ঐ ভাবেই, চাকশুদ্ধুই, নড়াচড়া করে। তারাদের এই চাক বা ঝাঁকগুলোকে বলা হয় তারাপুঞ্জ (রাশি) বা কনস্টেলেশন্। অবশ্য চাক বেঁধে থাকলেও এই সব চাকের এক-একটি তারা অপরটি থেকে লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েছে। যেমন ধরা যাক, যে চাকটিকে আমরা গ্রীক বীর হারকিউলিসের নাম থেকে নাম দিয়েছি হারকিউলিস তারাপুঞ্জ, তার এক কোণা থেকে অপর কোণায় আলো যেতে লাগে ৩৬ হাজার বছর। এ পর্যন্ত ৫০ হাজারের ওপর নক্ষত্র পাওয়া গেছে এই চাকে এবং সেই নক্ষত্র-গুলো প্রত্যেকটাই আমাদের সূর্যের চাইতে অনেক বড়। পৃথিবী থেকে এই তারাপুঞ্জের সবচেয়ে কাছের তারাটি আছে ২১ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। আবার কোন কোন তারা আছে ২ লক্ষ ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে।

ভাবতে অবাক্ লাগে, সেই কোন্ আদ্যিকাল থেকেই জ্যোতিষীরা গোটা আকাশটা চিনে রেখেছেন। ভূগোলে যেমন ম্যাপ্ বা মানচিত্র এঁকে পৃথিবীর কোথায় কোন্ দেশ, নদী, পাহাড়, সমুদ্র রয়েছে সব খুঁজে বার করে দেখানো হয়েছে, তেমনি আকাশেরও মান-চিত্র এঁকে রেখেছেন জ্যোতিষীরা। এখানে ব্যাপারটা আরও জটিল, কারণ পৃথিবীর মান-চিত্রের মত আকাশের মানচিত্র সব সময়ে এক রকম থাকে না—ঋতুতে ঋতুতে, মাসে মাসে—এমন কি দিনে দিনে তার পরিবর্তন ঘটে। কি করে এর হিসেব রাখা সম্ভব? সম্ভব হয়েছে ঐ তারাপুঞ্জগুলি দেখে। তারা-পুঞ্জের আকৃতি দেখে তার মধ্যে কতকগুলো কাল্পনিক রেখা টেনে তাদের এক-একটা মনগড়া ছবি গড়েছিলেন সেকালকার জ্যোতিষীরা। আমাদের দেশেও, ওদেশে - অর্থাৎ ইয়োরোপেও। কেমনধারা ছবি? কোনটা ভালুকের, কোনটা দৈত্যের, কোনটা বৃশ্চিকের, কোনটা সিংহের, কোনটা ষাঁড় বা বৃষের, কোনটা শিকারীর—এই রকম আর কি! সেই সব ছবি অনুযায়ী তারাপুঞ্জগুলির নামকরণ হয়েছিল এবং ঐ সব তারাপুঞ্জের মধ্যে যে সব তারা আছে তাদেরও অনেকের এক-একটা করে নাম দেওয়া হয়েছিল। আগেই বলেছি, তারাপুঞ্জগুলি আকাশে চাক বেঁধে একসঙ্গে ঘোরে। কাজেই ঐ সব কাল্পনিক ছবির সাহায্য নিয়ে এক-একটি তারাপুঞ্জের নড়াচড়া ধরে ফেলতে তেমন কষ্ট হ'ত না, আর ঐ তারাপুঞ্জ দেখেই গোটা আকাশটা চিনে রাখতেও তেমন বেগ পেতে হ'ত না। নক্ষত্র চিনবার এই সহজ উপায়টি এ যুগেও বিজ্ঞানীরা দরকার মত কাজে লাগাতে ছাড়েন নি।



নক্ষত্র চেনা

আমাদের দেশের মত প্রাচীন ইয়োরোপীয় জ্যোতিষীরাও তারাদের পাশে পাশে কাল্পনিক রেখা টেনে এক-একটা মূর্তি কল্পনা করে নিয়েছিলেন আর তাই থেকে বিভিন্ন তারা-পুঞ্জের বিভিন্ন নামকরণ করেছিলেন। এখানে তার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হ'ল: (১) লায়ার (বীণা জাতীয় যন্ত্র) (২) ড্রাগন (৩) ওয়াগনার বা ওয়াগন-চালক (৪) গ্রেট বেয়ার বা বড় ভালুক (আমাদের সপ্তর্ষি) (৫) হান্টার বা শিকারী (৬) লায়ন বা সিংহ (৭) ভার্জিন বা কন্যা (৮) ক্রো বা কাক (৯) সি সার্পেন্ট বা সমুদ্রের সাপ।

রাশিচক্র

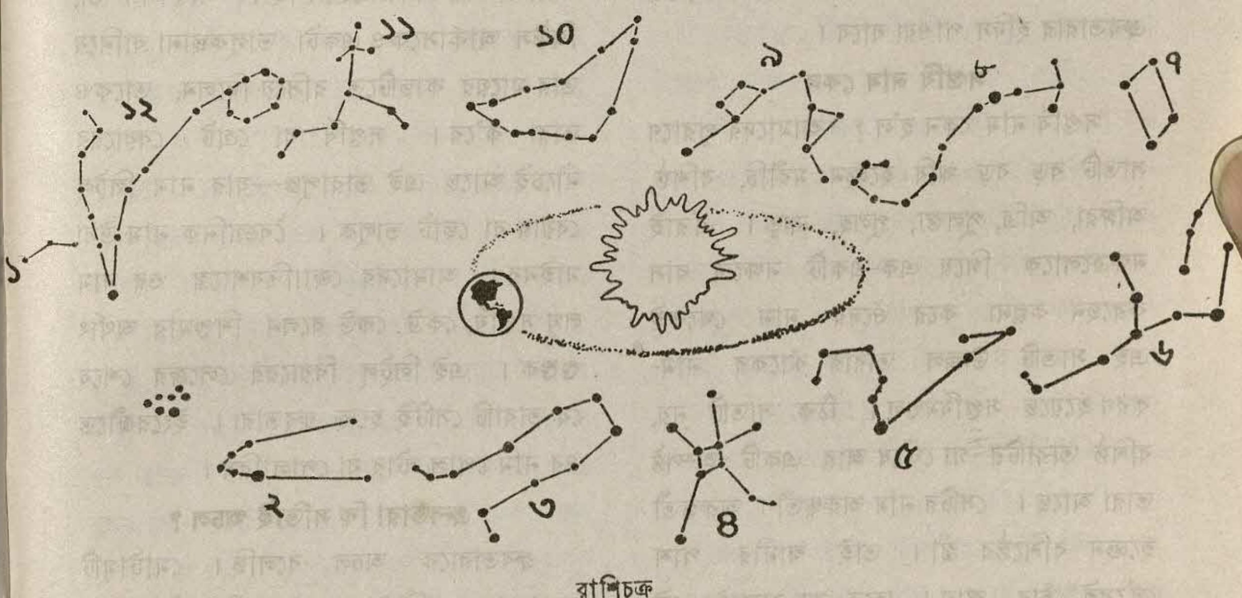
পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরলেও পৃথিবীতে বসে মনে হয় সূর্যই বুঝি একটু একটু করে সরে সরে যাচ্ছে। সূর্যের এই কাল্পনিক গতিপথটির নাম দেওয়া হয়েছে ক্রান্তিবৃত্ত বা ইক্লিপ্‌টিক। এই পথের মধ্যে এক এক মাসে এক-একটা তারাপুঞ্জ পড়ে। এই তারাপুঞ্জেরই অপর নাম রাশি বা সাইন (চিহ্ন)। বারো মাসে সূর্য বারোটা রাশির মধ্যে থাকে। ঐ বারোটা রাশিকে সব মিলে বলা হয় রাশিচক্র। যেমন, সূর্য মার্চ মাসে থাকে মেষ রাশিতে। এই তারাপুঞ্জটি দেখতে অনেকটা ভেড়ার মত, তাই ওকে বলা হয় মেষ রাশি। ইংরেজীতে ওর নাম এরিস্। পরবর্তী মাসে অর্থাৎ এপ্রিল মাসে সূর্য চলে আসে বৃষ রাশিতে যার ইংরেজী নাম টরাস। এই ভাবে পর পর মে মাসে মিথুন রাশিতে (জেমিনি), জুন মাসে কর্কট রাশিতে (ক্যানসার), জুলাই মাসে সিংহ রাশিতে (লিও), অগাষ্ট মাসে কন্যা রাশিতে (ভার্গো), সেপ্টেম্বরে তুলা রাশিতে (লিবরা), অক্টোবরে বৃশ্চিক রাশিতে (স্কর্পিও), নভেম্বরে ধনু রাশিতে (স্যাগিটেরিয়াস), ডিসেম্বরে মকর রাশিতে

(ক্যাপ্রিকর্নাস), জানুয়ারীতে কুম্ভ রাশিতে (অ্যাকোয়েরিয়াস) এবং ফেব্রুয়ারীতে মীন রাশিতে (পিসেস্) সূর্যকে দেখতে পাওয়া যায়।

নক্ষত্র চেনা

তারাপুঞ্জ দেখে একটু চেষ্টা করলে অনেক নক্ষত্রই চিনে নেওয়া যায়। কিঁ করে, এখানে তার সামান্য একটু আভাস দিচ্ছি। আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে লক্ষ করবে প্রায় সব তারাই যেন একটু একটু সরে সরে যাচ্ছে—কতক যেন যাচ্ছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, কতক পশ্চিম থেকে পূর্বে। কিন্তু তারই মধ্যে দেখবে একটি তারা যেন একেবারে স্থির—অচল—অনড়—মার্বল্ খেলার ভাষায় তোমরা যাকে বল "নট্ নড়নচড়ন"। এই তারাটি রয়েছে সোজা উত্তর আকাশে। তাই এটি দেখেই আমরা রাত্রিবেলাও ঠিক ঠিক বলে দিতে পারি কোন্‌টা উত্তর দিক্। এই তারাটিরই নাম ধ্রুবতারা (পোল্ স্টার)।

ধ্রুবতারা ঠিক উত্তরে থাকলেও ওটা কিন্তু খুব উজ্জ্বল তারা নয়, তাই ওকে খুঁজে বার করতে বেশ একটু সময় লাগে। কিন্তু এই সময়টা এড়ানো যায় যদি আমরা সপ্তর্ষি তারাপুঞ্জের সাহায্য নেই। সপ্তর্ষি দেখতে অনেকটা জিজ্ঞাসাবোধক (?) চিহ্নের মত, তাই অতি সহজেই এটি আকাশে খুঁজে বার করা চলে। আর সপ্তর্ষির মাথার তারা দু'টিকে একটা কাল্পনিক রেখা দিয়ে যুড়ে নিয়ে যদি সেই রেখাটিকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় তা হলে দেখা যাবে সেটা এমন একটা তারায় গিয়ে ঠেকছে যার আশপাশে অন্য তারা তেমন নেই। এই তারাটিই হচ্ছে ধ্রুবতারা।



রাশিচক্র

(১) মেষ (২) বৃষ (৩) মিথুন (৪) কর্কট (৫) সিংহ (৬) কন্যা
(৭) তুলা (৮) বৃশ্চিক (৯) ধনু (১০) মকর (১১) কুম্ভ (১২) মীন।

কিন্তু সপ্তর্ষি কি সব সময়ে আকাশে থাকে ? না। চৈত্র-বৈশাখ মাসে সে থাকে উত্তর আকাশে। তারপর জ্যৈষ্ঠ মাস পড়লেই সে ক্রমাগত পশ্চিমে সরে এসে এসে ভাদ্র মাসে একেবারে উধাও হয়ে যাবে আকাশ থেকে। আবার তার দেখা মিলবে সেই পৌষ মাসে উত্তর-পূর্ব আকাশে। সেখান থেকে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবে পশ্চিম দিকে।

তা হলে ঐ সময়টা, যখন আকাশে সপ্তর্ষি থাকবে না, তখন ধ্রুবতারাকে খুঁজে পাব কি করে ? তখন ওকে খুঁজে বার করতে হবে ক্যাসিওপিয়া তারাপুঞ্জটি দেখে। এটি দেখতে ঠিক ইংরেজী ডব্লিউ (W) অক্ষরের মত, আর থাকে সপ্তর্ষি ধ্রুবতারার যে দিকে থাকে তার উল্টো দিকে। কাজেই যখন আকাশে সপ্তর্ষি থাকে না তখন ক্যাসিওপিয়ার সাহায্যে ধ্রুবতারার হদিস পাওয়া যাবে।

সপ্তর্ষি নাম কেন

সপ্তর্ষি নাম কেন হ'ল ? আমাদের পুরাণে সাতটি বড় বড় ঋষি হচ্ছেন মরীচি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু। এঁরাই নক্ষত্রলোকে গিয়ে এক-একটি নক্ষত্রে বাস করছেন কল্পনা করে ওঁদের নাম থেকেই এই সাতটি উজ্জ্বল তারার ঝাঁকের নাম-করণ হয়েছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। ঠিক সাতটি নয়, বশিষ্ঠ তারাটির গা ঘেঁষে আর একটি অস্পষ্ট তারা আছে। সেটির নাম অরুন্ধতী। অরুন্ধতী হচ্ছেন বশিষ্ঠের স্ত্রী। তাই স্বামীর পাশ ঘেঁষেই তাঁর স্থান। তবে বড় অস্পষ্ট এই তারাটি। চোখের দৃষ্টি খুব ভালো না হ'লে এটিকে চোখে ঠাহর করা যায় না। আরব দেশে এক সময়ে কাউকে সৈন্যদলে ভর্তি করবার সময় তার দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করে নেওয়া হ'ত অরুন্ধতীকে দেখিয়ে। ঐ তারাটিকে যে খালি চোখে নজরে আনতে পারত সে-ই কেবল হ'ত পরীক্ষায় পাশ।

সপ্তর্ষির বৈজ্ঞানিক নাম উর্সা মেজর। ইংরেজীতে ওর নাম গ্রেট্ বেয়ার বা বড় ভালুক। ওর গায়ে কাল্পনিক রেখা টানলে নাকি বড়সড় একটা ভালুকের মতই হয় দেখতে। গ্রীক পুরাণে গল্প আছে, দেবরাজ জিউসের প্রিয়পাত্রী ছিলেন ক্যালিস্টো নামে একটি মেয়ে। জিউসের রাণীর তাতে হ'ল ভারি হিংসে। অগত্যা জিউস ক্যালিস্টোকে রক্ষা করবার জন্য একটা বড়সড় ভালুক বানিয়ে আকাশে তারা ক'রে রেখে দিলেন। ক্যালিস্টোর একটি ছেলে ছিল—আর্কাস। তা, জিউস আর্কাসকেও একটা ভালুকছানা বানিয়ে তার মায়ের কাছটিতে বসিয়ে দিলেন, তাকেও তারা ক'রে। সপ্তর্ষি বা গ্রেট বেয়ারের নীচেই আছে এই তারাপুঞ্জ—যার নাম লিট্‌ল্ বেয়ার বা ছোট ভালুক। বৈজ্ঞানিক নাম উর্সা মাইনর। আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে ওর নাম লঘু সপ্তর্ষি, কেউ কেউ বলেন শিশুমার অর্থাৎ শুশুক। এই লিট্‌ল্ বিয়ারের লেজের শেষে যে তারাটি সেটিই হচ্ছে ধ্রুবতারা। ইংরেজীতে ওর নাম পোল্ স্টার বা পোলারিস।

ধ্রুবতারা কি সত্যিই অচল ?

ধ্রুবতারাকে অচল বলেছি। মোটামুটি বলতে গেলে সত্যিই সে অচল। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন চিরকাল সে এ রকম অচল ছিল না, এমন কি হাজার **পাঁচেক বছর** আগেও না। তখন

যে তারাটি অচল অর্থাৎ ধ্রুবতারা ছিল সেটি ওরই কাছের আর একটি তারা। তার নাম থুবান; এটি রয়েছে সপ্তর্ষি আর লঘু সপ্তর্ষির মাঝখানে। পণ্ডিতেরা বলছেন, আজ থেকে হাজার বছর পরে এখনকার ধ্রুবতারাও আর ধ্রুব বা অচল থাকবে না, আবার আর একটি তারা অচল হয়ে ধ্রুবতারা নাম গ্রহণ করবে। কোন্ তারা সেটি? এখন যেটাকে আমরা বলি অভিজিৎ (ইংরেজী নাম ভেগা) সেইটিই তখন হবে ধ্রুবতারা।

কালপুরুষ

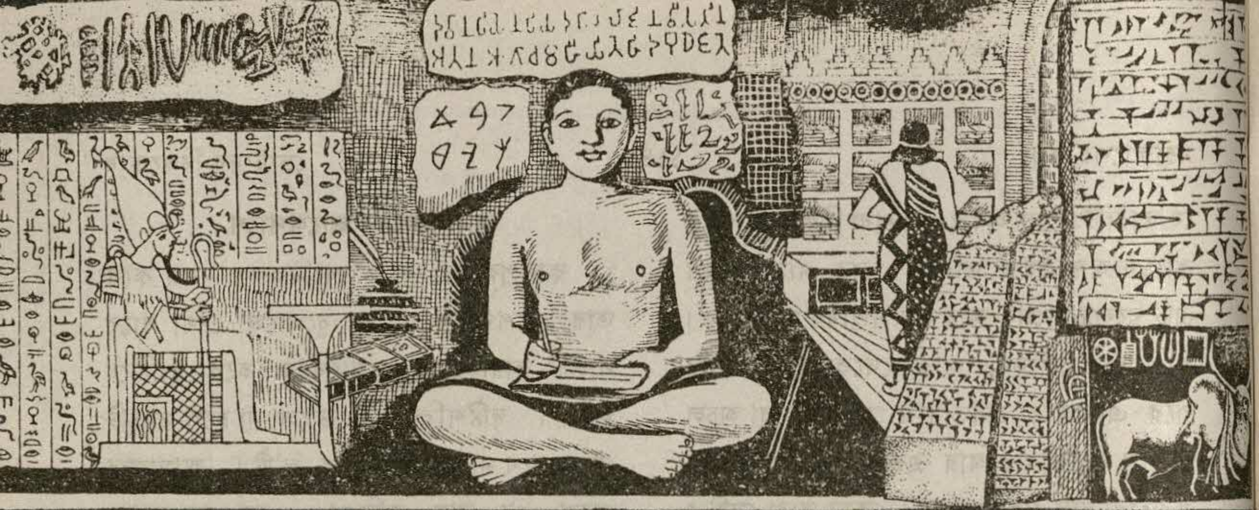
আকাশে সবচেয়ে সুন্দর এবং খুব সহজে নজরে পড়ে এমন একটি তারাপুঞ্জের কথা বলি। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম আকাশে একটা বেশ বড় নক্ষত্রের ঝাঁক দেখা যায়। এই ঝাঁকগুলির মধ্যে কয়েকটি কাল্পনিক রেখা টানলে মনে হবে যেন ধনুক হাতে এক দৈত্যাকার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাতে শুধু ধনুকই নেই, কোমরে আছে কোমরবন্ধ, তাতে তলোয়ার ঝুলছে। এই তারাপুঞ্জটির নাম কালপুরুষ, ইংরেজীতে বলে ওরায়ন। কখনও কখনও হান্টার বা শিকারীও বলা হয়। অগ্রহায়ণের শেষে কালপুরুষ সন্ধ্যা বেলায় থাকে পূব আকাশে, মাঘ মাসে চলে আসে মাথার ওপর। কালপুরুষের পায়ের কাছেও এক ঝাঁক নক্ষত্র আছে, তার মধ্যে একটি খুবই ঝকমকে – গোটা আকাশের ময়দানে অত উজ্জ্বল তারা আর নেই। এই তারাটির নাম লুব্ধক। ইংরেজীতে বলে সিরিয়াস্। কালপুরুষকে যদি শিকারী মনে করা যায়, তা হলে লুব্ধককে বলা যেতে পারে তার সঙ্গী শিকারী কুকুর।

কালপুরুষের আশেপাশে

কালপুরুষের দিকে খানিকক্ষণ নজর করে তার আশপাশে চোখ বুলোলে দেখা যাবে সাতটি তারা খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টিশক্তি খুব ভালো না হলে সাতটি দেখা যাবে না - দেখা যাবে ছ'টি। আমাদের দেশে এর নাম কৃত্তিকা। এরা ছয় বোন, যাঁরা দেবসেনাপতি কার্ত্তিককে দুধ দিয়ে মানুষ করেছিলেন। তাই এঁদের নাম থেকেই তাঁর নাম কার্ত্তিকেয় বা কার্ত্তিক। গ্রীক পুরাণের গল্পটা কিন্তু একেবারে অন্য রকম। তাতে এই কৃত্তিকাকে বলা হয়েছে ডায়না (চন্দ্র) দেবীর সখী, ওরায়ন অর্থাৎ কালপুরুষের ভয়ে পায়রা হয়ে আকাশে ছুটছে আর ওরায়ন ভয় দেখাবার জন্য কুকুর নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেছে।

কৃত্তিকার ঠিক নীচেই একটি লাল রঙের উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাবে। এটির নাম রোহিণী। কৃত্তিকা, রোহিণী এবং আরও কতকগুলি নক্ষত্র একত্র করে কাল্পনিক রেখা টানলে দেখতে হয় অনেকটা ষাঁড়ের মত। এই তারাপুঞ্জটিকে তাই বলা হয় বৃষ রাশি। আবার, কালপুরুষের একটু ওপরে এমন কতকগুলি নক্ষত্র আছে যাদের ভিতর কাল্পনিক রেখা টানলে একজোড়া মানুষের ছবি ফুটে উঠবে। তাই এদের বলা হয় মিথুন রাশি (জেমিনী)। মিথুন মানে যুগল—বা একজোড়া।

এই সব তারা আর তারাপুঞ্জ নিয়ে সব দেশের পুরাণেই নানা মজার মজার গল্প আছে। অবশ্য সবই মনগড়া, তবে শুনতে মন্দ লাগে না।



ভাষা ও লিপির কথা

ছাপাখানার জন্মকথা

পৃথিবীর মানুষ সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা বাড়ছে। বহু দেশ আছে যেখানে দেশের প্রায় সমস্ত লোকই পড়তে বা লিখতে পারে। লক্ষ লক্ষ খবরের কাগজ ছাপা হয় এবং বিক্রিও হয়। তেমনি বইও ছাপা হচ্ছে অজস্র। কত ভাষায় কত সংখ্যায় কত রকমের বই! জ্ঞানের এক বিরাট রাজ্য গড়ে তুলেছে মানুষ এবং তা অতি সহজে প্রত্যেকের আয়ত্তে এনে দিতে পারছে। ছাপাখানা বা মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলেই যে এটা সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য এ ব্যাপারে কাগজের ভূমিকাও কম নয়। কাগজের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬৪-৮৬৫)। এবারে বলব ছাপার জন্মকাহিনী।

কে আবিষ্কার করেছিলেন এই মুদ্রাযন্ত্র? জার্মানীর জোহান গুটেনবুর্গকেই (১৪০০-১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ) বলা হয় এর আবিষ্কারক। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পেছনে মানুষের প্রচেষ্টার বিরাট ইতিহাস রয়েছে কয়েক শ' বছরের।

কি করে ছাপা হয়

মুদ্রণের মূল ব্যাপারটা হ'ল এই রকম: কোন পদার্থের (কাঠ বা ধাতু বা আর কিছু) কিছু অংশ উঁচু এবং কিছু অংশ নীচু করে কোঁদাই করা থাকে (লেখা বা ছবি অর্থাৎ টাইপ বা ব্লক); উঁচু অংশে কালি লাগিয়ে কাগজে বা ঐ রকম আর কিছুতে তার ছাপ ফেলতে হবে। এই ছাপ ফেলাটা হয় যন্ত্রের সাহায্যে আর সেই যন্ত্রকেই বলা হয় মুদ্রাযন্ত্র বা প্রেস। প্রেস কথাটা থেকে আমরা ছাপার গোটা প্রতিষ্ঠানটাকেই এখন বলি প্রেস, আর তার বাংলা করেছি ছাপাখানা।

ওই একই লেখা বা ছবি প্রয়োজন-মত প্রচুর পরিমাণে ছাপতে পারলে বার বার লেখার বা ছবি আঁকার পরিশ্রম, সময় ও অর্থ বাঁচানো গেল। এইভাবে অল্প ব্যয়ে, অল্প সময়ে



কাঠ কুঁদে "ব্লক" তৈরি করে ছাপার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় চীন দেশে

ও অল্প পরিশ্রমে একই বক্তব্যকে বহু লোকের কাছে পৌঁছে দেবার সুযোগ এনে দিল মুদ্রাযন্ত্র।

চীন দেশ পথ দেখাল

কাঠ কুঁদে 'ব্লক' তৈরি করে ছাপার প্রথম নিদর্শন কিন্তু পাওয়া যায় চীন দেশে। সে হচ্ছে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের কথা; সুতরাং চীনকেই ছাপার আদি জন্মভূমি বললে ভুল বলা হবে না। ভারতের বৌদ্ধধর্মের প্রভাব চীন হয়ে জাপানে পৌঁছায়। জাপানের সম্রাজ্ঞী শোটোকু-র (রাজত্বকাল ৭৪৮-৭৬৯ খৃষ্টাব্দ) নির্দেশে লক্ষ লক্ষ কপি বৌদ্ধ মন্ত্র জাপানের তৈরি কাগজে ছেপে সাধারণের কাছে বিতরণ করা হয়েছিল। এর কয়েকটি নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে।

চীনের গৌরবময় তাং বংশের রাজত্বকালে (৬১৮-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) চীনে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির দারুণ প্রভাব। কিন্তু তাং রাজত্বকাল শেষ হতেই শুরু হয় বৌদ্ধদের ওপর নিপীড়ন। প্রায় ৪৬০০টি বৌদ্ধ মন্দির ভেঙে ফেলা হয়। সেই সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থও নিশ্চয়ই বিনষ্ট করা হচ্ছিল। কিন্তু ভক্তরাও যে ধ্বংসের হাত থেকে ধর্মগ্রন্থগুলি রক্ষা করার চেষ্টা করতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই রকম এক কৌতুককর ঘটনার কথা বলি।

সহস্র বুদ্ধ গুহায়

তুর্কিস্তান মরুভূমির মধ্যে তান-হুয়াং শহরের কাছে 'সহস্র বুদ্ধ' গুহা। পাহাড় কেটে এটা তৈরি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে একজন তাও পুরোহিত গুহার মধ্যেকার প্রাচীর-চিত্র উদ্ধার করতে গিয়ে প্রথম সন্দেহ করলেন যে প্রাচীর-চিত্রের পেছনটি মূল পাহাড়ের গা নয়, ইটের তৈরি। ইটের দেয়াল ভাঙা হ'লে একটি কুঠুরীর মধ্যে ১১৩০টি রোল করা অর্থাৎ গোটানো বৌদ্ধশাস্ত্র পাওয়া গেল। সাত বছর পরে ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্যার অরেল স্টেইন এ থেকে 'ডায়মণ্ড সূত্রে'র একটি কপি উদ্ধার করলেন। এটিও ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে।

ডায়মণ্ড সূত্র

ডায়মণ্ড সূত্রের কপিটা থেকে বোঝা যায় যে সে যুগেও বই আর ছবি ছাপার এবং তার প্রকাশনার মান বেশ উন্নত স্তরের



একটি কুঠুরীর মধ্যে ১১৩০টি গোটানো বৌদ্ধশাস্ত্র পাওয়া গেল

ছিল। 'ঠিকুজি' যেমন করে গোটানো থাকে সেই রকম গোটানো এক ফুট চওড়া কাগজ; সবশুদ্ধ ষোল ফুট লম্বা। (সাতটি কাগজ মুখোমুখি জোড়া-লাগানো।) প্রথম পৃষ্ঠা অর্থাৎ মলাটটা কিছু ছোট। পদ্মাসনে শাক্য মুনি বসে আছেন—এ রকম একটা ছবি ছাপানো আছে সেই মলাটে। সারা বইটা কাঠ কুঁদে ব্লক তৈরি করে ছাপানো হয়েছিল। গ্রন্থের শেষে লেখা আছে: "মা-বাবার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে ওয়াং চি কর্তৃক এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।" যে তারিখ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ১১ই মে, ৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

ব্লকের সাহায্যে মুদ্রিত খেলার তাস যে দশম শতকেও চীনে প্রচলিত ছিল তারও প্রমাণ আছে। শুধু তাই নয়, ঐ সময়ে চীনে ব্লকে ছাপানো নোটেরও প্রবর্তন হয়। ধাতুনির্মিত ব্লক থেকে এই নোট ছাপানো হ'ত। একাদশ শতকে ছাপানো নোটের প্রচলন বাড়ে এবং জাল নোটের সমস্যা এত বড় আকারে দেখা দেয় যে মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নানা রকম আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ব্লক আর টাইপের সুবিধা-অসুবিধা

ব্লকের দ্বারা ছবিও যেমন ছাপা যায়, তেমনি লেখাও ছাপা যায়। ব্লক পদ্ধতিতে লেখা ছাপার অসুবিধা এই যে ব্লকটি একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজন ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় না। বুঝিয়ে বলি। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'-এর স্বাক্ষর আমরা বহু জায়গায় ছাপা দেখেছি। এই স্বাক্ষর ছাপা হয়েছে একটি গোটা ব্লক থেকে। এই ব্লকের কোন একটি অক্ষর যেমন 'র' বা 'ব' বা 'ী' বা 'ন্দ্র' অন্য কোন লেখা ছাপার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু প্রতিটি অক্ষর যদি এক-একটি স্বতন্ত্র একক (যাকে আমরা বলি টাইপ) করে তৈরি করা যায় তা হলে প্রয়োজন-মত টাইপগুলি সাজিয়ে যে-কোন লেখা ছাপা যেতে পারবে এবং তা ছাপার পর খুলে ফেলে আবার অন্য লেখা ছাপার কাজে ব্যবহার করা চলবে।

জোহান গুটেনবুর্গের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনিই ধাতুর তৈরি টাইপ পর পর সাজিয়ে প্রথম বই আকারে লেখা ছাপান। কিন্তু চিং লি-র (১০৪১-১০৪৯ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে পি শেং বলে চীনের একজন সাধারণ নাগরিক পোড়ামাটির তৈরি টাইপ ব্যবহার করে

ছাপতেন বলে প্রমাণ আছে। ওয়াং চেং বলে আর একজন ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে কাঠের তৈরি টাইপ ব্যবহার করে ছাপতেন। টাইপ সাজানোর সুবিধার জন্যে তিনি এক ঘুরন্ত কাঠের গোল থালা আবিষ্কার করেন। ঐ থালাতে অনেকগুলি খোপ ছিল এবং বিভিন্ন খোপে স্বতন্ত্র টাইপ রাখা থাকত। প্রয়োজন বোধে থালা ঘুরিয়ে টাইপ সংগ্রহ করা হ'ত। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে কোরিয়াতে ব্রোঞ্জের টাইপ তৈরি ক'রে ছাপার চেষ্টা হয়েছিল এবং তা বেশ কিছুদিন চলেওছিল।

গুটেনবার্গের চলন্ত টাইপ

যে টাইপ বার বার ব্যবহার করা যায় তাকে ইংরেজিতে 'মুভেব্‌ল্ টাইপ' বলা যায়। বাংলায় আমরা ওকে নড়েচড়ে-বেড়ানো বা 'চলন্ত টাইপ' বলতে পারি। প্রাচ্যে এই চলন্ত টাইপের প্রথম প্রচলন হ'লেও প্রাচ্য যে এই পদ্ধতিতে ছাপার কাজে সাফল্য লাভ করতে পারল না তার প্রধান কারণ চীন ও কোরিয়ার ভাষা ধ্বনিভিত্তিক ছিল না—ছিল ভাবভিত্তিক।

এই ভাষাগুলিতে অক্ষরের সংখ্যা এত বেশি যে ছোট ছোট 'চলন্ত টাইপ' ব্যবহার করার চেয়ে গোটা পৃষ্ঠাটার মাপে কাঠ কুঁদে ব্লক তৈরি ক'রে নিয়ে তা দিয়ে ছাপানো তাদের কাছে সহজ মনে হয়েছিল।

জোহান গুটেনবার্গের 'চলন্ত টাইপ' দিয়ে বই মুদ্রণের পদ্ধতি আবিষ্কারের পটভূমি আলোচনা করলে দেখা যাবে সে সময়ে ইয়োরোপে এসেছিল নবজাগরণের যুগ। নানা রকম শিল্প ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। গড়ে উঠছে সাহিত্য-মনীষীদের নতুন নতুন চিন্তাধারা। তার প্রকাশের জন্য চাই প্রচুর বই। হাতে-লেখা বইএ খরচ পড়ে অনেক, একটি বই নকল ক'রে লিখতে সময়ও লাগে অনেক। কাজেই চাই এমন ব্যবস্থা যার ফলে বই সহজপ্রাপ্য হয়; অর্থাৎ অল্প সময়ে ও অল্প খরচে বহু বই বার ক'রে প্রচারের সুবিধা হয়।

কি করে সম্ভব হ'ল

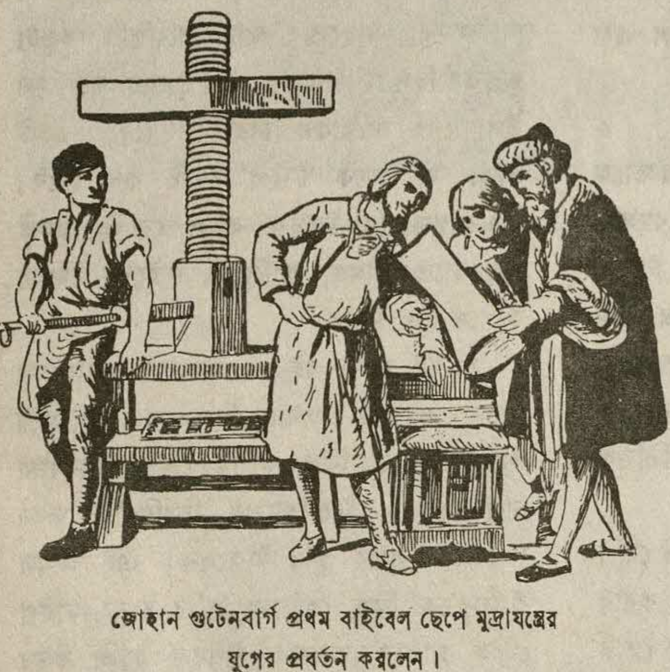
গুটেনবার্গের আবিষ্কারের সামাজিক প্রয়োজনের কথাটা জানা গেল। এখন আবিষ্কারে সাফল্যের জন্য পরিস্থিতি কতটা অনুকূল ছিল দেখা যাক। বই ছাপার জন্য মূল উপাদানের প্রয়োজন চারটি। (১) একটি ধাতু, যা থেকে 'টাইপ' তৈরি করা যাবে; (২) কাগজ; (৩) উপযুক্ত কালি এবং (৪) একটি যন্ত্র, যাতে কাগজ, কালি ও টাইপের সমন্বয়ে কাগজে ছাপ উঠবে।

হাতের লেখা বই-এর প্রয়োজনে কাগজের কোন সমস্যাই তখন ছিল না। জায়গায় জায়গায় বেশ কিছু কাগজ তৈরির কারখানা চালু ছিল। ইয়োরোপের চিত্রশিল্পীরা তখন 'অয়েল কালারে' ছবি আঁকছেন। এই 'অয়েল কালার'কে কিছু হেরফের ক'রে ধাতুর টাইপ থেকে ছাপার কাজের উপযুক্ত কালি ক'রে নিতে খুব অসুবিধা হ'ল না।

ইয়োরোপে স্ক্রু-প্রেসের তখন বেশ ভালোই প্রচলন ছিল। মদ তৈরি করতে, আঙুর, অলিভ ইত্যাদি নিংড়ানোর জন্যে, কাগজ তৈরি করতে মণ্ড থেকে জল নিংড়ানোর জন্যে, কাপড়, চামড়া ইত্যাদির ওপর ব্লক ছাপার জন্যে এবং হাতের লেখা বই বাঁধাইয়ে চাপ দেবার জন্যে ইত্যাদি নানা কাজে তখন স্ক্রু-প্রেসের ব্যবহার

হচ্ছে। কাজেই কাগজে টাইপের ছাপ ফেলার উপযুক্ত ক'রে স্ক্রু-প্রেসকে কিছু অদল-বদল করে কাজের যোগ্য করে নিতে দুস্তর বাধা কিছু দেখা যায় নি। স্ক্রু-প্রেস থেকে আধুনিক ছাপার অতিকায় যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে ক্রমপর্যায়ে এবং বহু সময় নিয়েছে এই উন্নতি ঘটতে।

ছাপার জন্য প্রধানতঃ দরকার টাইপ। হাতের লেখা বই-এর তখন ইয়োরোপে খানিকটা প্রচলন হয়েছে এবং সে বই বর্তমান বই-এর আকারে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সাজিয়ে বাঁধাই হয়ে লোকের হাতে হাতে ঘুরছে। ঠিকুজি আকারে গোটানো বই-এর প্রচলন বহুদিন লুপ্ত হয়েছে। ভালো বাঁধাই-এর দিকে তখন দৃষ্টি ছিল, কারণ হাতের লেখা বই-এর খরচ বেশ ভালোই পড়ত। কাজেই বইটাকে টেঁকসই ক'রে বাঁধাই-এর যত্ন নেওয়া হ'ত। পৃষ্ঠা সাজিয়ে হাতের লেখা বই বাঁধাই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে চামড়ায়, কখনও কখনও ভেলভেট ইত্যাদি দিয়েও) হবার পর তার মলাটে চামড়ার ওপর ছবি বা বই-এর নাম ইত্যাদি ছাপা হ'ত। চামড়ার ওপর ছবি ছাপা হ'ত ব্লক থেকে কিন্তু বহু ক্ষেত্রে বই-এর নাম ছাপা হ'ত স্বতন্ত্র টাইপ অর্থাৎ চলন্ত টাইপ সাজিয়ে তা থেকে। ছাপার এ কাজটাও অবশ্য হ'ত স্ক্রু-প্রেসের সাহায্যে। স্বতন্ত্র চলন্ত টাইপ প্রস্তুত আগেই হয়েছে এবং ব্যবহারও চলছে। ধাতু থেকে এ টাইপ তৈরি হ'ত।

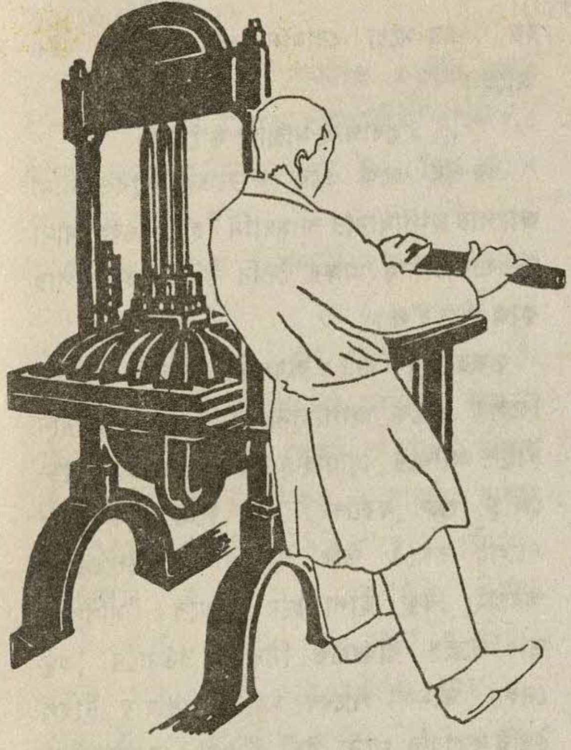


জোহান গুটেনবার্গ প্রথম বাইবেল ছেপে মুদ্রাযন্ত্রের যুগের প্রবর্তন করলেন।

কাজেই দেখা গেল মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের অবস্থা একান্ত অনুকূল। বই-এর চাহিদা আছে, ছাপার জন্য কাগজ ও কালি আছে, টাইপও আছে, ছাপার যন্ত্রও আছে। প্রয়োজন এখন একটি প্রতিভার যে এই উপাদান-গুলির সমন্বয়ে বই ছেপে মুদ্রাযন্ত্রের যুগের প্রবর্তন করবে। ঠিক এই কাজটিই করলেন জোহান গুটেন-বার্গ প্রথম একটি বাইবেল ছেপে। খুব সম্ভবতঃ তিনি এই বই ছাপার কাজ শুরু করেন ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে এবং তা শেষ হ'তে বছর দুই লেগেছিল। 'গুটেনবার্গ বাইবেল' নামে এই বইটি বিখ্যাত।

গুটেনবার্গ কে ছিলেন

গুটেনবার্গ সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় নি। শুধু এইটুকু জানা গেছে যে জার্মানীর মেইনৎজ শহরে অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে এক অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম। রাজনৈতিক



স্ক্রু-প্রেসকে কিছু অদলবদল ক'রে প্রথম ছাপার যন্ত্র তৈরি হ'ল।

অশান্তির দরুণ ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর নির্বাসন হয় এবং তিনি স্টার্সবার্গ শহরে বসবাস করতে আসেন। মানব জাতির এমন একজন হিতকারী আবিষ্কারক কিন্তু সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম ও দারিদ্র্যের সঙ্গেই সংগ্রাম ক'রে গেছেন। সমসাময়িক দু'-একজনের কাছ থেকে ছাড়া বিশেষ কারুর কাছ থেকে তিনি তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য সম্মান বা সহানুভূতি পান নি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক সাধকের জীবনই এই রকম অবজ্ঞাত ভাবে শেষ হয়েছে।

দেশে দেশে ছাপাখানা ছড়িয়ে পড়ল

যাই হোক, মেইনৎজ শহরেই যে আধুনিক ছাপার কাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেখান থেকে তা প্রথমে জার্মানীর আরও কয়েকটি শহরে এবং পরে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জার্মানীর পরেই ইতালির রোমে মুদ্রণের কাজ শুরু হয় ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে। রোমের পর মুদ্রণের প্রসার ঘটে ভেনিসে (১৪৬৯ খৃ), ফ্রান্সে (১৪৭০ খৃ), হল্যাণ্ডে (১৪৭৩ খৃ), স্পেনে (১৪৭৪ খৃ), সুইৎজারল্যাণ্ডে (১৪৭৪ খৃ), ইংল্যাণ্ডে, (১৪৭৬ খৃ), ডেনমার্কে (১৪৮২ খৃ), সুইডেনে (১৪৮৩ খৃ), পোর্তুগালে (১৪৯৫ খৃ), রাশিয়ায় (১৫৫৩ খৃ), এবং ভারতবর্ষে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে। ল্যাটিন আমেরিকায় ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ছাপা বই-এর নিদর্শন পাওয়া যায় এবং এখন যেটা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সেখানে প্রথম বই ছাপা হয় ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে।

ভারতে ছাপাখানার আবির্ভাব

অন্য দেশের কথা থাক, ভারতবর্ষের কথাই বলি। ভারতবর্ষে প্রথম ছাপাখানা আসে গোয়াতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর। তখন পোর্তুগীজরা উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যাতায়াত শুরু করেছে এবং খৃষ্টধর্ম প্রচারেও তারা দারুণ উৎসাহী। ধর্মপ্রচার করতে হ'লে ছাপা বই যে কত কাজের পাদরী সাহেবরা সেটাও বেশ বুঝতে পারছেন। ছাপার অক্ষরে বাইবেলের চাহিদা তাই দিনে দিনে বাড়ছে। এই সময়ে আবিসিনিয়ার রাজা খৃষ্টান যাজক সম্প্রদায়কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে পোর্তুগালের রাজার কাছে একটি ছাপাখানার এবং ছাপাখানার কাজ-জানা লোক পাঠাবার জন্য আবেদন করলেন।

এই আবেদন অনুযায়ী কয়েকজন ধর্মপ্রচারক-সহ (এর মধ্যে ছাপাখানার কাজ-জানা লোকও ছিল) একটি ছাপাখানা জাহাজযোগে পাঠান হ'ল। তখনও সুয়েজ খাল হয় নি, কাজেই আবিসিনিয়া যেতে হ'লে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে যেতে হ'ত। গোয়াতেও তারা থামত, তারপর আবিসিনিয়া যেত। সেইভাবে আবিসিনিয়া যাওয়ার পথে জাহাজ এসে থামল গোয়াতে এবং জাহাজ থেকে ছাপাখানা নামানো হ'ল ৬ই সেপ্টেম্বর ১৫৫৬ তারিখে। কয়েক মাস গোয়ায় কাটিয়ে যাজকদের প্রধান আবিসিনিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি হচ্ছিলেন, কিন্তু গোয়ার শাসনকর্তার অনুরোধে যাওয়া হ'ল না। গোয়াতেই থেকে গেলেন তিনি এবং ১৫৬২ সালে সেখানেই দেহত্যাগ করলেন। ছাপাখানাটা গোয়াতেই রয়ে গেল।

এই ছাপাখানার সঙ্গে যে টাইপ এসেছিল তা আবিসিনিয় ভাষার এবং এই টাইপ দিয়ে কাগজপত্র ছেপে আবিসিনিয়ায় পাঠান হ'ত বলে নথিপত্রে উল্লেখ আছে। ছাপাখানার সঙ্গে যারা এসেছিল তাদেরই মধ্যে একজন 'মালাবার ভাষায়' (গবেষকদের মতে 'তামিল' ভাষায়) টাইপ তৈরি ক'রে একটি বই ছেপেছিল। এই কারিগরটির নাম জোয়াও গনসাল্‌ভ্‌স্ আর বইটির নাম 'দৌত্রিনা ক্রিস্টা'। বইটি ছাপা হয় ১৫৭৮ সনে। এটাই ভারতীয় ভাষায় ভারতে ছাপা প্রথম বই। ১৬ পৃষ্ঠার এই বইটি আসলে একটি পোর্তুগীজ বই-এর তামিল অনুবাদ। মূল বইটার নামও দৌত্রিনা ক্রিস্টা। এর পর খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়োজনে ১৬৭৪ সন পর্যন্ত বেশ কিছু বই গোয়ায় ছেপে বের হয়। এর মধ্যে রোমান হরফে ছাপা বইও আছে।

বোম্বাই-মাদ্রাজ-তাঞ্জোর

এর পর একে একে ভারতের আরও নানা জায়গায় ছাপাখানার আমদানি হ'ল এবং নানা ভারতীয় ভাষায় অক্ষর তৈরি ক'রে বই ছাপার কাজ শুরু হ'ল।

গুজরাটের ধনী ব্যবসায়ী ভীমজী পারেখ বিলেত থেকে ছাপাখানা আর কিছু রোমান টাইপ আনিয়ে বোম্বাইএ বই ছাপার তোড়-জোড় শুরু করলেন। সে হচ্ছে ১৬৭৪-৭৫ সালের কথা। তাঁর ছাপাখানায় ইংরেজীতে অবশ্যই কিছু ছাপা হয়ে থাকবে। নথিপত্রে তার উল্লেখ থাকলেও নিদর্শন বর্তমানে কিছু নেই। ভীমজী পারেখ মহারাষ্ট্র ভাষায় টাইপ তৈরি করাবার জন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে একজন যোগ্য কারিগর পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয় নি। হাতে-লেখা 'ভগবদ্‌গীতার' তখন বেশ প্রচলন। পুনার নানা ফাড়নবিশ এই বই বাইবেলের অনুকরণে ছেপে বের করতে চাইলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্র ভাষায় টাইপ তৈরি করার মত কোন কারিগর পাওয়া গেল না। অগত্যা তিনি তামার পাতে দেশী কারিগর দিয়ে হাতে কুঁদে এক এক পৃষ্ঠায় এক একটি শ্লোকের ব্লক তৈরি করিয়ে কাজ শুরু ক'রে দিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর গঙ্গাধর রাও গোবিন্দর প্রচেষ্টায় 'ভগবদ্-গীতা' ব্লক পদ্ধতিতে ছেপে বেরোয় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে। এই বইএ আছে প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠা এবং এই বই এর একটি কপি পুণা সাতারা রত্নগিরি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

ক্রমে মাদ্রাজের ত্রাঙ্কুবারেও ছাপার চলন হ'ল। এখানেও উদ্যোক্তা পোর্তুগীজ পাদরীরা। ছাপার জন্যে কাগজও তখন ইয়োরোপ থেকে আমদানি করতে হ'ত।

একজন ড্যানিশ মিশনারী তাঞ্জোরের রাজা সারফোজি ভোঁসলের (১৭৯৯-১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ) গৃহশিক্ষক ছিলেন। এঁর উৎসাহে রাজা ভোঁসলেও একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপাখানা থেকে সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষায় বই প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষার জন্য দেবনাগরী টাইপ তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন স্যর চার্ল্‌স্ উইলকিন্স। দেবনাগরী টাইপ দিয়েই মারাঠী ভাষায় বই ছাপা হয়েছিল। মারাঠী ভাষায় দু' রকম হরফের প্রচলন,—দেবনাগরী ও মোদী। মোদী টাইপ তৈরি করার অসুবিধার জন্য দেবনাগরী টাইপ দিয়েই প্রথমে মারাঠী ভাষায় বই ছাপা হয়েছিল।

চার্ল্‌স্ উইলকিন্স

ভারতের মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাসে স্যর চার্ল্‌স্ উইলকিন্স একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর জন্ম ১৭৪৯ বা ১৭৫০ সনে। তিনি বাঙলায় আসেন ১৭৭০ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কেরাণী হয়ে। ইংরেজদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় এদেশে প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা ক'রে 'ভগবদ্‌গীতা', 'হিতোপদেশ' এবং 'শকুন্তলা' ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তিনিই প্রথম বাঙলা এবং দেবনাগরী টাইপ তৈরি করেন এবং একজন বাঙালী কারিগর পঞ্চানন কর্মকারকে টাইপ তৈরি করার কৌশল শিখিয়ে দেন। পঞ্চানন কর্মকারও পরে একদল শিল্পী তৈরি করেন। তাদের মধ্যে মনোহর বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

পোর্তুগীজরা ১৭৪৩ সনে লিসবনে (পোর্তুগাল) প্রথম একটি বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ ছাপেন এবং প্রশ্নোত্তরে ধর্মজিজ্ঞাসার কয়েকটি বই ছাপেন। কিন্তু সে বাঙলা টাইপে নয়, রোমান টাইপে। এরপর একজন গোয়ান ক্যাথলিক বারতো দ্য সিলভেস্ত্রের (১৭২৮-১৭৮৬ খৃ) লেখা বাঙলায় প্রার্থনার বই এবং প্রশ্নোত্তরে ধর্মীয় বই ছাপা হয়। কিন্তু সেও লণ্ডনে এবং রোমান হরফে।

প্রথম বাংলায় ছাপা বই

এদেশে বাঙলায় ছাপা প্রথম বই হ'ল নাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড প্রণীত বাঙলা ব্যাকরণ। এটি ছাপা হয় হুগলীতে ১৭৭৮ সনে।

১৭৭২ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার প্রশাসন-ভার গ্রহণ ক'রে উপলব্ধি করল যে দেশীয় ভাষাগুলি শিক্ষা করা দরকার। বাঙলার গভর্নর-জেনারেল তখন ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর উৎসাহে হলহেড প্রথম ফার্সী ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন 'জেন্টু কোড' ১৭৭৪ সনে। হলহেডের তারপরের বই বাংলা ব্যাকরণ। এই বই বাঙলা হরফে হুগলীতে ছাপা। এর আগে বাঙলা টাইপ ছিল না। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর উৎসাহে উইলকিন্স বাঙলায় বই ছাপার জন্য বাঙলা টাইপের প্রবর্তন করেন।

উইলিয়াম কেরী ও তাঁর ছাপাখানা

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীতি ছিল মিশনারীদের কাজকর্ম থেকে দূরে থাকা। তাই

ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪ খৃ) কলকাতায় ১৭৯৫ সনের ১১ই নভেম্বর পৌঁছে কোম্পানীর আওতার বাইরে শ্রীরাম-পুরকে (হুগলী) নিজের কর্মস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। শ্রীরামপুর তখন ড্যানিশদের দখলে। কেরী এ দেশে এসে বাঙলা শেখার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করলেন রামরাম বসুকে। কেরী সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করেন। কেরীর সাহিত্যকর্মের মধ্যে প্রথম কাজ হ'ল 'নিউ টেস্টামেন্টের' বাঙলা অনুবাদ। পরের কাজ হ'ল সংস্কৃত ব্যাকরণের ইংরেজী অনুবাদ ও সংস্কৃত-বাঙলা-ইংরেজী অভিধান প্রণয়ন।

বই তো লেখা হ'ল, কিন্তু ছাপা যায় কি করে? এমন সময়ে কেরী কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলেন একটি কাঠের ছাপাখানা বিক্রি হবে। তিনি চল্লিশ পাউণ্ড দিয়ে ছাপাখানাটি কিনলেন। কিন্তু টাইপের কি হবে? তিনি বিলেতের বিখ্যাত টাইপ প্রস্তুতকারক ক্যাসলনকে দিয়ে টাইপ তৈরি করিয়ে আমদানি করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তারা যে অসম্ভব দাম চাইল তাতে এই ব্যবস্থায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশী কারিগরের খোঁজ করতে হ'ল।

শ্রীরামপুরে ছাপাখানা বসল

মার্সমান ও ওয়ার্ড এদেশে কেরীর সহায়তাকল্পে আসেন ১৭৯৯ সনে। মার্সমান ও ওয়ার্ডের সহায়তায় ১৮০০ সনে কেরী ওই কাঠের ছাপাখানা স্থাপন করলেন শ্রীরামপুরে। যাই হোক, স্থানীয় করিগরের খোঁজ করাতে একদিন পঞ্চানন কর্মকার (উইলকিন্স-এর কাছ থেকে ইতিমধ্যেই শিক্ষাপ্রাপ্ত) এসে উপস্থিত হ'লেন এবং কেরী তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নিযুক্ত ক'রে নিলেন।

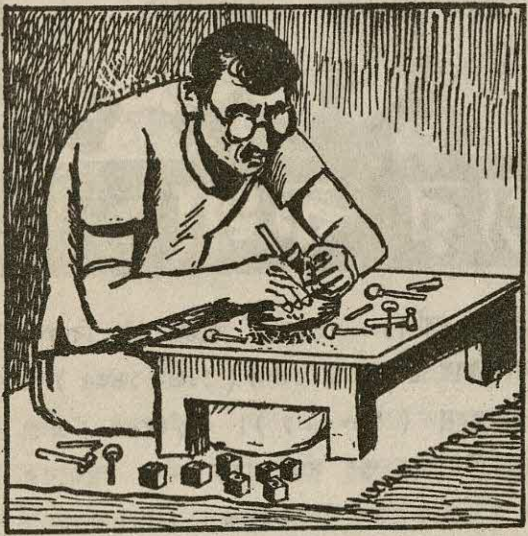
১৮০১ সনে তাঁর প্রথম 'বাইবেল'-এর বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হ'ল। পরবর্তী বই ১৮০১ সনেই প্রকাশিত 'ধর্মপুস্তক'। পরের বছর প্রকাশিত হ'ল রামরাম বসু প্রণীত 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র'।

১৮০১ সনে উইলিয়াম কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাঙলার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল এ-দেশে আগত বিদেশী প্রশাসকদের এ-দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান করা। কেরী বাঙলার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে প্রথমেই বাঙলায় পাঠ্য বই-এর অভাব বোধ করলেন এবং তাঁর বাঙলা শিক্ষক রামরাম বসুকে একটি পাঠ্য বাঙলা বই রচনা করতে অনুরোধ করলে তিনি 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র' বইটি রচনা করে দিলেন।

১৮০২ সনে শ্রীরামপুরের প্রেস থেকে আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য বই বাঙলায় প্রকাশিত হয়: (১) কাশীরাম দাসকৃত 'মহাভারত'; (২) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকৃত 'বত্রিশ সিংহাসন' এবং (৩) কৃত্তিবাসকৃত 'রামায়ণ'।

পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর

পঞ্চানন কর্মকারই প্রথম এখানে দেবনাগরী টাইপ তৈরি করেন। পঞ্চানন তাঁর সহকারী মনোহরের সহায়তায় বাঙলা ও দেবনাগরী ছাড়াও ফার্সী ও আরবী টাইপও তৈরি করেন। পরে তিনি মারাঠী ভাষায় ব্যবহৃত মোদী, মুলতানী, *সিন্ধী, কাশ্মীরী, *ডোগ্‌রী, পুস্তু,



পঞ্চানন কর্মকার কাঠের টাইপ কাটছেন।

টাইপও তৈরি করেন। পঞ্চানন কর্মকার মারা গেলে ১৮০৭ সনে মুদ্রিত 'মেময়ের রিলেটিভ টু দি ট্রানশ্লেশন্স্' গ্রন্থে পঞ্চাননের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। পরবর্তীকালে মনোহরের শিল্পনৈপুণ্যে কেরী বহু ভাষার টাইপ তৈরি করান এবং ১৮০১ থেকে ১৮৩২ সন পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের বহু অনুবাদ ও অন্য বই প্রকাশ করেন।

এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত বই-এর তালিকায় যে-সব ভাষার বই-এর উল্লেখ আছে তা হ'ল : বাঙলা, ওড়িয়া, মগধী, অসমীয়া, খাসী, মণিপুরী, সংস্কৃত, হিন্দী, ব্রজভাষা, কনৌজি, কোশলী, উদিপুরী, জয়পুরী, ভূগোলী, মারোয়াড়ী, বিকানীরী, *ভাট্টি, হারাওটি, *পাল্লা, *কামাওনি, গারওয়ালী, নেপালী, মারাঠী, গুজরাতী, কোণকানি, পাঞ্জাবী, বালুচী, তেলেগু, কানাড়ী, পারশী, বার্মিজ, হিন্দুস্থানী, সিংহলী, মালয়ালম ও চীনে।

উক্ত তালিকায় *-চিহ্নিত ভাষার বইগুলি ছাড়া সব বই-ই শ্রীরামপুর কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। সংস্কৃত, হিন্দী, কনৌজি মারোয়াড়ী, বিকানীরী ও মগধী ভাষায় ছাপার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টাইপ ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই, যে, চীনে ভাষায় বই ছাপার জন্য ব্লক পদ্ধতির বদলে বর্তমান কালে এই প্রথম 'চলন্ত টাইপ' দিয়ে বই ছাপা হয়েছিল এবং এ কৃতিত্ব ভারতীয় কারিগরীর।

শ্রীরামপুরে কাগজেরও কারখানা

ভারতে তৈরি কাগজের মান তখন বিশেষ উন্নত ছিল না। বিদেশ থেকে কাগজের আমদানি ছিল ব্যয়বহুল ও অনিয়মিত। ফলে সময়ে সময়ে কাগজের অভাবে ছাপার কাজ থেমে থাকত। এই অসুবিধা ঘোচাবার জন্য শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বোল্টন থেকে ১২ অশ্বশক্তির একটি বয়লার আমদানি ক'রে শ্রীরামপুরে ১৮২০ সনে (২৭ মার্চ) একটি কাগজের কল স্থাপন করেন। ১৮৬৫ সন পর্যন্ত এই কলে কাগজ উৎপাদিত হয়ে এদেশের চাহিদা মেটাত।

ভারতবর্ষে ছাপাখানার প্রথম প্রবর্তন হয়েছিল গোয়ায়। কিন্তু আজ সকলেই স্বীকার করেন যে অতি অল্পদিনে এদেশে এই শিল্পের এত উন্নতির কৃতিত্ব বাঙলা দেশের,—এবং বিশেষ করে শ্রীরামপুর মিশনের।



বিশ্বসাহিত্যের কথা

স্প্যানিশ ও পোর্তুগীজ সাহিত্য

এর আগে আমরা ইয়োরোপের বিভিন্ন সাহিত্যে রেনেশাঁস বা নবজাগরণের কথা কিছু কিছু আলোচনা করেছি। ইতালী ও ফ্রান্সের মত স্পেনেও রেনেশাঁসের প্রভাবে নবজীবনের প্রেরণা আসে এবং নাটকে, ছবিতে, গানে ও সাহিত্যে তা শতমুখে উৎসারিত হ'তে থাকে। কিন্তু ইতালী ও ফ্রান্সের সঙ্গে স্পেনের এক জায়গায় তফাৎ ছিল। স্পেনে আরবরা বহুদিন থেকে বাস করার ফলে খৃষ্টীয় ও আরব সংস্কৃতিতে সেখানে খানিকটা মেলামেশা হয়েছিল। তার ফলে স্পেনের লোকগাথা ও চারণ গানে একদিকে যেমন কীডের কাহিনী ও গানের প্রাধান্য হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি মধ্য প্রাচ্যের অনেক কাহিনী এবং উপকথাও এসে মিশেছিল তার সঙ্গে। তাই স্পেনের এই লোকসাহিত্য খুবই মূল্যবান্ বলে মনে করেন সাহিত্যরসিকেরা।

স্প্যানিশ সাহিত্যে রেনেশাঁসের প্রভাব

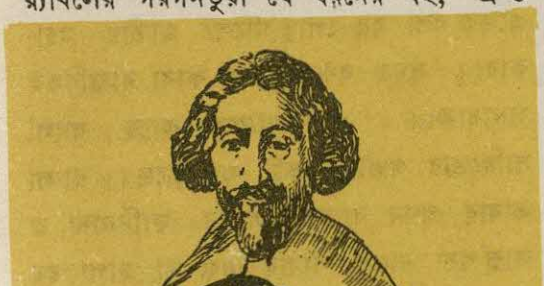
কিন্তু বিদ্বজ্জনের সাহিত্য, যা রচিত হয় স্পেনে রেনেশাঁসের প্রভাবে, তার গৌরবই সব চেয়ে বেশি। এই সময় ওঠেন দুই বিখ্যাত নাট্যকার লোপ দ্য ভেগা (১৫৬২-১৬৩৫) ও কলদেরন (১৬০০-৮১)। দু'জনেই এঁরা শেক্সপীয়ারের শুধু সমসাময়িক ন'ন, অনেকের মতে প্রতিভাতেও তাঁর সমকক্ষ। লোপ দ্য ভেগা লেখেন অজস্র নাটক। তার মধ্যে ভেড়ার কূয়ো (দি শিপ্‌ ওয়েল) এবং মালীর কুকুর (দি গার্ডনার্স্‌ ডগ্‌) সব চেয়ে পরিচিত। গ্রামের দরিদ্র সাধারণ মানুষদের জীবন চিত্রিত হয়েছে এই নাটক দু'টিতে। কলদেরনের জীবনটাই স্বপ্ন (লাইফ ইজ এ ড্রীম) গুণিজনের বিচারে হ্যামলেটের মত মহান্ কাব্য-নাটক। ইংরেজ কবি শেলী এর কিছু অংশ সযত্নে অনুবাদ করেছিলেন।

এঁদের সঙ্গেই দেখা দেন গনগোরা (১৫৬১-১৬২৭) ও সার্ভেন্তিস (১৫৪৭-১৬১৬)। প্রথম জন বিখ্যাত কবি। একদিকে তিনি যেমন লিখেছেন গভীর ভাবাবেগপূর্ণ গান ও গীতিকবিতা, অন্যদিকে তেমনি সোলেদাদেস বা আত্মার গভীরে নামে আছে তাঁর সুবৃহৎ কাব্য। এই কাব্যে প্রকৃতির শোভা, সৌন্দর্য ও জীবনের দার্শনিক উপলব্ধি অপূর্ব কাব্যভাষায়

রূপ পেয়েছে, যদিও এর অনেকাংশ এত জটিল যে বড় বড় পণ্ডিতও তার মর্ম ভেদ করতে পারেন নি। সার্ভেন্তিস জগৎজোড়া নামের অধিকারী তাঁর ডন কুইক্সোট বইটির জন্য।

ডন কুইক্সোট বা ডন কিহোটি

ডনকুইক্সোট (প্রকৃত উচ্চারণ ডন কিহোটি) একটি ব্যঙ্গ-উপন্যাস। তখনকার দিনে নাইটরা যে ধরনের মিথ্যা বীরত্বের ভড়ং করতেন তা নিয়ে বিদ্রূপ করার জন্যেই সার্ভেন্তিস এঁকেছিলেন কিহোটি ও তাঁর অনুচর সাঙ্কো পাঞ্জার চরিত্র। উদ্ভট ও অসম্ভব নানা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে মানবচরিত্রের নানা দুর্বলতার দিক্‌গুলি ফোটানো হয়েছে এতে এমন ভাবে যে আজও পর্যন্ত বইটি পুরোনো হয় নি। র‍্যাবলের গরগনতুয়া যে ধরনের বই, এ-ও



সার্ভেন্তিস

অনেকটা সেই রকমই। কয়ে ভেদো (১৫৮০-১৬৪৩) সুয়েনস বা স্বপ্নদর্শন নামে যে বই লেখেন অল্প পরে,—তাও ব্যঙ্গরচনা। তবে তা ডন কুইক্সোটের মত সরস নয়, বিদ্রূপের সুর তাতে অতিশয় তীব্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে

ইনকুইজিশন নামে তীব্র ধর্মকলহ, আরমাডা যুদ্ধ, মূরদের বিতাড়ন ইত্যাদির ফলে স্পেনের রাজনীতির গৌরব স্থায়ী হ'ল না বেশি দিন। তার সাহিত্যসংস্কৃতির গৌরবও পড়তে শুরু করল। মধ্য সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে স্প্যানিশ সাহিত্যে এল জটিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার হাওয়া। রেনেশাঁস যুগের সেই আবেগ-পূর্ণ গীতিকবিতা ও কাব্য-নাটক আর তৈরি হ'ল না। তার স্থানে এল হয় ব্যক্তিগত আক্রমণপূর্ণ ব্যঙ্গরচনা, নয় তো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক নিবন্ধ, কিংবা বিশেষত্বহীন নাটক-উপন্যাস। গ্রেসিয়ান (১৭০১-১৭৫৮), পাড্রে ইসলা (১৭০৩-১৭৫৮), লিয়েনদ্রো ফারনান-দেজ দ্য মোরাতেন (১৭৬০-১৮২৮) প্রভৃতি লেখক উঠতে থাকেন পরের পর। গ্রেসিয়ান 'মানুষের অধিকার' নামে একখানি মূল্যবান্ প্রবন্ধপুস্তক লিখেছিলেন। ইসলার ফ্রে গেরুন্দিয়া উপন্যাস এবং মোরাতেনের এল-সিদো-লাসনিনাস বা 'সবই খেলা' নাটকও এই সময়ের নামকরা রচনা। আজ এর কোনটাই পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করে না।

স্বনামখ্যাত সমালোচক লুজান (১৭০২-১৭৫৪) তাঁর 'পোয়েটিকা' নামক আলোচনা-গ্রন্থটিও লেখেন এই সময়ে। এই বইয়ে সাহিত্যের আদর্শ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি এবং সৎ কাব্য ও নাটক বলতে ঠিক কি বোঝায় তা যথেষ্ট যত্ন ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই ব্যাখ্যা করেছেন। শিল্প থেকে সাহিত্যে এসে যে বারোক রীতি অর্থাৎ অলঙ্কার-বহুল রচনা-রীতি ইতিমধ্যে খ্যাতিলাভ করেছে,

তার স্বরূপ যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন লুজান হলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। ইতালিতে ক্রোচে এবং জার্মানীতে বোসাঙ্কে পরবর্তীকালে এই রকম খ্যাতিলাভ করেছিলেন সাহিত্যের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে।

এ যুগের স্প্যানিশ সাহিত্য

উনিশ শতকে দেখা দিলেন বিখ্যাত কবি গুস্তাভ এদলফো বেকার (১৮৩৬-৭০), তাঁর পর অ্যান্টনিও মেচাদো (১৮৫৭-১৯৩৯)। বেকারকে বলা হয় দুঃখবাদের কবি। জীবনের নশ্বরতা ও দুঃখের অনিবার্যতাকে গীতিকবিতায় ভাষা দিয়েছেন তিনি। মেচাদো স্বপ্নাবেশের কবি। প্রেম, প্রীতি ও আনন্দের গানই ধ্বনিত হয়েছে তাঁর গীতিকবিতাগুলিতে। রোসালিয়া (১৮৩৭-৮৫) নামে একজন মহিলা কবিও ছিলেন এই সময়ে। এই কবিরা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বায়রন, শেলী প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের দ্বারা। কেউ কেউ অনুবাদও করেছেন তাঁদের রচনা কিছু কিছু।

আধুনিক কালেও স্পেনে বিশেষ শক্তিমান্ সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হয়েছে। এঁদের মধ্যে ঔপন্যাসিক ব্লাসকো আইবেনেজ ও নাট্যকার জেসিন্তো বেনাভাঁতের নাম আমরা সবাই জানি। গভীর মানসিক সংঘাতের পটভূমিতে সমস্যাবহুল উপন্যাস লিখেছেন আইবেনেজ এবং একালের অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঘৃণা ও বৈজ্ঞানিক আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে নাটক লিখেছেন বেনাভাঁতে। প্রথমের 'নিঃসঙ্গ পথ' (লোনলি ট্র্যাক্) নামক উপন্যাস এবং দ্বিতীয়ের 'তাঁর স্বামীর বন্ধু' (হার হ্যাজব্যাণ্ডস ফ্রেণ্ড) নামক নাটক ইংরেজী অনুবাদে অনেকেই পড়েছেন। কেউ কেউ বেনাভাঁতেকে বলেন স্প্যানিশ সাহিত্যের বার্নার্ড শ'। প্রখ্যাত কবি ও কাব্যনাট্য-রচয়িতা গার্সিয়া লোরকাও (১৮৯৯-১৯৩৬) এ যুগের প্রধান একজন সাহিত্যিক। তাঁর 'হাঘরের গান' (জিপ্‌সী ব্যালাড্‌স্) কবিতাগ্রন্থ এবং 'রক্তাক্ত বিবাহ' (ব্লাডি ওয়েডিং) কাব্যনাট্য সর্বত্র উচ্চ-প্রশংসিত হয়।

পোর্তুগালের সাহিত্য

স্পেনের প্রতিবেশী পোর্তুগালের সাহিত্যেও প্রতিভাবান্ লেখকের আবির্ভাব হয়েছে। ষোড়শ শতকে যোদ্ধা কবি ক্যামিয়ন্স (১৫২৪-৮০) লেখেন লুসিয়াড নামে কাব্যকাহিনী—ভাস্কো দ্য গামার দিগ্‌বিজয় বৃত্তান্ত প্রচারের জন্য। ইনিড বা জেরুজেলাম ডেলিভার্ডের মত একেও বলা হয় পোর্তুগালের জাতীয় মহা-কাব্য। সমুদ্র বর্ণনায় এই কাব্য বাস্তবিকই অসাধারণ। পোর্তুগালের কাছে বাংলা সাহিত্যের গভীর একটি ঋণ আছে। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লেখেন ফার্দিনান্দ দ্য লাস্যুঁপসা নামক পাদরি এবং তা ছাপা হয় লিসবন থেকে।

জার্মান্ সাহিত্য

মিনে সিংগারদের গান এবং নিবলান জেন লোককাব্য দিয়ে জার্মান্ সাহিত্যেরও যাত্রা শুরু হয়। মেরু অঞ্চলের সাগাগুলি থেকে ব্রুনহিল্ড এবং সিগুর্ড প্রভৃতি উপকথার বীরদের কাহিনীও ছড়াতে থাকে গানের আকারে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা স্পেনের মত জার্মা-নীতে সত্যিকার একটা সাহিত্য গড়ে ওঠে নি রেনেশাঁসকে কেন্দ্র করে। বরং তার পর

এসেছে যে রিফর্মেশন বা সংস্কার, তার ফলে জার্মানীতে এসেছে নৈতিক বিশুদ্ধির আন্দোলন এবং গান, নাটক ও কাব্যাদির পরিবর্তে ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র চর্চার দিকেই পড়েছে শিক্ষিত মানুষের ঝোঁক। তার ফলে আদর্শ গদ্য লেখা শুরু হয়েছে এ সময়। মার্টিন লুথারই (১৪৮৩-১৫৪৬) ভোলগেট বা লঘু ল্যাটিন ছেড়ে শুদ্ধ জার্মান্ ভাষায় প্রথম বাইবেলের অনুবাদ করেন। এখান থেকেই গদ্যের বিস্তার আরম্ভ হয়।

অদ্বিতীয় গ্যেটে

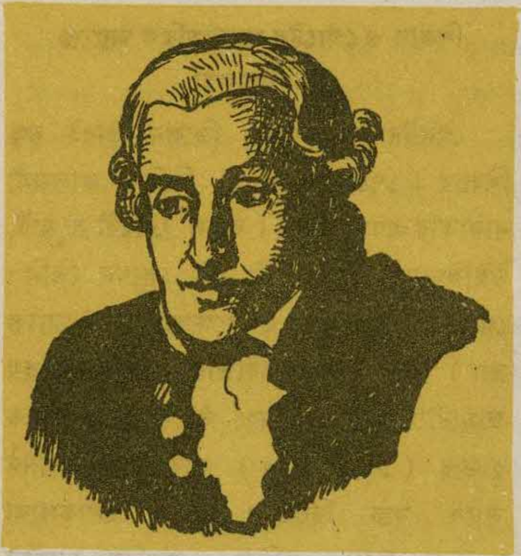
আসলে জার্মান্ সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন ভলফ গ্যাংফন গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) এবং শুধু জার্মানীর ন'ন, গোটা জগতেরই তিনি এক অদ্বিতীয় পুরুষ। কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিল্পী, রাষ্ট্র-নায়ক,—কি ন'ন তিনি? রবীন্দ্রনাথ ও তলস্তয় ছাড়া তাঁর মত মানুষই হন নি কোনও দেশে। সাহিত্যে গ্যেটের দান অজস্র। অপূর্ব গীতি-কবিতা, তরুণ ভের্টরের দুঃখ (সরোজ্ অব্ ইয়ং ভের্টর) উপন্যাস, ফাউস্ত কাব্যনাট্য, আত্মজীবনী এবং আরো বহু অমূল্য রচনা। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হ'ল ফাউস্ত। আলকেমি বিদ্যাবিশারদ ফাউস্ত কি করে প্রেতাত্মাকে বশীভূত করে তার সাহায্যে বহু অত্যাশ্চর্য ব্যাপার সম্ভব করেন, তারপর কি ভাবে তার হাতে আপন আত্মা বিসর্জন দেন, সেই কাহিনী বলা হয়েছে এই নাটকে। বৈজ্ঞানিক শক্তি ও আত্মিক শক্তির দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে এক অপূর্ব কাব্য-ভাষায়।

শিলার ও গ্যেটের সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যিকরা

গ্যেটের পাশাপাশি ছিলেন তাঁরই বন্ধু শিলার (১৭৫৯-১৮০৫)। তিনিও কালজয়ী নাট্যকার এবং দস্যুদল (রবার্স্), মেরী স্টুয়ার্ট, উইলিয়াম টেল প্রভৃতি বই লেখেন তিনি। গ্যেটের নেতৃত্বে 'ঝড় ও বিক্ষোভ' (স্টর্ম্ অ্যাণ্ড ড্রাং) নামে যে সাহিত্যিক আন্দোলন হয় জার্মানীতে, শিলার এবং তাঁদের সমসাময়িক হার্ডার (১৭৪৪-১৮০০) তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। হার্ডার লোকগাথা সংগ্রাহক রূপেও প্রসিদ্ধ। হেনরিক হায়েনে (১৭৯৭-১৮৫৬) ও হেল্ডারলিন (১৭৭০-১৮৪৩) এঁদের পরবর্তী কবি। হায়েনে গীতিকবি রূপে ভার্লেন ও শেলীর মতই নামী। রেশমের মত নরম তাঁর ভাষা, সুর ও স্বপ্নে ভরপুর তাঁর প্রতিটি কথা। কোন কোন কবিতায় তাঁর ভারতীয় চিন্তার ছায়া দেখা যায়। হেল্ডারলিন শহুরে জীবনের কবি এবং তাঁর কবিতায় ভাবাবেগের চেয়ে বুদ্ধির প্রাধান্য বেশি। লিলিয়েন কর্ন (১৮৪৪-১৯০৯), উগো হফমানসতাল (১৮৭৪-?) ও র্য়েনার্ মারিয়া রিলক্যে (১৮৭৫-১৯২৬) প্রমুখ কবি এই শতাব্দীতেও বিশেষ যশস্বী হয়েছিলেন। রিলক্যের রচনার কোন কোন অংশ রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়।

দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস

অজস্র কাব্য, নাটক যেমন একদিকে জার্মান্ সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে, অন্য দিকে তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান এবং ইতিহাসেও জার্মানরা মানব জাতিকে অসীম ঋণে আবদ্ধ করেছেন। কান্ট, হেগেল, শোপেনহাউয়ার,



কান্ট্

নীট্‌শে প্রমুখ দার্শনিক এবং স্পেঙ্গলার, ডেল-থাই, মমসেন প্রভৃতি ইতিহাসবিদ্ একদিকে, অন্যদিকে মার্ক্স, ফ্রয়েড, আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানী যে চিন্তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন, বিংশ শতাব্দীতে গোটা মানব জাতিই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাঁদের চিন্তাধারা আশ্রয় করেই পৃথিবীর দিকে দিকে বিরাট সাহিত্যের ঐশ্বর্য তৈরি হয়েছে আজ। কান্টের চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় অদ্বৈত তত্ত্বের কিছুটা মিল আছে। শোপেনহাউয়ার ভক্ত ছিলেন উপনিষদের। নীটশে যে মত প্রচার করেন তাকে বলা হয় 'অতি-মানববাদ'। স্পেঙ্গলার পশ্চিমী সভ্যতার ক্ষয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। ফ্রয়েড দেন অবচেতন লোকের দরজা খুলে। মার্ক্স উন্মুক্ত করেন সামাজিক দারিদ্র্যের ইতিহাস। আইনস্টাইন বদলে দেন গোটা জগৎচিন্তারই মূল। সবগুলি মতই স্পর্শ করেছে কোন না কোন ভাবে এ যুগের জীবন ও সাহিত্যকে।

এ যুগের জার্মান্ সাহিত্য

কিন্তু ও কথা যাক। বিশুদ্ধ সাহিত্যও রচিত হয়েছে জার্মানীতে এ যুগে প্রচুর এবং উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটকে অসাধারণ বলে গণ্য হতে পারেন এমন লেখক দেখা দিয়েছেন অনেক। জেকব ভেসারমান, হারমান জুডার-মান ও টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫) গল্প-উপন্যাসে এবং হাউপ্টমান (১৮৬২-১৯২৬), ফ্রাঞ্জ, মোলনার ও আর্থার সিনৎজেলার নাটকে অসামান্য প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য জাতিতে অষ্ট্রিয়ান, তবে জার্মান্ ভাষাভাষী বলে তাঁদের লেখা জার্মান্ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত রূপেই দেখতে হবে।

ভেসারমানের উপন্যাস 'জগতের মায়া' (ওয়ার্ল্ডস ইল্যুশন) এবং হংসমানব (গুজম্যান) তীব্র জীবনদ্বন্দ্বের কাহিনী। ফরাসী সাহিত্যে ব্যালজাক ও রুশ সাহিত্যে ডস্টয়েভেস্কী যে রকম, জার্মান্ সাহিত্যে ভেসারমান অনেকটা সেই রকম। টমাস মানও অদ্বিতীয় লেখক। তাঁর 'যাদুর পাহাড়' (ম্যাজিক মাউ-ণ্টেন) 'কালো হংসী' (ব্ল্যাক সোয়ান) এবং 'মাথাবদল' (ট্রান্সপোজ্ড্) অবিস্মরণীয় রচনা। মান ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত, তাঁর কাহিনীর মধ্যে তাই গল্পবস্তুকে ছাপিয়ে পদে পদে গভীর জ্ঞানের কথা এসে পড়ে। জুডারমান সং অব্ সংস্ উপন্যাস ও ইণ্ডিয়ান লিলি প্রভৃতি মনোরম ছোটগল্প লিখে প্রসিদ্ধ। তাঁর সমবয়সী পল হেস্যে লারাবোতিয়া বা রণচণ্ডী নামে যে গল্প লেখেন তাও জার্মান্ সাহিত্যের অলঙ্কার স্বরূপ। একটি বদ্‌রাগী মেয়ে কি করে শেষ পর্যন্ত

একটি তরুণ মাঝিকে বিয়ে করল তারই করুণ-মধুর কাহিনী এটি।

নাট্যকার হাউপ্টমান ডুবো ঘণ্টা (সানকেন বেল) এবং তাঁতী (উইভার) নামক নাটক লিখে বাস্তববাদী নাটকের জমি তৈরি করেন। জার্মান্ ভাষায় অপেরা বা গীতপ্রধান নাটক উনিশ শতকে প্রবর্তন করেন ভাগ্‌নার এবং এখনও পর্যন্ত সে জায়গায় তিনিই অদ্বিতীয়।

শিশুসাহিত্যেও জার্মান্ লেখকদের দান কম নয়। গ্রাম্ দু'ভাইএর লেখা রূপকথা (গ্রীম্স্ ফেয়ারী টেল্স্) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত। বাংলা ভাষায় অনেকে এগুলির তরজমা করে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিয়েছেন।



টমাস্ মান

হিটলারের পরে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অল্প আগে জার্মানীতে ওঠেন এক নায়ক হিটলার এবং তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য শুরু করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তিনি একাধারে ছিলেন ইহুদীবিদ্বেষী এবং শিষ্ট সাহিত্য ও শিল্পকলার বিরোধী। তাই তাঁর আমলে



আলেকজান্দার পুস্কিন

ফ্রয়েড, আইনস্টাইন, টমাস মান সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। 'পশ্চিম সীমান্তে সব শান্ত' (অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রণ্ট) বইয়ের লেখক রিমার্ককেও চলে যেতে হয় দেশ ছেড়ে। বিখ্যাত নাট্যকার ব্রেশট, আর্নষ্ট টলার প্রভৃতিও অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেন। যুদ্ধের পর বাংলার মত জার্মানীও দু'ভাগ হয়ে গেছে। তার আজকের সাহিত্যের খবর আমরা কমই পাই।

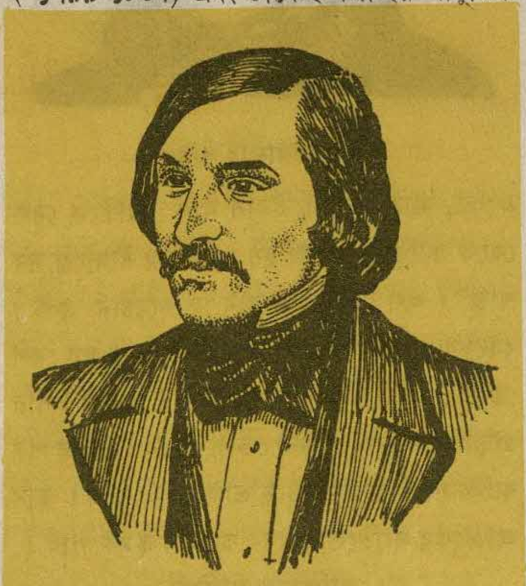
রাশিয়ান সাহিত্য

চিরদিনই পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক গঠনে পার্থক্য ছিল অনেক। তার ফলে তার সাহিত্যও গড়ে উঠেছিল ভিন্ন ধারায়। রাশিয়ার অর্ধেকটা আছে ইয়োরোপের মধ্যে, অর্ধেকটা এশিয়ার মধ্যে। একই সঙ্গে তাই তার সমাজে এসেছে খৃষ্টানদের, আবার সেই সঙ্গে স্লাভ, মুঙ্গল ও তাতারদের প্রভাব। ভাস্কর্যে ও

শিল্পকলায় যেমন, গানে, নাটকে ও লোক-গাথায়ও তেমনি এ সবের মিলিত ছাপ পড়েছে। আসলে ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী ও বৃটেন যখন সভ্যতার উচ্চ শিখরে, পূর্ব ইয়োরোপে রাশিয়া তখনও ছিল অনেকটাই অনগ্রসর মানুষের দেশ। প্রকৃত পক্ষে তার জীবনে যুগের হাওয়া লাগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

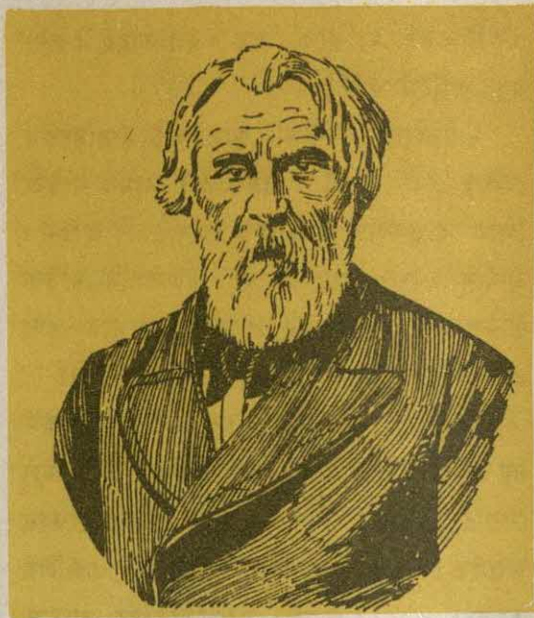
আলেকজান্দার পুস্কিন

প্রথম রুশ সাহিত্যিক যিনি ইয়োরোপে নাম করেন তিনি হলেন আলেকজান্দার পুস্কিন (১৭৯৯-১৮৩৭) এবং তাঁকেই বলা হয় আধুনিক



নিকোলাই গোগোল

রুশ সাহিত্যের জনক। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। 'হাঘরে' (জিপ্‌সীজ) নামক কাব্য, বোরিস গোডুনভ নাটক এবং ইস্কাবনের রাণী (কুইন অব স্পেড্‌স্) গল্প তাঁর সুপরিচিত। তবে তিনি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গীতি-কবিতার জন্যে। নির্বাসিত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মানুষের দুঃখদারিদ্র্য এই সব কবিতার

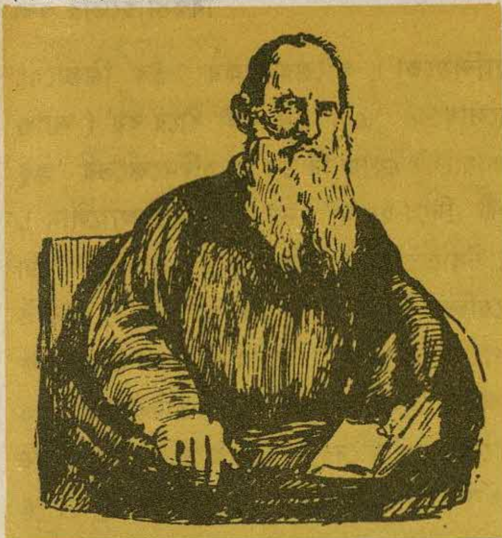


আইভান তুর্গেনিভ্

ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। তাঁর সমসাময়িক লারমনতফও কবিরূপে সমান খ্যাত। ডেভিল নামক কাব্যে তিনি ঈশ্বর ও শয়তানের সঙ্ঘাত বর্ণনা করেছেন। শয়তান এই কাব্যে চিত্রিত হয়েছে একজন নির্যাতিত মানুষ হিসাবে। লারমনতফেরও অনেক চমৎকার গীতিকবিতা আছে।

রুশ কথাসাহিত্য

কিন্তু রুশদের কলম খোলে সব চেয়ে বেশি কথাসাহিত্যে। নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-৫২), আইভান তুর্গেনিভ (১৮১৮-(৮৩), ফেদর দস্তয়েভস্কী (১৮২১-৮১), লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) পরের পর ওঠেন রাশিয়ায়, যাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং ব্যালজাক, জোলা, টমাস মান প্রভৃতি ছাড়া তাঁদের সমকক্ষ মানুষই এদিক্ দিয়ে খুব বেশি দেখা যায় না। গোগোল 'মৃত আত্মা' (ডেড

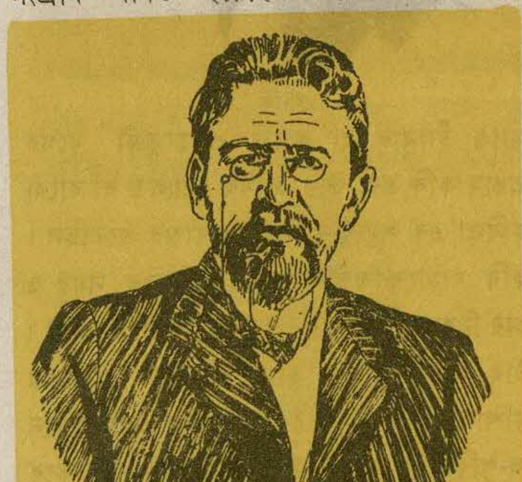


কাউন্ট লিও তলস্তয়

সোল্‌স্) নামের বৃহৎ উপন্যাসে জার-শাসিত রাশিয়ার সাধারণ মানুষদের দুঃখকষ্টের মর্মান্তিক ছবি এঁকেছেন। তুর্গেনিভের 'কুমারী মাটি' (ভার্জিন সয়েল) উপন্যাসে আমরা পাই চাষীদের জীবন ও তাদের সংগ্রাম ও স্বপ্নের কাহিনী। দস্তয়েভেস্কী দেখিয়েছেন সমাজের অবিচার মানুষকে কি ভাবে ঘৃণিত অপরাধীতে পরিণত করে তাঁর 'অপরাধ ও দণ্ড' (ক্রাইম্ অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট) উপন্যাসে। তলস্তয় সারা পৃথিবীরই একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

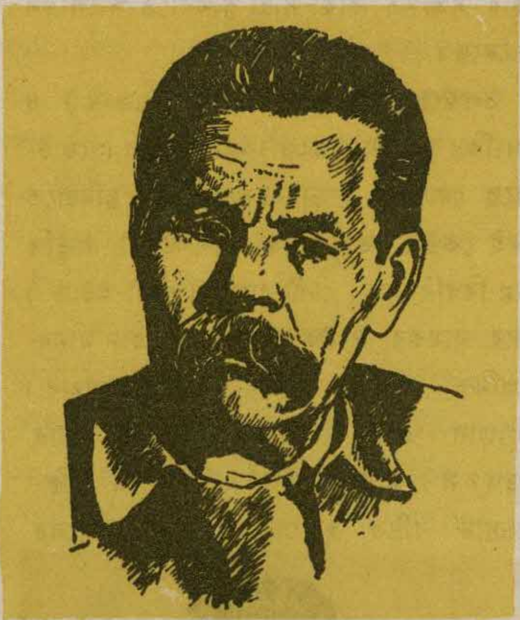
ওয়ার এণ্ড পীস বা 'যুদ্ধ ও শান্তি' তলস্তয়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এতে নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ ও রুশদের জাতীয় সংগ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে অপরূপ মহাকাব্যের ভঙ্গীতে। আনা কারেনিনা নামে এক নায়িকার কাহিনী বলেছেন তিনি ঐ নামের আর একখানি উপন্যাসে। পুনর্জন্ম (রেসারেক্‌শন্) তাঁর আর একখানি বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে তলস্তয় ছিলেন বিপ্লবী। তাঁর মতামত তাই সারা পৃথিবীতে আলোড়ন এনেছে।

তলস্তয়ের পর চেকভ (১৮৬০-১৯০৪) ও গোর্কির (১৮৬৮-১৯৩৬) নাম স্মরণীয়। ছোটগল্পে মোপাসাঁ ছাড়া চেকভের জুড়ি দুনিয়াতে নেই কেউ। তাঁর বাজি ও শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি গল্প বিশ্ববিখ্যাত। চেরী-বাগান (চেরী-অর্চার্ড) তাঁর নামকরা নাটক। গোর্কি মহান্ মানবপ্রেমিক লেখক। তাঁর 'মা' (মাদার) উপন্যাস এবং 'নীচের গভীরে' (লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স) নাটকে বঞ্চিত শ্রমিকদের মুক্তিসংগ্রাম বর্ণিত হয়েছে। ১৯১৭ সালের



চেকভ

সোভিয়েৎ বিপ্লবকে প্রেরণা দিয়েছিল গোর্কির এই সব লেখা। গোর্কির রচনা আমাদের দেশেও রবীন্দ্র-পরবর্তী লেখকদের বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। গোর্কির পাশাপাশি ছিলেন কবি আলেকজান্দার ব্লক, যিনি সিকল



গোর্কি

অ্যাণ্ড হ্যামার বা কাস্তে ও হাতুড়ী যুগের প্রধান কবি এবং তাঁর প্রসিদ্ধ টুয়েলভ বা বারো কবিতা এক সময়ে রাশিয়ায় যুগান্তর এনেছিল। কবি মায়াকোভস্কী ছিলেন বিপ্লবের সময় ও তার ঠিক পরের আর এক শক্তিশালী কবি। তাঁর গানে ধ্বনিত হয়েছে নতুন রাশিয়ার আশার বাণী। মায়াকোভস্কী স্বপ্ন দেখেছিলেন যে-পৃথিবীর, তাতে দারিদ্র্য ও শোষণ থাকবে না, অত্যাচার ও অবিচারপ্রপীড়িত মানুষ জাগ্রত জীবনবোধ নিয়ে উঠে দাঁড়াবে সর্বত্র। গোর্কিরই মত মহান্ মানববন্ধু তিনি।

নতুন যুগে

কথাসাহিত্যে রাশিয়ায় খ্যাতিমান লেখক আরো হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আইভান বুনিন, পাস্তেরনাক, সলোখব, ডুদিনস্তেভ ও আর্টি-বায়াসেভ সুপ্রসিদ্ধ। বুনিনের সানফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি (দি জেণ্টলম্যান ফ্রম সান-ফ্রান্সিসকো), প্যাস্তেরনাকের ডক্টর জিভাগো, সলোখবের 'এবং ডন নদী ধীরে বয়' (অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন), ডুদিনস্তেভের 'শুধু রুটি দিয়ে হয় না' (নট্ বাই ব্রেড অ্যালোন), আর্টিবায়াসেভের 'কি করে ইস্পাত গড়া হয়েছিল' (হাউ স্টীল ওয়াজ্ টেম্পার্ড) প্রভৃতি উপন্যাস আধুনিক রাশিয়ার জীবন ও মেজাজকে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে। ডুদিনস্তেভ ও পাস্তেরনাক তাঁদের লেখার জন্যে রুশ সরকারের ভর্ৎসনা পেয়েছিলেন, আর আইভান বুনিন ও পাস্তেরনাক ইয়োরোপ থেকে পেয়েছিলেন নোবেল প্রাইজ। তারপর সলোখবও পেয়েছেন এই পুরস্কার। অল্পদিন হ'ল পেয়েছেন সোলবোনেৎসিনও—তাঁর 'প্রথম চক্র' বা ফার্স্ট সার্কেল বইয়ের জন্য।



বরিস পাস্তেরনাক্

রাশিয়ার বর্তমান লেখকদের মধ্যে সলোখবই প্রধান। তাঁর কশাক জীবনের মহাকাব্য ডন উপন্যাসমালা সত্যিই অসাধারণ রচনা। তরুণ কবি ইভেশেতস্কুরও খুব নামডাক। তাঁকে বলা হয় রাগী যুবা, কিন্তু সত্যিই শক্তিমান্ কবি তিনি।

ইয়োরোপের অন্যান্য সাহিত্য

প্রধান প্রধান ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হ'ল। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কিন্তু তার বেশির ভাগেরই খবর বাইরের জগতে ছড়ায় নি। যে যে লেখকের রচনা স্বদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে পৌঁছেছে, শুধু তাঁদের সম্বন্ধেই দু'-একটা কথা এখানে বলছি।

সুইৎজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড

সুইৎজারল্যাণ্ডের প্রখ্যাত কবি কার্ল স্পিটেলার লেখেন ডা অলিম্পসে ফ্রালিঙ বা 'অলিম্পীয় বসন্ত' নামে দার্শনিক কাব্য, যা সর্বত্র প্রশংসিত। এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতার মূল ভাবটি লক্ষ করার মত। অষ্ট্রিয়ার নাট্যকার সিনৎজলার ও মোলনারের রচনার কথা আগেই বলেছি। হাঙ্গেরীর প্রসিদ্ধ গল্পলেখক জোকাইয়ের কোয়াড্রিস বইও অনেকের পড়ার সুযোগ হয়েছে, যেমন হয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ার কথা-সাহিত্যিক কার্ল চাপেকের 'শার্ট' গল্প এবং 'আবার ভাব' (থিঙ্ক এগেন) নাটকটি পড়ার। পোল্যাণ্ডের প্রধান ঔপন্যাসিক জোসেফ কনরাডের টাইফুন বইয়ের এক সময় খুব আদর ছিল। ইনি ইংরেজ না হয়েও ইংরেজী লিখে প্রসিদ্ধ। পোল ভাষাতেও দু'জন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হয়েছেন। এঁদের একজন সিন-কিয়োভিচ, যিনি লিখেছিলেন কুয়োভেডিস, যাতে আছে সম্রাট্ নিরোর আমলে খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিচিত্র কাহিনী, আর একজন ওয়াদিসওয়া রেমঁত, যাঁর পেজেন্ট বা 'চাষী' উপন্যাসও অতুলনীয় রচনা। যুগোস্লাভ লেখক ইভো আন্দ্রিচেরও ইদানীং বিশেষ নাম হয়েছে।

নরওয়ে

পূর্ব ইয়োরোপের চেয়ে কিন্তু স্কান্দিনেভিয়ার সাহিত্য ইয়োরোপে বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, জগতের মনকেও বেশি ছুঁয়েছে। উত্তর ইয়োরোপের প্রাচীন সাগা ও দু'খানি এড্ডার কথা তো বলাই হয়েছে। নরওয়েতে জন্মান মহান্ নাট্যকার ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬), যাঁর বাস্তবধর্মী নাটক 'পুতুলের ঘর' (ডলস্ হাউস) বার্নার্ড শ'কে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর 'প্রেতাত্মা' (গোষ্ট) এবং 'সমাজের স্তম্ভ' (পিলার্স অব সোসাইটি) নাটকও যুগান্তকারী। তাঁর সময়েই ছিলেন বিয়ার্নসন নামে আর একজন নাট্যকারও। তাঁর 'সম্পাদক' (এডিটার)



জোহান বোয়ের

ব্যঙ্গপ্রধান ট্রাজেডী। নরওয়েতে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখকও হয়েছেন দু'জন। একজন জোহান বোয়ের,—যাঁর 'মহাক্ষুধা' (গ্রেট হাঙ্গার) বইয়ে জীবনের সঙ্গে জীবনাতীতের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, আর একজন হামসুন,—যাঁর 'বুভুক্ষা' (হাঙ্গার) বইয়ে পেটের ক্ষুধা শেষ পর্যন্ত কোথায় টানতে পারে মানুষকে, তাই দেখানো

হয়েছে। ইবসেন এবং হামস্থন একদা বাংলা সাহিত্যে অশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

সুইডেন

সুইডেনে অগাষ্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ ও সেলমা লেগার-লাফ প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকা। স্ট্রিণ্ডবার্গ (১৮৪৯-১৯১২) প্রধানতঃ নাট্যকার। 'কুমারী জুলী' (মিস্ জুলী) এবং 'পিতা' (ফাদার) তাঁর দু'খানা প্রসিদ্ধ নাটক। তাঁর রচনায় সমাজ, সভ্যতা ও নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে এমন অনেক কথা আছে যা অপ্রিয় বলেই কেউ শুনতে চায় না। তাঁর কতকগুলি একাঙ্ক নাটকও আছে। সেলমা লিখেছেন 'গোস্তাবার্লিং সাগা' নামে বৃহৎ উপন্যাস, যাতে মেরু অঞ্চলের সাধারণ মানুষ নিয়ে দীর্ঘ ও সমস্যাবহুল একটি জমাট কাহিনী বলা হয়েছে। এঁর 'ষ্টোরি অব দি নাইল' থেকেই অবনীন্দ্রনাথ বুড়ো আংলা লেখেন। এই মহিলার মতই এলেন কী নাম্নী বিদুষীও সুইডেনের নামী লেখিকা। তিনি অবশ্য নারীদের সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন।

ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড

ডেনমার্কের যাদুকর লেখক হ্যান্স অ্যাণ্ডার-সন (১৮০৫-৭৫) লিখেছিলেন তাঁর সেরা রূপকথাগুলি,—কুশ্রী হাঁসের ছানা, ঘুমপরী ইত্যাদি,—যা সব দেশের ছেলেমেয়ে পড়েছে। ডেনমার্কের সমালোচক ব্র্যাণ্ডসের উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যধারাও পড়তে হয় সকলকেই কলেজে এসে উচ্চ সাহিত্য বোঝবার জন্য। আইসল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডের দু'-একজন লেখকের রচনাও ইদানীং আমরা পড়ছি। ফিনল্যাণ্ডের ফ্রাঞ্জ এমিল সিলানপা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন যে বইয়ের জন্যে তার নাম 'তরুণ বয়সের ঘুম' (ফল্ন্ অ্যাস্লীপ হোয়েন ইয়ং)। আবেগমধুর এই উপন্যাসখানি পড়লে শরৎচন্দ্রের কোন কোন বইয়ের কথা মনে পড়ে। ফিন জাতির পুরোনো লোককাব্য কালেভেলাও আজকাল ইংরেজীতে পড়ার সুযোগ হয়েছে। আইসল্যাণ্ডের লেখক ল্যাকসেনাসের



স্পিনোজা

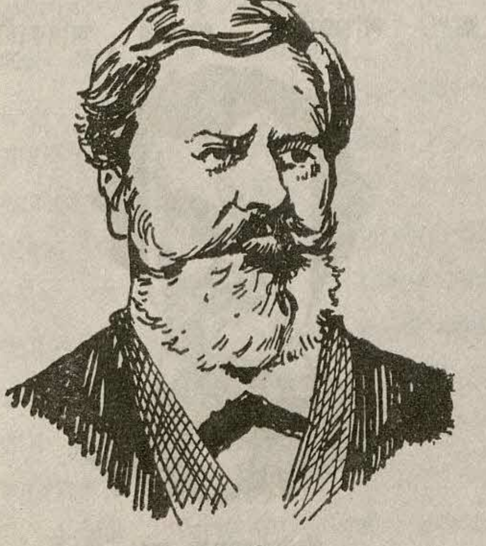
'ধীবরেরা' (ফিশারমেন) বইয়ে মেরুসমুদ্রে জীবিকা অর্জন করেন যে দুঃসাহসী জেলেরা, তাঁদের কথা স্থান পেয়েছে। বিষয়ের নূতনত্বের সঙ্গেই তাঁর লেখায় আছে আশ্চর্য মানবপ্রেম, যা মনকে ছোঁয়।

হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম

হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের কথাও একটু বলছি। নীতিবিদ্ ইরাসমাস (১৪৬৬-১৫৩৬)

ও দার্শনিক স্পিনোজা (১৬৩২-৭৭) মধ্য-যুগীয় ইয়োরোপে যে প্রজ্ঞার আলো তুলে ধরেছিলেন, গোটা ইয়োরোপকেই তা উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু এঁদের রচনা সবই ল্যাটিনে। খাঁটি ওলন্দাজ (হল্যাণ্ড ডাচ) ভাষায় কবি ভণ্ডেল লেখেন তাঁর লুসিফার কাব্য, যার নায়ক লুসিফার অর্থাৎ শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই শয়তানের আদর্শ দেখেই মিল্টন প্যারাডাইস লস্ট মহাকাব্য লিখেছেন অনেকে বলেন এ কথা।

বেলজিয়ামে নাট্যকার মেতারলিঙ্ক ও কবি এমিল ভেয়ারহারেন বিশ্বখ্যাতির অধিকারী। ভেয়ারহারেন বদলেয়ার ও শেলীর মত দুঃখী মানুষের কবি। তিনি অবশ্য একালীন যন্ত্র-সভ্যতার দুঃখ-দুর্ভাগ্যকেই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। মেতারলিঙ্ক মোনাভান্না নামক করুণ-মধুর নাটক লিখেছেন, আবার 'নীলপাখী' (ব্লু বার্ড) এবং 'দৃষ্টিহীন' (সাইট্লেস)



মেতারলিঙ্ক

সাঙ্কেতিক নাটকও লিখেছেন। তাঁর এই সাঙ্কেতিক নাটকগুলিই কারো কারো মতে রবীন্দ্রনাথকে ডাকঘর, মুক্তধারা ইত্যাদি লিখতে প্রেরণা দিয়েছিল। ভাবুক ও দার্শনিক মেতারলিঙ্ক ফরাসী ও ফ্লেমিশ বেলজিয়ামের দু'টি ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। 'মৌমাছি' (দি বী) তাঁর একখানি বৈজ্ঞানিক রচনা। এটি লেখা ফরাসী ভাষাতেই।

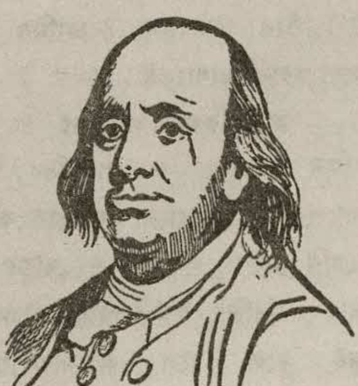
আমেরিকান সাহিত্য

মার্কিন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস ইয়োরোপের মত পুরোনো নয়, তার কৌলীন্যও অত বেশি নয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী জীবনধারণের তাগিদেই দলে দলে আমেরিকায় এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে বাগিচা ও কাজকারবার ফেঁদে আস্তে আস্তে নতুন দেশের বনিয়াদ গড়েছিলেন। আদি বাসিন্দা রেড ইণ্ডিয়ানরা এই নবাগতদের চাপে হয় লোপ পেয়েছিলেন, নয় মিলে-মিশে এক হয়ে গিয়েছিলেন ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে। এই নতুন আমেরিকার গঠনে নিগ্রো ক্রীতদাসদের শ্রমই ছিল সব চেয়ে বড়। কিন্তু তাঁরা মার্কিন সমাজে ন্যায্য অধিকার পান নি কোন দিন, তাই গোড়া থেকেই শ্বেত ও কৃষ্ণ আমেরিকানদের মধ্যে লেগেছে একটা বিরোধের ভাব। বলা দরকার যে নিগ্রোদের মধ্যেও কবি, শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ হয়েছেন অনেক।

ইংরেজীই হ'ল আমেরিকার ভাষা

তা সত্ত্বেও আমেরিকা বিরাট সভ্যতা গড়েছে। তার রাজনীতিক, বাণিজ্যিক এবং

বৈজ্ঞানিক গৌরব আজ সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত। শিল্পসাহিত্যের ইতিহাস তার দুই শতাব্দীর বেশি নয়, কিন্তু সাহিত্যেও তার দান অল্প নয়। বলা দরকার যে নানা দিক্‌দেশ থেকে এলেও আমেরিকা ইংরেজীকেই তাদের ভাষা বলে মেনে নিয়েছিল, যদিও ইংরেজের সঙ্গে



বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

প্রবল যুদ্ধ করে বৃটিশ প্রভুত্ব থেকে আমেরিকাকে স্বাধীন করতে কুণ্ঠিত হন নি মার্কিনরা। মার্কিন জগতের প্রথম গণনীয় গদ্য-লেখক হলেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০), যাঁর আত্মজীবনী এখনও সৎশিক্ষার জন্যে শিক্ষার্থীদের পড়া উচিত। ফ্র্যাঙ্কলিন একই সঙ্গে ছিলেন বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও নীতিপরায়ণ সজ্জন। নব্য আমেরিকার গঠক হিসাবে তাঁর নাম তাই আজও সসম্মানে উল্লিখিত হয়।

প্রকৃত সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে ইয়োরোপে খ্যাতিলাভ করেন প্রথম যে মার্কিনরা, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ওয়াশিংটন আর্ভিং (১৭৮৩-১৮৫৯), লংফেলো (১৮০৭-৮২), অ্যালেন পো (১৮০৯-৪৯), নেথানিয়েল হথর্ন (১৮০৪-১৮৬৪), এমার্সন (১৮০৩-১৮৮২), ডেভিড থরো (১৮১৭-৬২), ওয়াল্ট্ হুইটম্যান (১৮১৯-৯২) ও হুইটিয়ার। আর্ভিংএর প্রসিদ্ধ গল্প রিপ ভ্যান উইংকল কে না পড়েছ, কে না উপভোগ করেছ? লংফেলোর সাম্ অব লাইফ বা 'জীবন-সঙ্গীত'ও সারা জগতে পরিচিত কবিতা। বাংলায়ও আছে তার হেমচন্দ্রকৃত অনুবাদ। রেড ইণ্ডিয়ান কাহিনী নিয়ে কাব্যও আছে লংফেলোর। অ্যালেন পো একাধারে কবি ও গল্প-লেখক। তাঁর গায়ে-কাঁটা-দেওয়া গল্প ব্ল্যাক ক্যাট ('কালো বিড়াল') পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। র‍্যাভেন বা 'দাঁড়কাক' নামে একখানি কবিতা-সংগ্রহও তাঁর খুব জনপ্রিয়। হথর্ন স্কারলেট লেটার বা 'রক্তলিপি' উপন্যাস লেখেন, যাতে বিচিত্র মনস্তত্ত্বের খেলা চমৎকার গল্পে মূর্তি নিয়েছে। থরো লিখেছেন ওয়ালডেন নামক পল্লীচিত্রের বই, যাতে অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবনকে অদ্ভুত সরল ভাষায় আঁকা হয়েছে।

অন্যান্য মার্কিন দার্শনিক, কবি ও ঔপন্যাসিক

এমার্সন ও হুইটম্যান দার্শনিক ও কবি রূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী।



এডগার অ্যালেন পো



ওয়াল্ট্ হুইটম্যান

এমার্সনের রিপ্রেজেন্টেটিভ মেন বা 'অগ্রণী মানুষ' বইয়ে বহু বিখ্যাত মানুষদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু মনোরম কবিতাও আছে তাঁর এবং কোন কোন কবিতায় হিন্দু দর্শনের প্রভাব পড়েছে। হুইটম্যানও বিপ্লবী দার্শনিক এবং অসীম শক্তিশালী কবি। তাঁর লীভ্স্ অব গ্রাস্ বা 'ঘাসের পাতা' নামক কবিতার বই বিশ্বসাহিত্যের একখানি স্মরণীয় বই। ছন্দোময় আশ্চর্য বেগবান্ গদ্যে লেখা এঁর কবিতাগুলি। রবীন্দ্রনাথ এঁকে বলেছেন 'বন্ধনহীন মুক্তিদর্শনের প্রবক্তা'। দেখতেও তিনি ছিলেন অনেকটা রবীন্দ্রনাথেরই মত। তাঁর ক্যাপ্টেন বা 'পোতাধিনায়ক' কবিতা সমস্ত কাব্যসঙ্কলনেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়। হুইটিয়ার (১৮০৭-৯২) এবং লোয়েল (১৮১৯-৯১) এই সময়েরই আরো দু'জন কবি। প্রথম জন সরল পল্লীজীবনের গান লিখেছেন, দ্বিতীয় জন প্রচার করেছেন মার্কিন স্বাধিকারের বার্তা।

এমিলি ডিকিনসন (১৮৩০-১৮৮৬), শ্রীমতী স্টো (১৮১১-১৮৯৬) এবং মার্ক টোয়েন (১৮৩৫-১৯১০) আর তিনজন মর্কিন সাহিত্যিক, যাঁদের নাম দেশ ছাড়িয়ে দুনিয়ায় ছড়িয়েছে। শ্রীমতী ডিকিনসন কবি এবং শ্রীমতী স্টো ঔপন্যাসিক, আর তাঁর আংকল্ টম্স্ কেবিন বা 'টম কাকার কুঁড়ে'ই সেই বিখ্যাত বই যাতে নিগ্রো দাসত্বের অসীম দুঃখ বর্ণিত হয়েছে। এই বই মার্কিন ইতিহাসে কি ভূমিকা নিয়েছিল তা কে না জানে? মার্ক টোয়েন অদ্বিতীয় গল্পলেখক এবং তাঁর হাকলবেরী ফিন এক আশ্চর্য রচনা। তাঁর টম সায়ার্স অ্যাডভেঞ্চার্স বা 'টম সায়ারের সাহসিকতা' দুষ্টু ছেলের কাহিনী হিসেবে অপূর্ব। রঙ্গব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে গভীর কথা বলার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর।

নতুন যুগে

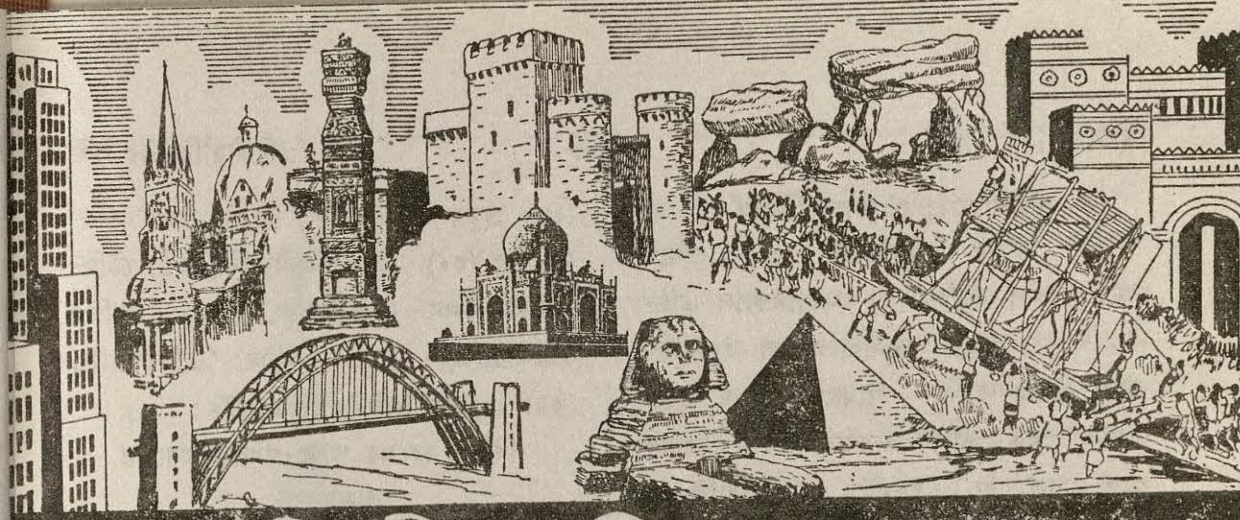
উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মার্কিন মুল্লুকে যে কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকরা উঠেছেন তাঁদের সকলের কথা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলা কঠিন। কবি স্যাণ্ডবার্গ, ফ্রস্ট, এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, নাট্যকার ইউজেন ওনেল, ঔপন্যাসিক সিনক্লেয়ার লিউইস, আপ্টন সিনক্লেয়ার, হেমিংওয়ে, জন স্টেনবেক, থিওডোর ড্রেজিয়ার প্রভৃতির নাম আজ সকলের মুখে মুখে। ফকনার ও পার্ল বাকের রচনাও। স্যাণ্ডবার্গের শিকাগো কবিতাগুলিতে মার্কিন সভ্যতার অন্তঃসারহীনতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যাণ্ড বা 'পড়ো জমি' কবিতা এ যুগের মানুষকে দিয়েছে নতুন কাব্যভঙ্গী ও জীবনচিন্তা। ওনেলের বাস্তবধর্মী



হেমিংওয়ে

নাটক 'আ ওয়াইলডারনেস' ('আহা বন কি সুন্দর!') একটি সুখনীড়ের মনোরম ছবি মেলে ধরেছে চোখের সামনে। লিউইসের মেন স্ট্রীট বা 'সদর রাস্তা' এবং সিনক্লেয়ারের জাঙ্গল বা 'জঙ্গল' আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার প্রাণহীন আতিশয্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছে। দু'জনেই এঁরা,—বিশেষতঃ সিনক্লেয়ার, শক্তিশালী ঔপন্যাসিক। স্টেনবেকের 'গ্রেপস্ অব রাথ' বা 'রাগের আঙ্গুর' এবং ড্রেজিয়ারের 'সিস্টার ক্যারী' বা 'ভগিনী ক্যারী' যুগ-জীবনের নানা দ্বন্দ্বকে উপন্যাসে রূপ দিয়েছে। 'ফর হুম্ দি বেল টল্স্' বা 'কার জন্য ঘণ্টা বাজে' বইয়ে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে বীরাঙ্গনা লা পাসিওনারার জীবনকে সমুজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করেছেন হেমিংওয়ে। তাঁর 'ওল্ড ম্যান অব দি সী' বা 'সমুদ্রের সেই বুড়োটি' মার্লেন মাছ শিকারের এক মহাকাব্যোচিত রোমাঞ্চকর কাহিনী। পার্ল বাক চীনা জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর গুড আর্থ বা 'সদয় মাটি' সুন্দর বই। ফকনার লিখেছেন নিগ্রো লিঞ্চিং ও দরিদ্রপীড়ন ইত্যাদির দ্বারা দক্ষিণের ধনী মার্কিনরা কি ভাবে ফেঁপে উঠেছেন তার মর্মান্তিক কাহিনী—এজ্ আই ল্যে ডাইং বা 'আমি যখন মারা যাচ্ছিলাম' এবং লাইট ইন অগাষ্ট বা 'অগাষ্টের আলো' প্রভৃতি বইয়ে। এঁদের আগে-পরে আরো বহু লেখক আছেন, যাঁদের মধ্যে নাট্যকার টেনেসী উইলিয়াম বোধ হয় এখন সবচেয়ে নামী। তাঁর এ স্ট্রীট কার নেম্ড্ ডিজায়ার বা 'আকাঙ্ক্ষা নামে রাস্তার গাড়ী' বলিষ্ঠ রচনা। আর্থার মিলারের ডেথ অব এ সেল্স্ম্যান বা 'ফেরীওয়ালার মৃত্যু'ও চমৎকার বই। মার্কিন নিগ্রোদের মধ্যে গত শতাব্দীর কবি ডানবার এবং আধুনিক কবি রিচার্ড রাইট বহুজনের শ্রদ্ধার অধিকারী।

আজকের প্রবন্ধকারদের মধ্যেও দার্শনিক স্যানটায়ানা, ঐতিহাসিক উইল ডুরাণ্ট এবং মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল সব দেশে সম্মানিত হয়েছেন। এঁরা মার্কিন মনীষারই গৌরব ন'ন শুধু, গোটা মনুষ্য জাতির সংস্কৃতিকেই গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে এঁদের চিন্তা। ডুরান্টের আওয়ার ইষ্টার্ন হেরিটেজ বা 'আমাদের প্রাচ্য দেশীয় উত্তরাধিকার' বইয়ে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ও আরব ভূমির ধর্ম, সাহিত্য এবং দার্শনিক চিন্তা সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে তা প্রত্যেকেরই পড়া উচিত। বাংলাভাষা-বিশারদ অধ্যাপক নর্মান ব্রাউনও আধুনিক আমেরিকার বরেণ্য সন্তান। বাংলাভাষার বিখ্যাত রচনাবলী তিনি অনুবাদে ব্রতী হয়েছেন।



এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা

আধুনিক যুগের এঞ্জিনীয়ারিং

মধ্যযুগের পরের যুগকেই আমরা আধুনিক যুগ বলব। মধ্যযুগের এঞ্জিনীয়ারিং বলতে শুধু রাজা-রাজড়াদের কাজের প্রয়োজনের এঞ্জিনীয়ারিং বোঝাত। প্রাচীন কালের রাজকীয় এঞ্জিনীয়ারদের ওপর ভার ছিল রাজত্ব কায়েম করার জন্য সামরিক বিষয় নিয়ে নানা ধরনের কাজ করা—যেমন, নৌ-চলাচলের জন্য খাল কাটা, সৈন্য চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরি, নদনদী পারাপারের জন্য নৌকো ও সেতু তৈরি, ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে নৌবহর রক্ষার জন্য ও নিরাপদে নোঙ্গর ফেলে থাকার জন্য বন্দর তৈরি, রাত্রে জাহাজ ও নৌকোকে পথ দেখানোর জন্য আলোকস্তম্ভ তৈরি, পানীয় জলের জন্য জলাশয়, দূর থেকে সংগৃহীত জল বয়ে আনার জন্য 'একুই-ডাক্ট' তৈরি, সৈন্য ও সামরিক কর্মচারীদের থাকার জন্য বিরাট লম্বা ছাদের ব্যারাক বাড়ী তৈরি প্রভৃতি। এই সব সামরিক কাজে নিযুক্ত তখনকার দিনের কর্মীদের 'এঞ্জিনীয়ার' নাম হয়তো হয় নি কিন্তু এখন তাঁদেরকে 'এঞ্জিনীয়ার' এবং তাঁদের কাজগুলিকে 'এঞ্জিনীয়ারীং'-ই বলতে হবে। নামে সামরিক হলেও এই সব রাজকীয় কাজের অনেক কিছু অসামরিক কাজেও প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করত। যেমন রাস্তাঘাট, খাল-বন্দর তৈরি প্রভৃতি।

রাজকীয় বা সামরিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর বিপরীত ধারা হ'ল অসামরিক বা 'সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং'। এই সামরিক আওতা থেকে পৃথক্ করে সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং-এর সৃষ্টি, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনষ্টিটিউশন অব সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিশ্চয়ই কিছু আগে। তবে এই সময় থেকেই সমবেত প্রচেষ্টায় সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং-এর ধারা নির্দিষ্ট পথে চলতে শুরু করে। নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার গোড়াপত্তন হয় ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বিলেতে 'রয়াল সোসাইটী' স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশও রাস্তা উন্নয়নের বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর দু'বছর পরে ফরাসীরাও প্যারিসে 'অ্যাকাডেমী অব সায়ান্স' স্থাপন করে।

এঞ্জিনীয়ারিং-এর নানা বিভাগ

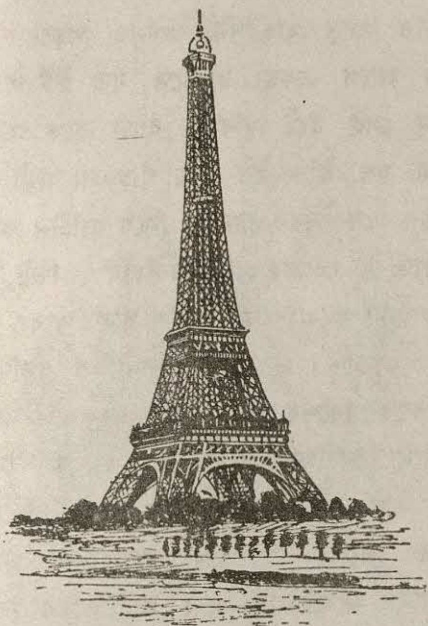
এই সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং থেকে প্রথমে ভেঙে বেরুল যন্ত্রবিদ্যা বা মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং ও বিদ্যুৎ-এঞ্জিনীয়ারিং বা ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং। আমাদের দেশে অবশ্য এগুলি পৃথক্ ভাবে শেখাবার ব্যবস্থা অনেক পরে চালু হয়। বর্তমানে এঞ্জিনীয়ারিং-এর এত বিভাগ হয়েছে যে সব বিষয়ে সামান্যতম বলতে গেলেও তোমাদের বিশ্বকোষের কয়েক খণ্ড লেগে যাবে। বর্তমানে এঞ্জিনীয়ারিং-এর নানা বিভাগের একটি মোটামুটি তালিকা এখানে দিচ্ছি। তাই বলে এটা কিন্তু পূর্ণ তালিকা ভেব না।

(১) বৈমানিক এঞ্জিনীয়ারিং, (২) স্থাপত্য এঞ্জিনীয়ারিং, (৩) কৃষি এঞ্জিনীয়ারিং, (৪) অটো (স্বয়ংগম) বা মোটর এঞ্জিনীয়ারিং, (৫) সেতু এঞ্জিনীয়ারিং, (৬) রাসায়নিক এঞ্জিনীয়ারিং, (৭) সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং, (৮) বৈদ্যুতিক এঞ্জিনীয়ারিং, (৯) বিদ্যুৎ-রাসায়নিক এঞ্জিনীয়ারিং, (১০) ভিত্তি এঞ্জিনীয়ারিং, (১১) সড়ক এঞ্জিনীয়ারিং, (১২) উদক (জল) এঞ্জিনীয়ারিং, (১৩) শিল্প এঞ্জিনীয়ারিং, (১৪) জেট এঞ্জিনীয়ারিং, (১৫) যান্ত্রিক এঞ্জিনীয়ারিং, (১৬) সামরিক এঞ্জিনীয়ারিং, (১৭) খনিজ এঞ্জিনীয়ারিং, (১৮) পারমাণবিক এঞ্জিনীয়ারিং, (১৯) খনিজ তেল এঞ্জিনীয়ারিং, (২০) জনস্বাস্থ্য এঞ্জিনীয়ারিং, (২১) রেলওয়ে এঞ্জিনীয়ারিং, (২২) স্বাস্থ্যবিধান এঞ্জিনীয়ারিং, (২৩) গঠন এঞ্জিনীয়ারিং, (২৪) বয়ন এঞ্জিনীয়ারিং, (২৫) পরিবহন এঞ্জিনীয়ারিং, (২৬) পরিমাণ এঞ্জিনীয়ারিং, (২৭) ঝালাই এঞ্জিনীয়ারিং (২৮) সুড়ঙ্গ এঞ্জিনীয়ারিং, (২৯) বন্দর এঞ্জিনীয়ারিং, (৩০) সেচ এঞ্জিনীয়ারিং, (৩১) টেলিকমিউনিকেশন এঞ্জিনীয়ারিং, (৩২) রেডিও এঞ্জিনীয়ারিং, (৩৩) মেরিন এঞ্জিনীয়ারিং, (৩৪) ধাতুবিদ্যা এঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি।

বিচিত্র ধরনের কাজ—বিচিত্র ধরনের মালমশলা

ওপরে এই যে দীর্ঘ এঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ের তালিকা দেওয়া হ'ল তার মধ্যে যে কত বিভিন্ন রকমের উপবিভাগ আছে তার ঠিক নেই। ধরা যাক জনস্বাস্থ্য এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা। এতে আছে পানীয় জল সংগ্রহ, জল পরিশোধন, জল পরিবেশন, বৃষ্টির জল আহরণ, সঞ্চয়ন ও নিষ্কাশন, মানুষের পরিত্যক্ত ময়লা জল-পরিবহন, পরিশোধন ও কলুষ মুক্তকরণ; নদীর জলের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ, স্নানকুণ্ডের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ, নদীর জলের স্বাস্থ্যবিধান, বাতাস দূষিত হওয়া ও তার প্রতিকার ও প্রতিরোধ, রোগ সংক্রামক পোকামাকড় ও ইঁদুর ইত্যাদির বিনাশ ও তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা প্রভৃতি। তেমনি গঠন এঞ্জিনীয়ারিং ব্যাপারে সেতু নির্মাণ, আকাশচুম্বী বহুতল হর্ম্য নির্মাণ, বন্দর তৈরি, উঁচু বাঁধ, আড় বাঁধ বা ব্যারাজ তৈরি, পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে, নদীর তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ নির্মাণ প্রভৃতি।

সেতু নির্মাণ ব্যাপারে বিভিন্ন মালমশলা ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন এঞ্জিনীয়ারিং পদ্ধতির প্রয়োগের প্রয়োজন। যেমন, ইস্পাত, উচ্চ টানের ইস্পাত, ইস্পাতের তার, ইস্পাতের শিকল প্রভৃতি একদিকে, তেমনি অন্য দিকে কংক্রীট ঢালাই করে নানা আকৃতির সেতু



ঈফেল টাওয়ার

নির্মাণ। কংক্রীটের মধ্যেও পার্থক্য আছে। কোনটাকে বলা হয় প্রি-স্ট্রেস্‌ড্‌ (পূর্ব টান), কোনটাকে বলা হয় পোস্ট-টেনশন্‌ড্‌ (উত্তর টান)।

আকাশছোঁয়া বিরাট বহুতল বাড়ী নির্মাণ ব্যাপারে ইটের তৈরি, পাথরের তৈরি, ইস্পাতের তৈরি, ঢালাই কংক্রীটের তৈরি, কাঠের তৈরি, মাটির তৈরি, ছেঁচাবেড়ার তৈরি বাড়ীর কথা জানার প্রয়োজন। তা ছাড়া আছে কাচের তৈরি, প্লাস্টিকের তৈরি, আগে-থেকে-তৈরি-করা ফ্রেমের বাড়ী। তেমনি বাঁধ তৈরির ব্যাপারে নদীতে আড় বাঁধ (ব্যারাজ), জল সরবরাহ, সেচের, জলবিদ্যুৎ প্রস্তুতের জন্য নানা আকৃতির, নানা উপাদানে প্রস্তুত বাঁধের কথা বলতে হয়। এমনিধারা কত রকম এঞ্জিনীয়ারিং-এর আওতায় কত বিচিত্র ধরনের কাজ এবং বিচিত্র রকমের মালমশলার দরকার হয়! সবটা বলতে গেলেই সে এক অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত হয়ে যাবে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, অনেক সময় এক রকম এঞ্জিনীয়ারিং-এর সঙ্গে আর এক রকমেরটা এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য, এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা আয়ত্ত করতে হলেও নানা ধরনের কাজে হাত পাকাতে হয়। এগুলিকে আমরা এইভাবে ভাগ করতে পারি: (১) গঠনকার্য, (২) উপদেষ্টার কাজ, (৩) পরিকল্পনা প্রস্তুত, (৪) উন্নয়ন, (৫) এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা, (৬) নক্সা প্রস্তুত, (৭) পরিচালনা, (৮) উৎপাদন, (৯) গবেষণা, (১০) বিক্রয়-বাণিজ্য, (১১) কৃত্যক্রম বা সার্ভিস এবং (১২) পরীক্ষা অভীক্ষা বা টেস্ট। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় যে আজকালকার যুগে একজনের পক্ষে এই এত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া কঠিন। যিনি যে বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে চান তাঁকে সেইটি বেছে নিতে হবে। তবে মোটামুটি খানিকটা জ্ঞান সবগুলি সম্বন্ধেই থাকা দরকার।

ভালো অঙ্ক জানা চাই

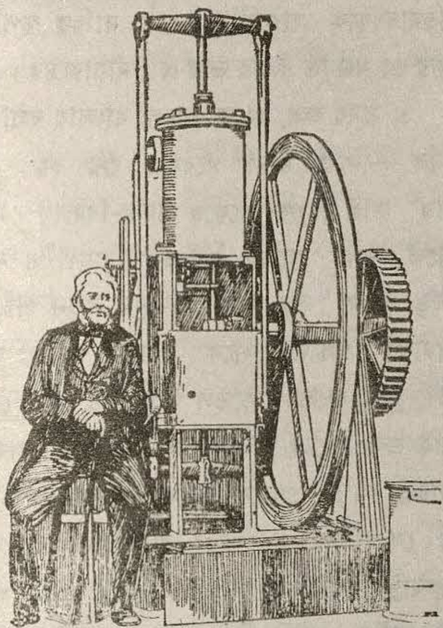
বর্তমান যুগে বিভিন্ন এঞ্জিনীয়ারিং শাস্ত্রগুলিকে আরও দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করার জন্য বিভিন্ন গবেষণাগারে ও কর্মক্ষেত্রে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে অঙ্কশাস্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার পর্ব চলছে। কারণ অঙ্কশাস্ত্রই হ'ল নিখুঁত স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিজ্ঞান। আগেকার দিনে এঞ্জিনীয়ারিং কাজটা নির্ভর করত প্রয়োগ-বিজ্ঞানে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া

স্থত্রের ওপর। এর প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয় মধ্যযুগের অন্তিম পর্বে রোমের সুবিখ্যাত সেন্ট পিটার্স গির্জার গম্বুজের পরিকল্পনায়। এইখানেই প্রথম স্থিতিবিজ্ঞানের (স্ট্যাটিক্স্) প্রয়োগ শুরু। এঞ্জিনীয়ারিংকে গাণিতিক ভিত্তিতে স্থাপনের জন্য মধ্যযুগের শেষে বারনেটলি (১৬৬৭-১৭৪৮), অয়লার (১৭০৭-১৭৮৩), চেজী (১৭১৮-১৭৯৮), কুলুম্ব (১৭৩৬-১৮০৬), ম্যাকাডাম (১৭৫৬-১৮৩৬), টেলফোর্ড (১৭৫৭-১৮৩৪), উনবিংশ শতাব্দীতে এটিল-উইন (১৭৬৪-১৮৪৮), ট্রেডগোল্ড (১৭৮৮-১৮২৩), নেভিয়ার (১৭৮৫-১৮৩৬), পয়সন (১৭৮১-১৮৪০), জর্জ স্টিফেনসন্ (১৭৮১-১৮৪৮), পনসিলে৺ (১৭৮৮-১৮৬৭), ক্ল্যাপিরন (১৭৯৯-১৮৬৪), বেসিমার (১৮১৩-১৮৯৮), মনিয়ার (১৮২৩-১৯০৬), ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-১৮৭৯), মোর (১৮৩৫-১৯১৮), রেনল্ডস্ (১৮৪২-১৯১২) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আর বিংশ শতাব্দীতে যে কত শত গবেষক এঞ্জিনীয়ারিং উন্নয়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন তার হিসেব নেই।

গঠনতত্ত্বের মূল কথা হ'ল গঠনবস্তুর মান নির্ণয় ও গঠনতত্ত্বের বিশ্লেষণ। আগেকার দিনে এই জ্ঞান নির্ভর করত রাজমিস্ত্রী ও ছুতোর মিস্ত্রীর অভিজ্ঞতার ওপর। তাদের এই জ্ঞান বৈজ্ঞানিক-ভিত্তিক না হয়ে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক হওয়ায় গঠনতত্ত্বের যে আধুনিক জ্ঞান তা কাজে লাগানো যায় নি। ধরা যাক, বাড়ী তৈরির কথা। আগেকার দিনে কত চওড়া দেওয়ালের ও গভীর ভিতের বাড়ী হ'ত; এখন হয় পাতলা পাতলা দেওয়ালের। আগেকার বাড়ীও পড়ে যায় নি, এখনও পড়ছে না। তবে আগে একটা বাড়ীতে যত ইট লাগত এখন সেই ইটে ছু'খানা বাড়ী হতে পারে। এখন দশ ইঞ্চি ইট দিয়ে পাঁচতলা বাড়ী করা হচ্ছে। যে সব গঠনবস্তু নিয়ে প্রাচীন কালে বিখ্যাত রোমান্ এঞ্জিনীয়ার ভিট্রুভিস্ আলোচনা করেছিলেন সেগুলি হ'ল পাথর, চুন, কাঠ প্রভৃতি। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গঠনবস্তুর বিশেষ জ্ঞান আহরণ করতে যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কত টানে সেই বস্তু ছেঁড়ে ও কত চাপে তা ভাঙ্গে। বৃষ্টির জলের সংস্পর্শে রাসায়নিক পদার্থ মেশানো জলের কি দশা হয় তারও যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। গঠনের তত্ত্বের বিশ্লেষণে স্থিতিবিদ্যার প্রয়োগে সমর্থ হ'ন লুই মেরী হেনরী নেভিয়ার। এঁরই প্রচেষ্টায় গঠনস্থিতিবিদ্যা এখন এঞ্জিনীয়ারিং-এর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা চলে।

শিল্পবিপ্লব ও এঞ্জিনীয়ারিং-এর অগ্রগতি

সারা ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লবের যুগে এঞ্জি-নীয়ারিং-এও প্রচুর অগ্রগতি দেখা দেয়। স্কটিশ এঞ্জিনীয়ার ম্যাকাডাম এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াতের জন্য নতুন পদ্ধতিতে রাস্তা তৈরির প্রথা প্রচলিত করেন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল রাস্তার মালমশলা এমন ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে বৃষ্টির জল রাস্তায় না জমে বা রাস্তায় না বসে। রাস্তা ছু'পাশে ঢালু হবে ও মাটির মধ্যে জলের লেভেলের ওপরে যেন কঠিন জলরোধক আচ্ছাদন থাকে। কয়লার আবিষ্কারের পরে কয়লা থেকে বাষ্প উৎপন্ন করে ষ্টীম এঞ্জিন দিয়ে গাড়ী টানা শুরু হয়।



জন রবিনসন-আবিষ্কৃত বাষ্পীয় যন্ত্র

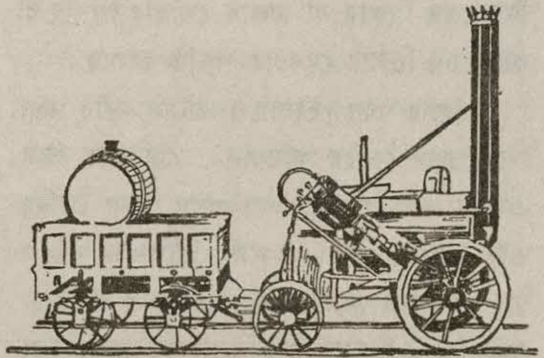
কয়লার খনি থেকে কয়লা তোলার জন্য ঐ কয়লা পুড়িয়ে বাষ্প উৎপন্ন করে স্টীম এঞ্জিনের ব্যবহারও আরম্ভ হয়। ১৮২৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর স্টকটন-ডালিংটনের পঁচিশ মাইল দীর্ঘ রেলপথে প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল আরম্ভ হয়। তবে রেল লাইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কয়লা দূরে বয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রথমে বর্তমান ইস্পাতের রেল লাইনের বদলে কাঠের, তার পরে কাঠের ওপর ইস্পাতের পাত মেরে, তারও পরে কাঠের লাইনের ওপর ইস্পাতের অ্যাঙ্গেল (L) লম্বা করে মেরে রেল লাইনের কাজ চালানো হ'ত। তার পর নানা ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তা বর্তমান ইস্পাতের রেল লাইনের রূপ নিয়েছে। যেমন প্রশস্ত তল (ফ্ল্যাট বটম্), যুগ্মশির (ডবল হেড), বুল হেড রেল। এখন কাঠের স্লিপার, ইস্পাতের স্লিপার বা ঢালাই লোহার স্লিপার বা কংক্রীটের স্লিপার দেওয়ার পদ্ধতি চলেছে।

তারপর এল ইংল্যাণ্ডে টেম্‌স্ নদীর তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরির অভিযান। ট্রেভিথিক নামে একজন এঞ্জিনীয়ারের ওপর প্রথম সুড়ঙ্গ তৈরির ভার দেওয়া হয়। জর্জ স্টিফেনসন্ যদিও স্টীম এঞ্জিনের আবিষ্কারক তবে তিনি স্টকটন-ডালিংটন এবং ম্যাঞ্চেষ্টার-লিভারপুল রেল রাস্তা তৈরির ভার নেন। তাঁর ছেলে রবার্ট স্টিফেনসন বাপের বেটার মত ব্রিটানিয়া সেতু নামে একটি লোহার সেতুর পরিকল্পনা ও গঠন করার দায়িত্ব নিয়ে তা সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হন। এটি মেনাই প্রণালীর ওপর প্লেট গার্টার সেতু, যার নির্মাণকাল ১৮৪৬-৫০। সস্তায় লোহা ও



বিভিন্ন আকৃতির রেল

ইস্পাতের উৎপাদন ও প্রচলনের ফলে সিভিল এঞ্জিনীয়ারিংয়ের নতুন দিগন্ত খুলে যায়। এতদিন বাড়ীর ছাদ কাঠের কড়ি ও বরগা দিয়ে তৈরি হচ্ছিল, তার বদলে ইস্পাতের কড়ি-বরগার ব্যবহার শুরু হ'ল। কেন না কাঠের কড়ির গোড়াগুলো দীর্ঘদিন দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে পচে যেত। এই নতুন গঠন-উপাদানের সাহায্যে ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে ঘরবাড়ী, সেতু-সাঁকো তৈরি শুরু হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বেসিমারের ইস্পাত প্রস্তুতের প্রণালী



প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেনের এঞ্জিন

আবিষ্কারের আগে ঢালাই লোহা ও পেটা লোহার ব্যবহার চালু ছিল। ঢালাই লোহা নক্সা করা সেতুনির্মাণে ইস্পাত আবিষ্কারের আগে ব্যবহার করা হ'ত। অনেক সময় ঢালাই লোহার সেতু ধ্বসে পড়ে মহা অসুবিধার সৃষ্টি করার নজিরও আছে। ঢালাই লোহা বেশি টান, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে টেনশন্—সহ্য করতে পারে না। কিন্তু নতুন ইস্পাত প্রতি বর্গ ইঞ্চে ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ পাউণ্ড টান সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। এরপর আরও বেশি টানের ইস্পাত তৈরি শুরু হয়।

এঞ্জিনীয়ারিং নানা শাখায় ভাগ হয়ে যেতে লাগল

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং থেকে স্থাপত্য বিদ্যা (আর্কিটেকচার) ভিন্ন হয়ে যায়। স্থপতিদের (আর্কিটেক্ট) কাজ হ'ল গঠনের সৌষ্ঠব প্রয়োগ এবং এঞ্জিনীয়ারদের দায়িত্ব হ'ল গঠনের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার। যে কোন সেতু বা গৃহ বা রেল স্টেশন বা মসজিদ, গির্জা কি আর্ট গ্যালারির কথাই ধরা যাক—তার বহিরাবরণকে আকর্ষণীয় করার দায়িত্ব স্থপতির, আর তা মজবুত করার ভার এঞ্জিনীয়ারদের।

এ সময় জল, যাকে ভালো বাংলায় বলা যায় উদক,—নিয়ে নানা গবেষণা শুরু হয়। এর নাম তাই দেওয়া হয়েছে উদক-বিদ্যা। নদীর খাতে নদীর জলের গতির পরিমাপ ও নদীর পাড় ভাঙ্গা বন্ধ করার নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। নদীর বুকে আড় বাঁধ তুলে জলের লেভেল উঁচু করে, খাল কেটে সেই জল সেচের ও নৌ-চলাচলের জন্য ব্যবহার আরম্ভ হয়। এখানে বললে হয়তো ভুল হবে না যে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেচবিদ্যায় যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষস্থান অধিকার করার আগে ভারতবর্ষই সেই স্থান দখল করে ছিল—সেই ফিরোজ শা তোগলকের সময় থেকেই। বিশেষ ক'রে ইংরেজ আমলে এদেশে বহু খাল কাটা হয়। যেমন—গঙ্গার খাল, যমুনার খাল, সিন্ধুনদের খাল, দামোদরের খাল প্রভৃতি। বিদেশেও রাইন, সীন, ভলগা, ডানিয়ুব প্রভৃতি নদীর খাল নির্মিত হয়।

এ ছাড়াও নদী শাসন ও নদীর কূলে বাঁধ বাঁধা ব্যাপারে ক্রমশ বিশেষ উদ্যোগ দেখা যেতে থাকে। ডাচেরা সমুদ্রকে ঘিরে, ভেতরের জল ছেঁচে, জমি উদ্ধার ক'রে মানুষের বাসের ও চাষের কাজে লাগিয়ে দেয়। নদীর বুকে বাঁধ তুলে জলের স্থিতি-শক্তিকে গতি-শক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে জলবিদ্যুৎ সৃষ্টি করার কাজও চলতে থাকে। জলের স্থিতি-শক্তিকে যন্ত্র চালাবার কাজে লাগাবার ব্যাপারটা বেশ ভালো ভাবেই চলতে শুরু করে। ফলে নানা রকমের টার্বাইন তৈরি হতে থাকে। ঐ টার্বাইন পাম্প

চালানোর ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগে।

রেল চলাচলের উন্নতির ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং-এর দিগন্ত আরও বেড়ে যায়। নদী পার হ'তে সেতু, পাহাড় অতিক্রম করতে সুড়ঙ্গ, নীচু জমি পার হতে বাঁধ তৈরির কাজ দোর্দণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর নানা দেশে চলতে থাকে। পৃথিবীকে যেন লৌহ-বেষ্টনে মানুষ বেঁধে ফেলতে চাইছে; মধ্যে শুধু সমুদ্রের ব্যবধান। দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের পরিশ্রমে আল্‌প্‌স্ পাহাড় ফুঁড়ে বিখ্যাত ও দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ তৈরি হয়ে যায় (১৮৫৭-১৮৭১)। এই সুড়ঙ্গ তৈরির কাজে পাথরের গায়ে ছেঁদা করার কাজ হাসিল করা হয় বায়ুর প্রেষিত শক্তি প্রয়োগ করে। এই প্রেষিত বা চাপ-দেওয়া বায়ু, যাকে বলা হয় কম্‌প্রেসড্ এয়ার, নদী ও সমুদ্রের বুকে সেতুর স্তম্ভ তৈরি করতেও নতুন সুযোগ এনে দেয়। দীর্ঘ সেতু রচনা সম্ভব হয়েছে 'ডাইভিং বেলে'র সাহায্যে ডুবুরী নামিয়ে সমুদ্রের বুকে মজবুৎ ভিতের সন্ধান পাবার পর।

গ্রাফিক স্ট্যাটিক্‌স্, যার বাংলা করা হয়েছে 'সলেখ স্থিতিবিদ্যা',—ইস্পাতের কাঠমোর সেতু তৈরির কাজ বেশ সহজ করে দিয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য হ'ল গণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে গ্রাফের সাহায্যে জটিল গঠনতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান করা। এর সাহয্যে বহু কঠিন ফ্রেম স্ট্রাক্‌চারের অংশ নির্ণয় করা সহজ হয়েছে। এই বিষয়ে জুরিকে কুলমান্ ও রীটার, জার্মানীর ড্রেসডেনে মোর, ইতালীর মিলানে ক্রেমোন বিশেষ গবেষণা করেন ও তার ফল এঞ্জি-নীয়ারিং-এ প্রয়োগ করেন। আগে উত্তর আমেরিকায় বনজঙ্গলের প্রাচুর্যের জন্য কাঠের সেতুনির্মাণ প্রচলিত ছিল। আজও কাঠের তৈরি রেল-সেতু কানাডায় দেখা যায়। লোহার আবিষ্কারের পর—বিশেষ করে টান গ্রহণের জন্য লোহার ব্যবহার শুরু হয়।

গাথনির মালমশলা

আগেকার দিনে আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে-আসা ছাইয়ের সঙ্গে চুন মিশিয়ে বাড়ী তৈরির মশলার কাজ চলত। যেখানে ঐ বিশেষ ছাই পাওয়া যেত না সেখানে ইট গুঁড়িয়ে সুরকী ক'রে চুনের সঙ্গে পিষে জল দিয়ে নরম করে গাঁথনির মশলা হিসেবে ব্যবহার করা হ'ত। আবার বালি ও চুন মিশিয়েও গাঁথনির মশলার কাজ চলত।

বন্দর কি লাইট হাউস তৈরি করতে জলের তলায় কাজ করার জন্য এমন মশলা ব্যবহার করা হ'ত যা দিয়ে জলের তলায় কাজ করা সম্ভব ও দিন দিন যা আরও মজবুৎ হয়।

ইংরেজ কনট্রাকটর জোসেফ এস্পডিন (১৭৭৯-১৮৫৫) যে দিন মাটি ও খড়ি গুঁড়িয়ে তাকে বিশেষ ভাবে পুড়িয়ে প্রথম সিমেন্ট তৈরি ক'রে 'কৃত্রিম পাথর' এই নামে পেটেন্টের জন্য দরখাস্ত করেন সেদিন গঠনবিদ্যার এক নবযুগের সৃষ্টি হয়। সে হ'ল ১৮২৪ সালের ২১শে অক্টোবরের কথা। বিলেতের পোর্ট-ল্যাণ্ড অঞ্চল হ'তে সংগৃহীত পাথরের মত রং হওয়ার জন্য এর নাম দেওয়া হ'ল 'পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট'। ক্রমে এরও নির্মাণপদ্ধতির নানা উন্নতি হ'তে লাগল। বর্তমানে ইস্পাত নির্মাণের কারখানার লৌহমল থেকেও সিমেন্ট

প্রস্তুত-পদ্ধতি চালু হয়েছে। আগে এ জিনিসটা কোনই কাজে লাগত না।

রীন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীট

রীন্‌ফোর্স্‌ড বা রি-এন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের আবিষ্কার এক আকস্মিক ব্যাপার। প্যারিস মহানগরীর এক মালী জোসেফ মনিয়ারের (১৮২৩-১৯০৬) জন্য এ আবিষ্কার অপেক্ষা করছিল। মনিয়ার ফুলের গাছ ও ফুলের ফলন ভালো না হ'লে রেগে গিয়ে ফুলের টব দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিত। টবের অবশ্যম্ভাবী দশার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। মাটির টব যাতে সহজে ভেঙ্গে না যায় সেই ভাবে টব তৈরি করা যায় না? এই কথাই ভেবে ফুলের টবের গায়ে ইস্পাতের তার জড়িয়ে তার উপর কংক্রীটের প্রলেপ দিয়ে দিতে দেখা গেল সেই টব বেজায় শক্ত হয়েছে। ফেলে দিলেও ভাঙ্গছে না। এই হ'ল রীনফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের আদি কথা। এখন দেখতে হবে কত পুরু কংক্রীট দিলে ভিতরের লোহায় মরচে ধরবে না ইত্যাদি খুঁটিনাটি।

বিলেতেও জোসেফ টল্‌ নামে এক এঁচোড়ে-পাকা পনেরো বছরের পড়ুয়া ছেলে রীনফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের পেটেন্ট নেয়। সে-ই কেন্টের অন্তর্গত বেক্সলহীথ নামক স্থানে পৃথিবীর প্রথম রীন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের বাড়ী তৈরি করে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ৫২½ ফুট উত্তারের ও ১৩ ফুট চওড়া প্রথম রীনফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটর সেতু তৈরি হয়। সাউথ আর্কে সেই ছোকরা পরে একটি কারখানাও তৈরি করে। প্রয়োগ-বিজ্ঞানের জগতে এই রীনফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীট এক বিপ্লব এনেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গঠন-বিজ্ঞানের এক নতুন যুগের অর্থাৎ কংক্রীট যুগের সৃষ্টি হয়েছে। সিমেন্ট কংক্রীট উপযুক্ত পরিমাণ জলের সঙ্গে মেশালে এমন একটি নরম বস্তু তৈরি হয় যাকে যে রকম ইচ্ছে ছাঁচে ঢালা যায় ও যে রকম ইচ্ছে রূপ দেওয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে সেই নরম উপাদানটি ছাঁচের মত কঠিন রূপ ধারণ করে। ফলে জিনিসটি স্থপতিদের গঠনকার্যকে মনোহর রূপারোপের যথেচ্ছ সুযোগ দিয়েছে। বহু আকর্ষণীয় ও সুন্দর হর্ম্য, সৌধ, সেতু, গির্জা প্রভৃতি নব কলেবরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। বিলেতের নতুন আর্লস্‌ কোর্ট প্রদর্শন ভবনটি বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের এক বিশেষ সৌধ। এই রীন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের সাহায্যে পাইল, ময়লা বা পানীয় জল ও সেচের জল বয়ে নেবার জন্য বড় বড় জলরোধক দীর্ঘ সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। রীন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের উপর ফরাসী এঞ্জিনীয়ার ফ্যাঙ্কয়েস্‌ হেনীরিক্‌ (১৮৪৩-১৯২১) বিশেষ গবেষণা করেন। তিনিই কংক্রীটের স্ল্যাব, বীম্‌, T-আকৃতির কড়ি ইত্যাদির হদিস দেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য ফরাসী এঞ্জিনীয়ার ল্যামবত একটি রীন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের নৌকো প্রস্তুত করান। সেটা হয়তো আজও ফরাসী দেশের কোন প্রদর্শনাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে।

রীন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের প্রথম ৩৩ ঘন গজের জলাধার ১৮৬৮-১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। প্রথম সেতু হ'ল ৫২½ উত্তারের; এটি ছিল ১৩ ফুট চওড়া। এটি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। রীন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের মূল তত্ত্বটি হ'ল এই : এর

দু'টি অংশ ইস্পাত আর কংক্রীট। ইস্পাতের কাজ টান গ্রহণ করা আর কংক্রীটের কাজ চাপ গ্রহণ। দেখা গেছে দুই ব্যবধানের মধ্যে বীম কি স্ল্যাব রাখলে বীমের মাঝখানে তলার দিকে বেশি বেশি টান পড়ে, ফলে বিপরীত দিকে চাপ সৃষ্টি হয়। তাই ইস্পাতের ছড় তলায় দেওয়া হয়—যাতে ইস্পাতের টান গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কংক্রীটেরও পরিমাণ এমন হওয়া দরকার যাতে নিরাপদে চাপ গ্রহণ করতে পারে।

নানা কাজে যন্ত্রের ব্যবহার

বাড়ী তৈরির ব্যাপারে যন্ত্র ব্যবহার করলে কাজ অদ্ভুত রকম তাড়াতাড়ি হ'তে পারে। যেমন, নরম মাটিতে কাঠের পিন বা কংক্রীটের পাইল পুঁততে, বহুতল বাড়ী তৈরির সময় ইট, চুন, সুরকী, কংক্রীট, লোহা প্রভৃতি উঁচুতলাতে তুলতে, জল পাম্প করা প্রভৃতি কাজে। ইংল্যাণ্ডে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ষ্টিফেনসন্ টাইন নদীর উপর সেতু নির্মাণ করবার সময়ে ষ্টীম বা বাষ্পচালিত হাতুড়ার সাহায্যে কংক্রীটের পাইল পুঁতেছিলেন। কাজ এত দ্রুত চলেছিল যে চার মিনিটে ৩৩ ফুট পর্যন্ত কংক্রীট পাইল পোঁতা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্যাসিফিক রেল কোম্পানী লাইন পাততে বাষ্প-চালিত খনকের ব্যবহার শুরু করে। ফলে কাজ দ্রুত শেষ করা সম্ভব হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় পাথর ভাঙ্গার কাজেও প্রথম যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়। এই পাথরই কংক্রীটের প্রধান উপাদান, যার সঙ্গে বালি ও সিমেন্ট মিশিয়ে পরে উপযুক্ত জল দিয়ে নিখুঁত ভাবে মেশালে কংক্রীট প্রস্তুত হয়। উপযুক্ত পরিমাণ জল দেওয়া হ'ল কিনা তা পরীক্ষার জন্য কংক্রীট যেখানে মেশানো হয় সেখানে স্লাম্পে পরীক্ষা করা হয়। একটি সমতল ভূমিতে রাখা মাথা-কাটা কোণের মধ্যে কংক্রীট ঢেলে ভর্তি করে সেই ফর্মাটি তুলে নিলে কংক্রীট কতখানি থেবড়ে বসেছে তার মাপ থেকে কংক্রীট মেশাতে ঠিক জল দেওয়া হয়েছে কিনা জানা যায়। তা ছাড়া ৬ ইঞ্চি ঘন ব্লক অথবা ৬ ইঞ্চি ব্যাসের একফুট খাড়াই চোঙ্গা কংক্রীট বিভিন্ন দিন ভিজে জায়গায় রেখে পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে কত চাপে তা ভাঙ্গে তার পরীক্ষা করা হয়। তাই থেকে কংক্রীটের চাপ গ্রহণের শক্তি নির্ণীত হয়।

ভারতে সিপাহীবিদ্রোহের সময় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কংক্রীট মেশাবার জন্য যন্ত্রের ব্যবহার প্রথম শুরু। এটি ছিল গোল মত, ড্রামের আকৃতির। ষ্টীম এঞ্জিন দিয়ে এটি চালিত করার রীতি ছিল। জার্মানীতে তিস্‌ৎসা সেতু নির্মাণে সিংসানী কংক্রীট মিশ্রণ যন্ত্র ব্যবহার করেন যাতে দিনে ১০ ঘণ্টা কাজ করে ৩০০০ থেকে ৩৫০০ ঘন ফুট কংক্রীট প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছিল। কংক্রীটে বেশি জল থাকলে কংক্রীটের চাপ গ্রহণের শক্তি ক'মে যায় ও জল বাষ্পীভূত হয়ে কংক্রীটকে সঙ্কুচিত করায় কংক্রীটের ক্ষতি হয়। তাই কংক্রীট কম জল দিয়ে মিশিয়ে ফর্মার ভেতর ফেলে ভাইব্রেটার দিয়ে কাঁপিয়ে বা ফর্মার বাইরে লাগিয়ে কাজের উপযোগী শক্তিশালী কংক্রীট করা হয়। তবে খুব ছোট ছোট মাপের পাথরকুচি হলে অতিঘন কংক্রীট করা সম্ভব। বড় পাথরকুচির ফাঁকে ছোট পাথরকুচি, তার ফাঁকে বালি ও তার ফাঁকে সিমেন্ট ভর্তি হয়।

কংক্রীটের ব্যবহারের আদিপর্বে দুর্ঘটনাও

কিছু ঘটেছিল এবং আজও যে মাঝে মাঝে তা ঘটে না তা নয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 'প্রাগে'র কাছে 'পোডোল' নামক স্থানে ৭৫ ফুট জ্যায়ের একটি খিলান সেতু পড়ে যায়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে একটি বড় মিউজিয়াম বাড়ী তৈরি করতে গিয়েও অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটে। ১৯০১ সালের ২৮শে অগাস্ট বালের এক বিখ্যাত হোটেল কোন অজ্ঞাত ত্রুটীর জন্য নির্মাণ-কালেই ধ্বসে পড়ে।

এর প্রতিরোধের জন্য নানা দেশে কংক্রীটের কাজের কড়া নিয়মকানুন রচিত হয়েছে। ফলে আকস্মিক দুর্ঘটনা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

সুড়ঙ্গ

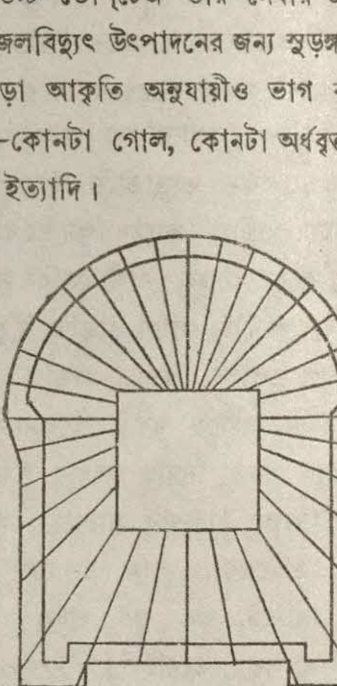
যদিও জ্বলন্ত জতুগৃহ থেকে পঞ্চপাণ্ডবকে উদ্ধার করে আনার জন্যে মহাভারতে জতুগৃহ থেকে বাইরে আসার সুড়ঙ্গের উল্লেখ আছে কিন্তু বৃহৎ সুড়ঙ্গের কাহিনী আমাদের অন্য ধর্মগ্রন্থে বিশেষ দেখা যায় না।

অতি প্রাচীন কালে দূর থেকে রোমে জল আনার জন্য জুলিয়াস সীজারের পরিকল্পনা মত একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয় ৫২ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট্ ক্লডিয়াসের আমলে। এটি ছিল দশ ফুট খাড়াই, ছ' ফুট চওড়া আর সাড়ে তিন মাইল লম্বা। দশ হাজার লোক দীর্ঘ এগারো বছর ধরে কাজ করে এটি সম্পূর্ণ করে।

সুড়ঙ্গকে তার অবস্থিতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে :—

(১) নদী বা সমুদ্রের তলায় সুড়ঙ্গ, (২) মাটীর ভিতর সুড়ঙ্গ, (৩) পাহাড় ভেদ করে পাথর কাটা সুড়ঙ্গ।

আবার বিভিন্ন কাজে কি ভাবে ব্যবহার করা হবে সেই অনুযায়ীও ভাগ করা যেতে পারে সুড়ঙ্গকে। যেমন, (১) রেল সুড়ঙ্গ, (২) গাড়ী চলাচলের জন্য সুড়ঙ্গ, (৩) মানুষ চলাচলের সুড়ঙ্গ, (৪) জল বয়ে আনার জন্য সুড়ঙ্গ, (৫) ময়লা জল বহন করার জন্য সুড়ঙ্গ, (৬) নদীর পথ সরিয়ে আনার জন্য সুড়ঙ্গ, (৭) উচ্চ ভোল্টেজ তার নেবার জন্য সুড়ঙ্গ, (৮) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সুড়ঙ্গ প্রভৃতি। তা ছাড়া আকৃতি অনুযায়ীও ভাগ করা যেতে পারে—কোনটা গোল, কোনটা অর্ধবৃত্ত, কোনটা চৌকো ইত্যাদি।



সুড়ঙ্গ নির্মাণের ধারা : প্রস্থচ্ছেদ চিত্র

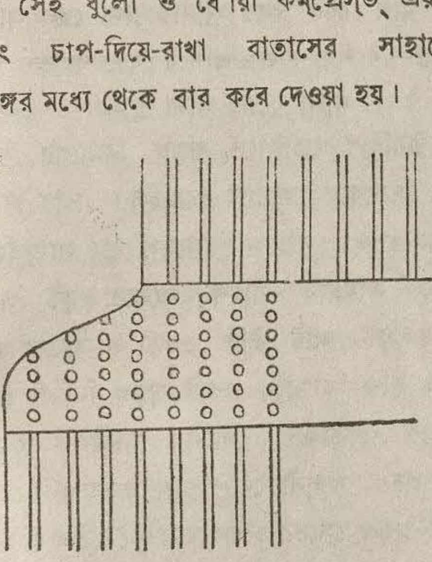
সুড়ঙ্গ কেমন করে বানায়

পাথর ফুটো করে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কৌশল যথাক্রমে নিম্নলিখিত পর্যায়ে বলা যেতে পারে :—

(১) পাথর ছেঁদা করা। ছেঁদা করার যন্ত্র জাম্বো ঠিক জায়গায় এনে লম্বা বেধ যন্ত্রের সাহায্যে পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা (৮ থেকে

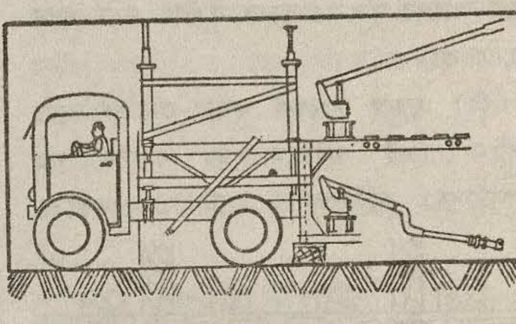
১২ ফুট) ছেঁদা করা হয়। ছেঁদা সব সময়ে আনুভূমিক নাও হতে পারে এবং তা হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। অনেকগুলি ছেঁদা তির্যক ভাবেও করা হয়।

(২) বিস্ফোরণ ঘটানো। সেই শূন্য ছেঁদার মধ্যে যথোপযুক্ত বিস্ফোরক দ্রব্য ভরে দেওয়া হয় এবং দূর থেকে সুইচ্ টিপে বিদ্যুতের স্পার্ক দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিস্ফোরণের ফলে বিস্ফোরণের জায়গার ছোট বড় পাথরের চাঙড় ভেঙে পড়ে এবং ধুলো ও ধোঁয়ার উদ্ভব হয়; সেই ধুলো ও ধোঁয়া কম্প্রেস্ড্ এয়ার অর্থাৎ চাপ-দিয়ে-রাখা বাতাসের সাহায্যে সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে বার করে দেওয়া হয়।



দীর্ঘচ্ছেদ চিত্র: বিস্ফোরণ ছিদ্র

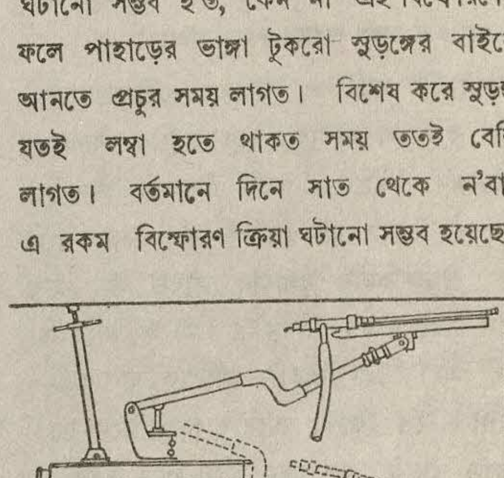
(৩) ভাঙ্গা পাথর সাফ করা। বিস্ফোরণের ফলে যে ভাঙ্গাচুরো পাথর পাহাড়ের গা থেকে চূর্ণ হ'য়ে ধ্বসে পড়ে তা বিচিত্র ও বিভিন্ন আকৃতির। সাধারণ গাঁইতি, কোদাল, বেলচা ও ঝুড়ির বদলে যন্ত্রের সাহায্যে সেই ভগ্নস্তূপ সুড়ঙ্গের মুখে আনা হয়। এই কাজ রেল লাইন পেতে খোলা রেল ট্রাকের ওপর চড়িয়ে অথবা



ট্রাকে চড়ানো ছিদ্র করার যন্ত্র

টায়ারের ওপর বসানো ট্রাকে ভর্তি করে হাসিল করা যায়।

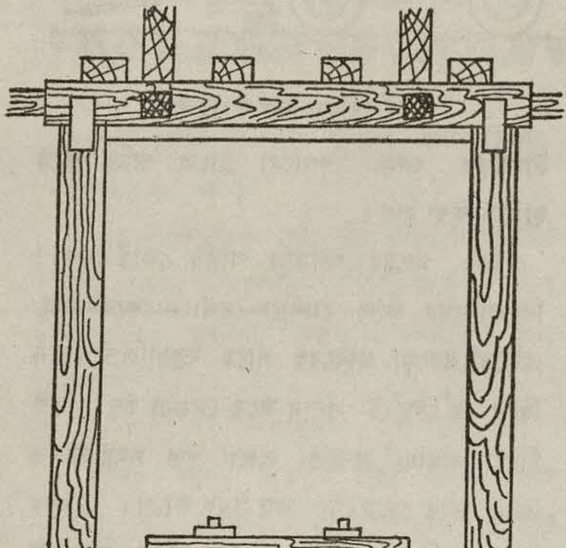
(৪) গায়ের অসমান পাথর কেটে ফেলা। বিস্ফোরণের ফলে যেখানে-সেখানে-ভেঙ্গে-পড়া, এবড়োখেবড়ো গহ্বরের গায়ে যন্ত্রচালিত ছেনি দিয়ে ছেঁটেছুঁটে সমান করে দেওয়া হয়। এই ক্রিয়া সমাধা করতে আগে যত সময় লাগত এখন তার চেয়ে ঢের কম সময় লাগে। ১৯৩০ সালে প্রতি ৮ ঘন্টায় একবার করে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব হ'ত, কেন না এই বিস্ফোরণের ফলে পাহাড়ের ভাঙ্গা টুকরো সুড়ঙ্গের বাইরে আনতে প্রচুর সময় লাগত। বিশেষ করে সুড়ঙ্গ যতই লম্বা হতে থাকত সময় ততই বেশি লাগত। বর্তমানে দিনে সাত থেকে ন'বার এ রকম বিস্ফোরণ ক্রিয়া ঘটানো সম্ভব হয়েছে।



ট্রলীতে চড়ানো ছিদ্র করার যন্ত্র

ফলে আগের তুলনায় সুড়ঙ্গ কাটার খরচ এখন অনেক কমে গেছে।

(৫) সুড়ঙ্গ সংরক্ষণ করার জন্য কাঠামো বসানো। এই কাঠামো হয় কাঠের, নয় ইস্পাতের কড়ি-বরগার সাহায্যে ওপরের



সুড়ঙ্গ সংরক্ষণ করার কাঠামো

পতনোন্মুখ মাটি ও পাথরকে ঠেকিয়ে রাখে। এই কাঠামো লাগাবার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। অর্থ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণী কাঠামো প্রয়োগ না করার ফলে বহু সুড়ঙ্গ-কর্মীর মূল্যবান্ জীবন আগেকার দিনে বিনষ্ট হ'ত। এখন এ রকম ফাঁকি দেওয়া চলে না। এটি একটি অবশ্যকর্তব্য কর্ম—কয়লা-খনিতে বিশেষ ভাবে পালন করানো হয়। পাহাড় থেকে জল যখন চুঁয়ে পড়ে তখন তা সরাবারও ব্যবস্থা রাখা দরকার।

(৬) সুড়ঙ্গ সংরক্ষণের জন্য আস্তর লাগানো। সংরক্ষণী কাঠামো লাগাবার পর সুড়ঙ্গের ভিতর দিক্‌টা সুদৃশ্য করার জন্য ইস্পাতের ও ঢালাই লোহার অথবা রীনফোর্স্‌ড কংক্রীটের সংরক্ষণী আস্তর লাগানো দরকার। তা না হ'লে সুড়ঙ্গগর্ভের উপাদান ওপর ও পাশ থেকে খ'সে সুড়ঙ্গের মধ্যে প'ড়ে সুড়ঙ্গপথ অবরুদ্ধ করতে পারে। সুড়ঙ্গ যেমন যেমন বেড়ে চলে, তেমন তেমন আলো জ্বালাবার জন্য বিদ্যুতের তার খাটানো, কর্মীদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যের জন্য ঠাণ্ডা বাতাস দেওয়া, জল বের করার জন্য পাম্প ও পাইপ বসানো, চূর্ণ মাল বের করে আনার জন্য রেল লাইন পাতা—এ সব কাজও এগিয়ে যেতে থাকে।

নানা যুগের নানা সুড়ঙ্গ

উনবিংশ শতাব্দীতে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ খুব দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়েছিল। তার আগে ১৬৭৯-১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ক্যানেল ড্যু ল্যাঙ্গুইডক নামক জায়গায় পাঁচশ' পনেরো ফুট লম্বা, বাইশ ফুট আট ইঞ্চি চওড়া ও সাতাশ ফুট সাত ইঞ্চি খাড়াই একটি সুড়ঙ্গ নির্মিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় আর্নিলক সুড়ঙ্গ শুরু হয়। ফরাসী দেশে বেশ কতকগুলি ছোট ছোট সুড়ঙ্গ সেচের জলের জন্যও তৈরি করা হতে থাকে। সেন্ট কুয়েনটিন সুড়ঙ্গের কাজ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শুরু হয় বালির মধ্যে দিয়ে খালের জল নেবার জন্য। ১৮২৫ থেকে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় লাগে টেম্‌স্ নদীর তলা দিয়ে ওয়েপিং ও রদারটাইয়ের রাস্তা তৈরি করতে। এটি পরে রেল চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়। রেল লাইনের প্রসারের পর বহু রেল-সুড়ঙ্গপথও তৈরি হতে থাকে—কেন না মোটরগাড়ীর মত রেলগাড়ী দ্রুত মোড় ফিরতে ও বেশি খাড়াই

উঠতে না পারায় পর্বত উল্লঙ্ঘন করতে সুড়ঙ্গের প্রয়োজন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত খনি-এঞ্জিনীয়াররাই কেবল সুড়ঙ্গনির্মাণে বিশেষজ্ঞ হতেন। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিতে এটিকে আনবার জন্য অষ্ট্রিয়ান এঞ্জিনীয়ার ফ্রাঁৎস্‌ফন্‌ রিহার (১৮৩৮-৯৭) অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম সুড়ঙ্গ-নির্মাণতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন। সুইৎজার-ল্যাণ্ডের বিখ্যাত সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ শুরু হয় ১৮৫৭ থেকে, শেষ হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। আট মাইল লম্বা মণ্ট সিনিস্ সুড়ঙ্গ খননে প্রথম কম্‌প্রেস্‌ড্‌ এয়ারে চালানো ফুটো করার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সেণ্ট গার্থার্ড সুড়ঙ্গে ব্র্যাণ্ড ও ফ্লোরেন্স বেধযন্ত্র এবং বিস্ফোরক বারুদের পরিবর্তে ডিনেমাইটের ব্যবহার শুরু হয়। এই ন' মাইলেরও বেশি দীর্ঘ সুড়ঙ্গটি নির্মাণে ন'বছর সময় লাগে। ১২·৩০ মাইল লম্বা সিম্পলন্ সুড়ঙ্গ নির্মাণে ৭½ বছর লাগে। সুড়ঙ্গ নির্মাণে বিলম্বের কারণ হ'ল বিস্ফোরণের ফলে ধ্বসে-পড়া মালগুলি সরানোর কাজে বিলম্ব। যদিও সুইস্‌রা দীর্ঘ সুড়ঙ্গ নির্মাণে বিশেষ পারদর্শী, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বহু সুড়ঙ্গ নির্মিত হয়েছে। ভারতবর্ষে হাওড়া থেকে মোগলসরাই যাবার পথে গয়ার কাছে, রাউর-কেল্লা যাবার পথে বেশ কয়েকটি রেল-সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হয়েছিল তা অনেকেই দেখে থাকবে। রাওলপিণ্ডি থেকে পেশোয়ার যাবার পথে এ রকম কত যে সুড়ঙ্গ আছে তার ঠিক নেই। এখন সেগুলো পাকিস্তানে পড়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে ১·৭৫ মাইল লম্বা ক্যালডেরা সুড়ঙ্গ, ক্যানাডার মন্ট্রিয়ালে ৩·৩০ মাইল লম্বা সুড়ঙ্গ, যুক্তরাজ্যের ওয়েল্‌স্ অঞ্চলে ৪·৪০ মাইল লম্বা সেভান সুড়ঙ্গ নির্মিত হয়েছিল। এ ছাড়া রাস্তার তলায়, নদীর তলায় কত না সুড়ঙ্গ তৈরি হয়েছে তার হিসেব নেই।

সুড়ঙ্গ তৈরিতে বিপত্তি

এক এক সময় কোন কোন কাজে এত বিলম্ব হয় যে তার যেন সীমা-পরিসীমা থাকে না। নিউইয়র্কে হাডসন নদীর তলায় যে সুড়ঙ্গটি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল তা শেষ হ'তে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত লেগে যায়। যদিও এতে প্রযুক্তিবিদ্যার ত্রুটির চাইতে অর্থাভাব, কর্মীদের জীবনহানি প্রভৃতিই বেশি দায়ী। ছ' বছর কাজ করার পর প্রেষিত বায়ু বা কম্‌প্রেস্‌ড্‌ এয়ার পাঠানো হঠাৎ থেমে যাওয়ায় সুড়ঙ্গের ছাদ ধ্বসে পড়ে; ফলে নদীর জল ঢুকে কুড়িজন লোকের সলিলসমাধি ঘটে। ১৮৯০ সালে আবার যখন কাজ শুরু হ'ল তখন আর এক বিপদ্। প্রেষিত বায়ুতে কাজ করার পর কাজের শেষে মুক্ত বাতাসে আসায় এক রকম রোগের উৎপত্তি হয়, তাতে শতকরা পঁচিশ জন কর্মীর জীবনহানি হ'তে থাকে। ওই সমস্যা সমাধান করা হয় প্রেষিত বায়ু-প্রকোষ্ঠ থেকে অল্প বায়ুচাপের প্রকোষ্ঠে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়ে ধীরে ধীরে মুক্ত বাতাসের পরিবেশে কর্মীকে আনা। তাতে অযথা জীবনহানি বন্ধ হয়।

এইসব নানা সমস্যার উপযুক্ত সমাধান করে সুড়ঙ্গনির্মাণ বিদ্যা বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্তমানে এর

বিশেষজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ এখন বেশ তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

সেতুর কথা

সেতু বলতে আমরা সাধারণতঃ হু'পারের মধ্যেকার ব্যবধানকে অতিক্রম করার জন্য বিশেষ পথকেই বুঝি। ইংরেজী করে ওকে 'স্ট্রাক্‌চার' বললে বাংলায় 'গঠন' বলা চলে। সেতুর দু'টি ভাগ। একটি ওপরের ভাগ—যাকে বলা হয় উর্ধ্বাংশ বা সুপার-স্ট্রাক্‌চার, আর যে অংশ মাটির ভিতরে বা জলের তলায় থাকে বা যার ওপর সেতুর মূল গঠনটিই স্থাপিত—তাকে বলা হয় নিম্নাংশ বা সাব্-স্ট্রাক্‌চার। ওপরের অংশকে সাধারণতঃ মূল সেতু আর নীচের অংশকে ভারগ্রাহী স্তম্ভ বা ভিৎও বলা হয়।

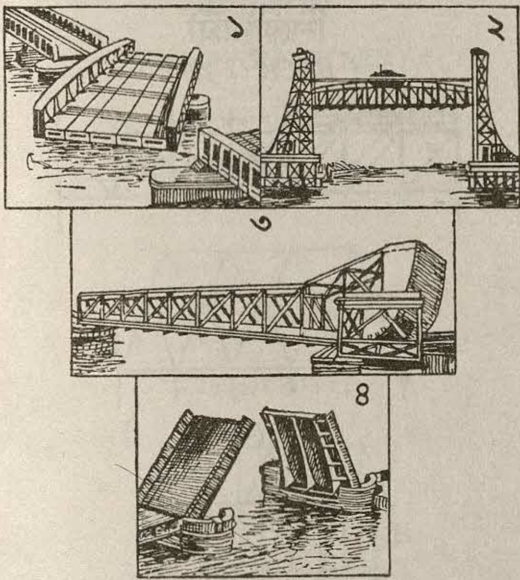
এঞ্জিনীয়াররা সেতুকে নানা দিক্ দিয়ে নানা ভাবে ভাগ করে তাদের নানা রকম নাম দিয়েছেন। তার লম্বা ফর্দ শুনতে কি তোমাদের ভালো লাগবে? তাই সংক্ষেপে শুধু কয়েকটির কথা বলি।

যেমন ধরা যাক্, সেতুর বিভিন্ন জায়গায় চলতি যানবাহনের অবস্থিতি অনুযায়ী ডেক শ্রেণীর সেতু, অর্ধমধ্যগামী, পূর্ণমধ্যগামী বা ঝুলন সেতু। সেতুর উর্ধ্বাংশের ভার ভিতের ওপর বসাবার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নানা ধরনের সেতু। এর মধ্যে খিলান সেতু, প্রসারণী সেতু, ঝুলন সেতু ইত্যাদি পড়ে। খিলান সেতুও আবার নানা ধরনের হয় -সেতুর ভার কোথায় পড়ল সেই অনুযায়ী। প্রসারণী সেতুর মধ্যে আছে একক প্রসারণী, যুগল প্রসারণী, সাম্যভার প্রসারণী (ব্যালান্স্‌ড্ ক্যান্টিলিভার)। ঝুলন সেতুও একক কেন্দ্র থেকে প্রসারিত বা দুই তীরস্তম্ভ থেকে প্রসারিত হতে পারে। ঝুলন ও প্রসারণীর সম্মিলনে সংগঠিত সেতুও হয়—যেমন বর্তমানের রবীন্দ্র সেতু।

নির্মাণপদ্ধতি অনুযায়ী প্লেট গার্ডার, রিভেট-মারা কাঠামোর সেতু, শঙ্কুনিবদ্ধ বা পিন্-জয়েন্টেড্, ঝালাই-করা কাঠামোর সেতু প্রভৃতি নানাভাবে সেতুকে ভাগ করা যায়। তেমনি নির্মাণ উপাদান অনুযায়ী কাঠের সেতু (মাপ-করে-কাটা, এমনি গাছের ডাল, প্লাইউডের তৈরি), ইটের সেতু, পাথরের সেতু, কংক্রীটের সেতু, রীনফোর্স্‌ড্ কংক্রীটের সেতু (পূর্ব-টান ও উত্তর চাপের), ইস্পাতের সেতু, ইস্পাতের সংকর ধাতুর তৈরি সেতু, ঢালাই লোহার সেতু (বর্তমানে অচল), ইস্পাতের তার বা শিকল দিয়ে তৈরি সেতু, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনে-সিয়ামের সংকর ধাতুর তৈরি সেতু, ঝালাই-করা ইস্পাত-সেতু, দড়ির বোনা প্রাচীন কালের ঝুলন সেতু ইত্যাদি হরেক রকম সেতু হতে পারে।

আরো কয়েক রকম

বাহু ও উত্তারের দিক্ দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরও সেতুকে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, সহজ ভাবে বসানো, একাধিক উত্তারযুক্ত, একদিকে দৃঢ় অন্যদিকে সহজ ভাবে বসানো, দু'দিকেই দৃঢ় ভাবে বসানো, প্রসারণী সেতু ইত্যাদি। যানবাহন চলাচল অনুযায়ী গাড়ী চলার সেতু, মানুষ চলার সেতু, রেল সেতু, ওপর বা নীচ দিয়ে পথ নিয়ে যাওয়ার সেতু ইত্যাদি ভাবেও ভাগ করা চলে। আবার নৌচলাচলের জন্যও নিশ্চল সেতু, আংশিক বা পূর্ণ বিবর্তিত উত্তোলিক সেতু, আংশিক চলমান



(১) সুয়িং অর্থাৎ ঘোরানো সেতু
(২) উল্লম্ব উত্তোলিত সেতু
(৩) একবাহু ব্যাসকুলি সেতু
(৪) দ্বিবাহু ব্যাসকুলি সেতু

সেতু (ভাসা পুলের খানিকটা সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা আছে যাতে) প্রভৃতি নানা ভাবে সেতুকে ভাগ করা চলে।

আরও আছে। একতলা, দোতলা, তেতলা সেতু, সুয়িং সেতু, ভার্টিকাল লিফ্ট্ বা উল্লম্ব উত্তোলিত সেতু, ভাসমান সেতু, ছাদ-লাগানো সেতু, ব্যাসকুলি সেতু ইত্যাদি। আগেকার হাওড়ার পুল ছিল ভাসমান সেতু। ছাদ-লাগানো সেতু সাধারণতঃ ঠাণ্ডার দেশে থাকে—যাতে ঢালু ছাদ বেয়ে বরফ গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। ব্যাসকুলি সেতুর এক অংশ তীরের গঠনের সঙ্গে এমন ভাবে সংযুক্ত যে একপার বা দু'পার থেকে রাস্তা সমেত পাটাতন ওপরে তুলে দিলে তলা দিয়ে সহজে নৌকো বা জাহাজ চলাচল করতে পারে। কলকাতার সারকুলার গার্ডেন রীচ রাস্তার ওপর এই ধরনের সেতু আছে।

যদিও সেতুকে উল্লিখিত নানা ভাবে ভাগ করা যায় তবে অধিকাংশ সেতুই বিভিন্ন আকৃতির কাঠামোর তৈরি। গঠন উপাদান ইস্পাত ও ইস্পাতের যে কোন সংকর ধাতু বা কাঠও হতে পারে। এদের প্রধান আকৃতি হ'ল (১) N-আকৃতির কাঠামো (২) ওয়ারেন গার্ডার (৩) হাউই কাঠামোর (৪) হুইপল আকৃতির (৫) বাল্টিমোর আকৃতির (৬) K-আকৃতির। ছবিতে প্রত্যেকটি দুইভাবে, ভার চলাচলের ওপর তাদের কেমন দেখতে হবে, তাই দেখানো হয়েছে। যথাক্রমে মধ্যগামী ও শিরোগামী উপায়ে ভার ন্যস্ত করার পরি-প্রেক্ষিতে এগুলি দেখানো।

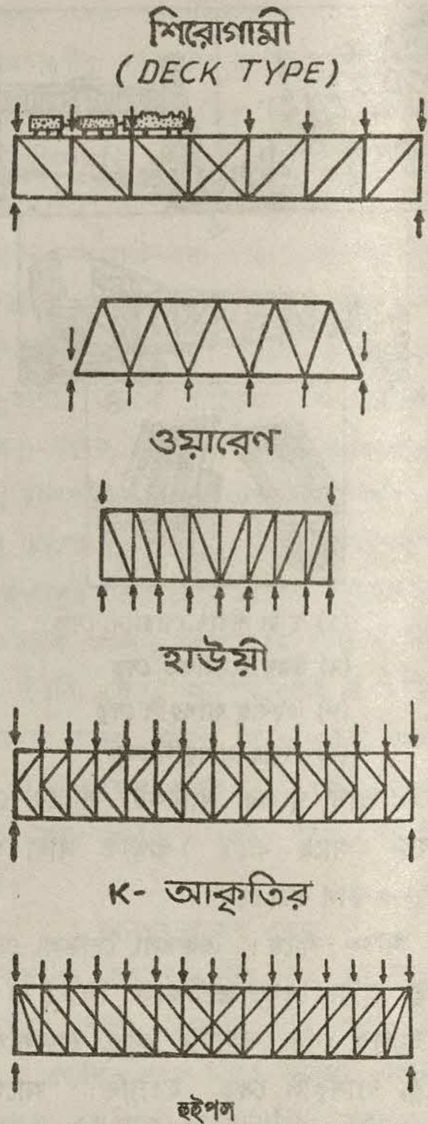
সাধারণতঃ বিভিন্ন উত্তারের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর সেতুর সাধারণ পদ্ধতি হ'ল ৪০ থেকে ১২৫ ফুট উত্তারের জন্য প্লেট গার্ডার, ১০০ থেকে ১৫০ ফুট উত্তারের জন্য রিভেটমাথা উপরোক্ত শ্রেণীর গার্ডার, ১৫০ থেকে ২০০ ফুট উত্তারের জন্য সহজ ভাবে বসানো কাঠামো, ২০০০ ফুট পর্যন্ত উত্তারের জন্য প্রসারণী সেতু, ৩০০০ ফুট পর্যন্ত উত্তারের জন্য —খিলান সেতু, ৪০০০ ফুট থেকে ৭৫০০ বা ততোধিক উত্তারের জন্য ঝুলন সেতু।

হাওড়ার রবীন্দ্র সেতুটি প্রসারণী ও ঝুলন শ্রেণীর মিশ্রণ, তবে মূলতঃ প্রসারণী। এর উত্তার ১৫০০ ফুট। ফার্থ অব্ ফোর্থের সেতুর উত্তার ১৭১০ ফুট এবং কুইবেক সেতুর উত্তার হ'ল ১৮০০ ফুট। এটিকে আজও কেউ অতিক্রম করতে পারে নি।

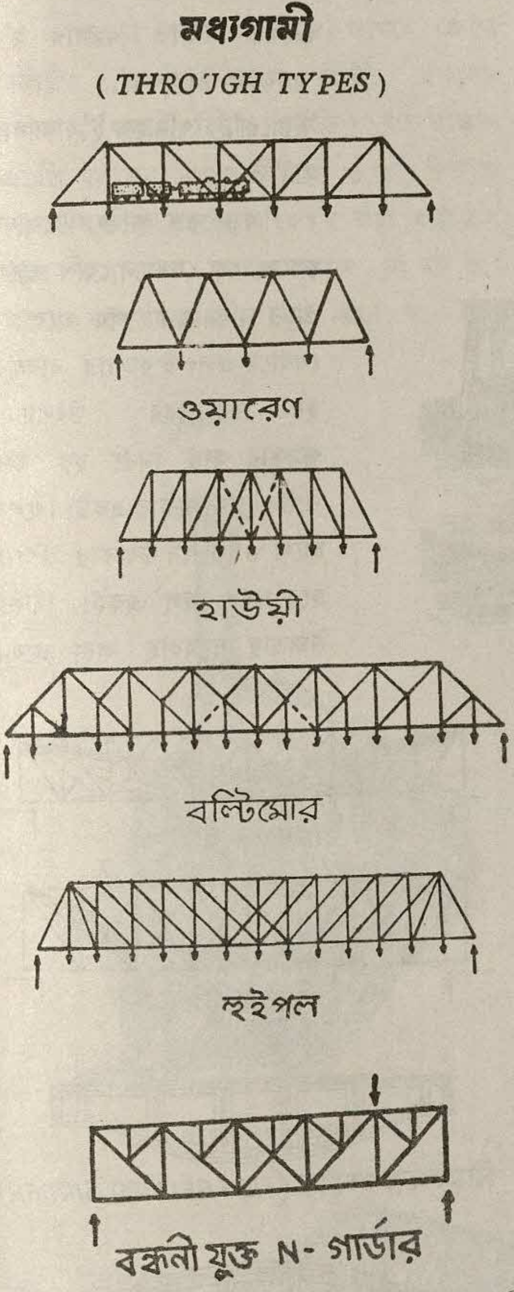
কয়েকটি বিখ্যাত সেতু

সেতু নির্মাণে ফার্থ অব্ ফোর্থের ওপরকার সেতু উনবিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। যদিও ঝুলন সেতু করার উদ্দেশ্য নিয়ে এর কাজ শুরু হয়, কিন্তু দুর্ঘটনার দরুণ পুরোনো পরিকল্পনার পরিবর্তে প্রসারণী সেতুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড (তখন প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্) ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ এই সেতুটির উদ্বোধন করেন। এর নির্মাণে ৫১ হাজার টন ইস্পাত লাগে, তৈরি করতে সময় লাগে প্রায় সাত বছর এবং তখন এর খরচ পড়েছিল ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড। এতে দু'টি রেল লাইন পাতা, যাতে উজান ও ভাটির ট্রেন একই সঙ্গে চলাচল করতে পারে। এর দু'পাশে আছে পায়ে চলার পথ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এটির মধ্যভাগের উচ্চতা ১৫০ ফুট।

নিউইয়র্কের ম্যানহাটান দ্বীপের সঙ্গে ব্রুকলীন অঞ্চল সংযুক্ত করার জন্য ইস্ট নদীর উপর ব্রুকলীন সেতু নির্মাণের ভার বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার জন্ রোয়েবলিংএর ওপর দেওয়া হয়। ঝুলন সেতুটির উত্তারের মাপ হ'ল ১৫৯৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। তীরস্তম্ভ জলের লেভেল থেকে ২৭৫ ফুট উঁচু। কাজ শুরু হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী। ১৮৭৭ সালে, তীরস্তম্ভগুলি যখন বেশ উঁচুতে উঠেছে, তখন চারটি ঝুলন-তার তৈরির কাজ হাতে নিতে হয়। ১৪০০ মাইল গ্যালভ্যানাইজ তার নিয়ে ৪টি তারের দড়া তৈরি হয়। প্রত্যেকটিতে ৫৩৮০ সংখ্যার ৩৫৮০ ফুট লম্বা তার লাগে। প্রত্যেকটি দড়ার পরিধি পৌনে ষোল ইঞ্চি। ঐ তারের দড়া ৪০০০ টন



ওজন বহন করতে পারে। সেতুটি চওড়ায় ৮৬ ফুট,—যাতে দু'টি রেল লাইন, দু'টি বৈদ্যুতিক ট্রাম, দু'টি গাড়ী চলাচলের রাস্তা ও পথচারীর পায়ে চলার রাস্তা আছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে এই সেতুর উদ্বোধন হয়। এই সেতু নির্মাণের সময় রোয়েবলিং আহত হন এবং সেতু সম্পূর্ণ হবার আগেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

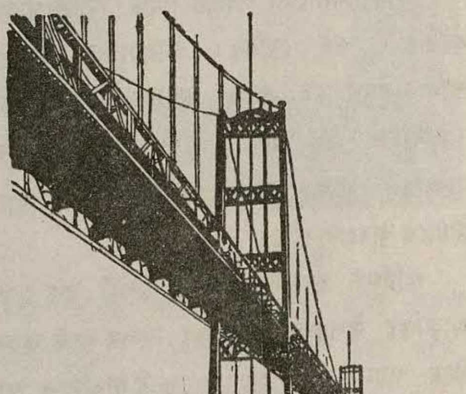


তাঁর প্রারব্ধ কর্ম তাঁর সুযোগ্য পুত্র সম্পূর্ণ করেন।

এমনি সারা বিশ্বে কত আকৃতির, কত উপাদানের, কত উত্তারের সেতু যুগে যুগে গড়ে উঠেছে। নির্মাণের সময় অবাক্ বিস্ময়ে পথচারীরা সে কাজ দেখেছে। সম্পূর্ণ হ'লে তার ওপর দিয়ে যাতায়াত করেছে—কেউ হেঁটে, কেউ গাড়ীতে। বাস্তবিক সেতু-বিজ্ঞান এঞ্জিনীয়ারিং শাস্ত্রের এক অনন্য কীর্তি।

স্টীম এঞ্জিন

বাষ্পচালিত এঞ্জিন চালাতে গেলে প্রয়োজন বাষ্প উৎপন্ন করার। বাষ্প উৎপন্ন করতে হলে জল গরম করতে হবে এবং তা থেকে বেরিয়ে-আসা বাষ্প সংগ্রহ করে স্টীম-এঞ্জিন চালাতে হবে। বাষ্প উৎপাদন করার যন্ত্রের নাম বয়লার। বয়লার তিন রকমের হয়। (১) ট্যাঙ্ক বয়লার (২) লোকোমোটিভ (অগ্নিগর্ভ) বয়লার (৩) জলগর্ভ বয়লার।



যুক্তরাষ্ট্রের 'মেন' রাজ্যে : একটা ঝুলন সেতু

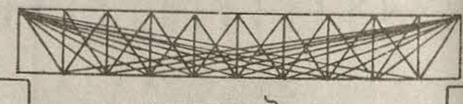


নিউইয়র্কের ব্রুকলীন সেতু

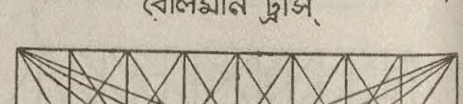
ট্যাঙ্ক বয়লারের পর্যায়ে পড়ে ল্যাঙ্কাশায়ার, কর্নিল ও স্কচ্ মেরিন। কারখানাতে ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লারের প্রচুর প্রচলন। কলকাতার কারখানার বড় বড় মিস্ত্রিরা একে লেঙ্কেশ্বর বয়লারও বলে। স্কচ্ মেরিন বয়লার আগে ষ্টীমারে ব্যবহৃত হ'ত।

অগ্নিগর্ভ বয়লারের মধ্যে একটি বড় সুড়ঙ্গ আকৃতির উপযুক্ত ইস্পাতের নলের গর্ভে কয়লা দিয়ে গরম করা হয় ও তার চারদিকে আর একটা বড় ইস্পাতের পাইপ জলে পূর্ণ থাকে। এগুলি রেলের এঞ্জিনে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় বলেই একে লোকোমোটিভ বয়লার বলে। তৃতীয় শ্রেণীর বয়লারে তলা দিয়ে কয়লার জ্বাল দেওয়া হয়, আর তার ওপরে প্রচুর জলপূর্ণ সরু সরু নল থাকে যাতে বহুবিস্তৃত জায়গার আঁচ পেয়ে জল বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। এই শ্রেণীর বিখ্যাত বয়লার হ'ল 'ব্যাবকক্-উইলকক্স', 'ষ্টার্লিং', 'ইয়ারো', 'থর্নিক্রফ্ট্' বয়লার প্রভৃতি।

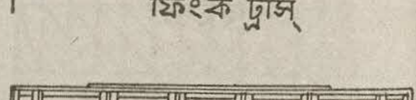
বড় বড় শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে এবং যেখানে বেশি চাপে প্রচুর পরিমাণ বাষ্পের প্রয়োজন সেখানে জলগর্ভ বয়লার ব্যবহৃত হয়। বয়লারের উৎপাদন-ক্ষমতার মান নির্ণয় হয় কত পাউণ্ড বাষ্প ঘণ্টায় একটা বিশেষ চাপে ও বিশেষ উষ্ণতায় উৎপন্ন হবে যখন জল একটা বিশিষ্ট উষ্ণতায় সরবরাহ করা হবে।



বোলম্যান ট্রাস্



ফিংক ট্রাস্



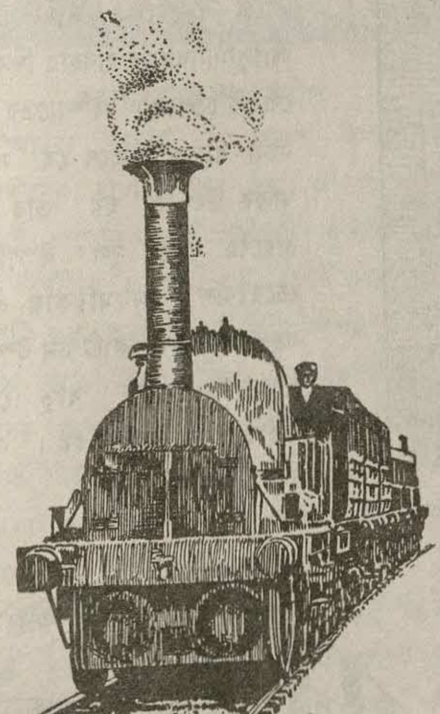
মীনোদর গার্ডার (FISH BELLIED GIRDER)



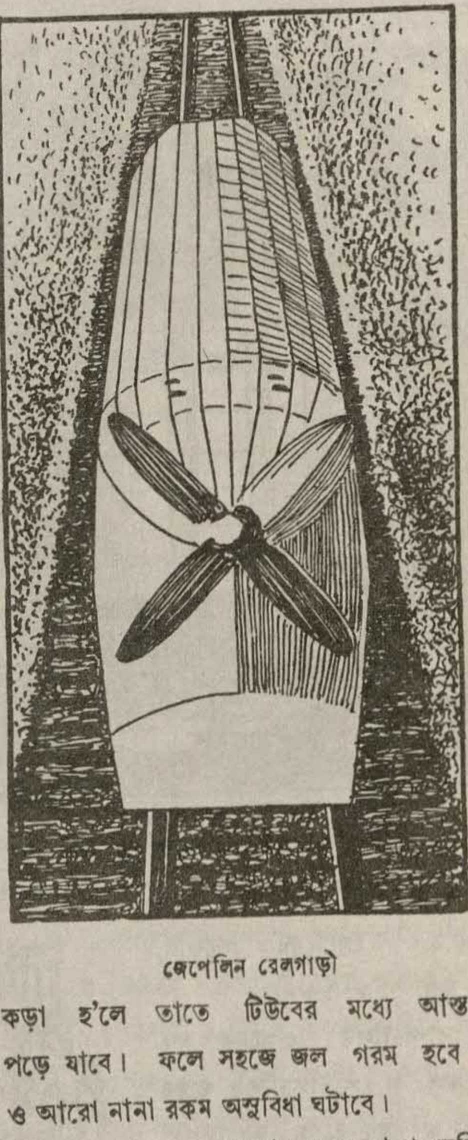
বরাহ পৃষ্ঠ গার্ডার (HOG-BACK GIRDER)

অন্যান্য আকৃতির সেতু-অংশ

এ ছাড়া বয়লারের সঙ্গে লাগবে ধোঁয়া বেরুবার চিমনী, সুপার হিটার, ইকনো-মাইজার, এয়ার হিটার প্রভৃতি। তা ছাড়াও এগুলি বসাবার উপযুক্ত ভিত্তি ও তার উপযুক্ত আচ্ছাদন,—যা সহজে পরিবর্তন করা যায় এবং উদ্ভূত রাসায়নিক গ্যাসে যাতে না নষ্ট হয়ে যায়। বয়লারের জল যেন কড়া না হয়।



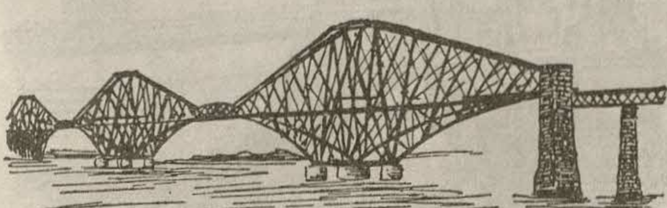
আদিপবের রেলগাড়ী



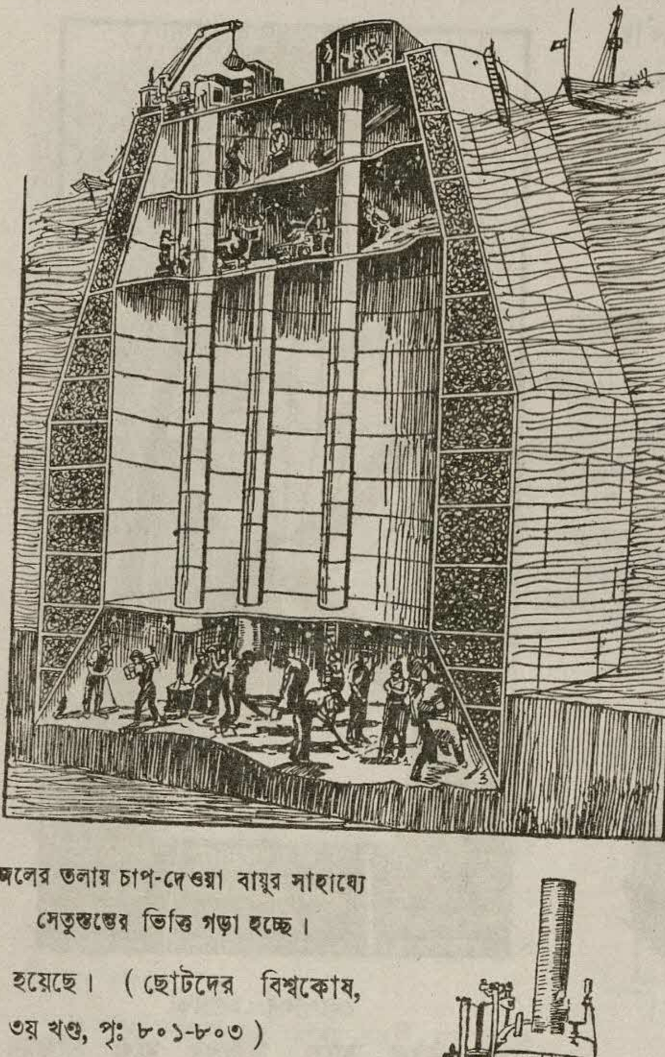
জেপেলিন রেলগাড়ী

কড়া হ'লে তাতে টিউবের মধ্যে আস্তরণ পড়ে যাবে। ফলে সহজে জল গরম হবে না ও আরো নানা রকম অসুবিধা ঘটাবে।

বয়লার থেকে বাষ্প বেরিয়ে কি করে এঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টনকে চালানো হয় এবং কি করে পিস্টনের সমান্ত-রাল গতিকে ফ্লাই হুইলের সঙ্গে যুক্ত করে ঘূর্ণন গতিতে পরি-বর্তিত করা হয় তা আগেই বলা



ফার্থ অব ফোর্থের সেতু



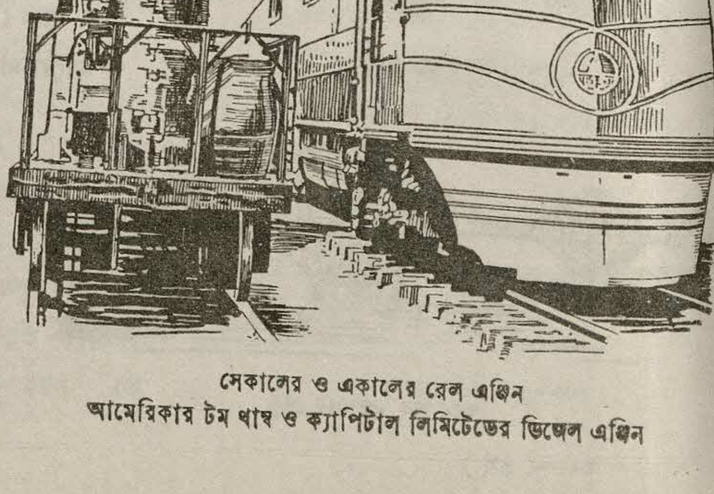
জলের তলায় চাপ-দেওয়া বায়ুর সাহায্যে সেতুস্তম্ভের ভিত্তি গড়া হচ্ছে।

হয়েছে। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮০১-৮০৩)

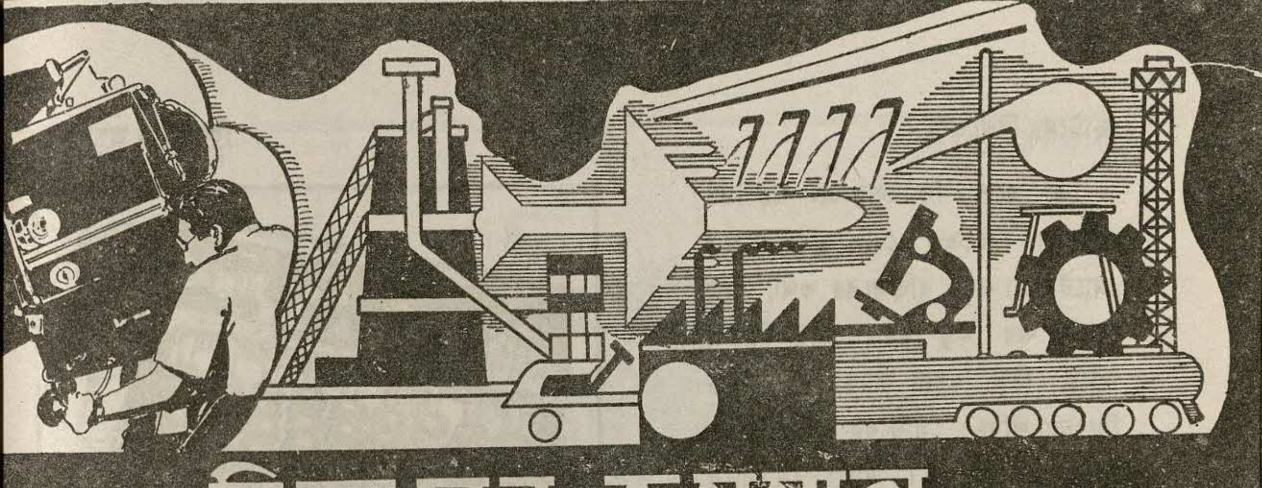
বাষ্পচালিত এঞ্জিনের মত ডিজেল বা পেট্রোলচালিত যন্ত্রের সাহায্যে 'ইন্টারনাল কমবাস্‌শন্‌' এঞ্জিনের আবিষ্কার হয়েছে। অর্থাৎ ডিজেল তেল বা পেট্রোল ভিতরেই বিস্ফোরিত হয়ে পিস্টনগুলি ক্রমান্বয়ে চালাতে থাকে।

ইস্পাত ও সংকর ধাতু

উনবিংশ শতকে, যখন ইস্পাত প্রস্তুতের উন্নতির প্রবাহ নানা দেশে চলতে থাকে, তখনই অ্যালুমিনিয়ামও শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশের চেষ্টা শুরু করে। ১৮৫৭ সালে প্রতি পাউণ্ড ওজনের ঐ ধাতুর দাম ছিল কুড়ি ডলার কিন্তু বর্তমানে তা তার শতকরা চার ভাগে নেমেছে। নানা ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইস্পাতের সঙ্গে নানা ধাতুর মিশ্রণে যে সংকর ধাতুর উৎপত্তি হয় তার টান গ্রহণের শক্তি মূল ইস্পাতের চেয়ে বেশি। আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় এক কোটি টন ইস্পাত ইস্পাতের সংকর ধাতু তৈরি করার কাজে ব্যবহৃত হয়।



সেকালের ও একালের রেল এঞ্জিন
আমেরিকার টম থাম্ব ও ক্যাপিটাল লিমিটেডের ডিজেল এঞ্জিন



বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

আলাদীনের মায়াপ্রদীপ

"আরব্য রজনী" বা আরব্য উপন্যাসের আলাদীনের মায়াপ্রদীপের গল্প আমরা প্রায় সকলেই পড়েছি। ঐ প্রদীপটি ঘষলেই তা থেকে বেরিয়ে আসত এক বিরাট দৈত্য—যে নাকি হুকুম করলেই যে কোন অসম্ভব কাজ হাসিল করে দিত। কিন্তু সে নেহাৎই গল্প। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটাবার সামর্থ্য না থাকলে এই ভাবেই মানুষ চিরকাল কল্পনার সাহায্যে গল্প বানিয়ে তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করে আসছে।

কিন্তু আজকের মানুষ আর শুধু কল্পনা করেই সন্তুষ্ট নয়, তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সে এখন সত্যি সত্যিই বাস্তবে রূপ দিতে শুরু করেছে। ধাপে ধাপে সে এগিয়ে চলেছে। সে চাঁদে পাড়ি দিয়েছে, সেখানে বসতি স্থাপনের কথাও চিন্তা করছে। পাতালপুরীতে—সমুদ্রের নীচে দিনের পর দিন কাটিয়ে আসছে। আলাদীনের দৈত্যও বুঝি আজ তার হাতের মুঠোর মধ্যে।

হ্যাঁ, আলাদীনের দৈত্যই বলব। কারণ একে দিয়ে সেই দৈত্যের মতই নানা অসম্ভব কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। এই আধুনিক দৈত্যের নাম দিয়েছি আমরা কম্পিউটার, কেউ কেউ বাংলায় নাম দিয়েছেন যন্ত্রগণক। তবে কম্পিউটার নামটাই এখন আমাদের কাছে বেশ পরিচিত। ওটাকেই বাংলা শব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে দোষ কি?

এ যুগের যন্ত্রদানব কম্পিউটার

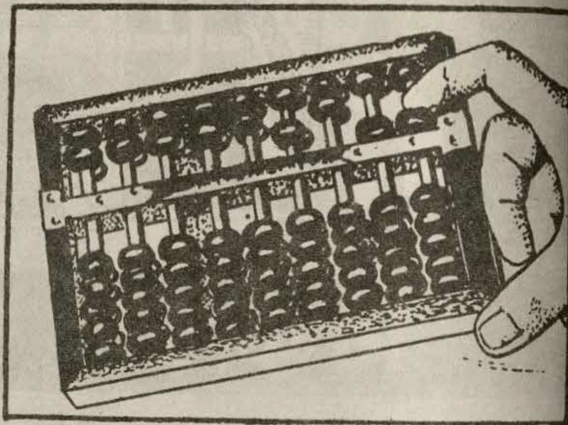
আধুনিক যুগের এই দৈত্যটি কিন্তু আসলে মানুষের হাতে তৈরি একটি যন্ত্র বই আর কিছু নয়। যন্ত্র হলেও অঙ্ক কষতে এর জুড়ি নেই,—বিশেষ করে পাটীগণিতের অঙ্ক। আর সে অঙ্কও এত দ্রুতগতিতে নির্ভুল ভাবে কষে দিতে পারে যে শুনলে বিশ্বাসই হতে চাইবে না। যে অঙ্ক খুব মেধাবী ছাত্রেরও কষতে লাগবে এক মিনিট, সে অঙ্ক এই যন্ত্রদানব করে দেবে এক মিনিটের এক লক্ষ ভাগেরও কম সময়ে। আর এ কাজ সে অনবরত করে যেতে পারে—বছরের পর বছর একটানা ভাবে, একটুও বিশ্রাম না নিয়ে। মানুষের মত এ যন্ত্র কখনো বিরক্ত হয় না, ভুল করে না। একশ' লক্ষ বা কোটি বার কাজ করার পরে ভুলের সংখ্যা হয় বড় জো'র একবার কিংবা তাও নয়।

তা হলে কি বলব এই যন্ত্রদানব মানুষের চাইতেও বেশি বুদ্ধি রাখে? মোটেই তা নয়। বুদ্ধি দূরের কথা, মগজ বলেই ওর কিছু নেই। তাই ওর না আছে চিন্তা করার ক্ষমতা, না আছে বিবেচনা-শক্তি। মানুষের বুদ্ধি নিয়েই তাকে চলতে হয়। মানুষ যে ভাবে তাকে চালায় সেই ভাবেই সে চলে।

কম্পিউটারের ভাষাজ্ঞানও অত্যন্ত সীমিত,—"হ্যাঁ" আর "না" ছাড়া আর কিছুই বোঝে না অর্থাৎ ধরতে পারে না। তাকে দিয়ে কোন কাজ বা অঙ্ক করাতে হলে তার বোধগম্য এই প্রাঞ্জল ভাষাতেই তার কাছে প্রশ্নটি প্রকাশ করতে হবে। তা ছাড়া কম্পিউটারের কোন রকম শেখবার ক্ষমতাও নেই। কয়েক লক্ষবার একই কাজ করার পরেও তাকে আবার প্রথম বারের মত নির্দেশ দিতে হয়।

প্রথম অঙ্ক-কষা কল

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—"নেসেসিটি ইজ্ দি মাদার অব্ ইন্‌ভেন্‌শন্"—প্রয়োজনই হচ্ছে আবিষ্কারের জননী। মানুষের ইতিহাস ঘাঁটলে কথাটা কত বড় সত্য তা বোঝা যায়। প্রথম অঙ্ক-কষা কলও এই রকম প্রয়োজনের খাতিরেই তৈরি হয়েছিল প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, চীনদেশে। এটিকে বলা হয় অ্যাবেকাস (ABACUS) এই যন্ত্রটি পরে বিভিন্ন রূপে প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও সুদূর প্রাচ্যে অ্যাবেকাসের প্রচলন আছে। সহজে গণনা শেখাবার জন্য এই যন্ত্রের ব্যবহার বেশ সুবিধাজনক।



অ্যাবেকাস

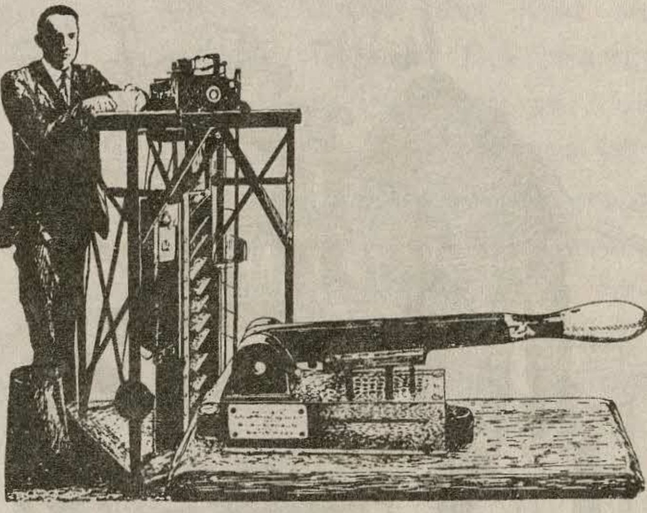
যোগ করার প্রথম 'আধুনিক যন্ত্র'

যোগ করার প্রথম আধুনিক যন্ত্র কিন্তু তৈরি করেছিল একটি উনিশ বছরের ছেলে—প্যাস্কেল। প্যাস্কেলের বাবা ছিলেন ফরাসী শুল্ক বিভাগের একজন কর্মচারী। তাঁকে অনেক কঠিন কঠিন এবং বিরাট বিরাট অঙ্কের হিসেব রাখতে হ'ত। প্যাস্কেল বাবাকে সাহায্য করার জন্য উঠে পড়ে লাগল এবং অনেক মাথা খাটিয়ে শেষে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করার জন্য একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলল। প্যাস্কেলের এই যন্ত্রটিকেই যোগ করার প্রথম আধুনিক যন্ত্র বলা যায়। সে হ'ল ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের কথা।

ইতিমধ্যে গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি পণ্ডিতদের সূত্র আবিষ্কারের ফলে অঙ্কের ব্যবহার বেশ বেড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি অঙ্ক কষার তাগিদও বেড়েছে। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে লিবনিৎজ্ নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী প্যাস্কেলের যন্ত্রটি নিয়ে তার অনেকটা উন্নতি সাধন করলেন। তারও

অনেক দিন পরে আমেরিকায় লোকগণনার জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন হেরমান হলারিথ। সে হ'ল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের কথা।

কিন্তু যুগের চাহিদা মেটাবার জন্য সত্যিকার যন্ত্রগণক বা কম্পিউটার আবিষ্কারের চেষ্টার সূত্রপাত হয় আরও আগে—১৮১২ সাল থেকে। ঐ সময়ে চার্ল্‌স্ ব্যাবেজ এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কারের পরিকল্পনা করেন যা



ইলেকট্রিক ট্যাবুলেটিং মেশিন

দু'টি ৫০ রাশির যোগফল এক সেকেণ্ডে এবং দু'টি ২০ রাশির গুণফল ৩ মিনিটে করে ফেলবে আশা করা হয়েছিল। তিনি এর জন্য দু'টি যন্ত্রের কথা ভেবেছিলেন আর তার নাম দিয়েছিলেন ডিফারেন্স এঞ্জিন আর অ্যানালিটি-ক্যাল এঞ্জিন। ব্যাবেজ কিন্তু তাঁর কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি, তবে আধুনিক কম্পিউটারের সূত্রপাত যে তাঁরই হাতে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটার

আধুনিক যে যন্ত্রগণক,—যাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক কম্পিউটার,—তার জন্ম হয় ১৯৪৩ সালে, ২য় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন গোলন্দাজ বাহিনীর প্রয়োজনে। ১৯৪৬ সালের মধ্যেই সেই শিশু কম্পিউটার সেকেণ্ডে ৪,৫০০টি যোগ করার ক্ষমতা অর্জন করে। সেই শিশু কম্পিউটার আজ তার যৌবনগর্বে দীপ্ত।

একটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের কাজের পদ্ধতির সঙ্গে কোনও সদাগরী অফিসের কর্ম-চারীর কর্মসূচীর তুলনা করা যেতে পারে। ধরা যাক কোনও কর্মচারীর কাজ হ'ল অফিসে যদি ২০০ জন্য লোক থাকে তবে তাদের নাম, ধাম, বয়স, মাতৃভাষা, মাইনে, কে কতদিন সময়মত অফিসে এসেছে, কার কতদিন কামাই হয়েছে ইত্যাদি খবরা-খবরের হিসের রাখা। এই কাজটি সুষ্ঠু ভাবে করতে হলে কর্মচারীটিকে এই ভাবে কাজ করে যেতে হবে : (১) প্রথমে তিনি প্রতিটি লোকের দৈনন্দিন হাজিরা খাতাটি নেবেন। (২) তার পর নেবেন সেই খাতাটি যার মধ্যে সকলকার নাম, ধাম, বয়স ইত্যাদি লেখা আছে—যাকে বলা হয় স্থায়ী খবর, (৩) তার পর তাঁর স্মৃতিতে তিনি মনে মনে গুছিয়ে নেবেন যদি এ বিষয়ে কিছু জানা থাকে। (৪) এর পর হিসেব নিকেশের জন্য একটি খাতা নেবেন। (৫) তার পর একটি কাগজে প্রয়োজনীয় খবর দিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবেন। (৬) এ ছাড়াও পুরো কাজটি



ব্যাবেজের ডিফারেন্স এঞ্জিন

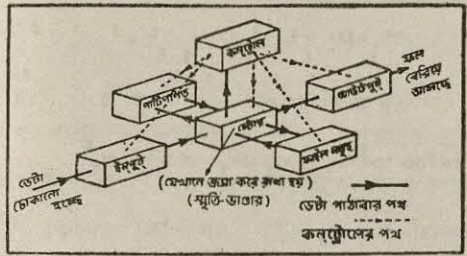
করার জন্য সমস্ত নিয়মাবলী বইগুলি কাছে রাখবেন।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটারও ঠিক ঐ ভাবে কাজ করে। পরপৃষ্ঠার ছবি দু'টি দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। যে কোন কম্পিউটারের প্রধান কাজ হ'ল খুব দ্রুত এবং নির্ভুল ভাবে অঙ্ক কষা। কিন্তু প্রতিবারই অঙ্ক কষার সময়ে যদি কম্পিউটারকে বাইরের নির্দেশ নিতে হয় তবে কাজ তাড়াতাড়ি চলবে কি করে? তাই সদাগরী অফিসের কর্মচারীটির মত কম্পিউটারেরও একটি স্মৃতিভাণ্ডার আছে—যাকে বলা হয় কম্পিউটারের মেমারি (স্মৃতি) বা স্টোরেজ, অর্থাৎ যেখানে তথ্যগুলো,—যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ডেটা,—জমা করে রাখা হয়। ডেটা ছাড়াও দু' রকম খবর জমা থাকে এখানে। তাদের বলা হয় সংখ্যাবলী বা এরিথমেটিক (পাটীগণিত) ইউনিট (যা নাকি কর্মচারীটির অঙ্ক কষার খাতার সঙ্গে তুলনীয়), এবং অঙ্ক কষার পরে উত্তর এবং পরবর্তী কর্মসূচীর নির্দেশ (যাকে বলা হয় প্রোগ্রাম)।

কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশে খবর এবং নির্দেশ আদানপ্রদানের জন্য 'কন্‌ট্রোল' নামে এক বৈদ্যুতিক জাল বিছানো থাকে। এর কাজ হ'ল কম্পিউটারকে যে ভাষায় কথা বলা হয় তার অর্থ উদ্ধার করে বৈদ্যুতিক ভাষায় তাকে নিয়ে যাওয়া, যাতে অন্যান্য অংশগুলি থেকে যথাযথ খবর এসে পৌঁছয় তার খবরদারি করা, এবং উত্তর তৈরি হবার পর সেগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া। কন্‌ট্রোল যে ক'টি অংশের ওপর প্রভাব রাখে তা পরপৃষ্ঠার ছবিতে ভগ্নরেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে।

কম্পিউটার কি ভাবে কাজ করে

কম্পিউটার চালাবার প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হয় প্রোগ্রামার। প্রোগ্রামারকেই ঠিক করতে হবে প্রবলেম (সমস্যা) বা অঙ্কটিকে কি ভাবে গুছিয়ে নিতে হবে এবং কি ভাবে তথ্যগুলি সাজিয়ে নিয়ে কম্পিউটারে দিতে হবে। তথ্যগুলি টাইপ রাইটার জাতীয় একটি যন্ত্রে ফেলে সেটিকে একটি দ্রুত চলন্ত চৌম্বক ফিতের ওপর ম্যাগনেটিক বিট্‌-এ (বাংলায় চৌম্বক আঘাত বলা যেতে পারে) রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়। ফিতে খুললেই এই বিট্‌গুলো আর একটি যন্ত্রে এসে বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা পাল্‌স্ জাগাতে শুরু করে। এই স্পন্দন

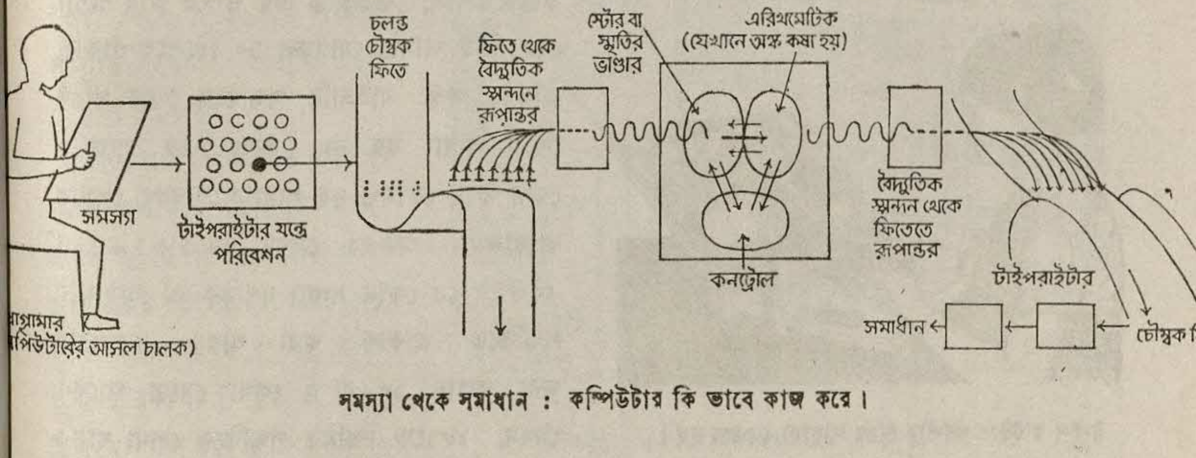


কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ

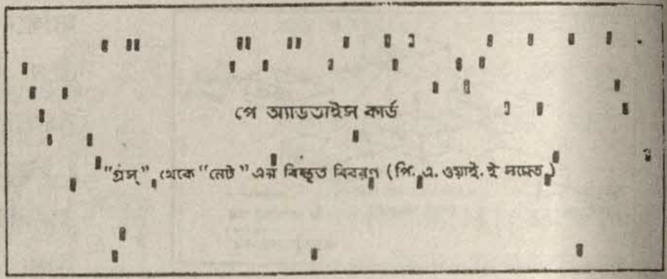
বিট্‌গুলোর সঙ্গে ঠিক ঠিক সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়,—অর্থাৎ বলা যেতে পারে ঠিক যেন ওকে বিদ্যুতের ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। এর পরই ঐ স্পন্দন আসল কম্পিউটার যন্ত্রে গিয়ে ঢোকে,—যেখানে আছে স্টোরেজ বা মেমারি, —যাকে আমরা কম্পিউটারের স্মৃতিভাণ্ডার বলেছি, এরিথমেটিক (পাটীগণিত) এবং কন্‌ট্রোল। এইখানেই অঙ্ক বা প্রবলেমটা সত্যিকার কষা হয়ে যায়।

কম্পিউটার থেকে উত্তরটা বেরিয়ে আসে ঐ বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা পাল্‌সের আকারে। কাজেই সেটাকে আবার নিয়ে আসা হয় আগের মত আর একটি যন্ত্রে, যেখানে সেগুলি আবার বিট্‌-এ রূপান্তরিত হয়ে আর একটা ম্যাগনেটিক টেপ বা চৌম্বক ফিতের ওপর এসে পড়ে। এবার সেই ফিতে থেকে তাকে সহজবোধ্য ভাষায় নিয়ে আসা হয়। তথ্য (ইন্‌পুট) ঢোকাবার সময় যে রকম টাইপ রাইটার জাতীয় যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল উত্তর (আউটপুট) বার করে আনবার সময়েও সাধারণতঃ সেই রকম একটা টাইপ রাইটার জাতীয় যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। **স্বয়ংক্রিয় টাইপ রাইটার**। অর্থাৎ ওতে ফিতে থেকে **আপনা আপনি টাইপ** রাইটারে লেখা হয়ে যায়। **সময় সময় টাইপ** রাইটারের বদলে দ্রুতগতি প্রিন্টার যন্ত্রে লাইনকে লাইন ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে—মিনিটে ৬০০ লাইন।

ম্যাগনেটিক টেপের (চৌম্বক ফিতে) বদলে ছিদ্রযুক্ত শক্ত কাগজের,—যাকে বলা হয় পাঞ্চ্‌ড্‌ কার্ড,—সাহায্য নিয়েও কম্পিউটারে নির্দেশ দেওয়া যায়। ঐ ফুটোগুলোর অবস্থানের ওপর কম্পিউটার নির্দেশ গ্রহণ করে। এই কার্ডগুলো সাধারণতঃ লম্বায় ৭⅜ ইঞ্চি আর চওড়ায় ৩¼ ইঞ্চি হয় এবং পর পর ৮০টি সারিতে ভাগ করা থাকে। প্রতিটি সারিতে ১২ টি করে "অবস্থান"



সমস্যা থেকে সমাধান : কম্পিউটার কি ভাবে কাজ করে।

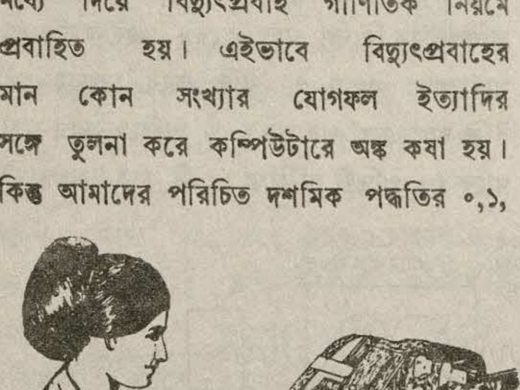


ব্যবহৃত 'পাঞ্চ্‌ড্‌ কার্ড' বা ছিদ্রযুক্ত শক্ত কাগজের নমুনা

আছে যেখানে ছিদ্র করা যেতে পারে। এই ছিদ্রগুলোর বিভিন্ন অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটার তার ভাষা ঠিক বুঝে নিতে পারে। সাধারণতঃ এই রকম কার্ডে কম্পিউটার মিনিটে ৬০০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত পড়তে পারে। ছোটখাট ব্যাপারে এই রকম পাঞ্চ্‌ড্‌ কার্ডই ব্যবহার করা হয়।

বৈদ্যুতিক পাটীগণিত

যন্ত্রের চিন্তাশক্তি নেই অথচ অঙ্ক কষতে পারে শুনে সত্যিই একটু অবাক্ লাগে। একটু খোঁজ নিয়ে দেখা যাক কম্পিউটার কি করে অঙ্ক কষে। কম্পিউটারের মধ্যে বিশেষ ভাবে বিন্যস্ত থাকে বৈদ্যুতিক সুইচ আর তারের জাল। এই সমস্ত তার এবং সুইচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ গাণিতিক নিয়মে প্রবাহিত হয়। এইভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহের মান কোন সংখ্যার যোগফল ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে কম্পিউটারে অঙ্ক কষা হয়। কিন্তু আমাদের পরিচিত দশমিক পদ্ধতির ০,১,



টাইপ রাইটার জাতীয় যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়।

২, ৩…৯ সংখ্যাগুলি কম্পিউটার বুঝতে পারে না। কম্পিউটারের 'তার' এবং 'সুইচ' কেবল বোঝে তাদের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ 'আছে' অথবা 'নেই'। যেমন বাড়ীতে ইলেকট্রিক বাল্‌বের কেবল দু'টি অবস্থাই সম্ভব—হয় বাতি জ্বলে অথবা নিবে থাকে। এই রকম 'হ্যাঁ' এবং 'না'-এর যে প্রাঞ্জল বৈদ্যুতিক ভাষা কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয় তাকে বলে বাইনারি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কেবল দু'টি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়—০ ও ১। বোঝাই যাচ্ছে ০ মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ নেই অর্থাৎ বাতি নেবানো এবং ১ মানে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ বাতি জ্বলছে।

দশমিকের সঙ্গে বাইনারি পদ্ধতি তুলনা করা যাক। দশমিকে ১এর সঙ্গে ৯ যোগ করতে গেলে, যেহেতু ৯ এর ওপরে আর সংখ্যা নেই, তাই আমরা যোগফল ১০ হিসেবে প্রকাশ করি। কিন্তু বাইনারি পদ্ধতিতে ১এর গরিষ্ঠ কোন সংখ্যা হয় না; অথচ ১এর সঙ্গে ১ যোগ করে কোনও দুই সংখ্যার যোগফল লেখার প্রয়োজন। অতএব লেখা হয় ১+১=১০। এইভাবে যে কোন সংখ্যা দশমিক বা বাইনারি পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায়। বোঝবার জন্য তলায় ১০ বা ২ লেখা যেতে পারে। যেমন, ১৮১কে দশমিক পদ্ধতিতে লেখা যায়ঃ

$$১৮১_{১০} = ১ \times ১০^{২} + ৮ \times ১০^{১} + ১ \times ১০^{০}$$
$$= ১ \times ১০০ + ৮ \times ১০ + ১ \times ১$$

কিন্তু বাইনারি পদ্ধতিতে ১৮১ বোঝাতে হলে ১৮১কে ক্রমাগত ২ দিয়ে ভাগ করে যেতে হবে। যদি কোনও ভাগশেষ থাকে তবে ১ লিখতে হবে, আর ভাগশেষ না থাকলে ০, তার পর সর্বশেষ প্রাপ্ত ভাগফল থেকে শুরু করে যথাক্রমে প্রথম ভাগশেষ পর্যন্ত আসতে হবে। যেমন:

	ভাগশেষ
২) ১৮১	১
২) ৯০	০
২) ৪৫	১
২) ২২	০
২) ১১	১
২) ৫	১
২) ২	০
১	১

অর্থাৎ $১৮১_{২} = ১০১১০১০১$

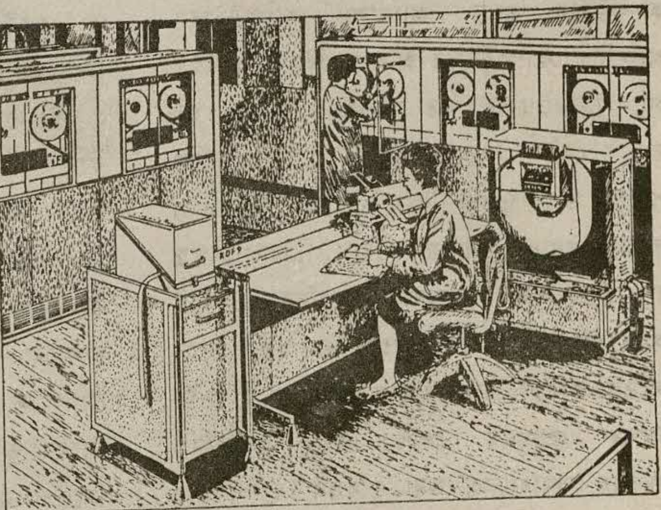
এইভাবে ৩এর বাইনারি সংখ্যা হবে ১১, ৪এর ১০০, ১০এর ১০১০। দশমিকে যেটাকে লেখা হবে ১০২৩, বাইনারি সংখ্যায় সেটা লিখতে হবে ১ ১১১ ১১১ ১১১।

বাইনারি পদ্ধতিতে যোগের নিয়ম দশমিক পদ্ধতিরই মতন, প্রথম ও দ্বিতীয় বাইনারি সংখ্যা দু'টি একই রকমের (০, ০ বা ১, ১) হলে যোগফল হবে ০, সংখ্যা দু'টি দু'রকমের (০, ১ বা ১, ০) হলে যোগফল হবে ১। $০+০=০$, $০+১=১$, $১+০=১$, $১+১=০$

বৈদ্যুতিক আলো জ্বলার ব্যাপারেও ঠিক এই রকম হয়। কোন বৈদ্যুতিক শক্তি সুইচ এবং তারের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত করা প্রয়োজন। যখন সুইচ অফ্ থাকে তখন বিদ্যুৎপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ বাতি জ্বলে না।

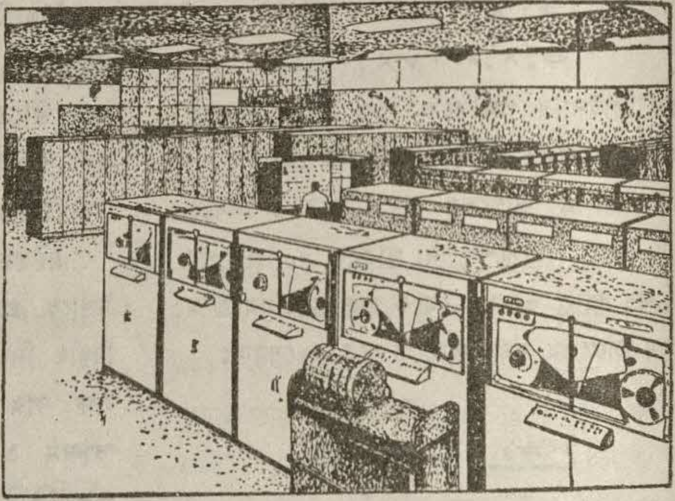
এইভাবে বাইনারি পদ্ধতির অঙ্ক বৈদ্যুতিক উপায়ে প্রকাশ করা যায়। কম্পিউটারে অবশ্য বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে না এসে সেকেণ্ডে দশ লক্ষ বার পর্যন্ত স্পন্দন উৎপন্ন হয়। একটি স্পন্দন ১ বোঝায় এবং নির্ধারিত স্পন্দনের অনুপস্থিতি ০ বোঝায়। এই বৈদ্যুতিক স্পন্দন এবং বাইনারি পদ্ধতির সাহায্যে একই ভাবে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা সম্ভব।

কম্পিউটারের নির্দেশাবলী বাইনারি পদ্ধতিতে পাঞ্চ্‌ড্ কার্ডে বা ম্যাগনেটিক টেপের সাহায্যে স্টোর (বা স্টোরেজ) বা মেমারিতে কি করে জমা রাখা হয় তা তো আগেই বলেছি। বর্তমানে ২০০০ থেকে ১,৩০০০০টি



কম্পিউটার যন্ত্রে কাজ চলছে, সঙ্গে রয়েছে চৌম্বক ফিতে।

নির্দেশ এইভাবে জমা রাখা সম্ভব। প্রতিবার অঙ্ক কষার সময়ে কম্পিউটার এই স্টোরে রাখা নির্দেশাবলী বা প্রোগ্রাম ব্যবহার করে। এইভাবে যে কোনও জটিল প্রশ্ন বা অঙ্ক যদি কম্পিউটারের বোধগম্য প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করে নির্দেশ বা প্রোগ্রাম তৈরি করা যায় তবে কম্পিউটার সেই সব প্রশ্নের উত্তর বিদ্যুতের বেগে (প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ মাইল) কষে আবার সাধারণ গতিতে বলে দিতে পারে।



একটি অতিকায় কম্পিউটার

দু'রকম কম্পিউটার

এতক্ষণ আমরা যে কম্পিউটারের কথা বললাম তাকে বলা হয় ডিজিটাল কম্পিউটার (ডিজিট=সংখ্যা)। আর এক রকম কম্পিউটার হচ্ছে অ্যানালগ্ কম্পিউটার। অ্যানালগ কম্পিউটারে অবিরাম বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, ডিজিটালের মত স্পন্দনে প্রবাহিত হয় না। সেই বিদ্যুৎপ্রবাহের মানের সঙ্গে পরোক্ষ ভাবে তুলনা করে কোনও প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদির ক্ষেত্রেই অ্যানালগ্ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। তবে বিভিন্ন কারণে সুবিধার জন্য ডিজিটাল কম্পিউটারের প্রচলনই বেশি। কিছু বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানের জন্য দু'রকম কম্পিউটার মিশিয়ে তৈরি হাইব্রিড কম্পিউটারও আজকাল ব্যবহার করা হচ্ছে।

কম্পিউটার অসাধ্য সাধন করতে পারে

কম্পিউটারের ক্ষমতার কথা ভাবলে সত্যি অবাক্ লাগে। ১০ লক্ষ বড় বড় হিসেব ৫।৭ মিনিটের মধ্যে নির্ভুল ভাবে কষে দেওয়া অসাধ্যসাধন বৈ কি! একবার একটা জটিল অঙ্ক, যা একজন মানুষের কষতে ১০০ বছর লাগত, তা একটা বড় কম্পিউটার ২ সপ্তাহে করে দিয়েছিল। আসলে অঙ্কটা কষতে তার লেগেছিল ২ ঘণ্টা মাত্র। বাকি সময়টা লেগেছিল যোগাড়যন্ত্র করে সাজিয়েগুছিয়ে নিতে। কত রকম হিসেব-পত্রই না তাকে দিয়ে বিজ্ঞানীরা করাচ্ছেন! পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইন, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, কল-কারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য চালানো—সর্বত্র আজ খুঁটিনাটি খবর কম্পিউটার যোগাচ্ছে। মহাকাশ-জয়ের ব্যাপারে কম্পিউটারের ভূমিকা কে না জানে? কম্পিউটারের নির্দেশ না পেলে মানুষের পক্ষে চাঁদে যাওয়াও সম্ভব হ'ত না, মঙ্গল, শুক্র বা বৃহস্পতির রহস্য সন্ধানে রকেট পাঠানোও সম্ভব হ'ত না।



দেশবিদেশের রূপকথা

পোল্যাণ্ডের রূপকথা : কুকুর, বেড়াল আর ইঁদুরের গল্প

এক ছিল কুকুর। তার বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার, জায়গা-জমির অন্ত নেই। কিন্তু কুকুরের আর ভালো লাগে না। সে ভাবল একবার দেশভ্রমণ করে এলে মন্দ হয় না। তার নায়েব ছিল এক বেড়াল। কুকুর তাকে বলল : তুমি জমিদারী দেখাশোনা কর, আমি কিছুদিন দেশভ্রমণ করে আসি। এই বলে বেড়ালের ওপর সব ভার দিয়ে কুকুর বেরিয়ে পড়ল।

বেড়াল ভাবল : সারা বছর খাটুনির শেষ নেই। এইবার মনিব মশাই একটু চোখের আড়াল হয়েছেন, যাই দিনকতক দেশ থেকে ঘুরে, খেয়েদেয়ে জিরিয়ে আসি গে।

সে তখন জমিদারির দরোয়ান ইঁদুরকে ডেকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে দেশে চলে গেল।

আর এদিকে ইঁদুর বেচারার কাজের পাহাড় জমল। নিজের কাজ, নায়েব-জমিদারের কাজ। তার হাঁপ ফেলার যো নেই।

ইঁদুর ভাবলে : দূর হোক্ গে যা! রোজই কাজ আর কাজ! কামাই হলে অমনি শাস্তি। এখন আর কে দেখবে আমায়? যাই, একটু আরাম করে ঘুমিয়ে নিই গে।

দিনের পর দিন যায়। ইঁদুর ঘুমোতে লাগল। সেই অবসরে দলে দলে--ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে ক্ষেতের ফসল খেয়ে চলে গেল। যখন ক্ষেত-খামার একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন দেশভ্রমণ শেষ করে কুকুর তার জমিদারিতে ফিরল। কুকুর এসে দেখে জমি শূন্য। ফসল উধাও।

কুকুর ডাকল বেড়ালকে। বেড়াল দেশ থেকে সবে ফিরেছে। খবর পেয়ে সব দেখে-শুনে সে ছুটল ইঁদুরের ঘুম ভাঙাতে। ঘুম ভেঙে উঠে ইঁদুর দেখে সর্বনাশ! ক্ষেত-খামারের এ কী দশা!

প্রাণের ভয়ে ইঁদুর তখন দৌড়তে লাগল। বেড়ালও তাকে তাড়া করল, কিন্তু ধরতে পারল না।

সব শুনে কুকুর বলল : ও-সব জানি না।



"মাটিতে একবার নামো না!"

তোমাকে পাহারা রেখে আমি বেরিয়েছিলাম, এখন সব দায় তোমার।

এই বলে কুকুর বেড়ালের ওপর লাফিয়ে পড়ল। বেড়ালও ছুটতে শুরু করে দিল। কুকুরের সঙ্গে বেড়াল আর পারে না। সে লাফিয়ে একটা গাছে উঠল। কুকুর তো গাছে উঠতে পারে না, সে মাটিতে দাঁড়িয়ে বলল: মাটিতে একবার নামো না, তোমার ঘাড়ে আর মাথা থাকবে না।

সেই থেকে ইঁদুরের শত্রু বেড়াল, আর কুকুর হ'ল বেড়ালের শত্রু।

এস্কিমোদের রূপকথা: বদ্‌মেজাজি বুড়ো

এক গাঁয়ে এক বদ্‌মেজাজি বুড়ো থাকত। একদিন সে শিকারে নামল। বরফের স্তূপে সারা দেশ ভরে আছে। মাঝে মাঝে সীল দেখা যায়। এই সময় গ্রামের লোকেরা 'হারপুন' দিয়ে সীল শিকার করে। ধারালো ছুঁচের মতো 'হারপুন' ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারলে সীলগুলো মরে যায়। তখন সেই সীলের মাংস খাওয়া হয়। বুড়োর শরীরে জোর কম। শিকারও তাই হাত ফস্কে যেতে লাগল।

বুড়োর কাণ্ড দেখে ছেলের দল মজা করছে আর বুড়োকে খ্যাপাচ্ছে।

রাগে গর গর করতে করতে বুড়ো বললে, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।

এই বলে সে গাঁয়ের ছেলেদের ধরে একটা পাহাড়ের গুহায় রাখল বন্দী করে। গুহার মুখটা বন্ধ। ছেলেদের কান্না তাই শোনা গেল না। তারা সেই পাথরের ভিতর রইল আট্‌কা পড়ে।

গুহার গায়ে একটা ফুটো ছিল। একদিন সেই ফুটো দিয়ে ছোট ছেলের কান্না শোনা যেতে লাগল। কান্না শুনে পাখিদের দয়া হ'ল। তারা একটু একটু খাবার এনে ফেলে দিতে লাগল। ছোটরা তাই খেয়ে দিন কাটায়। শেষকালে একদল পরী সেই ফুটো দিয়ে ঢুকল গুহার ভিতর। তারপর তারা ছেলেদের বাইরে বার করে নিয়ে এল।

এদিকে গ্রামের লোক ভেবে অস্থির কোথায় গেল তাদের ছেলেরা! তারা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেল। এমন সময় ছেলের দল এসে দেখা দিল।

ওদের কাছ থেকেই সব খবর পাওয়া গেল।

তখন গ্রামের লোকদের সে কি মূর্তি! তারা বুড়োকে এই মারে তো সেই মারে। সকলে মিলে লাঠি সোঁটা নিয়ে বুড়োকে তাড়া



সেই দৃশ্য দেখে পরীদের ভারি মায়া হ'ল।

করেছে, আর প্রাণের ভয়ে বুড়ো ছুটছে। তখন সেই দৃশ্য দেখে পরীদের ভারি মায়া হ'ল। বুড়োকে তারা শূন্যে তুলে নিয়ে আকাশের তারা বানিয়ে ফেলল। সেই থেকে সেই বদ্-মেজাজি বুড়ো শুকতারা হয়ে রইল আকাশে। আর, তারা হয়েও, আজও সে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকে গাঁয়ের মানুষগুলোর দিকে।

স্পেন দেশের রূপকথা : চাষার ছেলে ও রাজকন্যা

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল এক পরমাসুন্দরী কন্যা।

সেই দেশে হঠাৎ এল এক যাদুকর। সেই যাদুকর হাওয়ায় ঝোলানো, আকাশে হেলান দেওয়া এক বাড়ি তৈরি করে তাতে বাস করতে লাগল। রাজ্যের সকলে অবাক্ হয়ে সেই বাড়ি দেখে।

একদিন রাজকন্যা সেই বাড়ি দেখছে। এমন সময় যাদুকর এসে তাকে তুলে নিয়ে তার ঝোলানো বাড়ির মধ্যে রেখে দিল।

সারা রাজ্যে হৈ হৈ, কান্না-কাটি। কে রাজকন্যাকে উদ্ধার করবে? রাজার হুকুমে রাজ্যের কারিগররা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মই তৈরি করল। কিন্তু সেই মই নিয়ে যাদুকরের ঝোলানো বাড়ির কাছে যেই যাওয়া হয় তখনি সেই বাড়ি আরও উঁচুতে উঠে যায়। মই আর তার গায়ে ঠেকে না।

রাজা তখন জানিয়ে দিলেন, যে ঐ ঝোলানো বাড়ি থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে পারবে তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দেবেন।

কেউ আর এ-কাজ পারে না, শেষে একজন চাষার ছেলে সাহস করে এগিয়ে এল। চাষার ছেলে তার ধারালো তীরের পেছনে একটা লম্বা দড়ি লাগিয়ে নিল। সেই দড়িশুদ্ধ তীর সে ছুঁড়ল যাদুকরের বাড়ির দিকে। তীর গিয়ে বিঁধল ঝোলানো বাড়ির গায়ে, আর চাষার ছেলে সেই দড়ি বেয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকল। তারপর, যেই না তার দেখা হয়েছে যাদুকরের সঙ্গে, অমনি তলোয়ারের এক কোপে সে যাদুকরের মাথাটা কেটে ফেলল। তারপর এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে চাষার ছেলে রাজকন্যাকে



রাজকন্যা দড়ির সাহায্যে নামছে।

বার করল। এখন, রাজকন্যাকে নামাবে কি করে? চাষার ছেলে তার কোমরে দড়িটা বেঁধে সেটাকে মাটিতে নামিয়ে দড়ির মাথাটা রইল ধরে। রাজকন্যা নেমে গেলে ঐ দড়ির সাহায্যে সেও নামবে।

এদিকে রাজকন্যা যখন মাটিতে নামল তখন একটি দুষ্টু লোক সব কিছু দেখে ফেলেছে। সেই দুষ্টু লোকটি রাজকন্যার কোমরে বাঁধা দড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দড়িটা দু'খানা ক'রে ফেলল, তারপর রাজকন্যাকে নিয়ে রাজার কাছে গিয়ে বলল সে-ই যাদুকরের কাছ থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে এনেছে। রাজামশাই শুনে খুব খুশি হয়ে সেই লোকটির সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে দেবেন ঠিক করলেন।

ওদিকে চাষার ছেলে দড়িতে টান দিয়ে দেখল তার অনেকটা পুড়ে গেছে। কাজেই সে কি করে নামবে? সে যাদুকরের ঝোলানো বাড়িতেই রয়ে গেল। তারপর সারা বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে একদিন তার হাতে পড়ল কতগুলো যন্ত্রপাতি, কলকব্জা। সেগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখল তাই দিয়ে বাড়িটা নামানো-ওঠানো যায়। এমনি করে সে নিজে নিজেই ওই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শিখে গেল।

তারপর, যেদিন ঐ দুষ্টু লোকটির সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হচ্ছে, সেদিন চাষার ছেলে তার কলকব্জা নেড়ে বাড়িটাকে নামিয়ে আনল একেবারে বিয়ের সভায়। সকলে চমকে উঠল। সেই বাড়ি থেকে চাষার ছেলেকে নামতে দেখে দুষ্টু লোকটি বিয়ের আসন থেকে পালিয়ে গেল। চাষার ছেলে তখন রাজামশাইকে বলল সে-ই রাজকন্যাকে যাদুকরের কাছ থেকে উদ্ধার করে এনেছে।

রাজামশাই প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। তারপর রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করতেই জানলেন যে চাষার ছেলের কথাই ঠিক। রাজকন্যা ভয়ে এতদিন কিছু বলে নি।

তখন আর কি! রাজকন্যার সঙ্গে চাষার ছেলের ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। অর্ধেক রাজত্বও পেল সে।

জাপানী রূপকথা : ভূতে-পাওয়া কেটলি

অনেকদিন আগে জাপানে কদজুকি প্রদেশে তাতেবায়াসী নামে একটি শহরে মরিনজী-দেবতার মন্দির ছিল।

মন্দিরের যিনি প্রধান পুরোহিত ছিলেন তিনি জাপানের রীতি অনুযায়ী 'চা-পর্বের' ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন। প্রতিদিন ঐ মরিনজী-মন্দিরে চা-পর্ব চলত।

একদিন প্রধান পুরুত মশায় একটি নতুন চায়ের কেটলি কিনলেন। কেটলিটার গড়নও যেমন চমৎকার, তার রংটাও তেমনি সুন্দর। পুরুত মশায় হাতে নিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন আর ভাবলেন, ভালোই হ'ল, পাঁচজনকে ডেকে একটি বড় করে 'চা-পর্ব' করা যাবে, আর তখন কেটলিটা দেখিয়ে সকলকে অবাক্ করে দেওয়া যাবে।

ভাবতে ভাবতে তাঁর কেমন যেন তন্দ্রা এসে গেল। তিনি তাঁর সামনের জলচৌকিটার ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পুরুত মশায় ঘুমোবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। তাঁর পাশে একটি ছোট্ট টুলে রাখা হয়েছিল কেটলিটা, সেটা যেন একটু নড়ে উঠল। তারপর, আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, কেটলিটার চারটে পা, ল্যাজ আর বেজির মত একটি মুখ দেখা গেল। পা-ওলা কেটলিটা টুল থেকে নেমে মাদুর-পাতা সারা ঘরটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কেটলিটা নড়ে চড়ে বেড়াতে তার ঢাকনিটায় শব্দ হতে লাগল। পাশের ঘরে ছিল পুরুত মশায়ের দু'জন শিষ্য। তারা পুরুত মশায়ের ঘরে ঝুন্‌-ঝান্‌ শব্দ শুনে এসে দেখে, অদ্ভুত কাণ্ড। পুরুত মশায়ের কেনা নতুন কেটলিটি পায়ে হেঁটে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে!

একজন দেখে ভয় পেয়ে গেল, বলল, কেটলিটাকে ভূতে পেয়েছে।

আর একজনের খুব মজা লাগল, বা-রে মজার কেটলি! দিব্যি কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ভূত! ভূত! প্রথম শিষ্য বলল,—নিশ্চয়ই কেটলিটার মধ্যে ভূত আছে।

দূর্ বোকা!—দ্বিতীয় জন তাকে ধমক দিল, —দেবতার মন্দিরে কখনো ভূত আসতে পারে? থাক, পুরুত মশায়কে ডাকা যাক।

তাই ডাকা যাক।

দু'জনেই তখন ডাকতে লাগল, ও পুরুত মশায়, ও পুরুত মশায়, শীগ গির উঠুন। দেখুন আপনার কেটলি কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ডাক শুনে পুরুত মশায় ধড়ফড় করে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করলেন,—কী ব্যাপার?

কিন্তু ততক্ষণে কেটলিটা ভালোমানুষের মত আবার সেই টুলের ওপরে উঠে আগের মতই পড়ে রইল।

দেখে শিষ্য দু'জন অবাক্‌ও হ'ল, অপ্রস্তুতও হ'ল। তাই তো-তো করতে করতে বলল, মানে—মানে ঐ যে কেটলিটা না,—ওটা ঘরময়, হ্যাঁ, এই ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল!

শুনে পুরুত মশায় রেগে উঠলেন। —তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? না নেশা করেছ? কেটলি কি চলে বেড়াতে পারে? অযথা আমার ঘুমটা ভাঙালে। যাও, বেরিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।

তখন শিষ্য দু'জন আর কী করবে। দু'জনে দু'জনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে বোকার মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবশ্য সন্ধ্যেবেলায় পুরুত মশায় একলা তাঁর ঘরে কেটলিটাতে জল ভরে উনুনে চড়িয়ে দিলেন চা তৈরি করবার জন্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে কেটলিটা উনুন থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে চেঁচাতে লাগল, উঃ, পুড়ে গেলাম, মরে গেলাম। কী গরম!

কেটলির কাণ্ড দেখে পুরুত মশায় এবার

সত্যিই অবাক্ হলেন। তাই তো, কেটলিটাকে তো ভূতেই পেয়েছে! ওদিকে আওয়াজ শুনে শিষ্য দু'জন ছুটে এল পুরুত মশায়ের ঘরে। কিন্তু তারা এবার কেটলির পা বা ল্যাজ বা মুখ কিছুই দেখতে পেল না। তারা তখন কেটলিটাকে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল, বাজাল কয়েকবার—তাতে শুধু ঠুং ঠাং আওয়াজই হতে লাগল।

পুরুত মশায় বললেন,—না, এ ভূতে-পাওয়া কেটলিটাকে বিদায় করা দরকার। কালই তোমরা গিয়ে পুরোনো মালপত্র যারা কেনে, তাদের একজনকে ডেকে এনো।

তাই হ'ল।

পুরোনো বাসনওলা এসে কেটলিটাকে দেখে জিজ্ঞেস করল পুরুত মশায়কে,—এমন সুন্দর কেটলিটাকে বিক্রি করবেন কেন?

পুরুত মশায় বললেন, আমি একটা বড় ভালো কেটলি কিনেছি, তাই এটা বিক্রি করতে চাই।

বেশ, তবে দিন।—বাসনওলা বলল,—তবে এর জন্যে আমি চল্লিশ সেন (জাপানী একশ' সেন-এ এক ইয়েন) দিতে পারি।

তাই দাও।—পুরুত মশায় রাজী হলেন।

বাসনওলা সুন্দর নতুন কেটলিটাকে সস্তায় কিনতে পেরে খুশি হয়ে বাড়ী এল। রাত্রে মাথার কাছে কেটলিটা রেখে বাসনওলা সবে চোখটা বুজেছে, এমন সময় মনে হ'ল তার বালিশের কাছ থেকে কে যেন বলছে, বাসনওলা, ও বাসনওলা, ওঠ, শোন আমার কথা।

বাসনওলা তো তড়াক্ করে উঠে বসল। অবাক্ হয়ে দেখে, নতুন-কেনা কেটলিটা ল্যাজ-পা-মুখ বার করে বলছে, তুমি তো আমাকে আজ মরিনজী-মন্দির থেকে কিনে এনেছ, তা ভালোই করেছ। আমি খুব পয়মন্ত। তুমি আমাকে যত্ন করে রাখ, ভালো খেতে দাও, তবে আমিও তোমার উপকার করব। জান, মরিনজী-মন্দিরের পুরুত মশায় আমাকে আর একটু হলেই আগুনে পুড়িয়ে মারছিলেন।

বাসনওলা তো কেটলির চেহারা আর কথাবার্তা শুনে তাজ্জব। বলল, তুমি তা হলে সত্যিকারের কেটলি নও?

না,—কেটলি বলল।—আমি ভালো নাচতে পারি। তা ছাড়া জিমন্যাস্টিকও দেখাতে পারি। তুমি এক কাজ কর। টিকিট বিক্রি করে আমার নাচ দেখাও, খেলা দেখাও, দেখবে তোমার অনেক টাকা হবে।

তাই নাকি? বেশ, তাই করব আমি।—বাসনওলা খুশি হয়ে বলল। আর সম্মান দেখিয়ে বলল, কেটলি মশায়, আমি গরীব লোক। তবু আমি আপনাকে যথাসাধ্য যত্ন করব, ভালো খাওয়াবার চেষ্টা করব।

বাসনওলা সেদিন থেকে পুরোনো বাসন কেনা-বেচা বন্ধ করে বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট স্টেজ তৈরি করল, কয়েকজন বাজিয়েকে ভাড়া করল, তারপর নিজে সেজেগুজে স্টেজের বাইরে পর্দার সামনে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে শুরু করল বক্তৃতা:

ভদ্রমহিলা আর মহাশয়রা, আপনারা পৃথিবীর সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে চান তো আসুন। টিকিট কেটে পর্দার ভেতরে চলে যান, দেখুন কেটলি-নৃত্য। কেটলির জিমন্যাসটিক। আসুন। আসুন।



টাকাপয়সার অর্ধেক আপনাকে দিতে চাই।

পথ-চলতি মেয়েপুরুষরা তার কথা শুনে মজা দেখবার জন্যে টিকিট কেটে সবাই ঢুকতে লাগল। সত্যিই তারা দেখল কেটলির কাণ্ডকারখানা। দেখে অবাক্ হয়ে গেল সবাই। মুখে মুখে সেই খবর রটে গেল দেশ-বিদেশে। দূর দূর থেকে বহু লোক ভিড় করে আসতে লাগল পৃথিবীর সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে।

বাসনওলা কয়েকদিনের মধ্যেই বিরাট বড়লোক হয়ে গেল। নতুন পাকা বাড়ি হ'ল, টাকায় সিন্ধুক ভরে গেল।

এখন, বাসনওলা একদিন কেটলিকে বলল, কেটলি মশায়, আপনি সত্যিই পয়মন্ত—'বানবুকু'। আপনার দয়ায় আমি টাকা উপায় করেছি। আর আমি টাকা চাই নে। আমি এবার থেকে খেলা দেখানো বন্ধ করতে চাই। আপনার কি ইচ্ছা ?

বেশ, তাই হোক,—কেটলি বলল।—তোমার টাকার লোভ নেই দেখে আমি খুশি হয়েছি। তুমি এবার তা হলে আমাকে মরিনজী-মন্দিরের পুরুত মশায়ের কাছে রেখে এস আর তাঁকে বলে দিও তিনি যেন আমাকে যত্ন করেন, অমন করে আগুনে না পোড়ান।

তাই হবে।

বাসনওলা তখন কেটলিটাকে সযত্নে মরিনজী-মন্দিরের পুরুত মশায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে সম্মান দেখিয়ে সব কথা খুলে বলল এবং আরও বলল,—পুরুত মশায়, এই কেটলি মশায়ের জন্যে আপনার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তাই আমার টাকা-পয়সার অর্ধেক আমি আপানাকে দিতে চাই। আপনি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।

পুরুত মশায় সব শুনে চমকিত হলেন এবং বাসনওলার সততায় মুগ্ধ হলেন। তিনি বাসনওলাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

কেটলিটা সেই থেকে মরিনজী-মন্দিরে সযত্নে তোলা রইল। আর এখনও সেইখানেই আছে।



চিত্রশিল্পের কথা

ভারতের চিত্রসম্পদ্

এবারে আমাদের ভারতবর্ষের ছবির কথায় আসা যাক।

সেই সুদূর হরপ্পীয় যুগ থেকেই এর সুচনা। তখনকার ছবি কি রকম ছিল তার পরিচয় আমরা পাই সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্রের গায়ে। এ সব পাত্রে নানারকম জীবজন্তু, গাছগাছালি, ময়ূর প্রভৃতির ছবি দেখা যায়।

মহেন্‌জোদড়ো-হরপ্পার যুগ পেরিয়ে প্রায় হাজার বছর পরে চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায় পশ্চিম ভারতের অজন্তা গুহাতে। এখানকার প্রথম ছবিগুলি ছিল খানিকটা সহজ ভঙ্গীতে আঁকা, কিন্তু তারপরে ক্রমশ অজন্তার গুহা-প্রাচীরে আমরা দেখি সুন্দর সব জাতকের গল্প, বৌদ্ধজীবন ও বুদ্ধের চিত্র। তখনকার দিনের অনেক কথাই এই সব ছবির মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে এসে দেখা দেয়। প্রায় হাজার বছর ধরে অজন্তায় ছবি আঁকা হয়। এ ছাড়া পশ্চিম ভারতের এলুরা (যাকে সাধারণ লোকে ইলোরা বলে) গুহাতেও চমৎকার সব ছবি আছে। আর আছে দক্ষিণ ভারতের সিওনভাসাল গুহায়। এ ছাড়া মধ্যভারতের বাঘ গুহাতেও অপূর্ব চিত্রকলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গুপ্ত ও বাকটক রাজাদের সময়ে ভারতীয় চিত্রকলা অশেষ উন্নতি লাভ করে। তখনকার লেখক ও কবিদের কাব্যে, নাটকে ও অন্যান্য ধরনের রচনায় আরও নানা ধরনের ছবির কথাও জানা যায়। শুধু এ দেশেই নয়, এ সময়ে ভারত থেকে সিংহলের সিগিরিয়ায়ও ছবির একটি ধারা চলে আসে।

মধ্যযুগে

এর পরেই এল মধ্যযুগ। এ যুগের সবচাইতে সুন্দর নিদর্শনগুলি আমরা পেয়েছি পূর্বভারতের নানান্ ধরনের পুঁথি থেকে! এই ছবিকে পালযুগের চিত্রকলার নমুনা বলে বলা হয়। এতে একদিকে সূক্ষ্ম কাজ ও অন্য দিকে আগেকার দিনের ভাবসম্পদ্ একই সঙ্গে দেখা যায়। এ ধরনের বৌদ্ধ প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি ভারতের ও বিদেশের নানা স্থানের গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় আছে। এর মধ্যে নবম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতকের ছবিগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ভারতে মধ্যযুগের প্রথম দিক্‌কার ছবি আঁকার ভঙ্গীটা এসেছে গুজরাত-রাজস্থান অঞ্চল থেকে। এ সব ছবিতে



হরপ্পীয় যুগের মাটির পাত্র

মানুষকে আঁকা হয়েছে যেন কটমটে সূচালো আঁকাবাঁকা রেখায়। এই সব কারুকাজ-করা ছবিতে জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনী ও জৈন পুরাণকথা দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তর ভারতে এর পরবর্তী চিত্রকলার



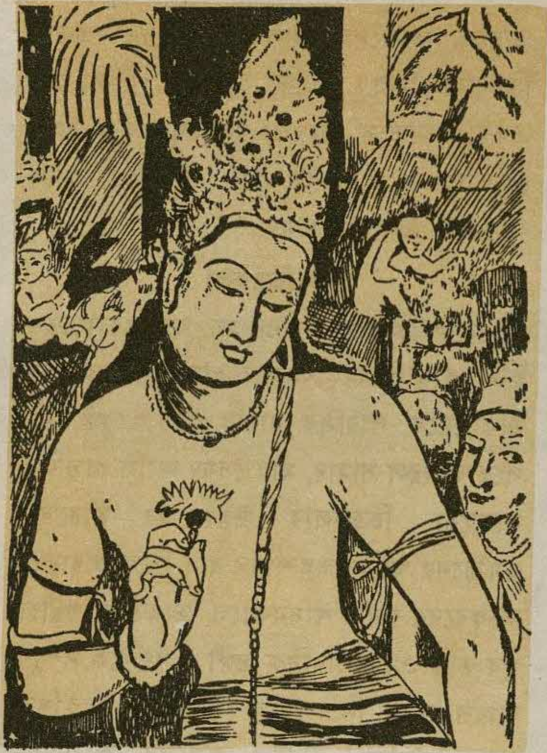
বীরভদ্র মন্দিরের দেওয়াল-চিত্র (ষোড়শ শতক)

ইতিহাসে প্রাধান্য পায় রাজস্থানের চিত্রকলা। এতে সাধারণ ভারতীয় জীবনের একটা সহজ ও সুন্দর ছাপ পাওয়া যায়। নানান্ সময়ের সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, রাগরাগিণীর রূপায়ণ, জন্তুজানোয়ার, গাছগাছালির ঘের দেওয়া কৃষ্ণলীলা ও পুরাণকথার ছবি এর মধ্যে অন্যতম। শেষের দিকে এই চিত্রকলায় মুঘল আমলের দরবারী চিত্রের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকে ভারতে মুঘলদের আসবার আগেও একটা চিত্রধারা ছিল। এতে পূর্বতন পুঁথিচিত্রের একটা আভাস দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্যে এই পুঁথিচিত্র মুঘল আমলের মত বিখ্যাত নয়।

মুঘল চিত্রকলা

মুঘল চিত্রকলার পত্তন হয় বাবরের হাতে। ইনি কামালুদ্দিন বিহজাদ প্রমুখ চিত্রকরদের ছবি দেখে পারসিক ধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে আবদুল সামাদ, মীর সৈয়দ আলি প্রভৃতির সাহায্যে চিত্রকলার উদ্ভব হয় ভারতে। হুমায়ুনের স্বল্পকালের শাসন বাদ দিলে প্রধানতঃ আকবরের সুদীর্ঘ শাসনকালে ভারতীয় শিল্পীরা খুব তাড়াতাড়ি পারসিক ভঙ্গী ও বর্ণনকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়ে মুঘল চিত্রকে পূর্ণ বিকশিত করে তোলেন। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে তখনকার আমলের বিখ্যাত চিত্রকরদের নাম আছে। আকবরের সময়ে শুরু, তারপর জাহাঙ্গীর এর পৃষ্ঠপোষক হয়ে এই মুঘল চিত্রের প্রভূত উন্নতি করেন। অন্যান্য ছবি ছাড়াও প্রাকৃতিক দৃশ্য, জীবজন্তু প্রভৃতির সম্পর্কেও এই সম্রাটের একান্ত আগ্রহ ছিল। কাজেই তাঁর সময়ে আঁকা গাছপালা ও পশু-পাখীর ছবি এখন গোটা পৃথিবীর সম্পদ্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকবর জাহাঙ্গীরের আমলে দশবন্ত, কেসু, মধু, মনোহর, মনসুর প্রভৃতি অনেক প্রতিভাধর শিল্পীর আবির্ভাব হয়। শাহ্‌জাহানের সময়ে মুঘল চিত্রকলা আরও অলঙ্কৃত হয়ে ওঠে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার ওরই মধ্যে নানান্ ধরনের ইয়োরোপীয় প্রভাবও দেখা যায় না



অজন্তা গুহার একটি ছবি

এমন নয়,—বিশেষ করে রঙের ব্যবহারে।

মুঘল আমলের শেষের দিকে ধীরে ধীরে দিল্লীর প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে যেতে থাকে ও চিত্রকলার শিল্পীরা প্রথমে অযোধ্যার বিভিন্ন শহরে, তারপর পাটনায় ও মুর্শিদাবাদে ছড়িয়ে পড়েন। এঁদের আঁকা ছবি দেখতে পাওয়া যায় ইয়োরোপের ধাঁচে কাগজে কিংবা হাতীর দাঁতের পাতে—তবে তা মুঘল পদ্ধতিতেই আঁকা।

মুঘল আমলের অনেক চিত্রকর ও রাজস্থানী চিত্রকরদের এক অংশ মধ্য-পশ্চিম হিমালয়ের বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে চম্বা ও কুলু উপত্যকায় একটি ছবি আঁকার পদ্ধতি গড়ে ওঠে, যার মধ্যে আমরা দেখি দেশীয় লাবণ্য আর মুঘল চিত্রের আশ্চর্য সংযোগ। প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি এঁদের ছবির মুখ্য বিষয় হলেও সেই ছবি পাহাড়ী চিত্রকলায়ও সাধারণ মানুষ ও তার ভাববৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করে নি।

মুঘল ভারত ছাড়াও মধ্য-দক্ষিণ ভারতের মুসলিম রাজ্যগুলিতে একরকম চিত্রকলা গড়ে উঠেছিল—যার মধ্যে দেখা যায় পারস্যের ছাপ আর মধ্যভারতের দেশীয় ধরনের চমৎকার সংমিশ্রণ। এই ছবিকে সাধারণতঃ দখ্‌নী চিত্রকলা বলে পরিচয় দেওয়া হয়। এতে যেন একদিকে আছে রাজকীয় জৌলুষ, আর তার সঙ্গে এসে মিশেছে দেশজ মাধুর্য।

দক্ষিণ ভারতে

এ সময়ে **দক্ষিণ ভারতও** চিত্ররচনার ক্ষেত্রে পিছিয়ে **ছিল না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ** থেকে **অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের** মধ্যে **দক্ষিণ**



সিওন ভাসাল গুহার ছবি



রেশমের বস্ত্রে কালিতে অঙ্কিত রেখাচিত্র

সুং রাজত্বের কাল

চিত্রশিল্পের কথা পৃঃ ১২০৭



গুজরাতী জৈন পুঁথিচিত্র (ষোড়শ শতক)

ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিত্রকলার নিদর্শন দেখা যায়। দক্ষিণের মন্দিরপ্রাচীর বহুকাল ধরে ছবি আঁকার জন্য ব্যবহৃত হ'ত। 'হাম্পি'র বিরূপাক্ষ মন্দির, 'লেপাক্ষী'র বীরভদ্র মন্দির ও কোচিনের 'মত্তনচারি' প্রাসাদের মধ্যে আমরা যথাক্রমে ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের চিত্রের পরিচয় পাই। চিদম্বরমের চিত্রকলা সপ্তদশ শতকের নায়ক আমলের। তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরে যে সুন্দর ছবিগুলি রয়েছে সেগুলি চোল আমলের বলে অনুমান করা হয় এবং এতে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের সুকুমার প্রাণবন্ত ভাবটা বিশেষ করে চোখে পড়ে।

পূর্বভারতে কি ছিল

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত আমাদের সমস্ত পূর্বভারতেও গত তিন-চারশ' বছর ধরে নানা ধরনের চিত্রকলার প্রচলন ছিল। এর মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের সুবিখ্যাত পুঁথির পাটার কথা বিশেষ করে বলা যেতে পারে। অবশ্য ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের এই চিত্রগুলিতে পশ্চিম ভারতের নানা ধরনের কিছু কিছু প্রভাব থাকলেও হাল্‌কা রঙের প্রয়োগে আর সংস্থাপনের মাধুর্যে এগুলির বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য আর তার মধ্যে বাঙ্গালিয়ানা বিশেষ করে চোখে পড়বে। ওদিকে আসাম ও কোচবিহারের রেখার ও রঙের কাজের কথাও বলতে হয়। আবার ওড়িশার চিত্রপদ্ধতিও ওখানকার ভাস্কর্যের মতই মহান্ এবং সমৃদ্ধ। ওড়িশায় তাল-পাতার পুঁথিতে খোদাই করে আঁকা তীক্ষ্ণ



সুলতানী আমলের পুঁথিচিত্র

রেখার ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—যার মধ্যে রয়েছে পরিপাটী গঠনমাধুর্য আর একটা মার্জিত ভাব। একটা কথা, পূর্বভারতের পুঁথিচিত্রে কিন্তু প্রধানতঃ বৈষ্ণব ভাবধারার প্রাধান্যই বেশি ছিল।

কিসের ওপর আঁকা হ'ত

এ সব ছবি কিসের ওপর আঁকা হ'ত এ বিষয়ে স্বভাবতঃই কৌতূহল হ'তে পারে। এর উত্তর—ভারতের মত বিরাট দেশে নানান্ ধরনের জমিন বা ব্যাকগ্রাউণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে এজন্য। গুহার বিশেষভাবে তৈরি পলেস্তারা থেকে শুরু করে জমাট চুনের মেজ, তালপাতা, কাঠ, মাজা কাপড় ও কাঠের পাত, কাগজ—এ সবই ব্যবহার করা হয়েছে অল্প-বিস্তর। আঁকবার পদ্ধতিও এখানে অনেক।



মুঘল চিত্র



পত্রলেখিকা (কাংড়া)

তবে সাধারণতঃ রেখার সাবলীল কাজ আর ছবি বসাবার ধরন দেখেই ঐতিহাসিক ভারতীয় ছবিগুলিকে এক নজরে চিনে ফেলা যায়।

পূর্ব এশিয়ার চিত্র

এশিয়া মহাদেশের চিত্রকলার ইতিহাস বিপুল ও বিচিত্র। এর মধ্যে পূর্ব এশিয়ার অবদান অভূতপূর্ব সম্পদের সৃষ্টি করেছে। এই ধারার উত্থান ও বিবর্তন হয় চীন দেশে। চীনের শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব ধারা ও আদর্শের প্রবর্তন করেন। প্রকৃতি ও মানুষকে এত অল্প আয়াসে ও এত অবলীলাক্রমে স্বল্প ও পরিমিত অঙ্কনে, লেখায়, ধোঁয়াটে রূপ দিয়ে ও বর্ণলেপে আর কেউ ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হন নি। চীনের চিত্র-কলার ইতিহাস হু'হাজার বছরেরও বেশি। তবে বেশির ভাগ ছবিই নিখুঁত অনুকৃতির মাধ্যমে



পুঁথির পাটার চিত্র : বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া (অষ্টাদশ শতক)

এসেছে আমাদের কাছে। প্রথম যুগের চিত্রকরদের মধ্যে কু-কাই-চিহ, চ্যাং-সেঙ-য়ু, ইয়েন-লি-পেন, য়ু-স্থঙ য়ুয়ান প্রভৃতি বিখ্যাত। হানকান, ওয়াং ওয়েই প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রকরদের অবদানও আজ অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। চীনের চিত্রকলার চরম বিকাশ হয় স্থং যুগে ; তারপরে আসে য়ুয়ান, মিং ও চিং রাজত্বের কাল।

চীন থেকে জাপানে

জাপানে চিত্রধারা ও চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল চীন থেকে। জাপানের চিত্রকলায় চীনের ছাপ খুব বেশি এবং বেশ গভীর। চীনের চিত্রকলার মত এতে বিরাট, বিশাল ভাব ও বৈচিত্র্য না থাকলেও ছবি আঁকার স্বাভাবিক নৈপুণ্যে ও বৈচিত্র্যে জাপানী চিত্রকলা অতুলনীয়। ধর্ম, রাজপ্রাসাদের অভিজাত জীবনধারা, সাধারণ মানুষ—এ সবই জাপানী চিত্রকলার কামাকুরা-পূর্ব, কামাকুরা, অপিকাগা মনোমায়া ও তকুগাওয়া যুগগুলিতে ছড়িয়ে আছে। শেষ দিকের জাপানী ছাপের ছবি, যা হকুসাই, উতামারো প্রভৃতি শিল্পীরা এঁকেছিলেন,—তা ইয়োরোপীয় চিত্রকলায়ও বেশ একটা প্রভাব এনেছিল উনিশ ও বিশ শতকে।

চীনের ও জাপানের চিত্রকলা এবং কোরিয়ার চিত্রকলা তাদের নিজ নিজ দেশের ভাবসম্পদে গরীয়ান্ হলেও এবং প্রধানতঃ চীনদেশ থেকে উৎসারিত হলেও বরাবর বিভিন্ন ভাবে মধ্য এশিয়ার ভারতীয় রীতিতে আঁকা বৌদ্ধ চিত্রকলার সংস্পর্শে এসেছিল। কাজেই পূর্ব এশিয় চিত্রকলায় অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় ও মধ্য এশিয় রীতির প্রতিচ্ছবি দেখলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।



জাপানী ছবি : কিয়োটো (দ্বাদশ শতক)

ইয়োরোপের চিত্রসম্ভার

ইতালির রোম শহর এক সময়ে যুদ্ধবিগ্রহের সাহায্য নিয়ে ইয়োরোপে আপন ক্ষমতা

সুপ্রতিষ্ঠিত করে। রোম ও গ্রীসের চিত্রের পরিচয় মাটির পাত্রের গায়ে, পম্পেই শহরের ঘরবাড়িতে ও ইতালির মাটির তলার সমাধিতে পাওয়া যায়। এই ইতালি দেশই আবার ইয়োরোপে নতুন ক্রীশ্চান ধর্মের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কাজেই ধীরে ধীরে খৃষ্ট পুরাণকথার ছবি আঁকবার প্রয়োজনে ইতালিতে বিখ্যাত সব চিত্রকরের আবির্ভাব হয়—বড় বড় গীর্জা, উপাসনালয়, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতিতে দেওয়ালে, কাঠের ফলকে, পুঁথিতে বা মোটা ক্যানভাসে ছবি আঁকার জন্য।



বাইজেণ্টাইন মোজেইক ছবি

একেবারে প্রথম দিকের ছবিগুলোতে মোজেইকের বা টুকরো পাথর দিয়ে ছবি আঁকার রেওয়াজ ছিল। এ রকম ছবির মধ্যে রাভেন্না শহরের সান বিতালে'র সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরা ও তাঁর পার্ষদ্‌দের ছবি উল্লেখ-যোগ্য। এ সব ছবির প্রভাব অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। পাওলো ভেনেজিয়ানের প্রাচীরচিত্র এই রকম একটি ছবি। এ ছাড়া রুশ দেশ ও সমস্ত পূর্ব ইয়োরোপে বিভিন্ন ধর্মসৌধে এ ধরনের ছবি ছিল। ইতালির লুকা, ফ্লোরেন্স, পিসা ও রোম সত্যিকারের শিল্পকেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রথম বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন চীমাবুয়ে। ইনি ত্রয়োদশ শতকে ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। চীমাবুয়ের ছবিতে তাঁর পূর্বেকার রীতির ধারা কিছুটা থাকলেও সূক্ষ্ম ভাবকে তিনি রেখা ও রঙের দ্বারা অনেক বেশি সুন্দর ও প্রাণবন্ত করেছিলেন।

পিয়েত্রো কাবার্লিনি নামে আর একজন চিত্রকর এই সময়ে ছবির জগতে আরও সুন্দর স্বাভাবিকতা নিয়ে আসেন। এই সময়েই ফ্লোরেন্সের কাছে এক গাঁয়ের ছেলে জিয়োত্তো চীমাবুয়ের কাছে কাজ শিখতে থাকেন ও ক্রমে বিখ্যাত শিল্পবিদ্ বলে স্বীকৃতি পান সমস্ত বড় বড় শিল্প-রসিক, শিল্পী ও পণ্ডিতদের কাছে। আম্‌সিসি'র এক গীর্জায় এই শিল্পীর অনেক ছবি আছে। জিয়োত্তোর ছবিতেই প্রথম 'অদরকারী খুঁটিনাটি' বাদ দেওয়া হয়। সোনালী রঙ, লম্বাটে দেহ—এই সব পূর্বতন রীতির বদলে মাটিতে স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়ানো সুন্দর প্রাণময় আধুনিক চিত্ররীতির জন্ম হয়। জিয়োত্তোর ছবিতে কোন রকমের আড়ষ্ট ভাব নেই আর ঘরবাড়ী ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়ে মানুষই আঁকা হয়েছে সরল ভাবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে ইতালির আর একটি শহর সিয়েনাতে—সাইমোনে মার্তিনি, পিয়েত্রো লোরেনজেত্তি প্রভৃতি চিত্রকরেরা ছবি আঁকতে

থাকেন। প্রায় একই সময়ে ফ্রান্সেও নানান্ ধারার চিত্রকলার চর্চা ছিল। জার্মানীতে কোলন শহরে, লুবেক, মারিয়েনবর্গে এবং টিরোলে নানান্ ছবি আঁকা হয়। স্পেনের কাটালোনিয়ায়ও ছবির চর্চা অব্যাহত থাকে।

শিল্পে নতুন ধারা

পঞ্চদশ শতকে ইয়োরোপের শিল্পকলায় একটা নতুন ধারা ও নতুন জীবনের লক্ষণ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এ সময়ের বিখ্যাত চিত্রকর—ফ্রা এঞ্জেলিকো, লুকা সিনোরেল্লি, আন্দ্রিয়া মন্তেনা, পাওলো উচ্চেল্লো, বেনোৎসো গৎসোলি, জেনতিল বেল্লিনি, সান্দ্রো বত্তিচেল্লি,



মোনা লিসা : লিওনার্দো



নিজের ছবি (পোর্ট্রেট) : ডুরার

ফিলিপ্পিনো লিপ্পি, পিয়েরো দেল্লা ফ্রানথেস্কা, গিয়োভান্নি বেল্লিনি—এঁদের ছবি সমস্ত ইয়োরোপে নাম করে। এ সময়ের ছবিতে সুন্দর রঙ দেবার, আর সেই সঙ্গে ছবি আঁকার পদ্ধতিতে গভীরতা আনবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। এঞ্জেলিকোর শান্ত সুন্দর ছবি, উচ্চেল্লো'র অনেক-মানুষ-দিয়ে-গড়া গভীরতায় মগ্ন ছবি আমাদের এ রকমের রসের আস্বাদ দেয়। গৎসোলি ছিলেন এঞ্জেলিকোর ছাত্র। ফিলিপ্পো লিপ্পি তাঁর ছবিতে এনেছিলেন ধর্মীয় ছবির মধ্যে সাধারণ জীবনের চিত্ররূপ। ফ্রা এঞ্জেলিকোর মত আর একজন শিল্পী ছিলেন বত্তিচেল্লি। বত্তিচেল্লির ছবিতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পুরাণকথা ও খৃষ্টীয় বিষয় প্রাধান্য

পেয়েছে। তাঁর রূপকল্পনার মধ্যে এসেছিল একটি বিশিষ্ট মাধুর্য, যেটা দেখলেই তাঁর ছবি চেনা যেত। বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর পিয়েরো দেল্লা ফ্রানথেস্কার আলোর ব্যবহার ছিল অতি সুন্দর আর তাঁর আঁকা মানবদেহ ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ। জ্যাকোপো বেল্লিনি ও তাঁর দুই পুত্র গিয়োভান্নি ও জেনতিল এবং দোমেনিকো ঘিরলান্দিয়ো তাঁদের ছবিতে তখনকার দিনের একটি সুন্দর বাস্তবতার সৃষ্টি করেছিলেন।

পঞ্চদশ শতকের ইয়োরোপে জান ভ্যান এইক সাধারণ সব জিনিস ও দৃশ্যকে বাস্তবের দৃষ্টি থেকে প্রকাশ করতেন। আঁকবার জন্য তিনি অতিসুন্দর জিনিসের সন্ধানে না থেকে বহুবার-দেখা মানুষ ও দৃশ্যকেই বেছে নিতেন।



হার্লেমে'র ডাইনী : হলস



নিজের ছবি (পোর্ট্রেট) : রুবেন্স

এ সময়ে ব্রুসেলস্ শহরের রোজিয়ার ভ্যান্ ডর ওয়েডেন ছিলেন তাঁর সমকক্ষ। হান্স্ মেমলিং, হিরোনিমাস কখও অলঙ্করণে ও বাস্তবতায় প্রতিভা দেখিয়েছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর আশ্চর্য সব ছবি

ইয়োরোপের চিত্রকলা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে এক অভূতপূর্ব উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। লিওনার্দো, রাফায়েল, মিকেলাঞ্জেলো, তিশিয়ান, ভেরোনিস, তিনতোরেত্তো এই সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের অন্যতম। এই সময়ে বিখ্যাত গীর্জা ও প্রাসাদগুলিতে এই চিত্রকরেরা ছবি আঁকতে থাকেন। এর মধ্যে লিওনার্দো দেওয়ালে, টানা বুনটের কাপড়ে, রেখাচিত্রে—সবদিক্ থেকেই মস্ত বড় শিল্পীরূপে নিজের পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর আঁকা 'মোনা লিসা', 'মেরী মা' ও 'অ্যানের সঙ্গে মানবপুত্র'—এ সব ছবি বিখ্যাত হয়ে আছে। মিকেলাঞ্জেলো ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়া এ দু'টোতেই সমান



সুজান ফুরমে : রুবেন্স

পারদর্শী ছিলেন। তাঁর দেওয়ালে আঁকা ছবি রোমের নিকটস্থ ভ্যাটিকানে সিস্‌টাইন চ্যাপেলে আছে। রাফায়েল ও তিশিয়ান ছবির মধ্যে মানুষকে সুন্দর ও বাস্তব রূপে ধরে রাখতে পারতেন। সূক্ষ্ম কাজের ক্ষেত্রে অনবদ্য কর্মী ছিলেন তিনতোরেত্তো। ওদিকে স্পেন দেশে ছবি এঁকেছিলেন এ সময়ে এক মহা প্রতিভাধর শিল্পী। তাঁর নাম এল্ গ্রেকো। তিনতোরেত্তোর অনুসরণ করে পরে তিনি দীর্ঘায়ত ভঙ্গীতে গড়ে-তোলা রঙিন ধর্মচিত্র এঁকে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

ষোড়শ শতকে জার্মানীতেও কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রকরের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে এলব্রেখট্ ড্যুরর তুলনাহীন।

পরবর্তী যুগে

সপ্তদশ শতকের ইয়োরোপের চিত্রকরদের মধ্যে কারাভাৎসিয়ো, পুস্যাঁ, লোরেন, হল্‌স্, রেমব্রাঁ, পিয়েটর দ্য হুখ্, ভারমিয়র, হব্বেমা, রুইসডেল, রুবেন্স, ভ্যানডাইক, ভেলাকোয়থ্ ও ওয়াত্তো প্রধান। প্রথম জন এঁর আগের যুগের ভাবধারায় ছবি আঁকতেন। পুস্যাঁ ও লোরেন এবং হল্‌স্‌এর ছবিতে দেখা যেত এক ধরনের বাস্তবতা। ভারমিয়র, হব্বেমা ও রুইস্‌ডেল এঁকেছিলেন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। রেমব্রাঁকে বলা যায় অনেকটা ঠিক আগের যুগের মহা মহা শিল্পীদের সমকক্ষ চিত্রকর। মানুষের মনের ভাব প্রকাশে ও আলোছায়ার খেলায় তাঁর তুলনা মেলা ভার। সাধারণ



ব্লু বয় : গেন্‌স্‌বোরো



দু'টি তরুণী : পিকাসো

বিষয়ও তাঁর হাতে অসীম শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হ'ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও তার পরে ক্রমশ আবির্ভাব হয় এক অপূর্ব বৈচিত্র্যের,—ওয়াত্তো, ব্যুশের, ফ্রাগোনার্দ, স্যাঁরদা, হোগার্থ, কানালেত্তো, তিয়েপোলো, গোয়া, গেন্‌সবোরো, ইনগ্রে, দেলাক্রোয়া, কনেষ্টবল প্রভৃতি চিত্রকরদের।

শিল্পে আধুনিক যুগের শুরু

নানারকমের যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও ক্যামেরার চলন দিয়ে আরম্ভ হয় আধুনিক চিত্রের পূর্বযুগ। এই সময়ে ফরাসী দেশ ও প্যারিস শহর চিত্রচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সময়ের চিত্রকরেরা কেউ কেউ বিন্দুজ পদ্ধতিতে তাঁদের রঙের খেলা দেখিয়েছেন আর গভীরতার বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছেন। অতি-রঙ, স্বল্প-রঙ এবং ইঙ্গিতময় রঙের মধ্যে দিয়ে মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন। অনেকে আবার ছবির মাধ্যমে আদিম ভাব ও সাধারণ মানুষের জীবনকে পরিস্ফুট করেছেন। এঁদের মধ্যে মানে, মনে, দেগা, রেনোয়া, পিজারো, সেজান, সিউয়ার্ত, গঁগ্যা, ভ্যান গখ্, লোত্রেক প্রভৃতি বিখ্যাত।



একটি রমণী : ভ্যান গখ্

উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের আরম্ভ থেকেই আধুনিক চিত্রশিল্পের উদ্ভব হয়। পিয়ের বোনার্দ, ভুলার্দ, দ্যুফি, দেরঁ্যা, মাতিস, পিকাসো, লোট, জাঁগ্রী, ব্রাক, মোদিগলিয়ানি, উৎরিল্লো, শাগাল, মার্ক, মিরো, দালি, ক্লী, কান্‌দিনিস্কি এঁদের মধ্যে অন্যতম।



শিল্পী রাফায়েলের আঁকা মাতৃমূর্ত্তি

চিত্রশিল্পের কথা পৃঃ ১২১১

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

আলো দিয়ে আঁকা ছবি : ফোটোগ্রাফ

আলো দিয়ে আবার ছবি আঁকা হয় নাকি? হয় বৈ কি! এবং আপনা থেকেই সে ছবি আঁকা হয়ে যায়—রং-তুলি ছাড়াই।

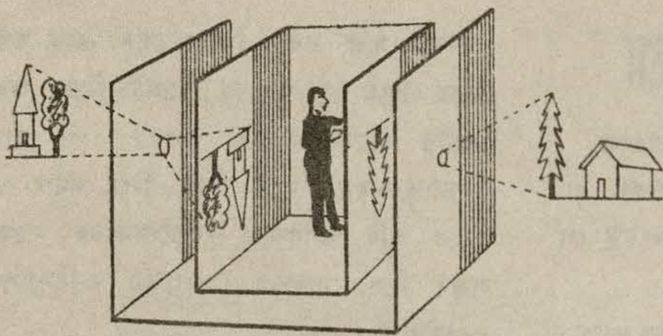
কথাটা হঠাৎ শুনলে কেমন অবাক্ লাগে। কিন্তু ফোটোগ্রাফি জিনিসটাই তো তাই! ফোটো মানে আলো, আর গ্রাফ মানে লেখা বা আঁকা। আলো দিয়ে ঐ ছবি লেখা বা আঁকা হয় বলেই তো ওর ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে আমরা ফোটোগ্রাফকে ফোটো বলি বটে কিন্তু সেটা শুদ্ধ নয়। কারণ শুধু ফোটো বলতে আলো'ই বোঝায়। তা এ রকম তো আমরা আরও কত বলি! মোটর-কারকে মোটর বলি, কিন্তু মোটর বলতে সত্যি গাড়ীটা বোঝায় না, বোঝায় যে যন্ত্রের সাহায্যে গাড়ীটা চলে—সেইটা। তেমনি আজকাল অনেকে বাজারে গিয়ে এক কিলো আলু চায়। ওটাও ভুল, কিলোগ্রাম বলা উচিত। কারণ কিলো মানে হাজার। হাজার গ্রাম আর হাজার নিশ্চয়ই এক কথা নয়। কিন্তু কথায় কথায় ঐ রকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগেকার দিনে, যখন ফোটোগ্রাফির আবিষ্কার হয় নি, তখন কারো ছবি পেতে হলে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হ'ত শিল্পীদের ওপর। তাও কি ঝঞ্ঝাট কম ছিল? যার ছবি আঁকা হবে তাকে শিল্পীর সামনে ঠায় বসে থাকতে হ'ত—কখনও কখনও ঘন্টার পর ঘণ্টা এবং তাও দিনের পর দিন। তার পর, শেষ পর্যন্ত যে ছবি দাঁড়াত, তা যে সব সময়েই লোকটির চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলে যেত এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। সেটা নির্ভর করত শিল্পীর হাতের গুণের ওপর। তা ছাড়া এ-ভাবে,—যাকে বলে 'সিটিং' দিয়ে অর্থাৎ বসে থেকে ছবি আঁকানো,—বড়লোকদের পক্ষেই সম্ভব ছিল, সাধারণ লোকের এ-বিলাসিতা পোষাত না।

আলো দিয়ে যে মানুষ বা অন্য কোন দৃশ্যের হুবহু প্রতিচ্ছবি ফেলা যায় এ তথ্য কিন্তু অনেক দিনের জানা। আয়নায় যে ছবি ফুটে উঠে সেও তো ঐ একই ব্যাপার। আলোর প্রতিফলনের জন্যই ওটা হয়। এই রকম প্রতি-চ্ছবি আর একভাবেও পাওয়া যেতে পারে। একটা ঘর চারদিক্ বন্ধ করে অন্ধকার করে দেওয়া হ'ল। ঘরের এক কোণে শুধু রইল একটা ফুটো কিংবা একটা লেন্স। সেই লেন্স কিংবা ফুটোটুকু দিয়েই শুধু বাইরের আলো ঢুকতে পারে ঘরে। তা হলে দেখা যাবে বাইরেকার দৃশ্যের একটা প্রতিচ্ছবি উল্টো দিকের দেয়ালে এসে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ছবিটা পড়ছে উল্টো হয়ে। আলোক-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারেই এমনটা হয়। ঘরের বদলে ছোট্ট একটা বন্ধ বাক্সের গায়ে ঐ রকম ফুটো করে বা লেন্স বসিয়ে নিলেও ঐ একই রকম প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে।

ক্যামেরা অবস্কিওরা

ফোটোগ্রাফির আদি যুগে এই ব্যাপারের সাহায্য নিয়েই প্রথম ছবি তোলা হ'ত। ফোটোগ্রাফ তোলার যন্ত্রকে আমরা বলি ক্যামেরা। সবপ্রথমকার এই যন্ত্রকে বলা হ'ত ক্যামেরা অবস্কিওরা। ওটা একটা ল্যাটিন কথা,



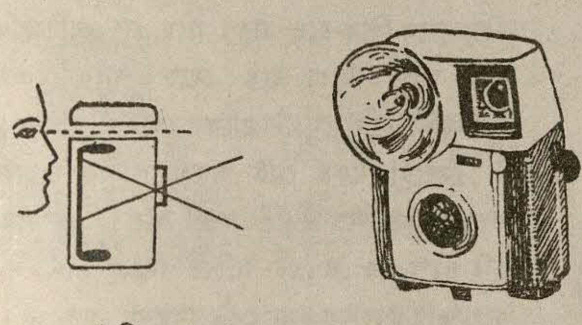
ক্যামেরা অবস্কিওরা : অন্ধকার ঘরের ভিতর ছোট্ট লেন্সের ভিতর দিয়ে বিপরীত দিকের দেয়ালে বাইরের দৃশ্য উল্টো হয়ে ফুটে উঠেছে। শিল্পী তাই এঁকে নিচ্ছেন।

ওর মানে অন্ধকার ঘর। কেন ঐ নাম দেওয়া হয়েছিল তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। এই ক্যামেরা অবস্কিওরাকেই আমরা আধুনিক ফোটোগ্রাফিক ক্যামেরার আদিপুরুষ বলতে পারি। সেকালকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এই রকম একটি আদি ক্যামেরার (ক্যামেরা অবস্কিওরা) বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। এর কিছুদিন পরেই ড্যানিএলো বারবারো নামে এক ভদ্রলোক একটি বাক্সের একদিকে একখানা কনভেক্স লেন্স বসিয়ে আর তার উল্টো দিকে ঘষা কাচ বসিয়ে একটি উন্নত ধরনের ক্যামেরা অবস্কিওরা বানিয়ে নেন। লেন্সের সামনে যা বসানো হ'ত তারই একটা উল্টো প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠত ঐ ঘষা কাচের গায়ে এবং বাইরে থেকেই তা দেখা যেত। বারবারো সেখানে একটা পাৎলা কাগজ বসিয়ে ছবিটা তার ওপর ট্রেস করে নিতেন।

ক্যামেরা অবস্কিওরার সাহায্য নিয়ে কোন দৃশ্যের বা মানুষের হুবহু ছবি আঁকা অনেকটা সহজ হয়েছিল এবং এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকার কাজ বেশ চালুও ছিল দীর্ঘ দিন ধরে। কিন্তু, যাই বল, এই পদ্ধতিতে ছবি তুলতে হলে শিল্পীর সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়—অবশ্য খুব বড় শিল্পী না হলেও হয়তো চলে। তা ছাড়া এই ক্যামেরায় যে প্রতিচ্ছবিটা আসত তার স্থায়িত্ব নির্ভর করত একান্তই আলোর উৎসটুকুর ওপর। আলো বন্ধ হলেই প্রতিচ্ছবিও অদৃশ্য হয়ে যেত।

কি করে প্রতিচ্ছবিকে স্থায়ী করা যায়

তখন চেষ্টা শুরু হ'ল প্রতিচ্ছবিটাকে স্থায়ী করা যায় কিনা। আমরা জানি সূর্যের আলো নানা জিনিসের ওপর পড়ে নানা রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। গায়ের চামড়ায় ক্রমাগত সূর্যের আলো পড়লে তাও ক্রমে বাদামী বা কালচে হয়ে যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক মশলার ওপর সূর্যের আলো পড়লে কি হয় তা নিয়েও পরীক্ষা করতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। একজন জার্মান বিজ্ঞানী লক্ষ করলেন যে রূপোঘটিত নানা রকম রাসায়নিক লবণের (যাকে বলা হয় সিলভার সল্টস্) ওপর সূর্যের আলোর প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এ-রকম কতকগুলো রূপো-লবণ আলোর মধ্যে ধরলেই কালো হয়ে যায়। আসলে আলো ঐ লবণগুলো থেকে রূপোকে সহজেই পৃথক্ করে দেয় বলে এ-রকমটা হয়। কোন একটা কাচের পাত্রে খানিকটা রূপো-লবণ ভরে তার গায়ে কতকগুলো কাগজের টুকরো সেঁটে দিয়ে রোদে রাখলে দেখা যাবে কাগজে ঢাকা অংশটা ছাড়া বাকি রূপো-লবণগুলো কালো



আধুনিক বক্স ক্যামেরা, সঙ্গে ফ্ল্যাশ বাল্‌ব্ লাগানো। পাশে দেখানো হয়েছে কি ভাবে বক্স ক্যামেরায় ছবি দেখা যায়।

হয়ে গেছে। এখন, ঐ কাগজের টুকরোগুলো যদি এবড়োখেবড়ো না রেখে কোন অক্ষরের মত করে কেটে নিয়ে এঁটে দেওয়া যায় তা হলে কি হবে? ঐ কাগজে ঢাকা জায়গাটুকুই কেবল বদলাবে না, বাদ বাকি কালো হয়ে যাবে। কাগজ সরালে দেখা যাবে কালোর গায়ে সাদা সাদা অক্ষর ফুটে উঠেছে।

আর, ঠিক এই ব্যাপারটির ওপর রং ফলিয়েই আধুনিক ফটোগ্রাফির সৃষ্টি।

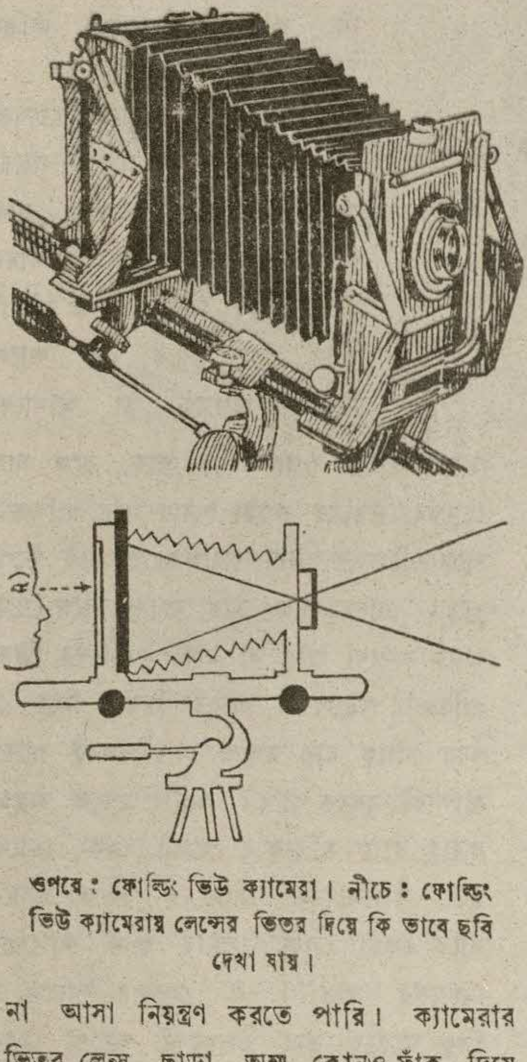
রূপো-লবণকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পী কি ভাবে এই ফোটোগ্রাফি বা আলোর লেখার পত্তন করেন তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। শুধু এই ব্যাপারে যাঁদের কৃতিত্ব অসাধারণ তাঁদের কয়েকজনের নাম বলছি। এঁরা হলেন যোসেফ নিপেস, লুই দাগেরে, দ্য আরাগো, উইলিয়াম ট্যালবট, ফ্রেডরিক আর্চার, রিচার্ড ম্যাডক্স এবং বিশেষ করে ইস্টম্যান। এদের প্রথম তিনজন ফরাসী, তার পরের তিনজন ইংরেজ এবং শেষের জন আমেরিকান।

ক্যামেরায় কি করে ছবি ওঠে

এবারে দেখা যাক আজকালকার ক্যামেরায় কি করে নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়।

ক্যামেরাকে আমাদের চোখেরই একটা অনুকরণ বলা যেতে পারে। আমাদের চোখের তারা হচ্ছে আসলে একটা লেন্স। আমরা যখন কোন কিছুর দিকে তাকাই তখন তা থেকে যে আলো ঠিকরে আসছে তা আমাদের চোখের তারার ওপর এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে চোখের ভিতরের একটা পর্দায় তার প্রতিচ্ছবি পড়ে—ঠিক ক্যামেরা অবস্কিওরার মতই উল্টো হয়ে। চোখের সঙ্গে আর মগজের সঙ্গে যোড়া আছে অসংখ্য স্নায়ু বা নার্ভ। চোখের ভিতর প্রতিচ্ছবি পড়লে ঐ স্নায়ুর ভিতর দিয়ে সে খবর পৌঁছে যায় মগজে আর তখনই আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারি। অর্থাৎ মগজে অনুভব করাই হচ্ছে সত্যিকার দেখা। এখন, চোখের মত ক্যামেরারও সামনের দিকে বসানো থাকে একটা লেন্স, সেটাই হচ্ছে ক্যামেরার "চোখের তারা"। ঐ লেন্সের সামনে যা কিছু থাকবে তার ওপরকার আলো ঠিকরে এসে পড়বে লেন্সের ওপর আর তারই ফলে লেন্সের পেছন দিকে, ক্যামেরার ভিতরকার একটা পর্দায় সেই দৃশ্যটির একটি হুবহু কিন্তু উল্টো প্রতিচ্ছবি এসে পড়বে, ঠিক চোখের বেলায় যেমনটি হয়।

চোখ বন্ধ করে যেমন আমরা সেখানে বাইরের আলো আসা ঠেকিয়ে রাখতে পারি তেমনি ক্যামেরার লেন্সটি ইচ্ছেমত খুলে বা বন্ধ রেখে আমরা ওর ভিতর দিয়ে আলো আসা বা



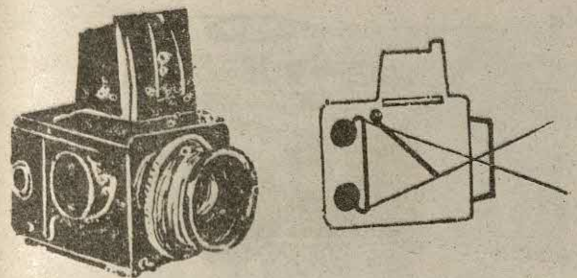
ওপরে : ফোল্ডিং ভিউ ক্যামেরা। নীচে : ফোল্ডিং ভিউ ক্যামেরায় লেন্সের ভিতর দিয়ে কি ভাবে ছবি দেখা যায়।

না আসা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। ক্যামেরার ভিতর লেন্স ছাড়া অন্য কোনও ফাঁক দিয়ে যাতে আলো ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হয়।

ফোটোগ্রাফির প্লেট ও ফিল্‌ম্

কিন্তু প্রতিচ্ছবি পড়লেই তো কেবল হবে না, সে প্রতিচ্ছবি যাতে স্থায়ী ভাবে গাঁথা হয়ে থাকে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। তা নইলে ছবি হবে কি করে? ক্যামেরার ভিতর তাই যেখানে প্রতিচ্ছবি পড়বে সেখানে এমন একটা কিছু রেখে দিতে হবে যার গায়ে সে প্রতিচ্ছবি স্থায়ী ভাবে আঁকা হয়ে যেতে পারে। এই জিনিসটিই হচ্ছে ফোটোগ্রাফের প্লেট বা ফিল্‌ম্।

ফোটোগ্রাফের প্লেট আগে বেশির ভাগই কাচের পাত দিয়ে তৈরি করা হ'ত। একবার ছবি ওঠার পর সে প্লেট সরিয়ে নিতে হ'ত, না হলে তার জায়গায় নতুন প্লেট বসানো যেত না। কিন্তু এতে একটু অসুবিধে ছিল। প্লেট পরাবার সময় ফোটোগ্রাফারকে কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে তবেই সে কাজ করতে হ'ত, নইলে বাইরের আলো একবার ভিতরে ঢুকতে পারলেই সে আলো প্লেটের ছবিকে নষ্ট করে দিত। ১৮৮৮ সালে ইস্টম্যান কাচের প্লেটের বদলে সেলুলয়েডের পাৎলা ফিল্‌ম্-এর প্রচলন শুরু করলেন। এতে সুবিধে হচ্ছে এই যে ছবি তোলা হলেই চাবি ঘুরিয়ে ফিল্‌মের সেই অংশটি গুটিয়ে ফেলা যায় এবং তার জায়গায় ফিল্‌ম্-এর অন্য অংশ,—যাকে বলা যায় টাটকা ফিল্‌ম্, অর্থাৎ যার গায়ে তখনও কোন ছবি ওঠে নি,—এনে বসিয়ে দেওয়া যায়। এতে সুবিধে এই যে প্রতি বার প্লেট বদলাবার হাঙ্গামা পোহাতে হয় না কালো কাপড় মুড়ি দিতেও হয় না। চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই একটার পর একটা অংশ লেন্সের সামনে বসিয়ে দেওয়া যায় আর ছবি তোলা হলে চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই তা একটা কাটিমের গায়ে জড়িয়ে রাখা যায়। ফিল্‌মের অপর দিক্ কালো কাগজ দিয়ে ঢাকা থাকে, কাজেই আলোর মধ্যেই গোটানো ফিল্‌ম্ ক্যামেরায় ঢোকাতে কিংবা তা থেকে বার করে আনতে কোন অসুবিধে হয় না।



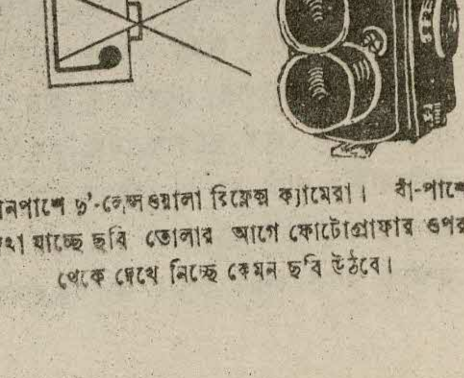
বাঁ-পাশে রিফ্লেক্স ক্যামেরা (এক-লেন্সওয়ালা), ডানপাশে দেখানো হয়েছে এই ক্যামেরায় ওপর থেকে ছবি দেখে নিতে হয়।

স্ন্যাপ্‌শট্‌ আর টাইম্‌ এক্সপোজার

ফোটো তুলবার সময় লেন্সের মুখটা কিন্তু মুহূর্তের জন্যই খুলে রাখা হয়, নইলে বেশিক্ষণ খুলে রাখলে বেশি আলো পড়ে সমস্ত ছবিটা এত গাঢ় হয়ে যাবে যে তা আর ছবি বলে বোঝা যাবে না। তেমনি, যদি প্রয়োজনের কম সময় খুলে রাখা যায়, তা হলেও ছবি হবে অস্পষ্ট। কতক্ষণ খুলে রাখতে হবে তা নির্ভর করে বাইরে আলোর জোর কতটা তার ওপর এবং যে প্লেটের বা ফিল্‌মের ওপর ছবি উঠছে সেটা কি ভাবে তৈরি—তার ওপর। যদি লেন্সের মুখ খুলেই পরমুহূর্তে আপনা থেকেই তা বন্ধ করে দেওয়া হয় তা হলে তাকে বলা হয় স্ন্যাপ্‌শট্‌। আর তার চাইতে আর একটু বেশি সময় খুলে রাখতে হলে তাকে বলা হয় 'টাইম্‌ এক্সপোজার'। "এক্সপোজার" বলতে আলো খাওয়ানো বলা যেতে পারে। এই টাইম্‌ এক্সপোজার কতক্ষণ দিতে হবে তা ফোটোগ্রাফারের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। ভালো ফোটোগ্রাফারকে অবশ্য আরও অনেক কিছু হিসেব করে নিয়ে কাজ করতে হয়। এইখানেই আনাড়ি ফোটোগ্রাফার আর কুশলী ফোটোগ্রাফারের মধ্যে তফাৎ।

প্লেট বা ফিল্‌মের গায়ে কি থাকে

ফোটোগ্রাফের প্লেট বা ফিল্‌মে কি করে প্রতিচ্ছবি স্থায়ী ভাবে ধরে রাখা যায় আবার সে কথায় আসা যাক। রূপো-লবণগুলোর ওপর আলোর প্রতিক্রিয়ার কথা আগেই বলেছি। এই রকম একটি রূপো-লবণ হচ্ছে সিলভার ব্রোমাইড,—রূপো আর ব্রোমিন দিয়ে যা তৈরি। এই সিলভার ব্রোমাইডই মাখানো থাকে ফোটোগ্রাফের প্লেট বা ফিল্‌মের ওপর। আজকাল অবশ্য বিশেষ বিশেষ ধরনের ফিল্‌মে ওর সঙ্গে অন্য রাসায়নিক মশলাও কিছু কিছু মাখানো থাকে কিন্তু আসল মশলা ঐটেই। লেন্সের মুখ খুলে দিলে আলো এসে পড়ে এই সিলভার ব্রোমাইডের ওপর, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। যেখানে বেশি আলো লাগে সেখানটা হয় বেশি কালো—

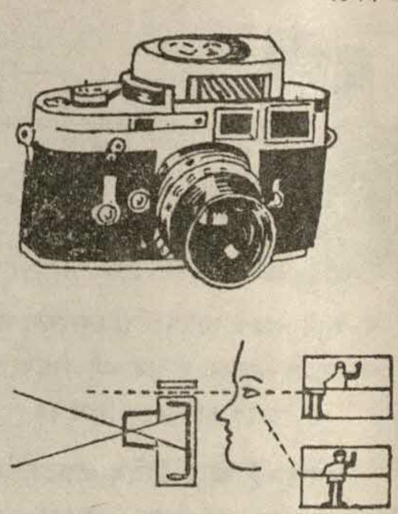


ডানপাশে দু'-লেন্সওয়ালা রিফ্লেক্স ক্যামেরা। বাঁ-পাশে দেখা যাচ্ছে ছবি তোলার আগে ফোটোগ্রাফার ওপর থেকে দেখে নিচ্ছে কেমন ছবি উঠবে।

অর্থাৎ সেখানে রূপোটা ব্রোমিন থেকে বেশি আলগা হয়ে আসে, যেখানে কম আলো লাগে সেখানটা হয় কম কালো। আর প্রতিচ্ছবি পড়ার কারণও তো আর কিছু নয়,—যে জিনিসটার ছবি উঠছে তার কোন অংশ থেকে বেশি আলো ঠিকরে আসছে, কোন অংশ থেকে কম আলো ঠিকরে আসছে, তারই জন্য তার প্রতিচ্ছবি উঠছে। নইলে তো সব কিছু লেপে একাকার হয়ে যেত।

ডেভালপ্ করা আর ফিক্স করা বলতে কি বোঝায়

সিলভার ব্রোমাইডের ওপর প্রতিচ্ছবি তো পড়ল, কিন্তু তাকে বাইরে টেনে বার করলেই তো আবার আলো লেগে সব একাকার হয়ে যাবে। কাজেই এর পরের কাজ হচ্ছে ছবিটাতে যাতে আর পরিবর্তন না হয়, পর পর তার ব্যবস্থা করা। এই প্রক্রিয়াগুলোকে ফোটোগ্রাফির ভাষায় বলা হয় ডেভালাপ্ করা এবং তা ফিক্স করা। আসল ব্যাপারটা এই : সিলভার ব্রোমাইডে আলো লেগে ব্রোমিন রূপো থেকে আলগা হয়ে গেল। সেটাকে কোন রাসায়নিক মশলার সাহায্যে সরিয়ে দিতে হবে। এই রাসায়নিক মশলাকেই বলা হয় ডেভালাপার। এ জন্য নানা ধরনের মশলার চলন আছে,—মিটোল, হাইড্রো-কুইনোন ইত্যাদি হরেক রকম রাসায়নিক মশলা। ডেভালাপার ব্রোমিনের সঙ্গে মিশে তাকে রূপো থেকে ছাড়িয়ে নেয়, কিন্তু তখনও প্রতিচ্ছবিটা স্থায়ী হয় নি, সেটাকে স্থায়ী করার জন্য এবার তাকে ডোবানো হয় আর একটা মশলায় যাকে চলতি কথায় বলা হয় হাইপো।



লাইকা মিনিয়েচার ক্যামেরা। এই ক্যামেরা দিয়ে ৩৫ মিলিমিটার মাপের মুভি বা সিনেমার ছবিও তোলা যায়। নীচের লোকটি ক্যামেরায় চোখ রেখে দু'টো টুকরো ছবি দেখতে পাচ্ছে। দু'টো টুকরো যখন একত্র হয়ে যাবে তখনই বোঝা যাবে ফোকাস্ ঠিক হয়েছে।

আসলে কিন্তু ও নামটা ঠিক নয়, জিনিসটা হচ্ছে সোডিয়াম থায়োসালফেট। সোডিয়াম থায়ো-সালফেটের কাজ হচ্ছে অপরিবর্তিত রূপো-লবণটুকুকে গুলে বের করে নেওয়া। সে কাজ সমাধা করতে পারলে ছবিটা আর বদলাবে না—একেবারে স্থায়ী হয়ে যাবে। এরই নাম ফিক্স করা। এবার প্লেট বা ফিল্মটা নিয়ে ভালো করে জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিলেই হ'ল।

তোমরা হয়তো ভাবছ এইবার একটা চমৎকার ছবি ফুটে উঠবে প্লেটের গায়ে। মোটেই তা নয়। ছবি উঠবে ঠিকই, কিন্তু সবই উল্টো-রঙা। ছবিতে যা হওয়া উচিত ছিল কালো তা হবে সাদা, আর যা হওয়া উচিত ছিল




বাঁ-দিকে নেগেটিভ ছবি, ডান দিকে পজিটিভ ছবি

সাদা তাই হয়ে যাবে কালো। তোমার হয়তো একমাথা কাঁচা কুচকুচে কালো চুল, কিন্তু ছবি দেখে মনে হবে ও যেন কোন থুথ্‌ড়ে বুড়োর পাকা চুল। এই উল্টো-রঙা ছবিকে তাই বলা হয় নেগেটিভ অর্থাৎ না-ধর্মী ছবি।

নেগেটিভ থেকে পজিটিভ

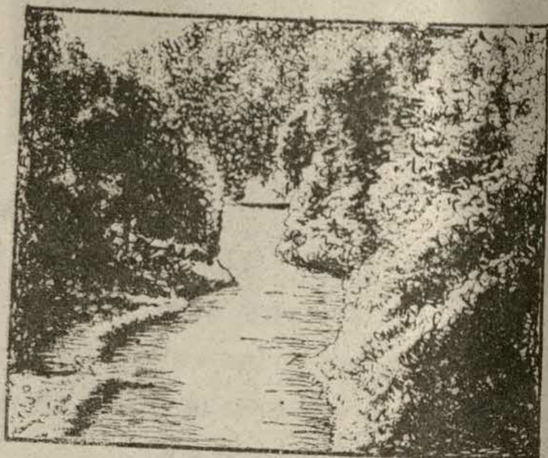
নেগেটিভ অর্থাৎ না-ধর্মী ছবিকে পজিটিভ অর্থাৎ হাঁ-ধর্মী ছবিতে রূপান্তরিত করা কিন্তু খুব কঠিন নয়। একখানা কাচ-বসানো ফ্রেমের গায়ে নেগেটিভটাকে সেঁটে দিয়ে তার পেছনে লাগিয়ে দিতে হবে আর একখানা রাসায়নিক মশলা-মাখানো কাগজ। রাসায়নিক মশলা বলতে সিলভার ব্রোমাইড গোছেরই একটা মশলা—তাই এরও নাম ব্রোমাইড পেপার। এই ব্রোমাইড পেপারের ওপরেও আলো পড়লে তা আলোর কম-বেশি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, তবে সিলভার ব্রোমাইডের মত অত তাড়াতাড়ি নয়। এইবার ঐ কাচের ফ্রেমের সামনে কোন উজ্জ্বল আলো রাখলে সে আলো নেগেটিভ ভেদ করে পেছনের ব্রোমাইড পেপারে গিয়ে পড়বে। নেগেটিভের যেখানটা বেশি কালো সেখানটা দিয়ে কম আলো আসবে, যেখানটা কম কালো সেখানটা দিয়ে বেশি আলো আসবে। ফল কি হবে? নেগেটিভে যা ছিল কালো ব্রোমাইড পেপারে তা হবে সাদা, নেগেটিভে যা ছিল সাদা ব্রোমাইড পেপারে তা হবে কালো। অর্থাৎ যা আমরা চাই। তা হলে তোমার কুচকুচে কালো চুল কালোই হয়ে যাবে, বুড়োদের মত পাকা দেখাবে না। কাজেই এই ছবির নাম হ'ল পজিটিভ। বলা বাহুল্য ফ্রেম থেকে বার করে পজিটিভ ছবি অর্থাৎ ব্রোমাইড পেপারে ওঠা ছবিটিও নিয়ে রাসায়নিক মশলায় ডুবিয়ে আগের মত ফিক্স বা স্থায়ী করে নিতে হবে। তারপর ধুয়ে

শুকিয়ে নিলেই হ'ল। ব্যস্, তৈরি হয়ে গেল তোমার মনের মত ছবি—হুবহু যেমনটি তুমি চাও।

নানান্ ধরনের ক্যামেরা

ফোটো তোলার ভিতরকার রহস্য মোটামুটি ভাবেই বললাম, কিন্তু আজকাল এর এত রকম উন্নতি হয়েছে যে তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে সে এক বিরাট মহাভারত হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমেই ধর ক্যামেরার কথা। আদিযুগের সেই বাক্সের মত সাদাসিধে বক্স ক্যামেরা এখনও চলছে, কিন্তু নতুন ধরনের ক্যামেরাও কম তৈরি হয় নি। এগুলিকে আমরা মোটামুটি তিন রকম ভাগে ভাগ করতে পারি। এদের মধ্যে বক্স ক্যামেরার ব্যাপারটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ। এর লেন্স এমন ভাবে বসানো যে প্রতিচ্ছবিটা সব সময় একই জায়গায় এসে পড়ে। ক্যামেরার মাথার দিকে একটা ছোট্ট অতিরিক্ত লেন্স বসানো থাকে যা দিয়ে ফোটো তোলার আগে যে জিনিসের ফোটো তোলা হচ্ছে তা ভালো করে দেখে নেওয়া যায়। ঐ লেন্সে যা দেখা যাবে ছবিতেও সেইটুকুই শুধু উঠবে। এই লেন্সটিকে বলা হয় ভিউ-ফাইণ্ডার। যে ফিল্মের ওপর ছবি উঠবে তা ক্যামেরার পেছন দিকে কাটিমে জড়িয়ে বসিয়ে দিতে হয়, তারপর চাবি ঘুরিয়ে ফিল্মের বিভিন্ন অংশ পর পর লেন্সের সামনে আনা হয়। লেন্সটা এমনিতে ঢাকা থাকে, বোতাম টিপে মুহূর্তের জন্য লেন্সের মুখ খুলে দিলেই ছবি উঠে যায়। এ ক্যামেরায় স্ন্যাপ্‌শটই ভালো ওঠে, টাইম এক্সপোজার দিতে গেলে খুব সাবধানে দিতে হয়। ক্যামেরা একটু নড়ে গেলেই সব ভেস্তে যাবে।

দ্বিতীয় ধরনের ক্যামেরা হচ্ছে ভিউ ক্যামেরা। এ ধরনের ক্যামেরাও অবশ্য বহুদিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু তাই বলে এর চলন বন্ধ হয় নি। এই ক্যামেরাগুলো দেখতে অনেকটা হারমোনিয়ামের বেলোর মত, —ভাঁজ করা চামড়া বা অনুরূপ কিছু দিয়ে





জরিপের কাজে ফোটোগ্রাফি : ওপরের ফোটো থেকেই নীচের ম্যাপটি তৈরি করা হয়েছে।

তৈরি। ভাঁজগুলোর জন্য ওটিকে ইচ্ছেমত টেনে বা চেপে ছোটবড় করা যায়; তার ফলে লেন্সের ভিতর দিয়ে যে প্রতিচ্ছবি আসে তার দূরত্ব ইচ্ছেমত কমানো-বাড়ানো যায়, বক্স ক্যামেরার মত তা সব সময়ে একই জায়গায় পড়ে না। এই ক্যামেরা সাধারণতঃ হাতের ওপর না রেখে তেপায়া স্ট্যাণ্ডের ওপর বসিয়ে ছবি তুলতে হয়। এতে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে ইচ্ছেমত পেছন দিক্‌টা কাৎ করে নেওয়া যায়, সামনের দিক্‌টা ওপরে তুলে বা নীচে নামিয়ে ধরা যায়। তার ফলে যে জিনিসের ছবি তুলবে তার স্বাভাবিক চেহারাই উঠে আসে। এ সুবিধে সাধারণ ক্যামেরায় নেই। প্রতিচ্ছবি ইচ্ছেমত সামনে বা পেছনে আনা যায় বলে তা অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভিউ ক্যামেরার পেছন দিকে থাকে একটা ঘষা কাচ, যার ওপর চোখ রেখে ছবিটা কি রকম উঠবে তা আগে-ভাগেই দেখে নেওয়া যায়। ছবি তুলবার সময় ঐ ঘষা কাচের জায়গায় প্লেট বা ফিল্‌ম্ বসিয়ে নিতে হয়।

তৃতীয় ধরনের ক্যামেরাকে বলা হয় রিফ্লেক্স ক্যামেরা। ভিউ ক্যামেরার সঙ্গে এর খানিটা মিল আছে, কারণ এখানেও একটা ঘষা কাচের ওপর কেমন ছবি উঠবে তা আগেভাগে জানতে পারা যায়; তবে এখানে ঘষা কাচটা ক্যামেরার পেছন দিকে থাকে না, থাকে ওপর দিকে। ক্যামেরার ভিতর একটা আয়না বসানো থাকে ট্যারছা ভাবে, ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে। তারই সাহায্যে ছবিটা প্রতিফলিত হয়ে ঘষা কাচের ওপর ফুটে ওঠে। সে সময় ফোটোগ্রাফের ফিল্‌ম্‌টা, ক্যামেরায় বসানো থাকলেও, সামনে একটা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। ফোটো তুলবার সময় একটা বোতাম টিপলেই বাঁকানো আয়না-খানা ওপরে উঠে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফিল্‌মের সামনেকার পর্দাটাও সরে যায়। ফলে লেন্সের ভিতর দিয়ে আলো ঢুকে ফিল্‌মের ওপর প্রতিচ্ছবির ছাপ এঁকে দিয়ে যেতে পারে।

কোন কোন রিফ্লেক্স ক্যামেরায় একটার জায়গায় হু'টো লেন্স থাকে। আসলে কিন্তু হু'টো লেন্সের একটাই ফোটো নেয়, বাকিটার কাজ শুধু ছবি ঠিক আসছে কিনা দেখা। অর্থাৎ এ যেন হু'টো ক্যামেরা একসঙ্গে বসানো। একটা আসল, একটা নকল। নকলটার সঙ্গে ফোটো-ফিল্‌মের কোন যোগাযোগ থাকে না। বক্স ক্যামেরার সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে এ-ক্ষেত্রে ছবিটা যত বড় উঠবে তত বড়ই দেখা যায়, বক্স ক্যামেরায় তা অনেক ছোট দেখায়।

আরও এক রকম ক্যামেরা আজকাল বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। একে বলে লাইকা মিনিয়েচার ক্যামেরা। এগুলো আকারে খুব ছোট কিন্তু একসঙ্গে ক্রমাগত অনেক ছবি তোলা যায় এতে। ৩৫ মিলিমিটার চওড়া সিনেমা তোলার ফিল্‌মের মত ফিল্‌মের সাহায্যে এই ক্যামেরায় ফোটো তোলা হয়। ছবি যাতে স্পষ্ট ওঠে তার জন্য এর মধ্যে একটা বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হয়।

ফোটো তোলায় নিত্য নূতন উন্নতি

ক্যামেরার লেন্স একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ। লেন্সের ভালোমন্দর ওপর ছবির ভালোমন্দ নির্ভর করে অনেকখানি। তেমনি যে ফিল্‌মের ওপর ফোটো উঠবে সেটির ওপরও

অনেক কিছু নির্ভর করে। সাধারণতঃ দু'রকমের ফিল্ম্ ব্যবহার করার রেওয়াজ আছে—অর্থোক্রোমেটিক আর প্যান্‌ক্রোমেটিক। প্রথম যুগের ফিল্‌ম্‌গুলোতে বিভিন্ন রংএর পার্থক্য ধরা পড়ত না। তারপর অর্থোক্রোমেটিক ফিল্‌ম্ আবিষ্কৃত হ'ল, এতে লাল আলো ছাড়া আর সব আলো ব্যবহার করা চলে। কাজেই এক্সপোজার দেওয়া হয়ে গেলে এ জাতীয় ফিল্‌ম্ অন্ধকার ঘরে লাল আলো জ্বালিয়ে সেখানে ডেভালাপ্ করা চলে। প্যান্‌ক্রোমেটিক ফিল্‌ম্-এ লাল আলোও ধরা পড়ে। কাজেই এগুলো ডেভালাপ্ করতে হয় একেবারে অন্ধকার ঘরে। প্যান্‌ক্রোমেটিক ফিলম্-এ কিন্তু অনেক উৎকৃষ্ট ছবি ওঠে আর কৃত্রিম আলোতেও এই ফিলম্ ব্যবহার করা চলে। তাই আজকাল এই ধরনের ফিল্‌মের কদর সবচেয়ে বেশি।

ফিল্‌মের মত আলোও ফোটোগ্রাফির একটি বিশেষ বিবেচনার জিনিস। বাইরে প্রাকৃতিক আলোর মধ্যে ফোটো তুলতে হলে এ বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার হতে হয়। আজকাল তাই অনেক ক্যামেরার সঙ্গেই কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা থাকে। লেন্স খুলবার বোতাম টিপলেই সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার ওপর ফ্ল্যাশ্ লাইট জ্বলে ওঠে, ফোটো তোলার প্রয়োজনীয় আলো তা থেকেই পাওয়া যায়। ঘরের ভিতর স্টুডিওতে আগে কৃত্রিম আলো সেট্ করে নিয়ে তারপর ফোটো তুলতেও কোনই অসুবিধে নেই। সিনেমার ফোটো তুলতে এই ব্যবস্থাই করা হয়। লেন্স কোন্ অবস্থায় কতক্ষণ খোলা থাকবে তা ফোটোগ্রাফারকে এ যাবৎ অভিজ্ঞতা থেকেই ঠিক করতে হ'ত, এখন ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক সেলের সাহায্যে আপনা থেকেই তা ঠিক করা যায়। এমন কি ইলেক্‌ট্রনিকের সাহায্যে আপনা আপনি ফোটো উঠিয়ে নেওয়াও সম্ভব হয়েছে আজকাল। এমনিতে খুব তাড়াতাড়ি ফোটো তুলতে হলেও এক সেকেণ্ডের ৫০০ ভাগের কম সময়ে তা তোলা সম্ভব নয়, কিন্তু ইলেকট্রনিকের সাহায্যে এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগ সময়ের মধ্যেই ফোটো এক্সপোজার দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এর ওপর আছে রঙিন ছবি। আগেকার দিনে সাদা-কালোয় আঁকা ছবিই শুধু তোলা যেত ক্যামেরায়। এখন একই ফিল্‌মে বিভিন্ন রং ফিল্টার করার ব্যবস্থা করে এক এক্সপোজারেই রঙিন ছবি তোলার পদ্ধতি বেরিয়েছে। এগুলি ডেভালাপ্ এবং প্রিন্ট করার পদ্ধতি অবশ্য আলাদা।



ফোটোগ্রাফির সাহায্যে তোলা এই ছবিখানিতে মুখে কোন শেড বা ছায়া না ফেলে সৌন্দর্যসৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে।

কলির দিব্যচক্ষু

ক্যামেরা অর্থাৎ ফোটোগ্রাফি এখন আমাদের জীবনের প্রতিটি ব্যাপারের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেছে যে ও-ছাড়া সভ্য জগতের কথা আমরা যেন ভাবতেই পারি না। যেমন ধর, ভোরে উঠেই খবরের কাগজে দেখছি কোথায় কি ঘটনা ঘটল তার টাটকা ছবি। ফোটোগ্রাফির সাহায্য না পেলে তা তো আর সম্ভব হ'ত না! শুধু ফোটো তোলাই নয়, সেই ছবির ব্লক্ করে কাগজে ছাপবার ব্যবস্থা করাও ক্যামেরার একটি কাজ। শুধু খবরের কাগজের ছবিই নয়, যেখানে যত ছবি ছাপা হচ্ছে—তা সে বইএর ছবিই হোক বা রঙচঙে মোড়কের কাগজের ছবিই হোক বা ঐ রকম আর কিছুর ছবিই হোক, ক্যামেরা না থাকলে তার কোনটাই সম্ভব হ'ত না। সিনেমা বা চলচ্চিত্র এ যুগের একটি বড় অবদান। শুধু আনন্দ দেবার জন্তই নয়, শিক্ষাদীক্ষা এবং জীবনের নানা প্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে সিনেমা আজ অপরিহার্য। ফোটোগ্রাফির সাহায্য না পেলে এই সিনেমা কখনও সম্ভব হ'ত না। নিউজ রীল বা সংবাদ-চলচ্চিত্রও তো ক্যামেরারই দান।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও ফোটোগ্রাফির দান রয়েছে অবিশ্বাস্ত রকমের। ক্যামেরার সঙ্গে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স বসিয়ে অদৃশ্য জীবাণু-জগতের ছবি তোলা হচ্ছে—যা নাকি চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তর এনেছে। এক্স-রে ফোটো তুলে শরীরের অদৃশ্য অংশের ছবি দেখে অস্ত্রচিকিৎসার পথ কত সহজ হয়ে গেছে! অদৃশ্য আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে ফোটো তুলে জাল দলিল ধরা পড়ছে। অদৃশ্য ইনফ্রা-



ফোটোগ্রাফিকে চিত্রশিল্পের মতও ব্যবহার করা যায়। একটি বৃদ্ধের ছবিতে একটা দিক্ কালো রেখে এবং অন্য দিকটায় আলো ফেলে হাতে-আঁকা ছবির মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

রেড রশ্মির সাহায্যে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরের ছবি, কুয়াশা-ভেদ-করা ছবি ইত্যাদি অসম্ভব অসম্ভব ছবি তোলা হচ্ছে। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে ছবি তুলে একটা জিনিসকে লক্ষ গুণ বড় করে দেখা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানী আজ টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে দূর দূরান্তরের দৃশ্য তো বটেই—সুদূর চাঁদের নানা দৃশ্য, এমন কি চন্দ্র-অভিযানের প্রতিটি খুঁটিনাটি দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছেন। ক্যামেরার সঙ্গে দূরবীনের লেন্স বসিয়ে দূর আকাশের গ্রহ-তারার খবরও একে একে টেনে বার করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

এ যুগের ক্যামেরা শব্দের ফোটো তুলছে, ভূমিকম্পের কাঁপুনির ফোটো তুলছে, হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনির ফোটো তুলছে, আকাশে

বাতাসের চাপের তারতম্যের ফোটো তুলছে, এমন কি পরমাণু কি করে ভেঙ্গে যায় তার হদিস দিতেও পিছপা হচ্ছে না। ফোটোগ্রাফির সাহায্য না পেলে এ যুগের বিজ্ঞানীর গবেষণা অনেকখানিই থেমে থাকত।

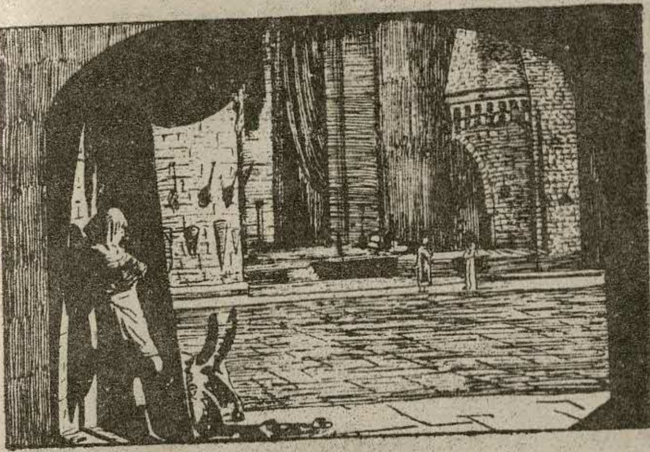
মূল্যবান্ দলিলপত্র, পুঁথিপত্র, বই ইত্যাদি নকল করে রাখার কাজে ক্যামেরার জুড়ি নেই। ফোটোগ্রাফের সাহায্যে ঐ সব দলিল বা পুঁথিপত্রের খুব ক্ষুদে ক্ষুদে ফোটো,—যাকে বলা হয় মাইক্রোফোটো,—তুলে রাখা হয়। এতে জায়গা খুব কম লাগে। ছোটদের বিশ্বকোষ বা তার চেয়েও বড় মাপের একটি পৃষ্ঠার ছবি হয়তো একটা ডাকটিকেটের মত ছোট ফোটোর মধ্যেই আঁটিয়ে রাখা যায়। যখন দরকার হবে, এন্‌লার্জার যন্ত্রে বসিয়ে সেই ছোট ফোটোটিকে আবার আগের মত বা তার চেয়েও বড় করে নিয়ে পড়তে কোনই কষ্ট নেই। আর ঐটুকু ফোটোর মধ্যে থাকায় স্থান সংকুলানের প্রশ্নও ওঠে না। এই ভাবে বিরাট বিরাট লাইব্রেরীর সমস্ত দরকারী বইএর মাইক্রোফোটো অতি অল্প জায়গায় রেখে দেওয়া যায়। যুদ্ধবিগ্রহের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে দরকারী কাগজপত্র রক্ষা করার জন্য এই রকম মাইক্রোফোটো আজকাল হামেশাই ব্যবহার করা হচ্ছে।

বাস্তব জীবনে ফোটোগ্রাফিকে আরও কত রকমে যে কাজে লাগানো হচ্ছে তা আর কি বলব! এরোপ্লেনে উঠে আকাশ থেকে ফোটো তুলে সেই ছবি দিয়ে দেশের মানচিত্র তৈরি করা হচ্ছে। বিশাল বিশাল পাহাড়-পর্বত, মাঠ-প্রান্তর, সমুদ্র ইত্যাদির সঠিক মাপজোঁক করতে এর চাইতে ভালো উপায় বোধ হয় আর নেই। সমুদ্রের তলাকার রকমারি দৃশ্য আজ আর আমাদের কাছে নতুন নয়। সমুদ্রের নীচে নেমে কৃত্রিম আলো ছড়িয়ে ডুবুরীরা সে সব ছবি, সে সব দৃশ্যের চলচ্চিত্র তুলে আনছেন। অতি দ্রুত ফোটো তোলার সাহায্য নিয়ে কত অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি যে তোলা যায় তা আমরা ভাবতেও পারি না। একটা কাচের গ্লাস ভেঙ্গে পড়ছে, একটা ডিম ফেটে যাচ্ছে, একটা বাটির মধ্যে জল পড়ে ফোঁটাগুলো কি ভাবে ছিটকে যাচ্ছে, তার প্রত্যেকটি ধাপ আজ ফোটোগ্রাফির সাহায্যে ধরে রাখা যায়। একেই বোধ হয় বলে দিব্যদৃষ্টি!

যে ছবি নড়ে বেড়ায়

এমন এক সময় ছিল যখন ছবি নড়েচড়ে বেড়ায়, হাসে, কাঁদে, মারামারি করে—এ সব কথা বললে লোকে বিশ্বাস করা দূরে থাক, যে বলছে তার মাথা ঠিক আছে কিনা সেই সন্দেহই করত। এখন, সিনেমার যুগে, এ কথা শুনে আর কেউ অবাক্ হবে না; কারণ ছবি এখন শুধু নড়েই বেড়ায় না, এমন কি কথাও বলে এবং সাধারণ মানুষের মতই সব কিছু করে বেড়ায়। নিজের চোখেই তো তা আমরা দেখছি।

সত্যি, সিনেমা হলে বসে পর্দার দিকে তাকালে মনে হবে ছবিরও বুঝি প্রাণ আছে, সুখদুঃখ, অনুভূতি আছে, সজীব মানুষের যা কিছু গুণাগুণ সবই বুঝি রয়েছে তার মধ্যে। আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। সিনেমার ছবিও ছবিই—যে কোন ছবির মত সেও একটা জড় পদার্থ। ওর ঐ



রবিন্ হুড্ চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য (স্টুডিওর ভিতরে তোলা)

জের কাটবার আগেই দ্বিতীয়টি এসে তার সঙ্গে মিশে যাবে—আর মনে হবে দু'টি বুঝি একই দৃশ্য। একটা খুব ছোট পরীক্ষার সাহায্যে তোমরা নিজেরাই এটি পরখ করে দেখতে পার।

একটা ছোট কার্ডবোর্ডের দু'পাশে একই লাইনে দু'টো ফুটো করে তার সঙ্গে দু'টো সুতো বেঁধে নাও। এবার কার্ডবোর্ডের এক পিঠে আঁক একটা পাখী, অন্য পিঠে ঠিক সেই জায়গায় আঁক একটা পাখীর খাঁচা। এবারে দু'হাতে দু'দিক্‌কার সুতো ধরে এমন ভাবে পাক দিতে থাক যাতে কার্ডবোর্ডটা খুব দ্রুত ঘুরতে থাকে। দেখবে পাখীটা খাঁচার মধ্যে ঢুকে গেছে। ব্যাপারটা আর কিছু না। পাখীটা দেখবার পর এক সেকেণ্ডের ২৩ ভাগ সময় পার হওয়ার আগেই তুমি খাঁচাটা দেখতে পাচ্ছ, তাই দু'টো একাকার হয়ে গিয়ে মনে হচ্ছে পাখীটাই বুঝি খাঁচার মধ্যে ঢুকে রয়েছে।

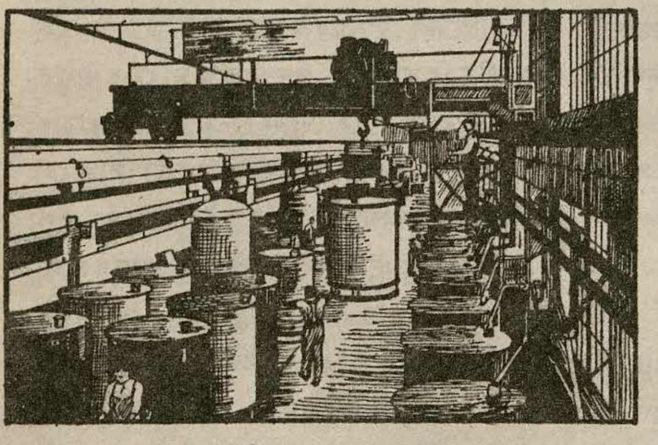
চালচলন সবই বিজ্ঞানের কৌশল মাত্র, বিজ্ঞানের ফাঁকি বললেও হয়তো ভুল বলা হবে না।

কি করে সম্ভব

সিনেমা কি করে সম্ভব হয়েছে এবার সে কথায় আসা যাক্। আগেই বলেছি, আমরা যখন কোন জিনিস দেখি তখন চোখের তারার সাহায্যে চোখের মধ্যে তার প্রতিচ্ছবি পড়া মাত্রই কিন্তু আমরা সত্যি করে দেখি না। আমাদের চোখের সঙ্গে আমাদের মগজের যে স্নায়ুর যোগ আছে তারই সাহায্যে যখন মগজে সাড়া জাগে তখনই হ'ল সত্যিকার দেখা। চোখের সামনে কোন দৃশ্য এসে যদি সঙ্গে সঙ্গে তা সরে যায় তা হ'লেও তার সাড়া সঙ্গে সঙ্গে মগজ থেকে সরে যায় না—আরও একটুক্ষণের জন্য তা মগজের মধ্যে যেন জেগে থাকে। ঐ সময়টা অবশ্য খুব কম,—এক সেকেণ্ডের ২৩ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কাজেই ঐ সময়টুকুর মধ্যে যদি অন্য কোন দৃশ্য এসে আমাদের চোখের সামনে হাজির হয় তা হ'লে প্রথমটির

সিনেমা যে সম্ভব হয়েছে তাও চোখের এই গুণটির জন্যই। (গুণ বলবে না দোষ বলবে তা তোমরাই ভেবে দেখো।) মনে কর তোমার সামনে পর পর অনেকগুলি ফোটো সাজানো আছে। প্রথমটিতে তুমি হাতটা টেবিলের বেশ একটু ওপরে ধরে রেখছ, তোমার আঙ্গুলগুলো সব একত্র হয়ে যেন কিছু ধরবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তার পরের ছবিটায় তুমি হাতটা আর একটু নামিয়েছ; তার পরেরটিতে আর একটু। এই ভাবে পর পর এক একটি

ফোটোতে হাত নামাতে নামাতে একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে তুমি টেবিলের ওপর একটা পেনসিলে হাত দিয়েছ। এর পরের ফোটো-গুলিতে তুমি পেন্সিলটা ধরে পর পর ওপরে তুলছ। প্রথমে একটু ওপরে, তারপর আর একটু—এই ভাবে। প্রত্যেকটিই এক-একটা আলাদা ফোটো, কিন্তু টেবিল থেকে পেন্সিল তোলার বিভিন্ন ভঙ্গী এক একটা ফোটোতে ফুটে উঠেছে। এখন ঐ ফোটোগুলি যদি একটার পর একটা খুব দ্রুতগতিতে,—সেকেণ্ডের ২৩ ভাগেরও কম সময়ের মধ্যে তোমার চোখের সামনে দিয়ে টেনে নেওয়া যায় তা হলে দেখবে তুমি টেবিল থেকে পেন্সিলটা হাত দিয়ে তুলে নিচ্ছ ছবিতে এই রকমই দেখা যাবে। সিনেমার ছবিও ঠিক এই ভাবেই দেখানো হয়। অর্থাৎ কোন কিছুর নড়াচড়ার প্রতিটি ভঙ্গীর পৃথক্ পৃথক্ ফোটো তুলে সেগুলো খুব দ্রুতবেগে চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আর সব মিলে একাকার হয়ে মনে হয় বুঝি ছবিটাই ঐ ভাবে নড়ছে।



ফিল্ম্ তৈরির কারখানার একটি অংশ

প্রথম সজীব ছবি তোলার চেষ্টা

সব-প্রথম যিনি এই রকম সজীব ছবি তোলবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর নাম ব্রীজ। তাঁর পদ্ধতিটি অভিনব হলেও তাকে খুব সহজ পদ্ধতি নিশ্চয়ই বলা চলে না। অনেকগুলি ক্যামেরার সাহায্যে পর পর অনেকগুলি ফোটো নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। পদ্ধতিটা ছিল এই রকম ঃ গোটা চব্বিশেক ক্যামেরায় ফোটো প্লেট ভরে নিয়ে তিনি একদিন চলে গেলেন ঘোড়দৌড়ের মাঠে, তারপর তাক্ বুঝে ক্যামেরাগুলিকে সেখানে সাজিয়ে ফেললেন। প্রত্যেকটি ক্যামেরার সঙ্গে বাঁধা রইল একটি করে সুতো, সুতোগুলো এমন ভাবে বাঁধা যে তাতে টান পড়লে ক্যামেরার লেন্স আপনা-আপনিই চকিতের জন্য খুলে গিয়ে তাতে ফোটো উঠে যায়। সেই সুতোগুলির অপর প্রান্ত রেখে দেওয়া হ'ল মাঠে যেখানে ঘোড়াগুলো দৌড়বে। উদ্দেশ্য, ঘোড়াগুলি যখন দৌড়বে তখন তাদের পায়ে ঐ সুতো লেগে সেই টানে ক্যামেরায় তাদের দৌড়বার ছবি উঠে যাবে। এক-একটা ক্যামেরায় এক-একটা ভঙ্গীর ছবি।

ব্রীজ যা ভেবেছিলেন তাই হ'ল। সত্যিই সে রকম ছবি পাওয়া গেল এবং সে ছবি দ্রুত-বেগে টেনে নিয়ে চলন্ত ঘোড়ার ছবিও দেখতে পাওয়া গেল।

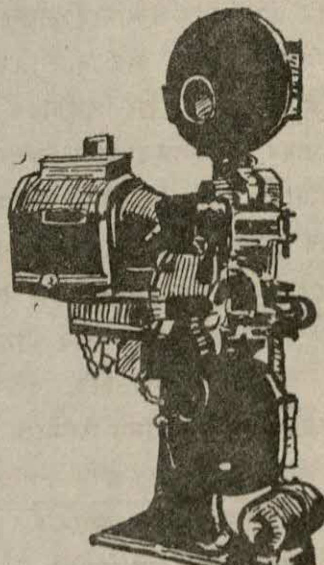
কিন্তু এ পদ্ধতিটি যে ব্যব-হারিক ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারে না তা তো বোঝাই যাচ্ছে। প্রতিটি ভঙ্গীর জন্য যদি একটা করে পৃথক্

ক্যামেরা লাগে তা হ'লে একটা গোটা বইএর দৃশ্য তুলতে কত হাজার হাজার—অগুণতি ক্যামেরা লেগে যাবে তার ঠিক নেই। কাজেই ব্রীজের এই প্রথম চলন্ত ছবি ইতিহাসের দিক্ থেকে যতই রোমাঞ্চকর হোক না কেন, বাস্তব জগতে কোনও সম্ভাবনার পথ দেখাতে পারল না।

সত্যিকার চলচ্চিত্র

কিন্তু ওপরের বাধা দূর হতে বেশি সময় লাগল না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল অতগুলো ক্যামেরার কোনই দরকার নেই, একটি ক্যামেরা দিয়েই কাজ হাসিল হতে পারে যদি খুব দ্রুতবেগে ফোটো তুলে নেওয়া যায় আর ফোটো তোলার সঙ্গে সঙ্গে যার ওপর ফোটো উঠছে সেই পর্দাখানাকে সরিয়ে সরিয়ে নেওয়া যায়। প্লেটের ওপর ফোটো তুলতে গেলে অবশ্য এ কাজটা সম্ভব নয়, কিন্তু ইতিমধ্যে প্লেটের বদলে ফিল্‌মের প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। সেলুলয়েডের তৈরি স্বচ্ছ ফিতে—প্লেটের মতই তাতে রাসায়নিক মশলা মাখানো—এরই নাম ফিল্‌ম্। প্লেটের মত ক্যামেরার মাপে টুকরো টুকরো করে কাটা নয়—এক-একটা ফিতে ইচ্ছে করলে শত শত ফুট লম্বা করে তৈরি করতে কোন বাধা নেই, আর ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে ক্যামেরার মধ্যেই কাটিমের গায়ে জড়িয়ে রাখাও কঠিন নয়।

এই ভাবেই তখন ছবি তোলা শুরু হ'ল। শত শত ফুট লম্বা ফোটো ফিল্‌ম্ কাটিমে জড়িয়ে ক্যামেরার মধ্যে ভরে দিয়ে ক্রমাগত ফোটো নিয়ে নেওয়া হতে লাগল। প্রতি সেকেণ্ডে অসংখ্য ছবি—পর পর প্রতিটি ভঙ্গীর ছবি। আর ছবি ওঠা মাত্র ফিতেটা অর্থাৎ ফিল্‌ম্‌টা আপনা-আপনি ক্রমাগত সরে সরে গিয়ে আর একটা কাটিমে—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় রীল,—তাইতে গুটিয়ে যেতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ফিল্‌মের পরবর্তী অংশ এসে হাজির হতে লাগল লেন্সের সামনে। এর আগে টেবিল থেকে পেন্সিল তোলার উদাহরণ দিয়েছিলাম। সে দৃশ্যও এই ভাবে অতি সহজে তোলা যেতে পারে। এজন্য তোমাকে



প্রজেক্টর

ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, হাত বাড়িয়ে প্রতিটি ভঙ্গী দেখাতে হবে তা মনে ক'র না। তুমি যেমন স্বাভাবিক ভাবে পেন্সিল তুলবার তেমনি তুলবে, কিন্তু ক্যামেরা দ্রুতগতিতে তার প্রতিটি ভঙ্গী পৃথক্ পৃথক্ ফোটোতে তুলে নেবে—তা সে ২৫।৩০ খানা ছবিতেই হোক কিংবা ২০০।৩০০ খানাতেই হোক।

বলা বাহুল্য, এজন্য বিশেষ ধরনের ক্যামেরা তৈরি হতে লাগল,—যার ছবি তোলার ক্ষমতা,

গতিবেগ বললে আরও ঠিক বলা হয়,—সাধারণ ক্যামেরার তুলনায় অনেক বেশি। সেকেণ্ডে ২০।৫০ খানা থেকে শুরু করে ৫।৬ হাজার বা তারও বেশি ছবি তোলা সম্ভব হ'ল এই সব ক্যামেরায়। এখন এগুলিকে বলা হয় মুভি-ক্যামেরা। মুভি মানে মুভিং পিক্‌চার অর্থাৎ চলন্ত ছবি। সিনেমাকেও মুভি বলা হয় অনেক সময়। আমাদের ছেলেবেলায় ওকে বলা হ'ত বায়োস্কোপ। এখন আর ও নাম বুড়োদের মুখে ছাড়া বড় একটা শোনা যায় না। মোশান্ পিকচার, পিক্‌চার শো বা শুধু পিক্‌চারও কেউ কেউ বলে, এমন কি ফিল্‌ম্ দেখা বা ফিল্‌ম্ শো দেখা কথাটাও চালু হয়েছে। ফিল্‌ম্ বা সেলুলয়েডের (আজকাল প্লাস্টিকেরও) ফিতের ওপর ছবি তোলা হয় বলেই ঐ ছবিকেও ফিল্‌ম্ বলা হয়। বাংলাতেও নানা রকম নামকরণ হয়েছে ওর। কেউ বলে ছায়া-ছবি, কেউ বলে চলচ্চিত্র,—এই রকম কত নাম। তা নামে কিছু এসে যায় না, সিনেমা যে এখন কি রকম জনপ্রিয় হয়েছে সে কথা কে না জানে?

কি করে সিনেমা দেখানো হয়

কিন্তু ছবি তুললেই তো শুধু হবে না, সেগুলোকে দ্রুতবেগে এবং বড় করে পর্দার গায়ে ফেললে তবেই না তা দেখবার উপযোগী হবে। প্রথম ব্যাপারটিকে, ওটাই আসল, যদি প্রথম পর্ব বলি তা হলে দ্বিতীয়টিকে সিনেমার দ্বিতীয় পর্ব বলতে হবে।

সিনেমা যেখানে দেখানো হবে সেখানে ঝোলানো থাকে একটা বিরাট পর্দা। পর্দা সাদা হওয়া চাই, নইলে ছবি স্পষ্ট হবে না। পর্দাটি থাকে দর্শকদের চোখের সামনে, কিন্তু যে যন্ত্রটি দিয়ে পর্দার ওপর ছবি দেখানো হয় সেটি থাকে দর্শকদের পেছনে, একটু ওপর দিকে। একে বলা হয় প্রজেক্টর।



চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য : এডওয়ার্ড হর্টন ও এড্‌না অলিভার (পুওর রিচ্ ছবিতে)

এ রকম প্রজেক্টর তোমরা ম্যাজিক লণ্ঠনেও দেখে থাকবে। প্রজেক্টরের মধ্যে থাকে একটা তীব্র আলো,—যা নাকি ফোকাস্ করে পর্দার ওপর ফেলা যায়, আর দু'খানা লেন্স। সিনেমার অসংখ্য ছবি তো আর বড় করে তোলা যায় না—তোলা হয় ছোট্ট করে; প্রায় ডাকটিকেটের মতই এক-একটা ফোটো লম্বা ফিতের গায়ে পর পর আঁকা। কাটিম বা রীলে জড়ানো সেই ফিতে প্রজেক্টরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফোটোগুলো কিন্তু নেগেটিভ আকারেই থাকে, ওকে আগে পজিটিভ করে নেবার কোনই দরকার নেই। কারণ, যখন আলো দিয়ে পর্দায় ওকে ফেলা হবে তখন তো তা আপনিই পজিটিভ হয়ে যাবে। শুধু দরকার ওকে আকারে খুব বড় করে নেওয়া,—যাকে বলা হয় এন্‌লার্জ করা। প্রজেক্টরের ভিতরকার লেন্সের সাহায্যেই এই এনলার্জ করা হয়।

তা হ'লে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? ডাক-টিকেটের মত চওড়া শত শত ফুট লম্বা ফিল্মের গায়ে তোলা হ'ল নানান্ দৃশ্যের ছবি—যার প্রত্যেকটি ছবিতে বিভিন্ন ভঙ্গী ধরে রাখা আছে। সেই নেগেটিভ ফিল্ম্ কাটিমে জড়িয়ে প্রজেক্টরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রজেক্টর চলার সঙ্গে সঙ্গে সেই ফিল্ম্ তার সামনেকার তীব্র আলো আর লেন্সের সামনে দিয়ে দ্রুতবেগে সরে সরে এসে আর একটা কাটিমে গুটিয়ে যেতে লাগল। দ্রুতবেগে বলতে সেই এক সেকেণ্ডের ২৩ ভাগেরও কম সময় বুঝতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছবি পজিটিভ হয়ে অর্থাৎ স্বাভাবিক চেহারায় বিরাট আকৃতি নিয়ে অপর দিকে রাখা পর্দার ওপর ফুটে উঠল। দর্শকেরা অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল ছবি কি ভাবে নড়ছে, হাঁটছে, হাসছে, কাঁদছে, মারামারি করছে, আরও কত কি করছে!—ঠিক যেন জ্যান্ত ছবি। ছবি দেখাবার সময় বাইরের আলো ঢুকলে ছবিকে অস্পষ্ট করে দেবে, চাই কি বেমালুম অদৃশ্যও করে দিতে পারে। তাই ঘর অন্ধকার করে দেওয়া হয়। বাইরে, মাঠে সিনেমা দেখাতে হ'লে রাতের অন্ধকার ছাড়া দিনের আলোয় তা সম্ভব হয় না।

নির্বাক্ থেকে সবাক্ ছবি—কিনেটোফোন

প্রথম যুগের সমস্ত ছবিই ছিল "সাইলেন্ট" অর্থাৎ নির্বাক্। ছবি জ্যান্ত মানুষের মত নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে এইটেই ছিল অভাবনীয়। সে ছবি যে আবার কখনও কথা বলতে পারবে এ সম্ভাবনা কেউ মনেও স্থান দেয় নি। কথা বলার সময়ে ছবির অভিনেতা ঠোঁট আর মুখ অবশ্যই নাড়ত এবং তা নাড়ার ভঙ্গী দেখে সে যে কিছু একটা বলছে এবং সময় সময় কি বলছে তাও হয়তো আন্দাজ করা যেত। কিন্তু সে কথার সঙ্গে কোন আওয়াজ বেরোত না। সুতরাং তার বক্তব্য বিষয় লিখে নিয়ে পর্দার ওপর ফেলা হ'ত, পর্দায় ফুটে ওটা লেখা দেখে দর্শকেরা বুঝতে পারত অভিনেতা কি কথা বলছে।

কিন্তু এ তো তা হ'লে হ'ল মূক-বধিরদের অভিনয়! ছবিকে যদি জ্যান্তই করা গেল তবে জ্যান্ত মানুষের মত তাকে দিয়ে কথা বলাতে না পারলে আর হ'ল কি? বিজ্ঞানীরা এবার সেই চেষ্টা শুরু করলেন।

সব-প্রথম ছবিকে দিয়ে কথা বলাবার চেষ্টা করলেন এডিসন সাহেব। টমাস্ আল্ভা এডিসন—যিনি ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার করে মানুষের গলার স্বরকে রেকর্ডে ধরে রাখবার কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। সিনেমায় যখন কোন অভিনেতা অভিনয় করবেন তখন তাঁর কথাবার্তাও যদি রেকর্ড করে নেওয়া হয় আর পর্দার ছবি দেখাবার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই রেকর্ডগুলি বাজানো যায় তা হ'লে মনে হবে ঐ ছবিগুলোই কথাবার্তা বলছে। এডিসন মাথা খাটিয়ে ঐ রকম একটি যন্ত্র বানিয়েও ফেললেন। এই যন্ত্রে ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো রেকর্ডে তোলার ব্যবস্থা করা হ'ল। এডিসন যন্ত্রটির নাম দিলেন কিনেটোফোন। এডিসনের এই কিনেটোফোনই সবাক্ চলচ্চিত্রের পূর্ব-পুরুষ। প্রথম সবাক্ চিত্রও বলা চলে একে।

কিন্তু এডিসন ব্যাপারটা যতটা সহজ হবে ভেবেছিলেন আসলে তা হ'ল না। ছবি আর রেকর্ড যদি হুবহু একসঙ্গে না চলে তা হ'লে

ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে এবং এক্ষেত্রেও সময় সময় তা হতে লাগল। ছবির অভিনেতা যখন হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচামেচি করছে তখন হয়তো কোন শব্দই শোনা গেল না; তার পর যেই সে অভিনেতা কথা বন্ধ করে অন্য কাজে হাত দিয়েছে অমনি শুরু হয়ে গেল তার চেচাঁমেচি। এতে লোকে হাসবে না তো কি? এডিসনের কিনেটোফোন তাই সবাক্ চিত্রের পথপ্রদর্শক হলেও আসর জমাতে পারল না।

সত্যিকার টকি তুলতে দরকার শব্দের ছবি

বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, ছবিকে দিয়ে যদি সত্যি কথা বলাতে হয় তা হ'লে অভিনয়ের ফোটো তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার শব্দেরও ফোটো তুলতে হবে। তা না হলে ছবিকে দিয়ে কোনমতেই ঠিকমত কথা বলানো যাবে না। এবার সেই চেষ্টাই শুরু হ'ল।

শব্দের ফোটো শুনে খুব অবাক্ লাগছে, না? কিন্তু ব্যাপারটা যেমন অসম্ভব মনে হচ্ছে আসলে তা নয়।

শব্দটা আসলে বাতাসের কাঁপুনি ছাড়া আর কিছু নয়। কথা বললে বা অন্য কোনও ভাবে শব্দ করলে বাতাসে একটা কাঁপুনি ওঠে। সেই কাঁপুনি যদি হুবহু সেই ভাবে আমাদের কানের পর্দায় এসে আঘাত করে তা হ'লে অবিকল সেইভাবেই শব্দটা শোনা যাবে। কাঁপুনির ভঙ্গী অনুযায়ী শব্দটাও সেই রকম হবে। আজকাল এই শব্দকে আমরা বিদ্যুতের সাহায্যে অনেক জোরাল করে দিতে পারি। আগেকার দিনে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে হলে গলার জোর না থাকলে শ্রোতারা তা শুনতে পেত না। ভালো বক্তা হতে হ'লে গলার জোর থাকা চাই-ই। এখন আর তা দরকার হয় না। বক্তৃতা দেবার সময় মুখের সামনে একটা মাইক বসিয়ে দিলেই হ'ল। মাইকের সামনে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক গলায় কথা বললেও তা বহুদূরের লোকেরা শুনতে পায়—ঠিক মনে হয় বক্তা বুঝি উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করছে। উৎসব বা তথাকথিত "ফাংশনের" সময় এই মাইকের উৎপাতে অনেক সময় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহিও করে। মাইক কথাটা কিন্তু সংক্ষেপ করে বলা হয়—আসলে ওর নাম মাইক্রোফোন। মাইক্রোফোনের ভিতরকার ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়। মাইক্রোফোন যন্ত্রের সামনের দিকে থাকে একটা পাৎলা পর্দা ও তার সঙ্গে যুক্ত থাকে বিদ্যুৎপ্রবাহ। মাইক্রোফোনের সামনে মুখ রেখে কথা বললে মুখের সামনের বাতাস যে ভাবে কাঁপতে থাকে মাইক্রোফোনের



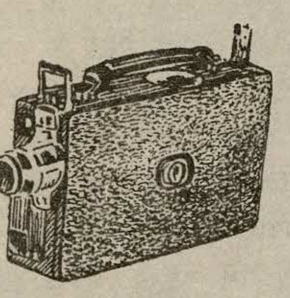
স্টুডিওর বাইরে ছবি তোলা হচ্ছে
(আউটডোর শুটিং)

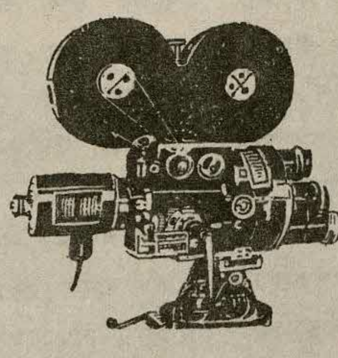
পর্দাও ঠিক সেই সঙ্গে তালে তালে কাঁপতে থাকে আর ওর সঙ্গে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ আছে তাও ঠিক সেই তালে কম-বেশি হতে থাকে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহকে এবার ইচ্ছেমত বহুগুণ জোরদার করে দেওয়া যায় আর একটি যন্ত্রের সাহায্যে—যাকে বলে অ্যাম্‌প্লিফায়ার। অ্যাম্‌প্লিফায়ার মানে যা অ্যাম্‌প্লিফাই করে অর্থাৎ বাড়িয়ে দেয়। এবার এই অ্যাম্‌প্লিফায়ারের বিদ্যুৎপ্রবাহকে যদি আবার কোন যন্ত্রের সাহায্যে শব্দের ঢেউএ পরিবর্তিত করা যায় তা হলেই মাইক্রোফোনের সামনে যে কথাটা বলা হচ্ছিল তা অনেক জোরদার কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যাবে। এই শেষোক্ত যন্ত্রটিকে বলা হয় লাউড-স্পীকার।

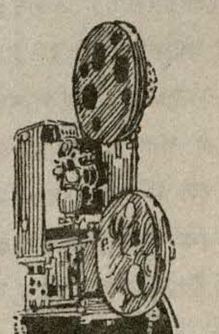
টকি কি করে তোলা হয়

এবারে সবাক্ চিত্র, যাকে আমরা ইংরেজী করে বলি 'টকি', কি করে তোলা হয় সে কথায় আসা যাক। টকি হচ্ছে মুভির মতই টকিং পিক্‌চারের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ।

সাধারণ মুভি-ক্যামেরায় আর টকি-ক্যামেরায় একটু তফাৎ আছে। টকি-ক্যামেরায়ও মুভি-ক্যামেরার মতই অভিনয়ের ছবি দ্রুতবেগে ফিল্‌মের ওপর তোলা হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ওর মধ্যে আরও একটু অতিরিক্ত ব্যবস্থা আছে। সেটি হচ্ছে ওর এককোণে বসানো একটা বিশেষ ধরনের বিজলী বাতি, যাকে বলা হয় এয়োলাইট। বিশেষ ধরনের বলছি এইজন্য যে এয়োলাইটের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ চললে সেই বিদ্যুতের কম-বেশি অনুযায়ী এর আলোও কম-বেশি হতে থাকে। এয়োলাইট বসানো থাকে একটা চোঙের মধ্যে, যার শুধু সামনের দিকে থাকে একটা ছোট ছিদ্র। অর্থাৎ ঐ ছোট ছিদ্রটি ছাড়া অন্য কোনও দিক্ দিয়ে ওর আলো বেরিয়ে আসতে পারে না। টকি তুলবার ফিল্‌ম্ থাকে একটি কাটিমে জড়ানো, তার স:ঙ্গ যুক্ত থাকে আর একটা কাটিম। শব্দের ছবি তুলবার সময় ফিল্‌মটা এয়োলাইটের ছোট্ট ছিদ্রটির সামনে চ:লে আসে,


ক


খ


গ


ঘ

ক: সিনেমা তুলবার ছোট্ট ক্যামেরা—সখের ছবি তুলবার উপযোগী। খ: টকি তুলবার ক্যামেরা—যাতে শব্দ ও দৃশ্যের ছবি একসঙ্গে ওঠে। গ: ছোটখাট একটি প্রজেক্টর। ঘ: টকি ফিল্‌মের একটু টুকরো,—মূল দৃশ্যের পাশাপাশি রেখাগুলি শব্দের ছবি।

তার পর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তা অপর কাটিমটির গায়ে জড়ানো হয়। অর্থাৎ ফোটো তুলবার সময় এয়োলাইটের সামনেকার আলোর ফোটোই ফিলমের গায়ে গাঁথা হয়ে যায়।

তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই : অভিনেতা যখন অভিনয় করছেন তখন তাঁর অঙ্গভঙ্গী সাধারণ মুভি-ক্যামেরার ছবির মতই উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে কিন্তু তিনি কথাও বলে যেতে লাগলেন। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখের সামনেকার বাতাসে একটা ঢেউ উঠল। অভিনেতার সামনে আছে একটা মাইক্রোফোন। বাতাসের ঢেউ সেই মাইক্রোফোনের পর্দায় পড়ে তার ভিতরকার বিদ্যুৎপ্রবাহকে ঐ শব্দের ঢেউ অনুযায়ী কম-বেশি করে তুলল। তার পর সেই বিদ্যুৎপ্রবাহকে অ্যাম্‌প্লিফায়ারের সাহায্যে বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল প্রায় দশ লক্ষ গুণ। সেই অবস্থায় সেটা গিয়ে হাজির হ'ল এয়োলাইটে। ফলে এয়োলাইটের আলোও সেই অনুযায়ী কম-বেশি হতে লাগল, আর সেই কম-বেশি আলোর ছবিই কতকগুলি কালো কালো রেখার আকারে ফুটে উঠতে লাগল ফিল্‌মের গায়ে—আসল ছবির পাশাপাশি এক-ধার দিয়ে। তারপর আগের মতই ডেভালাপ্ করে পাওয়া গেল টকি-ফিল্‌মের নেগেটিভ।

টকি কি করে দেখানো হয়

ফিল্‌ম্ তো তৈরি হ'ল, এবার তা দর্শকদের দেখানো হবে কি ভাবে ? নির্বাক্ বা সাইলেন্ট মুভির জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন জাতীয় একটা প্রজেক্টর দরকার সে কথা আগেই বলেছি। টকির বেলাও তাই, তবে এ প্রজেক্টরের একটু রকমফের আছে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় লেন্স এবং তীব্র আলো ফেলবার ব্যবস্থা ছাড়াও থাকে একটা অতিরিক্ত আলো। এ আলোর কাজ হচ্ছে শব্দের ফোটোকে শব্দে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করা। এ আলোটিরও চারদিক্ থাকে ঢাকা, শুধু সামনের দিকে দু'টি লেন্স আর তার পর আলো বেরিয়ে আসার জন্য একটা ফুটো।



অভিনেতা বিছানায় শুয়ে ; ওপর থেকে ছবি নেওয়া হচ্ছে।

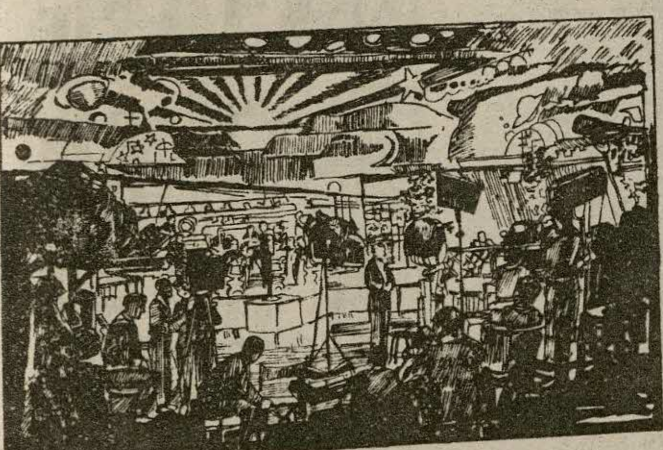
এখন, যদি ঐ ফুটোর সামনে দিয়ে ফিল্‌মের শব্দের ছবি অর্থাৎ সেই কালো কালো রেখাগুলোকে ক্রমাগত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আনা যায় তা হ'লে ফুটোর ভিতর দিয়ে যে আলো আসছিল তা ফিল্‌মের কালো রেখাগুলি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। কালো রেখাগুলো তো সর্বত্র সমান গাঢ় নয়, শব্দের জোর অনুযায়ী কোথাও বেশি কালো, কোথাও হাল্কা কালো। কাজেই যেখানে দাগগুলো বেশি কালো সেখান দিয়ে কম আলো বেরুবে, যেখানে দাগগুলো হাল্কা কালো সেখান দিয়ে বেশি আলো বেরুবে। এ আলো কিন্তু তখনই পর্দার দিকে যাবে না, যাবে আর একটি মজার যন্ত্রে—বিজ্ঞানের

ভাষায় যাকে বলা হয় ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক সেল। নামটা ভালো করে লক্ষ করলেই এই আলোটির গুণ সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়। আর কিছু না, যদি এই যন্ত্রে কোন আলো এসে পড়ে তবে ওর মধ্যে দিয়ে শুরু হবে বিদ্যুৎপ্রবাহ এবং সে প্রবাহের পরিমাণ নির্ভর করবে যে আলো পড়ছে তার উজ্জ্বলতার ওপরে। অর্থাৎ আলো যদি কম হয় তবে বিদ্যুৎপ্রবাহও কম হবে, যদি বেশি হয় তবে হবে বেশি। অর্থাৎ এক কথায় ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক সেলে ঠিক যে রকম আলো পড়বে বিদ্যুৎপ্রবাহও হবে সেই অনুযায়ী।

এবার ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহকে অ্যাম্‌প্লিফায়ার যন্ত্রে বাড়িয়ে নিয়ে এমন একটি যন্ত্রে ফেলতে হবে যেখানে ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ রূপান্তরিত হয়ে যায় শব্দের ঢেউএ। বিদ্যুৎকে এ ভাবে শব্দে রূপান্তরিত করা খুব কঠিন নয়। এই যন্ত্র, যাকে বলা হয় লাউড-স্পীকার,—তার কথা তো আগেই বলেছি। এইভাবে লাউড-স্পীকারে যে শব্দ পাওয়া যাবে সেটা হবে ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহেরই হুবহু অনুরূপ। অর্থাৎ বিদ্যুৎ-প্রবাহ কম-বেশি হলে শব্দও হবে সেই রকম। আর ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহও তো নির্ভর করছে সেই আগেকার আলোর উজ্জ্বলতা অনুযায়ী। তা হলে শেষ পর্যন্ত যে শব্দটা বেরিয়ে আসবে সেটা হবে হুবহু ফিল্‌মের ওপর তোলা শব্দের ছবি অনুযায়ী।

লাউড-স্পীকারটি ছবি দেখাবার সময়ে দর্শকদের সামনে সিনেমা হলের পর্দার পেছনে বসানো থাকে, আর টকির প্রজেক্টরটা থাকে দর্শকদের পেছনে। শব্দ আর অভিনয়ের ছবি একই ফিল্‌মে পাশাপাশি ছাপা থাকে বলে ফিল্‌ম্ ঘোরাবার সময়ে দু'টি একই সঙ্গে ঘুরতে থাকে। কিনেটোফোনে যে অসুবিধা দেখা গিয়েছিল এখানে তাই আর সে আশঙ্কা নেই।

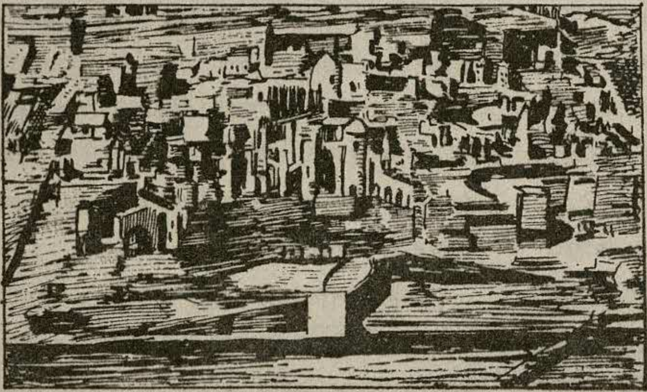
বলা বাহুল্য ভিতরে অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে যা হাতে-কলমে করতে না গেলে বোঝা যাবে না। তবে মোটামুটি ব্যাপারটা এই। সিনেমায় নিত্যই নানা উন্নতি হচ্ছে, আবিষ্কার হচ্ছে নানা রকম নতুন নতুন পদ্ধতির। ফলে ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান—যাকে বলে টেক্‌নিক্যাল সায়ান্স। সাধারণের পক্ষে ওর সব কিছু জানা বা বোঝা সম্ভবও নয়, বোধ হয় দরকারও নেই—যদি না ওই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার ইচ্ছে থাকে।


স্টুডিওয় টকি তোলা হচ্ছে। অভিনেতা গান গেয়ে শোনাচ্ছেন।

সিনেমা-জগতের কথা

তার চেয়ে বরঞ্চ সিনেমা তোলার তোড়জোড় সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

সিনেমা যেখানে তোলা হয়

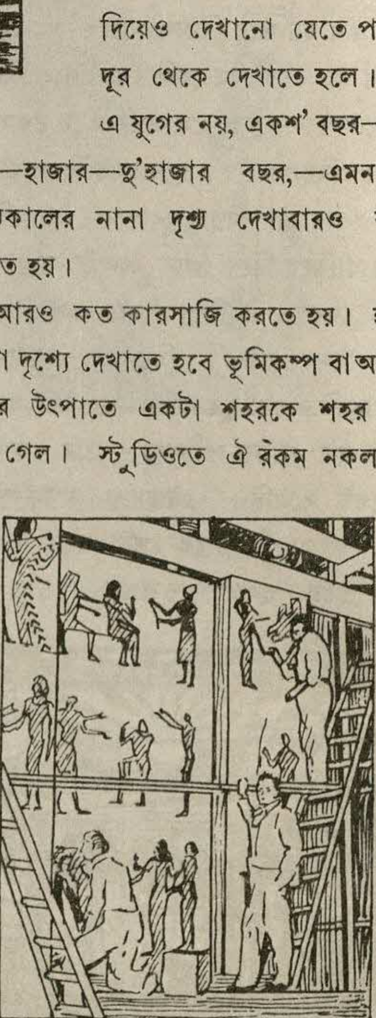


পিচবোর্ড দিয়ে তৈরি নকল শহর

তাকে বলা হয় স্টুডিও। সাধারণতঃ গল্প-উপন্যাসের ছবিই সিনেমায় বেশি তোলা হয় বলে সিনেমার ছবি তোলার বেশির ভাগ কাজই হয় এই স্টুডিওতে। সব রকম দৃশ্য, সরঞ্জাম, সব রকম পরিবেশ যাতে সর্বদা হাতের কাছে পাওয়া যায় স্টুডিওতে সেই চেষ্টাই করা হয়। এজন্য যে কত হাঙ্গামা-হুজ্জৎ করা হয়—কত লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয় তা কল্পনা করা যায় না।

সিনেমা-শিল্পের সবচেয়ে নামকরা দেশ হচ্ছে আমেরিকা। সেখানে আবার হলিউড বলে একটি জায়গা আছে যেখানে এই শিল্পের উন্নতির জন্য কত কী যে করা হয়েছে তা শুনলে তাজ্জব বনে যেতে হবে। নকল পাহাড়—বরফ-ঢাকা যার চূড়ো, নকল সমুদ্র, নকল মরুভূমি, নকল বনজঙ্গল হয়তো পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। তারই পাশে হয়তো ছোটখাট গ্রাম কিংবা বড় বড় শহর—আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নকল বলছি এইজন্য যে অনেক সময়েই এগুলো কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয়। হয়তো পিচবোর্ড দিয়েই বাড়ীঘরের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে, ছবি দেখে বোঝার উপায় নেই যে ওগুলো নকল। বরফ-ঢাকা পাহাড় হয়তো তৈরি করা হচ্ছে নুন দিয়ে। ট্রাম, বাস্, রেলগাড়ী, জাহাজ অনেক সময় খেলনার গাড়ী দিয়েও দেখানো যেতে পারে—দূর থেকে দেখাতে হলে। শুধু এ যুগের নয়, একশ' বছর—দু'শ' বছর—হাজার—দু'হাজার বছর,—এমন কি আদ্যিকালের নানা দৃশ্য দেখাবারও ব্যবস্থা রাখতে হয়।

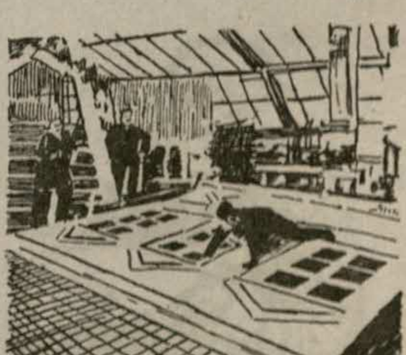
আরও কত কারসাজি করতে হয়। হয়তো একটা দৃশ্যে দেখাতে হবে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়-গিরির উৎপাতে একটা শহরকে শহর ধ্বংস হয়ে গেল। স্টুডিওতে ঐ রকম নকল শহর



প্রাচীন মিশরের ছবি তুলবার জন্য ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড তৈরি করা হচ্ছে

তৈরি করে, নকল আগুনে-পাহাড় তৈরি করে, নকল ভূমিকম্প দেখিয়ে সেই ভয়াবহ কাণ্ড দেখানো হয়। অবশ্য, যতটা সম্ভব ফাঁকি দিয়ে কার্যোদ্ধারেরই চেষ্টা হয়, কিন্তু তাতেও খরচ বড় কম হয় না। এজন্য দরকার মত বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয় প্রচুর। তোমরা 'কিং কং' কিংবা কোনান্ ডয়ালের 'লস্ট ওয়ার্ল্ড' অনেকে দেখে থাকবে। 'টুয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ্‌স্ আণ্ডার দি সী'ও এইরকম একটা বই যাতে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়েছিল প্রচুর। বিরাট বিরাট প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ার—অতিকায় সরীসৃপ ডাই-নোসর, উড়ুক্কু সরীসৃপ পাখীর পূর্বপুরুষ টেরোডাক্‌টাইল ইত্যাদি তৈরি করে তাদেরকে দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করানো, লড়াই করানো—এর জন্য বিজ্ঞানীদের অনেক মাথা খাটাতে হয়েছে। ২৫।৩০ ফুট লম্বা বনমানুষ জাতের প্রাণী কিং কং-এর ভিতর ছ'জন মানুষকে ঢুকিয়ে (এবং লুকিয়ে) নানা রকম কলকব্জা চালিয়ে তবেই ওর চালচলন স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়েছিল। এমনিধারা কত কি! স্টুডিওতে দরকার মত আলোর ব্যবস্থা করাও কম হাঙ্গামার নয়। কারণ, আলো তো সব সময় এক রকম হলে চলবে না। তবে বিজ্ঞানীরা এ সব হাঙ্গামা সহজেই মিটিয়ে থাকেন—নানা কৌশলে কৃত্রিম আলোর সাহায্য নিয়ে।

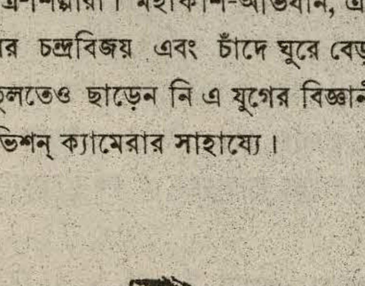
মনে পড়ে একবার একটা ছবিতে দেখে-ছিলাম একটি লোক চল্লিশতলা বাড়ির দেয়াল বেয়ে বেয়ে উঠছে। এই বুঝি পড়ল! পড়লে কি আর রক্ষা আছে? লোকটি অনেক বার পড়ো-পড়ো হয়েও অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে রক্ষা করল। অনেক দিন পরে ব্যাপারটার রহস্য জানতে পারলাম। লোকটি মোটেই দেয়াল বেয়ে ওঠে নি। মেঝের ওপরেই ঐ রকম চল্লিশতলা বাড়ীর দেওয়ালের মত করে ছবি এঁকে রাখা হয়েছিল আর লোকটি কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও লম্বা হয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে দেয়াল বেয়ে ওঠার ভঙ্গী করে করে এগোচ্ছিল। ফোটোগ্রাফার একটা মইয়ে চড়ে ট্যারছা ভাবে ফোটো তুলে নিয়েছিল বলেই ছবি দেখে মনে হচ্ছিল লোকটি বুঝি সত্যি দেয়াল বেয়ে উঠছে। কী মজার কাণ্ড বল দেখি! এ রকম ফাঁকিবাজী সিনেমায় আরও অনেক হয়। ছবি কেটে, জোড়াতালি দিয়েও অনেক মজার মজার দৃশ্য দেখানো যায়। 'লরেল-হার্ডির বা চার্লি চ্যাপলিনের অনেক হাসির বইতে এ রকম করা হয়েছে। চার্লি চ্যাপলিনের গোল্ড রাশ্ ছবিতে উড়ন্ত বাড়ীর ছবি, কিংবা একসঙ্গে ছ'জোড়া লরেল-হার্ডির অভিনয়ও ঐ রকম ব্যাপার।



ফাঁকিবাজী ছবি। মেঝের ওপর আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী এঁকে অভিনেতা হামাগুড়ি দিয়ে তাই বেয়ে ওঠার ভান করছে। মইএ চড়ে ওপর থেকে ফোটো নেওয়া হচ্ছে।

এখন আর ফাঁকি নয়

হলিউড ছাড়া অন্যান্য দেশেও আজকাল সিনেমা-শিল্পের প্রচুর উন্নতি হচ্ছে। তবে এখন অবশ্য দর্শকেরাও সেয়ানা হয়েছে। তাই নকল দৃশ্য দেখিয়ে সব সময় রেহাই পাওয়া যায় না। এখন সত্যি সত্যি গহন অরণ্যে গিয়ে বুনো জীবজন্তুর জীবনযাত্রার চলচ্চিত্র তুলে আনতে হয়, দুর্গম তুষারশুভ্র পাহাড়ে সত্যি সত্যি উঠে কিংবা সমুদ্রের তলায় নেমে সেখানকার ছবি তুলে আনতে হয়। তা সিনেমার কর্তারা তাতে পিছ-পা হ'ন না। এমন কি সত্যিকার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও সেখানকার ছবি তুলে আনেন সাংবাদিক চলচ্চিত্র-শিল্পীরা। মহাকাশ-অভিযান, এমন কি মানুষের চন্দ্রবিজয় এবং চাঁদে ঘুরে বেড়ানোর ছবি তুলতেও ছাড়েন নি এ যুগের বিজ্ঞানীরা—টেলিভিশন্ ক্যামেরার সাহায্যে।



সিনেমার মেক্ আপ: 'হাঞ্চব্যাক্ অব্ নোৎরদামে' কোয়াশিমোদোর ভূমিকায় লন চ্যানী

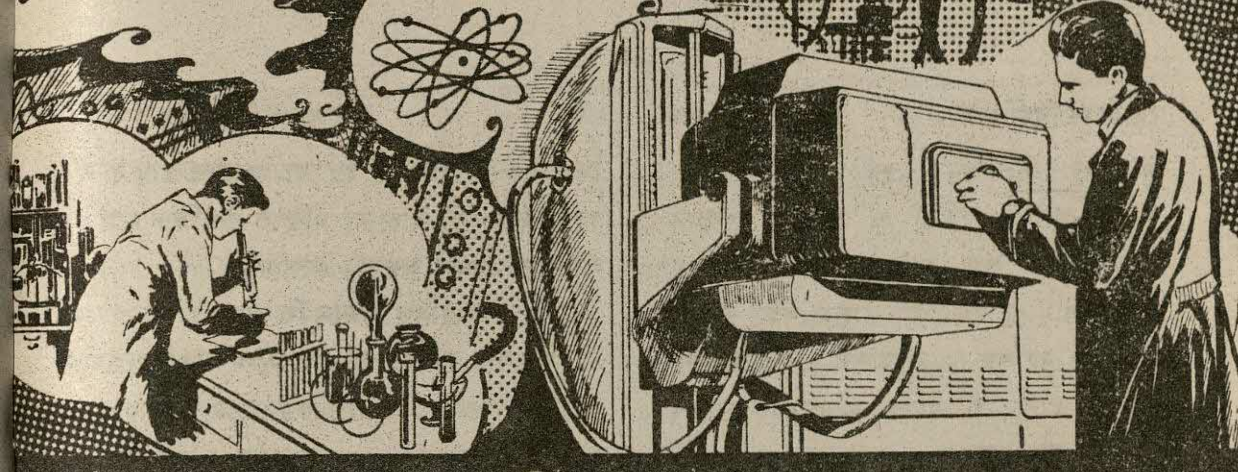


একটি খাবার ঘরের ছবি তুলতে কত রকমের আলো!

লোকশিক্ষায় সিনেমা

এ যুগের সিনেমাকে শুধু আনন্দদায়ক প্রমোদশিল্প বলে ধরলে কিন্তু খুবই ভুল করা হবে। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রেও সিনেমার ভূমিকা এখন বড় কম নয়। পৃথিবীর কোথায় কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছে আজকের মানুষ শুধু তার বিবরণ চায় না, সে চায় হুবহু সেটি কি ভাবে ঘটেছিল তাই জানতে। সিনেমার নিউজ্ রীল বা সংবাদ-চিত্র সে অভাব পূর্ণ করছে।

আজকের সিনেমা ইতিহাস, ভূগোল, জীবনকথা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য মনোরম ভাবে চোখের সামনে তুলে ধরছে—যার স্বাদ নাকি হাজার বই পড়লেও পাওয়া যেত না। স্কুলে-কলেজেও সিনেমার সাহায্যে অনেক কিছু শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের দেশেও তা হওয়া দরকার।



সাধারণ বিজ্ঞানের কথা

আলো আসলে কি

আলো, উত্তাপ, শব্দ প্রভৃতি নানা রকমের শক্তি। এ সব শক্তি এবং তার রূপান্তরের কথা আমরা ছোটদের বিশ্বকোষের **১ম, ২য় ও** ৩য় খণ্ডে বলেছি। এবারে দেখা যাক আলো জিনিসটা কি।

বাইবেলে আছে, একদিন ভগবানের ইচ্ছেতে তৈরি হ'ল পৃথিবী। ভগবান্ দেখলেন, পৃথিবীটা ভারি অন্ধকার। ভারি বিশ্রী লাগল তাঁর। তিনি বললেন, "লেট্ দেয়ার বি লাইট্।" তারপর? "অ্যাণ্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট্ অ্যাণ্ড গড্ স ইট্ ওয়াজ গুড্।" (ভগবান্ বললেন, "আলো হোক" এবং আলো হ'ল। ভগবান্ দেখলেন জিনিসটা ভালো।) পৃথিবীকে স্থায়ী ভাবে আলো দান করবার জন্য ভগবান্ এরপর সৃষ্টি করলেন সূর্যকে। তাকে স্থাপন করা হ'ল আকাশে। এক কথায় সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু বলেন অন্য কথা।

বহুদিন আগে থেকেই আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা ভেবেছেন। মহাবিজ্ঞানী নিউটন বললেন, ভাস্বর কোন পদার্থ থেকে অতি ছোট ছোট কণিকা বেরিয়ে তীব্র বেগে ছুটে চলে চারিদিকে। কোন পদার্থের ওপর তা পড়ে প্রতিফলিত হয়ে সেগুলো আমাদের চোখে পড়লেই পদার্থটি আমরা দেখতে পাই। নিউটন এর নাম দিলেন কণিকা-তত্ত্ব বা করপাস্কুলার থিয়োরী। পরে হিউজেন্স, ফ্রেসনেল্ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন আলোর তরঙ্গ-বাদ বা ওয়েভ থিয়োরী। এই মতবাদ অনুসারে বলা হয় যে আলো হ'ল কতকগুলো তরঙ্গের সমষ্টি। আলো-প্রদানকারী কোন পদার্থ থেকে এই সব তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬০০০ মাইল বা ২৯৯৩২৪ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলে। কোন পদার্থের ওপর থেকে সে ঢেউগুলো প্রতিফলিত বা বিচ্ছুরিত হয়ে চোখে পড়লেই জিনিসটি দেখা যায়। আলো নিজে কিন্তু অদৃশ্য, অন্যকে দৃশ্যমান্ করাই আলোর কাজ।

তরঙ্গ বা ঢেউ সৃষ্টি করার জন্যে একটি

মাধ্যমের প্রয়োজন। সূর্য থেকে আমরা আলো পাই। পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মাইলের ব্যবধান। এর ভিতরে বায়ু বা অন্য কোন মাধ্যম নেই,—যাকে বলে এক মহাশূন্য। অথচ সূর্য থেকে স্বচ্ছন্দে আলো এসে পৌঁছোচ্ছে আমাদের কাছে। এটা কি করে সম্ভব ?

কাল্পনিক মাধ্যম ঈথার

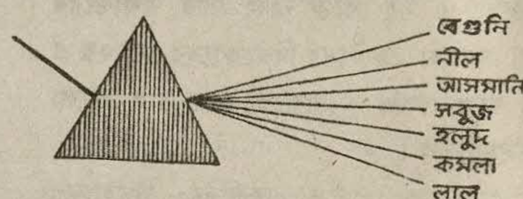
বিজ্ঞানীরা ঈথার নামে একটি মাধ্যমের কল্পনা করলেন। মাধ্যমটি অ-জড়। ঈথার আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র—এমন কি কঠিনতম পদার্থের অণুর মধ্যেও। তা ছাড়া তীব্রবেগে আলোক-তরঙ্গ বহন করে নেওয়ার জন্যে যে-সব ধর্ম থাকা দরকার ঈথারের মধ্যে সে-সব ধর্ম আরোপ করা হয়েছে। সত্যিকারের ঈথার আছে কিনা তার পরীক্ষামূলক প্রমাণও যেমন নেই, তেমনি ঈথারের অস্তিত্বকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়ার মত পরীক্ষামূলক প্রমাণও আমাদের হাতে নেই।

আলোর তরঙ্গ সৃষ্টি হয় কি করে

ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন দিয়েই পদার্থ-পরমাণু গঠিত (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৮)। ভাস্বর কোন পদার্থের ইলেকট্রনগুলো খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ফলে চার দিক্‌কার ঈথার-সমুদ্রে ছোট-বড় অসংখ্য ঢেউএর সৃষ্টি হয়। এ সব ঢেউ বা তরঙ্গ সেকেণ্ডে ২৯৯৩২৪ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলে ঈথারের ভিতর দিয়ে। ইলেকট্রন থেকে বয়ে-নিয়ে-আসা শক্তি-তরঙ্গ আমাদের চোখের রেটিনার ওপর পড়লে সেখানে এক ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এর জন্যে কতকগুলো বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয় যা চোখের স্নায়ু বা অপ্‌টিক নার্ভের সাহায্যে মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়ে আমাদের দেখার অনুভূতি জাগায়।

আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে

আলোর কণিকা-তত্ত্ব এবং তরঙ্গ-বাদ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান কিন্তু খানিকটা নতুন কথারও অবতারণা করেছে। ম্যাক্সওয়েল বললেন, আলো হ'ল আসলে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ (ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিভ ওয়েভ)। এ জাতের তরঙ্গ ছোট-বড় নানা আকারের হতে পারে এবং আলোর গতিবেগের সমান গতিতে মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে ছুটে চলতে পারে। একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ঈথার-তরঙ্গ সৃষ্টি হলে আমরা পাই



প্রিজ্‌মের ভিতর সূর্যের আলো পড়লে সে আলো সাতটি রং-এ ভাগ হয়ে যায়।

দৃশ্যমান্ আলো। সূর্যের আলোর সৃষ্টি হয় সাতটি মূল রংএর মিশ্রণে। কোনও প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো এলে তা সাতটি রংএ ভাগ হয়ে যায়। এই সাতটি মূল রং হ'ল বেগুনী, ঘননীল, আসমানি, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। এই রং ক'টি একত্র মেশালেই পাওয়া যাবে সাদা আলো। এদেরই আমরা নাম দিয়েছি দৃশ্যমান্ আলো। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এর চেয়ে বেশি হলে আমরা পাই অবলোহিত বা ইন্‌ফ্রা-রেড আলো, বেতার-তরঙ্গ প্রভৃতি। আবার দৃশ্যমান্ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে আকারে ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করে অতি-

বেগুনী বা আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্‌ আলো, এক্স-রে প্রভৃতি।

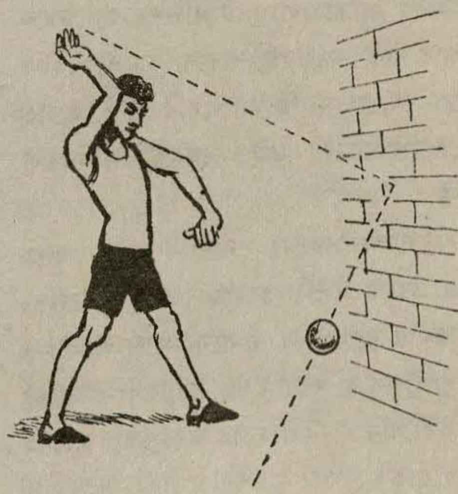
১৯০০ সালে বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক তাঁর আলোর 'কোয়ান্টাম্‌ তত্ত্ব' প্রচার করেন। তিনি বললেন, কোন আলোর উৎস থেকে যখন আলোক-শক্তি নির্গত হচ্ছে তখন তা হয়ে থাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে; নির্দিষ্ট পরিমাণে শক্তি প্রতি বারে একটু একটু করে নির্গত হয় মাত্র। ১৯০৫ সালে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বললেন, আলোর এই শক্তিপুঞ্জ যখন তীব্র বেগে ছুটে চলে তখন তাদের মধ্যে অন্য কোন রকম বিভাগ হয় না, অর্থাৎ শক্তিটুকু একই একক হিসেবে থেকে যায়। আলোর এই একককে বলা হয় আলোর কোয়ান্টাম্‌ বা ফোটোন। ফোটোন যখন কোন পদার্থে শোষিত হয় তখন সে তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই: আলোক-শক্তি কখনো কখনো পদার্থ-কণিকার মত ব্যবহার করে, কখনো বা তার ব্যবহার তরঙ্গের মত। ভাস্কর পদার্থের পরমাণু থেকে যখন আলোকশক্তি নির্গত হচ্ছে তখন সে হ'ল পদার্থ-কণিকা, আর যখন তীব্র বেগে ছুটে চলে চার দিকে তখন সে তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিউটনের কণিকা-তত্ত্ব এবং হিউজেন্‌সের তরঙ্গ-বাদ—এ দু'টোর মধ্যে এমনি ভাবে একটা রফা হয়ে গেল। আজ দু'টি মতবাদই চলছে পাশাপাশি।

আলোর নানা ধর্ম

আলো সরল রেখায় চলে। গতিপথের সামনে কোন অস্বচ্ছ পদার্থ পড়লে পেছনে সৃষ্টি হয় একটি ছায়ার। ক্যামেরা যন্ত্রে আলোর এই ধর্মটিরই সুযোগ কাজে লাগানো হয়। দেয়ালে একটা বল্‌ ছুঁড়ে মারলে তা উল্টো দিকে ফিরে আসে। আলোর ক্ষেত্রেও অনেকটা এ রকম ব্যাপারই ঘটে। একে বলা হয় আলোর প্রতিফলন বা রিফ্লেক্‌শন্‌। কোন স্বচ্ছ পদার্থের ওপর আলো পড়লে তার



দেয়ালে একটা বল ছুঁড়ে মারলে তো উল্টো দিকে ফিরে আসে।

খানিকটা পদার্থের ভিতরে প্রবেশ করে। এ সময়ে আলোর গতিপথ সামান্য বেঁকে যায়। এ ব্যাপারটাকে বলা হয় আলোর প্রতিসরণ বা রিফ্র্যাক্‌শন্‌। এমনি ধরনের আলোর যে-সব ধর্ম আছে তার সবগুলোই আলোর নানা তত্ত্ব দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা চলে।

কোন পদার্থের ওপর আলো পড়লে আলোক-শক্তির খানিকটা ঐ পদার্থ শোষণ করে নেয়; এর ফলে সামান্য উত্তাপের সৃষ্টি হয়। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে আলোক-শক্তি তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বায়ুশূন্য অবস্থায়

যদি কোনও মসৃণ ধাতুপাতের ওপর আলো পড়ে তবে ধাতুর ভিতরকার ইলেকট্রনগুলো এতটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে অসংখ্য ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে আসে ধাতুর গা থেকে। এ ব্যাপারটাকে বলা হয় ফোটো-কেমিক্যাল এফেক্ট (ফোটো = আলো, কেমিক্যাল এফেক্ট = রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া)। টেলিভিশন ক্যামেরায় আলোর এই ধর্মটিরই সাহায্য নেওয়া হয়। আমরা যে কোন জিনিস দেখি তার মূলেও রয়েছে আলোর এই ফোটো-কেমিক্যাল এফেক্ট।

আলোক-বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই তৈরি হয়েছে অনেক অতি-প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। এ সবের মধ্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ বা দূরবীন যন্ত্র, ক্যামেরা প্রভৃতির নাম করা যায়। ক্যামেরার কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

আকাশ কেন নীল ?

দৃশ্যমান্ আলোর মধ্যে বেগুনী, নীল প্রভৃতি রংএর আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুবই ছোট, আর লাল, কমলা প্রভৃতির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খানিকটা বড়। অতি ক্ষুদ্র পদার্থ-কণিকার ওপর আলো পড়লে আলোক-শক্তিকে কণিকাগুলি শুষে নেয়, তারপর তা ছড়িয়ে দেয় চারদিকে। এ ব্যাপারটাকে বলা হয় আলোর বিক্ষেপণ বা স্ক্যাটারিং। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত ছোট হবে বিক্ষেপণও হবে তত বেশি। আকাশের বায়ু এবং ক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে সূর্যকিরণ বিক্ষেপিত বা বিচ্ছুরিত হয়ে তার নীল রংটি এসে হাজির হয় আমাদের চোখে। তাই আকাশটাকে আমরা দেখি নীল।

রামন এফেক্ট

ভারতীয় বিজ্ঞানী সি. ভি. (চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট) রামনের নাম কে না জানে? এই, মাত্র সেদিন, ৮২ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। রামন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে চমকপ্রদ আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম দেওয়া হয়েছে রামন এফেক্ট। এই আবিষ্কারের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন ১৯৩০ সালে।



চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন

তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন তা সংক্ষেপে হ'ল এই যে কোন বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো যদি স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর প্রবেশ করে তবে বিক্ষেপিত আলোর মধ্যে আলাদা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোর অবস্থিতি দেখা যায়।

শব্দ-শক্তিও একরকম তরঙ্গ

ইলেকট্রনদের ছটফটানির জন্য ঈথার-সমুদ্রে কাঁপুনি জাগে, তৈরি হয় নানা আকারের তরঙ্গ,

আর আমরা পাই আলো। কিন্তু কোন জড়-পদার্থই কেঁপে শব্দের সৃষ্টি করে, আবার কোন জড়-মাধ্যমই শব্দকে বহন করে নিয়ে যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। শুনবার মত শব্দ সৃষ্টি করার জন্যে শব্দসৃষ্টিকারী পদার্থটি কম-সে-কম সেকেণ্ডে সাতাশ বার কাঁপবে। কম্পন-সংখ্যা যত বাড়বে শব্দ হবে তত কর্কশ। এমনি ভাবে কম্পন-সংখ্যা বেড়ে বেড়ে যদি তা সেকেণ্ডে বিশ হাজার বারের ওপরে ওঠে তবে যে-শব্দ সৃষ্টি হবে তা আর শোনা যাবে না। এ ধরনের শব্দকে বলা হয় সুপার-সোনিক শব্দ। বাংলায় বলা যায় শ্রবণোত্তর বা শব্দহীন শব্দ। বাদুড়, চামচিকে প্রভৃতি প্রাণীরা শ্রবণোত্তর শব্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে, টেরও পায়,—যার জন্যে অন্ধকারে উঠতে এদের কোন অসুবিধে হয় না। বিজ্ঞানীরা আজকাল এই শ্রবণোত্তর শব্দ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করে তা দিয়ে অনেক অসম্ভব অসম্ভব কাজ হাসিল করে নিচ্ছেন।



বাদুড়, চামচিকে—এরা শব্দহীন শব্দ টের পায়, সৃষ্টিও করতে পারে।

এই রকম শব্দ দিয়ে আগুন জ্বালানো, কাপড় কাচা, ঘরদোর সাফ করা ইত্যাদি কত কাণ্ডই না করা হচ্ছে!

শব্দও এক রকমের শক্তি। যে শব্দ শোনা যায় তারও আছে কাজ করবার ক্ষমতা। সাধারণ অবস্থায় বায়ুর মধ্যে শব্দের গতিবেগ সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট বা ৩৪১·৩ মিটার। আলোর মত শব্দেরও প্রতিফলন হয়, হয় প্রতিসরণ। প্রতিফলিত শব্দকে আমরা বলি প্রতিধ্বনি। দূরের কোন দেয়াল বা গাছপালা থেকে শব্দ প্রতিফলিত হয়ে প্রতি-ধ্বনির সৃষ্টি করে। এমনও হতে পারে যে একই শব্দ অনেকগুলো প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা প্রদেশের বাড়ীগুলো এমন ভাবে তৈরি যে সেখানকার কোন রাস্তায় জোরে একটি শব্দ করলে তার প্রতিধ্বনি বেশ কয়েকবার শোনা যায়। এই শহরের কোন এক জায়গায় ইংরেজী 'নিকার-বোকার' কথাটি জোরে চেঁচিয়ে বললে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় অন্ততঃ পক্ষে কুড়িবার। 'মেঘ ডাকা'র মূলেও রয়েছে শব্দের প্রতিফলন।

প্রতিধ্বনি আমাদের নানাভাবে বিরক্তির উদ্রেক করলেও নানা কাজে এরও ব্যবহার দেখা যায়। সমুদ্রের গভীরতা মাপবার কাজে, ডাক্তারদের স্টেথোস্কোপ যন্ত্রে এবং আরও নানা ভাবে প্রতিফলিত শব্দকে কাজে লাগিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

গান আর চীৎকার

যাকে আমরা গান বা ভালো কথায় সঙ্গীত বলি তাও আসলে শব্দই। কেউ হাত-পা ছুড়ে এলোপাথাড়ি চীৎকার শুরু করলে কার-ই



গান আর চীৎকার

বা ভালো লাগে ? অথচ নামকরা গায়কেরা যখন সুরেলা গলায় চীৎকার করে যান তখন আমরা বিরক্ত না হয়ে তাঁদেরকে বাহবা দিই। প্রথমোক্ত চীৎকারে বিরক্তি এলেও গায়কের চীৎকার কানে সাধারণতঃ মধু বর্ষণ করে। দু'টোই কিন্তু শব্দ—সোজা কথায় চীৎকার। তা হলে পার্থক্যটা কোন্‌খানে ?

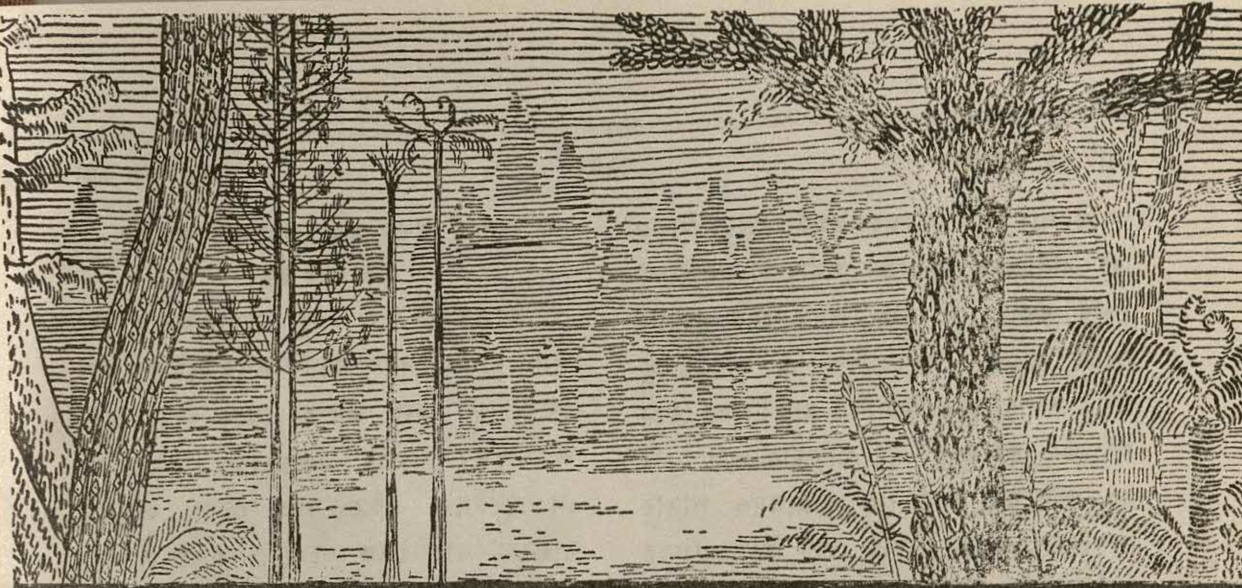
যে শব্দ আমাদের কানের পক্ষে পীড়াদায়ক তাকে আমরা বলি গোলমাল। আর যে শব্দ কান এবং মনকে তৃপ্তি দেয় তাকে বলি গান—ভালো কথায় সঙ্গীত। সুর-তান-লয়-সমন্বিত শব্দই সঙ্গীত পর্যায়ে পড়ে। শব্দ-তরঙ্গ এখানে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে।

শব্দ-বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বের সাহায্যে তৈরি কত যন্ত্রপাতিই না আমরা ব্যবহার করি। গ্রামোফোন, মাইক্রোফোন, রেডিওগ্রাম, টেপ্‌ রেকর্ডিং যন্ত্র প্রভৃতি এর মধ্যে পড়ে। নানা রকম বাদ্যযন্ত্র—যেমন বেহালা, এস্রাজ, সেতার, বীণা, নানা ধরনের বাঁশী, পিয়ানো, হারমোনিয়াম—এ সবও শব্দ-বিজ্ঞানের নানা নিয়ম-কানুন কাজে লাগিয়েই তৈরি করা হয়।

যেমন, ধরা যাক, তারের বাদ্য-যন্ত্র। এই সব যন্ত্রের সুর নির্ভর করে তারের টান, দৈর্ঘ্য এবং খানিকটা ভরের ওপর। টান যত বাড়বে তারের কম্পাঙ্ক তত বাড়বে, আবার তারের দৈর্ঘ্য যত বাড়বে কম্পাঙ্কও তত কমবে। কম্পাঙ্ক মানে প্রতি সেকেণ্ডে তারটা কতবার কাঁপছে। তারের নানা জায়গায় ইচ্ছেমত আঙুল চালিয়ে দৈর্ঘ্য বদলে বদলে নানা রকমের কম্পাঙ্ক তুলে শব্দকেও ইচ্ছেমত শ্রুতিমধুর করা চলে।



শব্দ-বিজ্ঞানের নানা নিয়ম-কানুন কাজে লাগিয়ে এই সব বাদ্যযন্ত্র তৈরি হয়েছে।



গাছপালার কথা

পাতার আসল কাজ কি

গাছের পাতা সম্বন্ধে নানা কথা এর আগে আমরা বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৭-৪৩৪), কিন্তু পাতার আসল কাজ কি ? আসল কাজ বলতে কিন্তু বিশেষ করে চার রকমের কাজের কথা বলতে হয়, কারণ সব পাতাকেই ঐ কাজগুলো করতে হয়, এগুলো না হলে গাছকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

এর মধ্যে, বোধ হয়, প্রধান কাজ হচ্ছে ফোটোসিন্থেসিস—যাকে বাংলায় বলা হয় 'সালোক সংশ্লেষ'। (ফোটো = আলো, সিন্থেসিস্= সংশ্লেষ বা একত্র মিশে গড়ে ওঠা)

কথাটা শুনতে বেশ একটু খটমট—যেমন ইংরেজীটা, তেমনি বাংলাটা,—কিন্তু ব্যাপারটা তেমন নয়। একটু বুঝিয়ে বলি।

আমরা দেখি প্রায় সব গাছের পাতার রংই সবুজ। সবুজ হবার কারণ আর কিছু নয়, পাতার মধ্যে এক রকম সবুজ কণা ছড়ানো থাকে, তাইতেই ওকে সবুজ দেখায়। এই সবুজকণাকে বলা হয় ক্লোরোফিল। একটা পাতা নিয়ে যদি একটা পাত্রে স্পিরিট বা অ্যালকোহলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা যায় তা হলে ঐ সবুজ কণাগুলো পাতা থেকে বেরিয়ে এসে ঐ স্পিরিট বা অ্যালকোহলের মধ্যে গুলে যাবে। তখন পাতাটা হয়ে যাবে সাদা, স্পিরিট বা অ্যালকোহলটুকু হয়ে যাবে সবুজ। সূর্যের আলো ছাড়া কিন্তু এই ক্লোরোফিল তৈরি হয় না। খানিকটা ঘাসজমি ইটচাপা দিয়ে রাখলে কয়েকদিন পরে দেখা যাবে তার রং সাদা হয়ে গেছে, সবুজ নেই ; তার মানে তার ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে গেছে।

এই সবুজ কণা, যার আমরা নাম দিয়েছি ক্লোরোফিল,—এর আছে আশ্চর্য গুণ। এরই সাহায্যে পাতারা বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আর মাটি থেকে শিকড় দিয়ে শুষে-নেওয়া জল একত্র করে পাতার মধ্যেই তৈরি করে কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয়

পদার্থ যা নাকি গাছের একটি প্রধান খাদ্য। এই রাসায়নিক পরিবর্তন অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট তৈরি করতে যে শক্তি লাগে সেটা যোগায় সূর্যের আলো। ক্লোরোফিল এ কাজটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করে দেয় কিন্তু তার নিজের কোন পরিবর্তন হয় না। এই প্রক্রিয়ার ফলে তৈরি হয় অক্সিজেন আর সে অক্সিজেনও পাতার ভিতরকার অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্রের ভিতর দিয়েই বেরিয়ে যায়। এই সমস্ত ব্যাপারটাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ফোটোসিন্থেসিস বা সালোক সংশ্লেষ।

তা হলে ব্যাপারটা কিন্তু দাঁড়াল আমাদের শ্বাসকার্যের ঠিক উল্টো। তাই নয় কি? নিঃশ্বাস নেবার সময় আমরা বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নিই আর তার বদলে বাতাসে ছড়িয়ে দিই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। ফোটো-সিন্থেসিসের বেলায় কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকেই টেনে নেওয়া হয় আর তার বদলে বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হয় অক্সিজেন।

গাছের এই অদ্ভুত ক্ষমতা কিন্তু প্রাণীদের নেই। জীবনধারণের জন্য তাদেরও কার্বোহাই-ড্রেট জাতীয় খাদ্যের দরকার কিন্তু তা তারা নিজেরা তৈরি করে নিতে পারে না, গাছপালা থেকেই তা তাদেরকে সংগ্রহ করতে হয়। নিরামিষভোজী প্রাণীরা গাছপালা খেয়েই ঐ খাদ্য সংগ্রহ করে, আমিষভোজীরা আবার সেই সব প্রাণীকে খেয়ে তাদের শরীর থেকে ঐ সব খাদ্য যোগাড় করে নেয়। অর্থাৎ গোড়া থেকে দেখতে গেলে সকলকেই এজন্য নির্ভর করতে হয় ঐ গাছেরই ওপর। পাতাকে তাই গাছের রান্নাঘরও বলা হয়।

পাতার প্রথম কাজ: সালোক সংশ্লেষ কি করে হয়

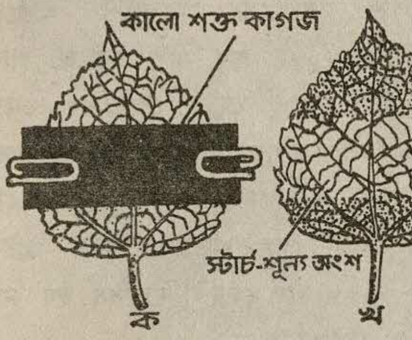
আবার তা হলে একটু গোড়ার কথায় ফিরে আসা যাক। ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটে? মাটি থেকে এল জল, বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সসাইড। পাতার ভিতরকার ক্লোরোফিল সে দু'টোকে একত্র করে সূর্যের আলোর সাহায্যে তার তেজ বা শক্তি কাজে লাগিয়ে তা থেকে তৈরি করল গ্লুকোজ, যা হচ্ছে চিনি জাতীয় পদার্থ। এই গ্লুকোজই আবার পরের ধাপে পরিণত হয় স্টার্চে। এই স্টার্চকে আমরা বাংলায় বলি শ্বেতসার, আর এই শ্বেতসারই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য। গ্লুকোজ শুধু কার্বোহাইড্রেটই তৈরি করে না, এ থেকেই তৈরি হয় প্রোটিন, তৈরি হয় ফ্যাট বা স্নেহ-জাতীয় খাদ্য। অর্থাৎ গাছেদের বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু প্রয়োজনীয় খাদ্য দরকার সবই জোগাবার ভার এর ওপর।

সূর্যের আলো এই ফোটোসিন্থেসিসের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়। রাতে তো সূর্য আলো দেয় না, তাই এই ফোটোসিন্থেসিস ব্যাপারটা একমাত্র দিনের বেলাই হওয়া সম্ভব (যদি না কৃত্রিম উপায়ে গাছকে আলো জোগানো যায়)। একটা ছোট্ট পরীক্ষা করে ব্যাপারটা তোমরা নিজেরাই যাচাই করে দেখতে পার।

সূর্যালোকের ভূমিকা

টবে লাগানো একটা ছোট্ট গাছ নিয়ে গাছটাকে একটা অন্ধকার ঘরে দু'-একদিন রেখে দেওয়া হ'ল। যদি সূর্যের আলোর অভাবে ফোটোসিন্থেসিস হওয়া সম্ভব না হয় তা হলে অন্ধকার ঘরে রাখার ফলে ঐ গাছটির

পাতায় আর নতুন করে স্টার্চ বা শ্বেতসার তৈরি হবে না, এবং দু'দিন অন্ধকার ঘরে রাখায় ওর পাতায় যে স্টার্চটুকু জমা ছিল তাও



সূর্যের আলো না পেলে ফোটোসিন্থেসিস হবে না, পাতায় শ্বেতসারও তৈরি হবে না।

খরচ হয়ে যাবে। এবারে সূর্য ওঠার আগেই গাছশুদ্ধ টবটাকে বাইরে এনে যদি ওর যে কোন পাতার মাঝখানটুকু কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায় তা হলে রোদ লাগলেও ঐ ঢাকা অংশটায় সূর্যের আলো পৌঁছতে পারবে না। সূর্যের আলো তো আর কালো রঙের কোন জিনিস ভেদ করে যেতে পারে না। অবশ্য পাতাটার দু'পিঠেই ঐ রকম কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এবারে ঐ অবস্থায় টবটি নিয়ে সূর্যের আলোয় রেখে দেওয়া হ'ল—সারাদিন। সূর্যের আলোয় রাখলে সারা দিন ধরে গাছের পাতাগুলিতে ফোটো-সিন্থেসিস চলবে—যার ফলে ওর মধ্যে নতুন করে তৈরি হবে স্টার্চ বা শ্বেতসার। ঠিক সূর্যা-স্তের আগে টবটিকে তুলে এনে যে পাতাটার গায়ে কালো কাগজ লাগানো ছিল তা থেকে ঐ কালো কাগজ খুলে নেওয়া হ'ল। তার পর গোটা পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে গরম জলে একটু সিদ্ধ করে নিয়ে (পাতার কোষগুলো নির্জীব করার জন্য) পাতাটি অ্যালকোহলে ডুবিয়ে রাখা হ'ল। ফলে ওর ভিতরকার সমস্ত সবুজ-কণা বা ক্লোরোফিল গুলে বেরিয়ে এসে পাতাটাকে সাদা করে দেবে। এবারে ঐ সাদা পাতা মিনিট খানেক আয়োডিন সলিউশনে ডুবিয়ে তুলে নিলে দেখা যাবে এক মজার কাণ্ড। পাতার সবটা গাঢ় নীল হয়ে গেছে, শুধু যে অংশটুকু কালো কাগজে ঢাকা ছিল সেটুকুতে কোন পরিবর্তন ঘটে নি। সেখানে আয়োডিন সলিউশনের পাৎলা হলদেটে রংটাই শুধু দেখা যাচ্ছে :

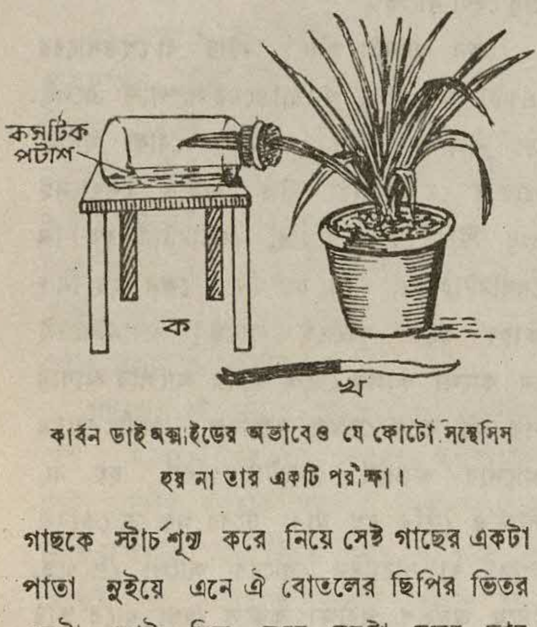
কেন এমনটা হ'ল? স্টার্চ বা শ্বেতসারের একটা গুণ হচ্ছে আয়োডিনের সংস্পর্শে এলেই তা নীল হয়ে যায়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে পাতার যে অংশটা নীল হয়েছে সেখানেই শুধু স্টার্চ তৈরি হয়েছে, যেখানটায় হয় নি সেখানটার রং নীল হয় নি। কেন হয় নি? কারণ তো বুঝতেই পারছ! ওখানটাতেই যে কালো কাগজ ঢেকে সূর্যের আলোর আসার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল! অর্থাৎ সূর্যের আলোর অভাবে ফোটোসিন্থেসিস হয় না, স্টার্চও তৈরি হয় না। টবের অন্য যে কোনও পাতা, যা সারাদিন রোদের আলো পেয়েছে, নিয়ে অনুরূপ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার সবটাই নীল হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তার সর্বত্রই স্টার্চ তৈরি হয়ে গেছে।

কার্বন ডাইঅক্সাইডও দরকার

শুধু সূর্যের আলোই নয়, কার্বন ডাই-অক্সাইডের অভাবেও ফোটোসিন্থেসিস হয় না।

এও একটা সহজ পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড কস্টিক পটাশ সলিউশনে গুলে যায়—যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় দ্রবীভূত হওয়া। একটা বড় বোতলে খানিকটা কষ্টিক পটাশ সলিউশন ঢেলে খানিকক্ষণ ঝাঁকিয়ে যদি বোতলের মুখটা ছিপি দিয়ে আটকে দেওয়া যায় তা হলে বোতলের ভিতরকার বাতাসের সমস্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে যাবে। এবারে ঠিক আগেকার পরীক্ষার মত একটা অন্ধকার ঘরে রেখে কোনও টবের

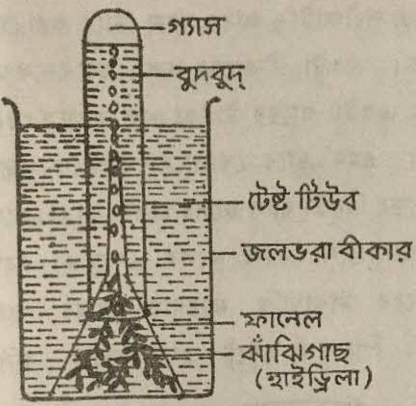


কার্বন ডাইঅক্সাইডের অভাবেও যে ফোটোসিন্থেসিস হয় না তার একটি পরীক্ষা।

গাছকে স্টার্চশূন্য করে নিয়ে সেই গাছের একটা পাতা নুইয়ে এনে ঐ বোতলের ছিপির ভিতর একটা ছোট ছিদ্র করে যতটা সম্ভব তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল আর বোতলটাকে টবের পাশে একটা জলচৌকির ওপর শুইয়ে সবশুদ্ধ সারাদিন রোদে রেখে দেওয়া হ'ল। বিকেলের দিকে ঐ বোতলে ঢোকানো পাতাটা টবের গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যদি আগের পরীক্ষার মত জলে সিদ্ধ করে আয়োডিন সলিউশনে ডোবানো যায় তবে দেখা যাবে ঐ পাতার ডাঁটির দিকে যে অংশটুকু বোতলের বাইরে ছিল, অর্থাৎ বাইরের কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিল, সেইটুকুই শুধু নীল হয়েছে, আর পাতার বাকি অংশ, যেটুকু বোতলের ভিতর কার্বন ডাইঅক্সাইড-শূন্য বাতাসের মধ্যে ছিল, সেটা পাৎলা হলদেটেই হয়ে রয়েছে। এর থেকেই বোঝা গেল বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড না থাকলে ফোটোসিন্থেসিস হয় না —স্টার্চও তৈরি হয় না।

ফোটোসিন্থেসিসের সময় পাতা বাতাসে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় বলেছি। তারও একটা সুন্দর পরীক্ষা করা যেতে পারে।

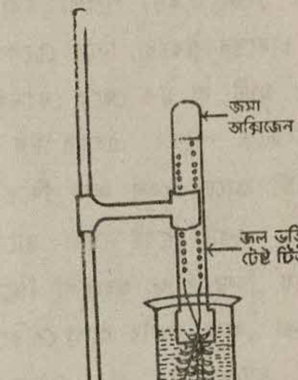
একটা কাচের বীকারের মধ্যে জল ভরে তার মধ্যে কিছু টাটকা জলজ গাছ (যেমন হাই-ড্রিলা) উল্টো করে, অর্থাৎ কাণ্ডের কাটা দিক্‌টা ওপরের দিকে রেখে, বসিয়ে দেওয়া হ'ল। এবারে ঐ গাছের ওপর একটা কাচের ফানেল উল্টিয়ে (অর্থাৎ চওড়া দিক্‌টা নীচের দিকে রেখে (গাছটিকে এমন ভাবে ঢেকে দেওয়া হ'ল যে ফানেলের চওড়া মুখের মধ্যে গাছটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায়। ফানেলের ডাণ্ডাটা কিন্তু খাড়া ভাবে থাকলেও সম্পূর্ণ ভাবে বীকারের জলে ডুবে থাকবে। এবারে একটা কাচের টেস্ট টিউব জলে ভর্তি করে বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে ফানেলের ঐ ডাণ্ডাটার ওপর উল্টে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। টেস্ট টিউবের খোলা মুখটা কিন্তু, জলের নীচে থাকলেও, জলে ভর্তি হয়েই রইল। এবার বীকারটি নিয়ে রোদের আলোর মধ্যে রেখে দিলে দেখা যাবে কয়েক



ফোটোসিন্থেসিসের সময়ে পাতা বাতাসে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়।

মিনিটের মধ্যেই গাছের কাটা মুখ থেকে অনবরত বুদ্‌বুদ্‌ বেরিয়ে টেস্ট টিউবের মাথার দিকে জড় হচ্ছে। এই বুদ্‌বুদ্‌গুলো আর কিছুই না,—অক্সিজেন গ্যাস। অক্সিজেন যতই ক্রমাগত ওপরে উঠতে থাকবে, টেস্ট টিউবের ভিতরকার জলও ততই নেমে যেতে থাকবে। যখন সব জল বেরিয়ে টেষ্ট টিউবটি পুরোপুরি অক্সিজেনে ভর্তি হয়ে যাবে তখন আগের মত বুড়ো আঙুল দিয়ে ওর মুখটা টিপে ধরে বাইরে এনে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে ঐ গ্যাস অক্সিজেন ছাড়া আর কিছুই না। একটা জ্বলন্ত কাঠি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে আগুনে তাতা লাল অবস্থাতেই (যেমন ধূপকাঠির বেলা করা হয়) ঐ গ্যাসের মধ্যে ধরলে সেটা আবার দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে। অক্সিজেন গ্যাস হলেই এ রকমটা হতে পারে।

এই পরীক্ষাটা আরও সহজ ভাবেও করা যায়। একটা কাচের জার জলে ভর্তি করে তার মধ্যে কিছু জলজ গাছ উল্টো করে, অর্থাৎ কাণ্ডের কাটা দিক্‌টা ওপরের দিকে রেখে, ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। তার পর একটা কাচের টেস্ট টিউব জলে ভর্তি করে আগের পরীক্ষার মত ঐ গাছের ওপর জলের মধ্যেই উল্টো করে বসিয়ে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে দেওয়া হ'ল। এবার টেস্ট টিউব সমেত জারটি রোদের মধ্যে রেখে দিলে দেখা যাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাছের গা থেকে ক্রমাগত বুদ্‌বুদ্‌ উঠে টেস্ট টিউবে জড় হচ্ছে। ঐ বুদ্‌বুদ্‌গুলো যে অক্সিজেন তাও আগের মত আধ-নিবন্ত কাঠি ডুবিয়ে সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে।



ফোটোসিন্থেসিসের সময়ে পাতা অক্সিজেন ছেড়ে দিচ্ছে : আর একটি পরীক্ষা

পাতার দ্বিতীয় কাজ : বাষ্পমোচন

পাতার দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ট্রান্‌স্‌পিরেশন্‌ — যার বাংলা করা হয়েছে 'বাষ্পমোচন'। সোজা বাংলায় যাকে বলা যায় ঘামানো।

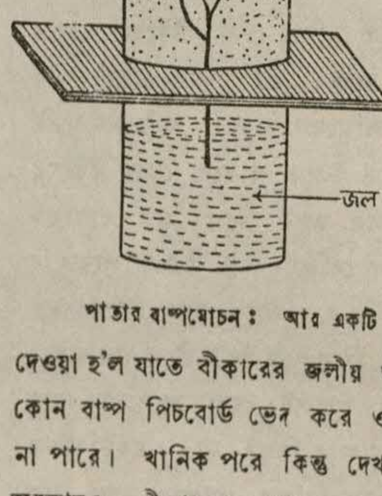
গাছ শিকড় দিয়ে জল-মেশানো খাদ্য টেনে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু যতটা জল টেনে নেয় ততটা জল ওর কাজে লাগে না. এই অতিরিক্ত জলটা তাই সে আবার বার করে দেয় এবং সে কাজের ভারও পাতার ওপরেই। এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় ট্রান্‌স্‌পিরেশন্ বা বাষ্পমোচন বা সোজা ভাষায় ঘামানো।

এ ব্যাপারটাও একটা ছোট্ট পরীক্ষা করে দেখানো যেতে পারে। একটা টবের গাছ বেশ কিছুক্ষণ রোদে রেখে তারপর গোড়াটা অর্থাৎ মাটি সমেত টবটা একটা পাৎলা রবারের বা প্লাস্টিকের চাদরের টুকরো দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'ল—যাতে মাটি বা টব থেকে কোনও জলীয় বাষ্প না বেরুতে পারে। এবারে টব সমেত গাছটা একটা কাচের বেল জার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'ল। একটু পরেই দেখা যাবে বেল জারের গায়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা গিয়ে জমা হচ্ছে। পাতা থেকে জলীয় বাষ্প বেরিয়েই যে এ ব্যাপার ঘটছে এর পর তাতে আর সন্দেহ কি ?



শিকড় দিয়ে জল টেনে নেবার পর গাছ অতিরিক্ত জলটা আবার বার করে দেয়—তারই একটি পরীক্ষা

এ পরীক্ষাটাও আরও সহজ ভাবে করা যেতে পারে। একটা বীকারের তলায় জল রেখে তার মধ্যে একটা গাছের টাটকা ডাল ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। এমন ভাবে ঝোলানো হ'ল যে গাছের শিকড়ের দিক্‌টা রইল জলের মধ্যে, পাতা সমেত ডালপালাগুলো রইল জলের ওপরে। এবারে বীকারের মাঝামাঝি জায়গায় জলের ওপরে একটা পিচবোর্ড কেটে এমন ভাবে বসিয়ে দেওয়া হ'ল যাতে বীকারের জলীয় অংশ থেকে কোন বাষ্প পিচবোর্ড ভেদ করে ওপরে উঠতে না পারে। খানিক পরে কিন্তু দেখা যাবে, এ অবস্থায়ও বীকারের গায়ে ওপরের দিক্‌টায় বিন্দু বিন্দু জলকণা এসে জমছে। তা হলে ঐ জলীয় বাষ্প কোথা থেকে আসছে ? নিশ্চয়ই পাতা থেকেই বেরিয়ে আসছে।



পাতার বাষ্পমোচন : আর একটি পরীক্ষা

পাতার তৃতীয় কাজ : শ্বাসকার্য

পাতার তৃতীয় কাজ হচ্ছে রেস্‌পিরেশন অর্থাৎ শ্বাসকার্য।

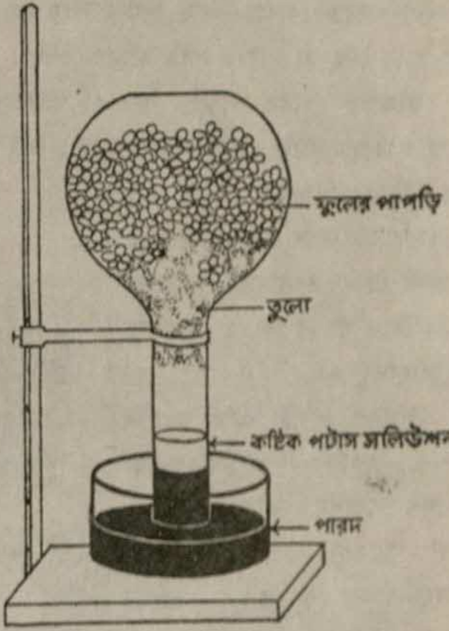
আমরা বাতাস থেকে নাক দিয়ে ফুসফুসে

অক্সিজেন টেনে নিই। তাকে বলা হয় প্রশ্বাস। সেই অক্সিজেন শরীরের মধ্যে খাদ্য পুড়িয়ে তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড- যা আমরা আবার বাতাসে ছেড়ে দিই। তাকে বলা হয় নিঃশ্বাস। প্রশ্বাস এবং নিঃশ্বাস দু'টি মিলিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে বলা হয় শ্বাসকার্য। শ্বাসকার্যের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু শক্তিসৃষ্টি। শরীরের ভিতরকার ঐ মৃদু দহনক্রিয়ার ফলে যে শক্তি বা এনার্জি পাওয়া যায় তাই দিয়েই আমাদের দেহযন্ত্র সচল থাকে। গাছেদের বেলাও ঠিক তাই। আমাদের মত গাছেরাও ঐ রকম ভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়—অক্সিজেন টেনে নিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়, আর এ কাজও তারা করে পাতার ভিতর দিয়েই, সর্বক্ষণ।

গাছের এই শ্বাসকার্যও একটা পরীক্ষা দিয়ে দেখানো যায়।

কতকগুলি টাটকা ফুলের পাপড়ি জলে ভিজিয়ে একটা কাচের ফ্লাস্কের মধ্যে পুরে দেওয়া হ'ল আর তার ওপর গুঁজে দেওয়া হ'ল কিছু তুলো। এবার ফ্লাস্কের মুখের কাছে খানিকটা কষ্টিক পটাশ সলিউশন দিয়ে সমস্ত ফ্লাস্কটা উপুড় করে বসিয়ে দেওয়া হ'ল একটা পারা বা পারদ ভর্তি পাত্রের ওপর। একটা ক্ল্যাম্প দিয়ে ফ্লাস্কটাকে ঐ অবস্থায় আটকে রাখা হ'ল। একটু পরেই দেখা যাবে ফ্লাস্কের মুখের ভিতর দিয়ে পারার লেভেল ক্রমেই ওপরের দিকে উঠছে, অর্থাৎ পারাটা ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

এবারে ভেবে দেখা যাক কেন এমনটা হ'ল। গোড়ায় ফ্লাস্কের ভিতরকার বাতাসে যে সামান্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ছিল কষ্টিক পটাশ সলিউশন তা সবটাই শুষে নিয়েছিল। কষ্টিক পটাশ যে কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নেয় সে



আমাদের মত গাছেরাও যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়—অক্সিজেন টেনে নিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড বার করে দেয়—তারই একটি পরীক্ষা

কথা তো আগেই বলেছি। কাজেই ফ্লাস্কের মধ্যে কোন কার্বন ডাইঅক্সাইড ছিল না। কিন্তু ফ্লাস্কের ভিতরে রাখা ফুলের পাপড়ি শ্বাসকার্য শুরু করায় নতুন করে সেখানে কার্বন ডাই-অক্সাইড জমতে শুরু করল। কিন্তু এলাকার কষ্টিক পটাশ সলিউশন সেটাকেও জমতে দিল না, বেরোনো মাত্রই তা শুষে নিতে লাগল। আর তারই ফলে পারার লেভেলও ফ্লাস্কের খোলা মুখ বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

পাতার চতুর্থ কাজঃ সংবহন

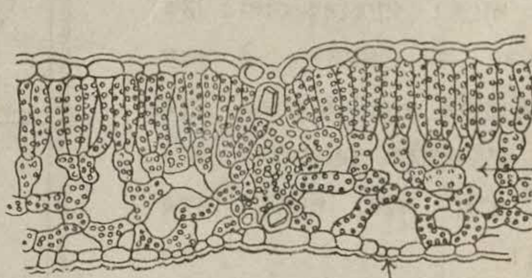
ওপরের তিনটি কাজ ছাড়া পাতার আরও একটি কাজ আছে—যাকে ইংরেজীতে বলা হয় কনডাক্‌শন। ওর বাংলা করা হয়েছে 'সংবহন'। সংবহন বলতে বোঝায়—গাছ শিকড় দিয়ে যে জল শুষে নেয় তা গাছের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া। এ কাজটির ভারও নিয়েছে পাতা। গাছের মধ্যে জাইলেম নামে এক রকম নল আছে। সেই নল দিয়ে শিকড়ের টানা রস পাতার মধ্যে এসে ঢোকে, তারপর পাতায় তৈরি তরল খাদ্য ফ্লোয়েমের মধ্যে দিয়ে গাছের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

ওপরের চারটি কাজ ছাড়াও কোন কোন পাতা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কাজ করে সে কথা আগেই বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩২-২৩৪)।

পাতার গায়ে সূক্ষ্ম ছিদ্র—স্টোমাটা

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ফেললে পাতার ভিতরকার গড়ন স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। কোন কোন পাতার ওপরের দিক্‌টা নীচের দিকের চাইতে বেশি গাঢ় সবুজ। একটা আমপাতা বা কাঁঠালপাতা নিয়ে দেখলেই এই তফাৎটা বেশ বোঝা যাবে। এর কারণ হচ্ছে, এই সব গাছের পাতা মাটির সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবে বসানো থাকে, কাজেই সূর্যের আলোর বেশির ভাগই পড়ে ওর ওপরের দিক্‌টায়। এইজন্যেই ওপরের দিক্‌টাতেই সবুজ কণার যত ছড়াছড়ি, পাতার ভিতর সূক্ষ্ম ছিদ্রও থাকে এই দিক্‌টাতেই।

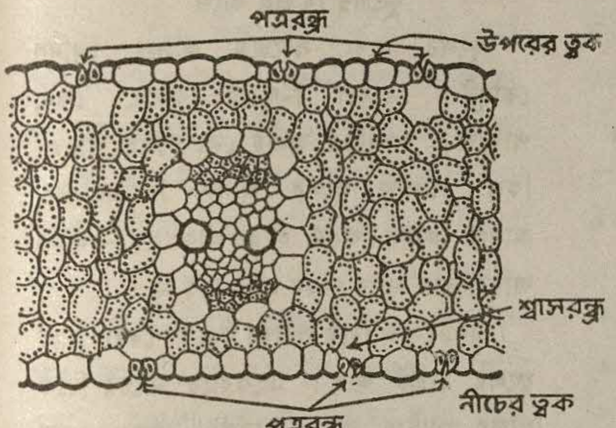
কিন্তু কোন কোন গাছের,—যেমন বাঁশ গাছ, কলাবতী গাছ, ভুট্টা গাছ প্রভৃতির পাতাগুলি কিন্তু সে রকম নয়। ওদের দু'দিক্‌ই এক রকম গাঢ়। এই সব গাছের পাতা প্রায় খাড়া ভাবে থাকে, তাই ওর দু'দিক্‌ই সমান সূর্যের আলো পায়। কাজেই একদিকের রং অপর দিকের চাইতে বেশি গাঢ় হবার কারণ নেই। অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলেও দেখা যাবে এদের ক্লোরোফিল-গুলো ওপরে নীচে সর্বত্রই সমান ভাবে ছড়ানো



অণুবীক্ষণের নীচে গাছের পাতা : এই জাতের গাছের পাতার ওপরের দিক্‌টা নীচের দিকের চাইতে বেশি সবুজ।

এবং পাতার ভিতরকার সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলোও দু'দিকেই বসানো।

পাতার গায়ে যে ছোট্ট ছিদ্রের কথা বললাম, বাংলায় ওকে বলে পত্ররন্ধ্র। রন্ধ্র মানে ছিদ্র। বিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম স্টোমাটা (বহুবচনে স্টোমা)। আকারে অবশ্য এগুলি অত্যন্ত ছোট,—এত ছোট যে খালি চোখে দেখাই যায় না, ম্যাগ্‌নিফাইং লেন্স দিয়ে দেখলে তবেই টের পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অবশ্য আরও ভালো করে দেখা যায়। এই স্টোমাটা দিয়েই পাতা কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নেয়, অক্সিজেন ছেড়ে দেয়; আবার শ্বাসকার্যের সময়েও এই স্টোমাটাই



যে সব গাছের পাতার রং দু'দিকেই সমান গাঢ় সবুজ সেগুলি অণুবীক্ষণের নীচে কেমন দেখায়

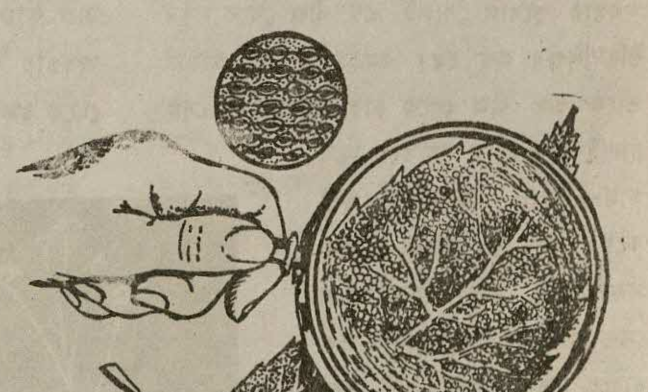
হচ্ছে অক্সিজেন টেনে নেবার আর কার্বন ডাই-অক্সাইড বার করে দেবার পথ। ট্র্যানস্পিরেশন বা ঘাম বেরোবার পথও এই স্টোমাটা। পাতারা এই স্টোমাটা প্রয়োজন মত খুলে রাখতে পারে, আবার বন্ধ করেও রাখতে পারে।

গাছকে সজীব থাকতে হলে সূর্যের আলো তাকে পেতেই হবে। ১২৫২ পৃষ্ঠার নীচের ছবিটি দেখলেই বোঝা যাবে সূর্যের আলো পেয়ে কিংবা না পেয়ে একই গাছের কি রকম অবস্থা হতে পারে।

গাছের ফুল

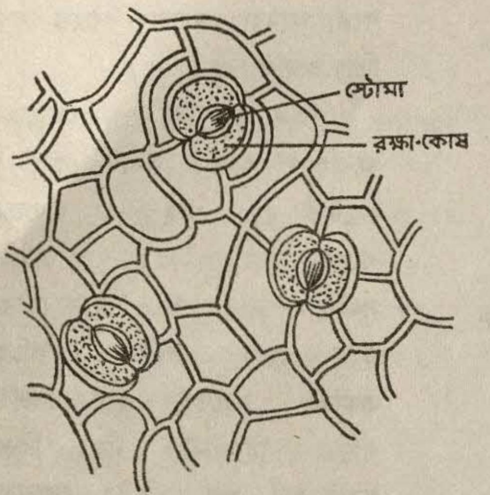
পাতার পরে আমরা চলে আসছি গাছের ফুলে। গাছের সমস্ত অংশের মধ্যে ফুলই হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর। ফুল ভালোবাসে না এমন লোক খুব কমই আছে। ফুলের রং, ফুলের গন্ধ আমাদের আকুল করে তোলে। ফুলকে পবিত্র মনে করে আমরা দেবতার পায়ে ফুল দিয়ে অঞ্জলি দিই।

কিন্তু ফুল কি শুধু লোকের মনোহরণ করবার জন্যই ফোটে? মোটেই না। গাছ তার নিজের গরজেই ফুল ফোটায়। গাছ একটি সজীব পদার্থ, আর আজ হোক কাল হোক, সজীব পদার্থকে একদিন মরতেই হবে। তাই গাছও চিরজীবী নয়। কিন্তু মৃত্যুই যদি শুধু পৃথিবীর একমাত্র নিয়ম হ'ত তা হলে তো সমস্ত সৃষ্টিই এত দিনে ধ্বংস হয়ে যেত। মৃত্যুর পাশাপাশি চলেছে জন্ম। সজীব পদার্থেরা এই সৃষ্টি রক্ষা করে চলেছে সন্তানের জন্ম দিয়ে—



ম্যাগ্‌নিফাইং লেন্স দিয়ে দেখলে পাতার গায়ে ছোট ছোট অসংখ্য ছিদ্র দেখা যায়। এর নাম পত্ররন্ধ্র বা স্টোমাটা। ওপরে এই স্টোমাটা বড় করে দেখানো হয়েছে।

বংশ বিস্তার করে। গাছেরাও তাই করে। ফুল হচ্ছে এই বংশবিস্তারের প্রথম ধাপ। ফুল থেকে হয় ফল, ফলের মধ্যে থাকে বীজ আর



পাতার গায়ে স্টোমাটা (বহুবচনে স্টোমা) আরো বড় করে দেখানো হয়েছে।

এই বীজের মধ্যেই থাকে ঘুমন্ত অবস্থায় উদ্ভিদের প্রাণ—যাকে আমরা বলি গাছের ভ্রূণ। অনুকূল অবস্থার সুযোগ পেলেই এই বীজ থেকে নতুন উদ্ভিদ্‌শিশুর জন্ম হয়। চলতি কথায় আমরা তাকে বলি বীজ থেকে চারা গজানো। সেই চারাই ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে নতুন গাছ—বিরাট বনস্পতির সৃষ্টি করে। তার পর একদিন তাকেও মরতে হয়, কিন্তু মরবার আগে সেও যথা সময়ে ফুল ফুটিয়ে, ফল ধরিয়ে, নতুন বীজের সৃষ্টি করে বংশরক্ষার ব্যবস্থা করে যায়। সৃষ্টির আদিযুগ থেকে এই নিয়ম চলে আসছে।

তবে সব গাছে কিন্তু ফুল হয় না। সে সব গাছে বীজও হয় না। সে সব গাছের বংশবিস্তারের ব্যবস্থা অন্য রকম। সে গল্প আমরা পরে বলব।

ফুলের বিভিন্ন অংশ

ফুলের মধ্যে সবচেয়ে আসল জিনিস কোন্‌টি ? তোমরা নিশ্চয়ই বলবে, কেন, পাপড়ি! পাপড়ির জন্যই তো ফুলের আদর! কিন্তু পাপড়ি ফুলের আসল জিনিস নয়, আসল জিনিস থাকে আরও মাঝখানে,—যদিও আমরা তার ওপর তেমন নজর দিই না।

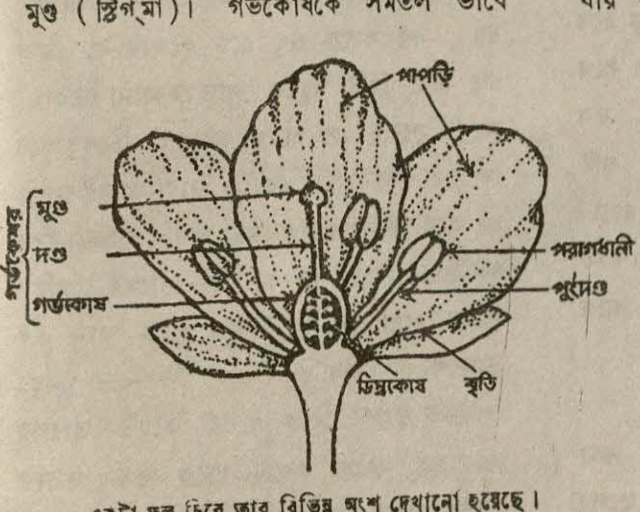
একটা ফুল নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ফুলের চারটি অংশ। একেবারে নীচের দিকে ফুলের বোঁটার কাছে অনেকটা গেলাসের মত একটি সবুজ ঢাকনা। ঠিক গেলাসের মত বলব না, কেননা অনেক ফুলেই এটি কয়েকটি দাঁতের মত পাতা দিয়ে তৈরি। বাংলায় এই অংশ-গুলিকে বলা হয় ফুলের বৃতি, ইংরেজীতে বলে সেপাল। সবটা মিলে বলা হয় ক্যালিক্স। এর কাজ হচ্ছে ফুল ফুটবার আগে যখন কুঁড়ি অবস্থায় থাকে তখন তাকে বাইরের শীতাতপ থেকে রক্ষা করা।



বাঁ-দিকের গাছটি সূর্যের আলো পায় নি, তাই ওর পাতাগুলি নিস্তেজ হয়ে ঝুলে পড়েছে। কিন্তু ডানদিকের গাছটি সূর্যের আলো পাওয়ায় কি রকম সতেজ!

বৃতির ঠিক ভিতরেই থাকে পাপড়ি—যার ইংরেজী নাম পেটাল। সবগুলি পাপড়ি মিলিয়ে বলা হয় করোলা। পাপড়িগুলি খুব রঙচঙে হয় —এক এক ফুলে এক এক রং। লাল, নীল, হলদে, বেগুনী, সাদা, আরও কত কি! রঙচঙে হবার কারণ—ঐ রূপ দেখিয়ে ওরা মৌমাছি, কীটপতঙ্গ প্রভৃতিকে আকৃষ্ট করে। কেন, তা পরে বলছি। যে সব ফুল রাতের অন্ধকারে ফোটে সেগুলো এই কারণেই হয় সাদা, রাতে সাদা রং ছাড়া অন্য রং চেনা মুশ্‌কিল তো!

ফুলের ঠিক মাঝখানে থাকে স্ত্রীস্তবক বা গাইনেসিয়াম। একটা নলের মত খাড়া জিনিস, যার গোড়াটা একটু মোটা, মাথাটাও গোল। শুধু গোল নয়, একটু চটচটেও,—আঠার মত। ফুলের এই অংশগুলিকে বলে গর্ভকেশর। ইংরেজীতে বলে কার্পেল। ওর গোড়ার ফোলা অংশটিকে বলা হয় গর্ভকোষ বা ডিম্বাশয় (ওভারি), খাড়া নলটিকে বলা হয় গর্ভদণ্ড (স্টাইল) এবং চটচটে ডগাটাকে বলা হয় গর্ভমুণ্ড (স্টিগ্‌মা)। গর্ভকোষকে সমতল ভাবে কাটলে দেখা যাবে কতকগুলো ডিম্বকোষ দিয়ে এগুলি তৈরি।



একটা ফুল চিরে তার বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে।

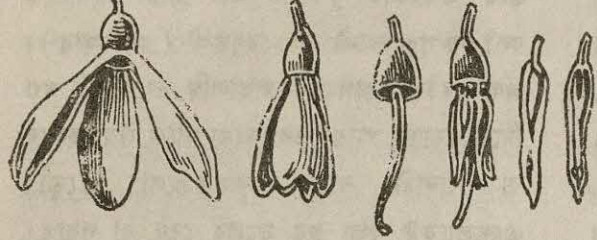
গাইনেসিয়াম বা স্ত্রীস্তবককে ঘিরে রয়েছে ফুলের পুংস্তবক (অ্যান্ড্রেসিয়াম)। এর এক একটি অংশকে বলা হয় পুংকেশর (স্ট্যামেন)। এগুলি দেখতে যেন কতকগুলো সুতোর মত খাড়া খাড়া কাঠি, মাথাগুলি মোটা—তার ওপর একটা করে পুঁটলি বসানো। ঐ কাঠিগুলির নাম দেওয়া হয়েছে পুংদণ্ড (ফিলামেণ্ট) আর তার ওপরকার পুঁটলির মত মোটা অংশটিকে বলা হয় পরাগধানী বা রেণুস্থলী (অ্যান্থার)। এক-একটা পরাগধানী লম্বালম্বি ভাবে দু'টি খণ্ড দিয়ে যোড়া আর ওর মধ্যে থাকে ঈষৎ হলদে বা বাদামী রঙের কতকগুলো গুঁড়ো। এগুলোকেই বলা হয় ফুলের রেণু বা পরাগ। ইংরেজীতে ওর নাম পোলেন গ্রেন।

কোন কোন ফুলে আবার পুংস্তবক বা স্ত্রীস্তবক এদের একটা থাকে না। হয় পুংস্তবক থাকে, নয় তো স্ত্রীস্তবক থাকে। এদের প্রথমটিকে বলা যায় পুরুষ-ফুল, দ্বিতীয়টিকে বলা যায় মেয়ে-ফুল। তবে একই গাছে আলাদা আলাদা পুরুষ-ফুল বা মেয়ে-ফুল থাকতে পারে। লাউ, কুমড়ো, শশা প্রভৃতি এই ধরনের গাছ।

কোন কোন ফুল আবার একেবারে একই সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে ফোটে। যেমন গাঁদা, রজনীগন্ধা। এদের ফুল না বলে বলা যায় ফুলের মঞ্জরী। ইংরেজী নাম ইনফ্লোরেসেন্স।

ফুল ভালো করে ফুটলে পুং-

কেশরের পরাগধানী ফেটে ভিতরকার পরাগ বা রেণুগুলো বেরিয়ে আসে। তার পর সেগুলির কোনটা বাতাসে উড়ে কিংবা রঙিন পাপড়িতে আকৃষ্ট কীটপতঙ্গদের বা আর কারো সাহায্যে গর্ভকেশরে এসে পড়লে গর্ভমুণ্ডের চটচটে আঠায় আটকে যায়। তার পর সেখান থেকে একটা নল গজিয়ে তা গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়ে গিয়ে হাজির হয় গর্ভকোষে। নলের আগায় থাকে পুংকোষ। সেখানে সেগুলি



ফুলের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদা করে দেখানো। বাঁ-দিকে বৃতি (সেপাল), তার পাশে পাপড়ি (পেটাল), তার পাশে স্ত্রীস্তবক (গাইনেসিয়াম)। পাশে গাইনেসিয়ামকে ঘিরে আছে ৬টি পুংস্তবক (অ্যান্ড্রেসিয়াম)। তার পাশে ২টি আলগা পুংকেশর

ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলে দু'টিতে মিলে সৃষ্টি করে উদ্ভিদের ভ্রূণ। এটিই ক্রমে বড় হতে হতে হয়ে যায় বীজ, আর গর্ভকোষটিও সঙ্গে সঙ্গে বড় হতে হতে পরিণত হয় ফলে। ফল আরও পাকলে তার বীজ বেরিয়ে এসে সৃষ্টি করে নতুন উদ্ভিদ্‌শিশু বা গাছের চারা। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, ফুলের পাপড়ি যতই মনোহারী হোক না কেন, ফুলের প্রধান অংশ হচ্ছে পুংকেশর আর গর্ভকেশর।

পরাগযোগ

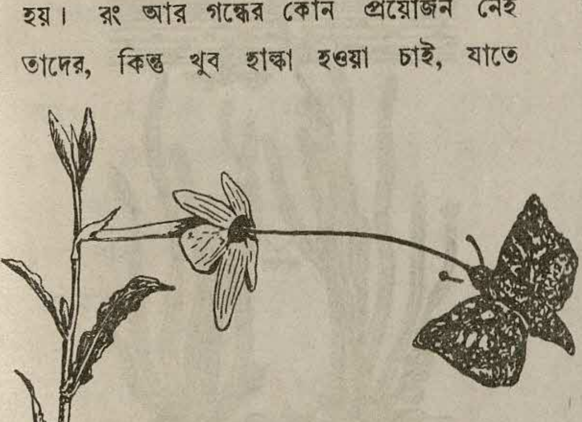
আগে বলেছি, গাছের বংশরক্ষার জন্য নতুন বীজ সৃষ্টি করা বিশেষ দরকার। ফুলের পরাগ বা রেণু গর্ভকেশরে পৌঁছে দিতে পারলে তবেই এই বীজ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু একই ফুলের রেণু সেই ফুলের গর্ভকেশরে পড়লে ভালো বীজ হয় না। এজন্য প্রকৃতি সর্বদাই চেষ্টা করে গর্ভকেশরে কি করে রেণু পৌঁছে দেওয়া যায় এবং কি করলে যতটা সম্ভব অন্য ফুলে ঐ রেণু পৌঁছয়। অন্য গাছের ফুলে পৌঁছে দিতে পারলে তো আরো ভালো। কারণ সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাছের গুণ ঐ উদ্ভিদ্‌শিশুর মধ্যে চলে আসে। গর্ভকেশরের সঙ্গে রেণুর এই যোগাযোগকেই বলা হয় পরাগ-যোগ বা পরাগ-মিলন। ইংরেজীতে ওকে বলা হয় পলিনেশন।

এই পরাগযোগ ঘটাবার জন্য প্রকৃতিতে যে কত রকম ব্যবস্থা আছে তার ঠিক নেই। কতকগুলি ফুল আছে যারা মৌমাছি, প্রজাপতি, পিঁপড়ে ও অন্যান্য নানা রকম কীটপতঙ্গকে এ কাজে লাগায়। ওদের আকৃষ্ট করবার জন্যই পাপড়িদের অমন রঙচঙে চেহারা নিয়ে সাজতে হয়। সব সময়ে শুধু রঙে কুলোয় না, এজন্য গন্ধ এবং মিষ্টি মধুরও লোভ দেখানো দরকার। অনেক ফুলেই সে ব্যবস্থা আছে। বিশেষ করে যে সব ফুল রাত্রে ফোটে তারা প্রায়ই সুগন্ধি হয় আর সেগুলির রংও হয় সাদা। অন্ধকারের জন্যই ঐ সাদা রং তা তো আগেই বলেছি। ফুলের মধ্যে যে মধু সঞ্চিত থাকে তাও এই উদ্দেশ্যে। মৌমাছি, প্রজাপতি—এরা মধুর লোভেই ফুলের দিকে ধাওয়া করে। তারপর যখন মধু সংগ্রহ করতে থাকে তখন তাদের ডানায়, পায়ে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ঐ

ফুলের রেণুগুলো জড়িয়ে যায়। তার পর যখন তারা আবার অন্য ফুলে গিয়ে বসে তখন সেই রেণু ঝরে পড়ে সেই সব ফুলের গায়ে। এই-ভাবে পরাগযোগও ঘটে যায়। গোলাপ, পদ্ম, জবা, ধুতরা, যুঁই, চাঁপা—সবই এই জাতের গাছ। কুন্দ, রজনীগন্ধা, কামিনী—এগুলি সাদা, রাতেই ফোটে কিনা।

শুধু কীটপতঙ্গ নয়, অনেক পাখী, জন্তু-জানোয়ারও এ কাজে ফুলদের সাহায্য করে। ফুলের গন্ধ, রং আর মধুর লোভে কাছে এলে ওদের গায়ে, গায়ের লোমে পরাগ আটকে যায়। অনেক সময় এমন ব্যবস্থা থাকে যে কাঁটা বা আঁকশির মত অজান্তেই তা জীবজন্তুর গায়ে আটকে থাকে। কৃষ্ণচূড়া, শিমুল প্রভৃতি গাছের ফুল এর উদাহরণ।

কোন কোন গাছের ফুল আবার বাতাসের সাহায্যে পরাগযোগ ঘটায়। বলা বাহুল্য এ সব জাতের ফুল সাধারণত আকারে ছোট হয়। রং আর গন্ধের কোন প্রয়োজন নেই তাদের, কিন্তু খুব হাল্কা হওয়া চাই, যাতে



পরাগযোগ

রাতের প্রজাপ ত মথ লম্বা শুঁড় দিয়ে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে পরাগ-কণাও টেনে নিচ্ছে, পরে অন্য ফুলে তা ঝরে পড়ছে।

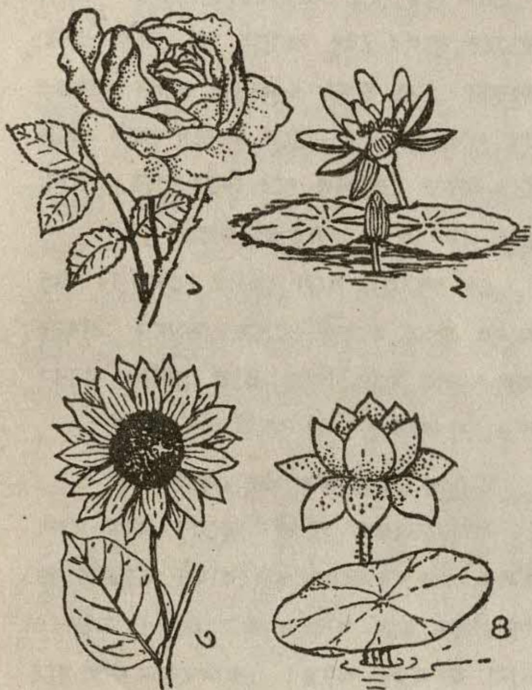
বাতাসে খুব দূরে ভেসে যেতে পারে। এইসব জাতের ফুলের রেণু সংখ্যায় খুব বেশি হওয়া দরকার। তা ছাড়া এ-জাতীয় ফুলের গর্ভমুণ্ডও হয় পালকের মত—যাতে বাতাস থেকে সহজে উড়ে-যাওয়া রেণুগুলি ধরে নিতে পারে। ধান, ভুট্টা, এমন কি ঘাসফুলও এই জাতের ফুল।

যে সব ফুল জলে ফোটে সেগুলির রেণু অনেক সময় জলের স্রোতে ভাসতে ভাসতে অন্য ফুলের মধ্যে গিয়ে কাজ হাসিল করে। পাতা শেওলার ফুল এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ

পরাগযোগের পরেই ফুলের কাজ শেষ হ'ল। এর পর ফুলের গর্ভকোষটি আস্তে আস্তে বড় হতে হতে পরিণত হবে ফলে। ফলেরও নানা রকমফের আছে। কোন কোন ফলে মাত্র একটি বড় বীজ থাকে। আম এর একটি চমৎকার উদাহরণ। আবার কোন কোন ফলে অসংখ্য বীজ থাকে—যেমন, আতা। কতকগুলি ফলের ছবি (আস্ত এবং কাটা) ১২৫৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল। এ থেকেই বিভিন্ন জাতের ফলের তফাৎ বোঝা যাবে। ফুলের বেলায় যেমন মঞ্জরী, তেমনি ফলের বেলায়ও সময় সময় এক সঙ্গে কতকগুলি ফল একত্র হয়ে একটা ফলের মত দেখায়। যেমন, কাঁঠাল। কাটা কাঁঠালের ফালি দেখলেই তা বোঝা যাবে।

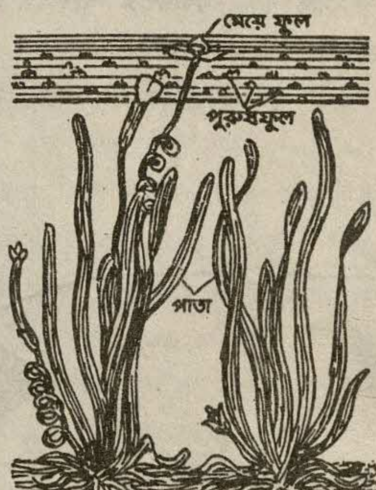
ফলের মধ্যে বীজ কিন্তু চিরকাল আবদ্ধ থাকে না। বীজ বেরোবার সময় হলে এক সময়ে ফল পেকে ওঠে। তখন তার ভিতর থেকে বীজ বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু শুধু বেরিয়ে পড়লেই



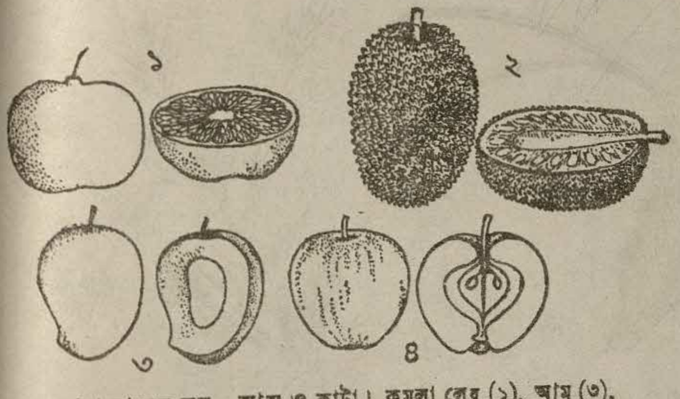
ফুল হচ্ছে-গাছের বংশরক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এখানে চার রকমের ফুল দেখা যাচ্ছে : (১) গোলাপ (২) শাপলা (৩) সূর্যমুখী (৪) পদ্ম।

তো হবে না, উপযুক্ত জায়গা বেছে তাকে ছড়িয়ে পড়তে হবে মাটিতে,—যেখানে সে জল, হাওয়া, আলো ভালো ভাবে পেতে পারে।

তা প্রকৃতি এজন্যও নানা ব্যবস্থা করেছেন। পরাগযোগের মত এখানেও নানা কৌশল আছে বীজ ছড়িয়ে দেবার। ফলের মিষ্টি স্বাদ, মিষ্টি গন্ধ—এ সবেরই মূল লক্ষ্য পাখী, জীবজন্তু বা পোকামাকড়কে ডেকে এনে তাদের সাহায্যে নানা দিগ্‌বিদিকে বীজ ছড়িয়ে দেওয়া। মজার মজার ব্যবস্থাও আছে। কোন কোন বীজের গায়ে বঁড়শি বা আঁকশির মত বাঁকানো কাঁটা লাগানো থাকে, কারও গায়ে থাকে ছোট ছোট কাঁটা। চোরকাঁটার খপ্পরে তো আমরাই কতবার পড়েছি মাঠে চলতে গিয়ে। এ সবেরই উদ্দেশ্য দূর দূরান্তরে বীজ ছড়িয়ে দেওয়া। বাতাসের সাহায্যে বীজ ছড়ানোর জন্যও বীজের গায়ে নানা ব্যবস্থা থাকে। তুলোর বীজের গায়ে যে তুলো আটকানো থাকে সেও তো এই উদ্দেশ্যেই। অনেক বীজের গায়ে হাল্কা ডানার মত 'পাখা' লাগানো থাকতেও দেখে থাকবে। কোন কোন ফল আবার পেকে গেলে আপনি ফেটে যায় এবং ফাটবার সময় তার বীজ অর্থাৎ বীচিগুলো এত জোরে ছিটকে বেরোয় যে সেগুলো আপনিই দূর দূরান্তরে গিয়ে পড়ে। কোন কোন ফল এত শব্দ করে ফাটে আর এত প্রচণ্ড জোরে তার বীজ ছিটকে যায় যে কারো গায়ে লাগলে সে জখম হয়ে যাবে। আফ্রিকায় একরকম কাঁটাওয়ালা ফলের গাছ দেখা যায়। তার কাঁটাগুলি ঠিক বাঘের নখের মত আর



পাতাশেওলার পরাগযোগ ঘটে জলে ভাসতে ভাসতে।



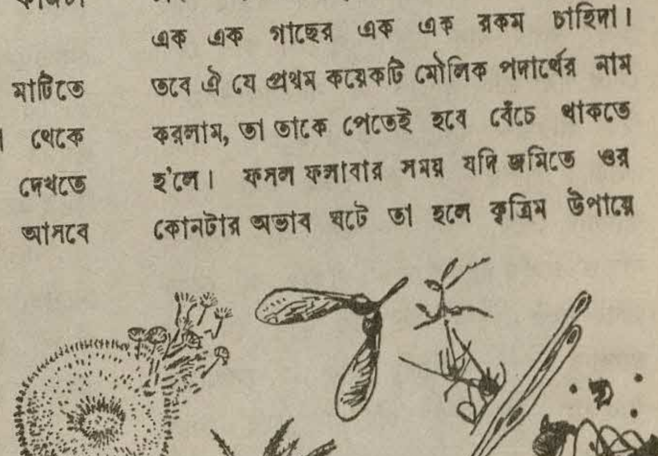
নানা জাতের ফল—আস্ত ও কাটা। কমলা লেবু (১), আম (৩), আপেলের (৪) সঙ্গে কাঁঠালের (২) তফাৎটা লক্ষ কর।

সংখ্যায় অগুণতি। কাঁটার এক একটা মুখ আবার এক এক দিকে। কোন বুনো জন্তুর গায়ে সে কাঁটা একবার লাগলে তার সাধ্য নেই তা ছাড়ায়। যতই ছুটোছুটি করবে, বীজগুলো ততই দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। মাঝের থেকে জন্তুটির প্রাণ নিয়ে হবে টানাটানি। জন্তুর প্রাণ বাঁচুক আর না বাঁচুক, বীজ ছড়ানোর কাজটা কিন্তু ভালো রকমেই হয়।

তারপর? তারপর আর কি। মাটিতে বীজ পড়লে অনুকূল পরিবেশে তা থেকে অঙ্কুর বেরোবে, তার পর কাণ্ড। দেখতে দেখতে ছোট্ট বীজটি থেকে বেরিয়ে আসবে নতুন জীবন নিয়ে নতুন একটি চারা গাছ। কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

গাছ কি খায়

বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড আর মাটি থেকে জলে গোলা নানা রাসায়নিক পদার্থ টেনে নিয়ে গাছ তার নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নেয়, আমাদের মত চাষবাস করে বা জীবজন্তু পুষে আর নানা রকম হাঙ্গামা-হুজ্জোত করে খাবারের জন্য 'হা পিত্যেশ' করে থাকতে হয় না তাদেরকে। তবে মাটিতে ঐ কাঁচামালগুলো অবশ্যই থাকা চাই। এই সব কাঁচামালের মধ্যে যে ক'টি মৌলিক পদার্থ তার অবশ্যই চাই তা হ'ল কার্বন (অঙ্গার,) হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার (গন্ধক) ও ফস্‌ফরাস্। এ ছাড়া আর কতকগুলি মৌলিক পদার্থ পেলেও ভালো হয়—যেমন পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লোহা ইত্যাদি। কোন কোন "পোশাকী" গাছের আবার এতেও মন ওঠে না—তাদের চাই আরও দুষ্প্রাপ্য ধাতু। কারও চাই ভ্যানাডিয়াম্, কারো বা সোনা। এক এক গাছের এক এক রকম চাহিদা। তবে ঐ যে প্রথম কয়েকটি মৌলিক পদার্থের নাম করলাম, তা তাকে পেতেই হবে বেঁচে থাকতে হ'লে। ফসল ফলাবার সময় যদি জমিতে ওর কোনটার অভাব ঘটে তা হলে কৃত্রিম উপায়ে



গাছের বীজ ছড়াবার নানা রকম কৌশল



বীজ ছড়াবার জন্য গাছের ফলেরাও নানা কৌশল অবলম্বন করে। কাঁটা, আঁকশি ইত্যাদির কাজই তাই। একেবারে বাঁ-দিকের ছবিতে ভেড়ার লোমে কাঁটাওয়ালা ফল আটকে আছে দেখা যাচ্ছে।

তা আমরা জমিতে দিয়ে দিই। একেই বলা হয় সার দেওয়া। প্রধানত নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস্‌, পটাসিয়াম এই সব পদার্থই ঐ সব সারের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়। নাইট্রোজেন প্রোটিন তৈরি করবার জন্য অবশ্যই চাই। তেমনি ফস্‌ফরাস্‌ও গাছের পুষ্টির জন্য প্রচুর প্রয়োজন। মাটির মধ্যে এই সব জিনিস থাকে বলেই গাছ মাটির ওপর বাস করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যদি মাটি ছাড়াও ঐ সব জিনিসগুলি ঠিক পরিমাণ মত একত্র করে জল, বালি, খোয়া, পাথর বা ঐ রকম অন্য কোন জায়গায় রেখে দিয়ে তার ওপর গাছ বসানো যায় তা হলেও গাছের বেঁচে থাকার বা বেড়ে ওঠার পক্ষে কোন বাধা হয় না। যে সব জায়গায় মাটি পাওয়া যায় না সেখানেও আজকাল এইভাবে চাষবাস করে ফসল ফলানো হচ্ছে—যাকে বলা হয় "মাটি-ছাড়া চাষ"। মরুভূমিতেও এইভাবে চাষ করা সম্ভব, এবং কোন কোন জায়গায় তা হচ্ছেও।

যে গাছ পোকামাকড় ধরে খায়

কিন্তু যদি বলি গাছ তার খিদে মেটাবার জন্যে জ্যান্ত পোকামাকড় ধরে খেতেও ছাড়ে না তা হলে নিশ্চয়ই অবাক্‌ হয়ে যাবে। কিন্তু সে রকম রাক্ষুসে গাছও আছে এবং আছে আমাদের দেশেই। তবে গাছেরা তো আর জন্তুজানোয়ার-দের মত নড়েচড়ে এখানে-ওখানে গিয়ে শিকার ধরতে পারে না, কাজেই তাদের নানা ফন্দী-ফিকির করে কাজ হাসিল করতে হয়। মধুর লোভ দেখিয়ে, গন্ধে মাতিয়ে, রংএর ছটায় মন ভুলিয়ে—নানা কৌশলে তারা পোকামাকড়দের তাদের কাছে টেনে আনে। তারপর, ব্যস্‌, কাছে এলেই বেচারাদের দফা রফা।

গারো পাহাড়ের স্যাৎসেঁতে জায়গায় নেপেন্থাস নামে এক ধরনের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলায় কেউ কেউ এদেরকে কলস বা কলসী গাছ বলে থাকে। তবে কলসী না বলে গেলাস বা থলে গাছ বললে বোধ হয় আরও ভালো হয়। এই গাছের পাতাগুলি দেখতে অনেকটা কলসী বা গেলাসের মত, থলের মতও বলতে পার। আরে সেই কলসী বা গেলাস বা থলের ওপর চমৎকার সুদৃশ্য একটা ঢাকনি বসানো। রসের গন্ধে বা

রঙের মোহে ভুলে যদি কোন পোকামাকড় একবারটি ওর ওপরে এসে বসে, তা হ'লেই হ'ল। অমনি সে পিছলে ঐ কলসী বা গেলাস বা থলের ভিতর পড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ওপর-কার ঢাকনিটাও যাবে বন্ধ হয়ে। অর্থাৎ তখন আর সে পোকাটির ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসবার কোনও উপায় নেই। তার পর? তারপর আর কি, সেই রাক্ষুসে গাছ তখন সেই বন্দী পোকাকে ধীরে ধীরে শুষে শুষে হজম করে ফেলবে, পোকার শরীরের সারাংশ নিয়ে নিজের দেহ পুষ্ট করবে। এই গাছের পুরোনো পাতা চিরলে ঐ সব মরা পোকা-মাকড়ের ডানা বা পালক হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়।

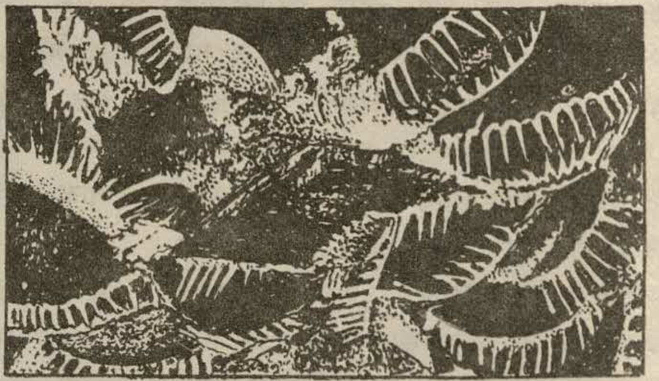
ইঁদুর মারবার জন্য জাঁতিকল দেখেছ নিশ্চয়ই? কলের দু'ধারে করাতের মত ধারাল দাঁত, ভিতরে স্প্রিংএর সঙ্গে যোড়া একটা বসবার আসন। সেই আসনে খাবার রেখে দেওয়া হয়। খাবারের লোভে ইঁদুর এসে সেই আসনে উঠে বসলেই, আর কথাটি নেই, সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিংএ টান পড়বে আর খটাং করে দু'দিক্ থেকে করাতের দাঁত এসে ইঁদুরকে চেপে ধরবে। এক রকম গাছ আছে যাদের চেহারাও অনেকটা ঐ রকম জাঁতিকলের মত। এদেরও পাতার দু'ধারে করাতের মত দাঁত বসানো। কোন পোকা যদি দৈবাৎ সেই পাতার ওপর এসে বসে, অমনি ঐ পাতা স্প্রিংএর মত সজোরে দুমড়ে গিয়ে সেই পোকাকে তার কাঁটার জাঁতিকলে পিষে ধরবে। তার পর তাকে হজম করতে আর কতক্ষণ? ইংরেজীতে এই গাছের নাম ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ্।

এ রকম মাংসাশী গাছকে বিজ্ঞানীরা বলেন পতঙ্গভুক্ গাছ—অর্থাৎ যে গাছ পতঙ্গ ধরে খায়। সান্-ডিউ (সূর্য-শিশির) এ রকম আর একটি গাছ। এগুলি দেখতে টকটকে লাল, পাহাড়ী অঞ্চলেই এদের বেশি দেখা যায়। এদের পাতাগুলি লম্বা লম্বা শুঁয়োয় ভরা, তা দিয়ে এক রকম আঠাল রস বেরিয়ে আসে। কোন পোকা রঙে ভুলে বা রসের লোভে একবার তার ওপর এসে বসলেই হ'ল, অমনি সেই আঠায় তার পা জড়িয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে বাকি শুঁয়োগুলো ধীরে ধীরে সরে এসে তাকে চেপে ধরবে। সেই রাক্ষুসে আলিঙ্গনের হাত



নেপেন্থাস বা কলসী গাছ: এরা জ্যান্ত পোকামাকড় ধরে খায়।

থেকে নিস্তার পাবার আর কোন উপায় নেই।



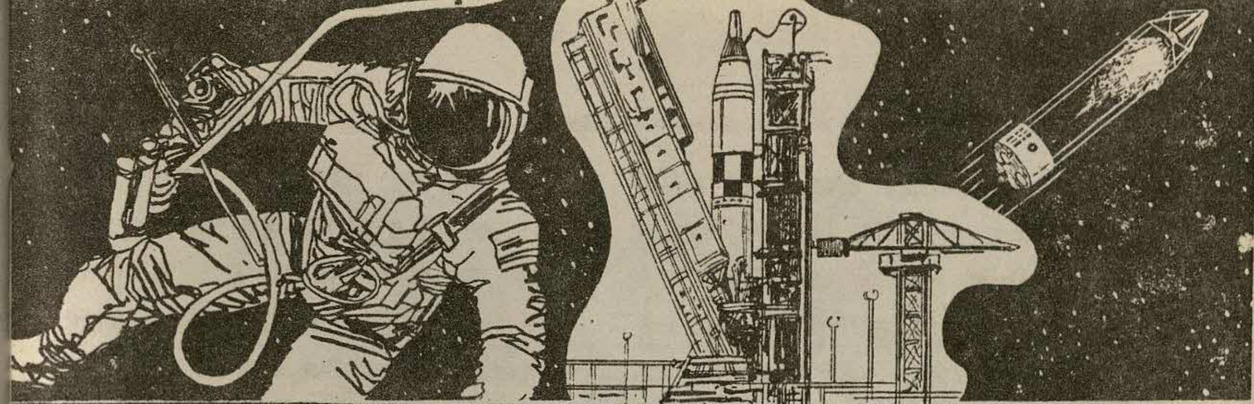
ভেনাস্ ফ্লাইট্র্যাপ দেখতে অনেকটা জাঁতিকলের মত। কোন পোকামাকড় এর ভেতরে এসে বসলে তার আর রক্ষা নেই।

পুকুরে, নালায় আর এক রকম মাংসাশী গাছ দেখা যায়। তাদের শরীরের খানিকটা অংশ জলে ডুবে থাকে আর সারা শরীরে ছড়ানো থাকে ছোট্ট ছোট্ট গোল গোল থলি। প্রত্যেকটি থলির মুখে একটা করে দরজা। কোন জলের পোকা ভাসতে ভাসতে একবার সেই দরজায় পৌঁছলেই ঠেলো লেগে দরজা খুলে যায় আর পোকা গিয়ে পড়ে থলির মাঝখানে। দরজা আবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়, ভিতর থেকে তা আর খোলার উপায় নেই। বন্দী পোকার কি হাল হয় তা তো বুঝতেই পারছ। ঝাঁঝি গাছও এই রকম ধরনের জলজ মাংসাশী গাছ।

ভাগ্যিস এ সব গাছ পোকামাকড়ের চাইতে বড় জীবকে আক্রমণ করে না, তাই রক্ষা। অবশ্য সেকালকার কোন কোন ভ্রমণকারী বলেছেন যে আফ্রিকায় নাকি তাঁরা এমন গাছও দেখেছেন যারা বড় বড় পাখী, হরিণ, এমনি কি বাগে পেলে মানুষ ধরে খেতেও ছাড়ে না। তবে মনে হয় সেগুলি নেহাৎই গালগল্প। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত সে রকম কোন গাছের সন্ধান পান নি, তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসও করেন না।



আর এক জাতের পতঙ্গভুক্ গাছ। এদের আঠাল শুঁয়োগুলো পোকামাকড়ের কাছে সাক্ষাৎ যম।



মহাশূন্যের পথে

চাঁদে মানুষ নামল : পর পর ছ'বার

মানুষের চন্দ্রবিজয়ের কাহিনী মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার মহাকাশযাত্রী আর্মস্ট্রং কি ভাবে প্রথম চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে এসেছেন সে কাহিনী আমরা আগেই শুনিয়েছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড ; পৃঃ ৯৫৩)। তার পর একে একে আরও পাঁচবার, অর্থাৎ সবশুদ্ধ ছ'বার মানুষ চাঁদের বুকে নেমে, ঘুরে বেড়িয়ে, আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। যে মহাকাশ-জাহাজগুলি এ কাজ হাসিল করেছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাপোলো। অ্যাপোলো-১১, অ্যাপোলো-১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭। অ্যাপোলো-১৩র অভিযাত্রীরা চাঁদে নামতে পারেন নি, যন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ায় তিন-চতুর্থাংশ পথ পেরিয়ে গিয়েও তাঁদের ফিরে আসতে হয়েছে। তবে অক্ষত দেহে এই ফিরে আসার ব্যাপারেও তাঁরা কম বাহাদুরী দেখান নি। অ্যাপোলো-১৭র অভিযানই এই পর্বের শেষ অভিযান। এটির পর আপাততঃ আর চাঁদে নামা হবে না বলে ঠিক হয়েছে। এখন চলবে চাঁদ-থেকে-নিয়ে-আসা নানা তথ্য আর নমুনা নিয়ে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

এই সব অভিযানের প্রথম দু'টির কথা ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ডে বলা হয়েছে, বাকিগুলির কথাও সংক্ষেপে বলব। কিন্তু তার আগে শোন লুনোখোদের গল্প।

লুনোখোদ

লুনোখোদ ? নামটা বেশ নতুন নতুন লাগছে, তাই না ? নতুন তো লাগবেই। ওটি যে একটি রাশিয়ান্ শব্দ, তাও আবার নতুন করে বানানো। 'লুনো' শুনে চাঁদের সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক হয়তো আছে আন্দাজ করা যায়, কারণ ইংরেজীতে লুনার বলতেও চাঁদের বিশেষণ "চন্দ্রীয়" বা "চান্দ্রিক' শব্দটি বোঝায়। সত্যিই তাই। লুনোখোদ হচ্ছে চাঁদে চালাবার গাড়ী। রুশরা ওকে বলেছেন "রোবোট্ শ্যাসি"। যান্ত্রিক বা নকল মানুষকে বলা হয় রোবোট্, আর রুশ ভাষায় শ্যাসি বলতে মোটর গাড়ী, ট্রাক্ ইত্যাদির কাঠামো বোঝায়। তা হলে লুনোখোদ হ'ল চাঁদের বুকে চালাবার যান্ত্রিক—অর্থাৎ মানুষের সাহায্য ছাড়াও যা আপনি চলে—এ রকম গাড়ী।

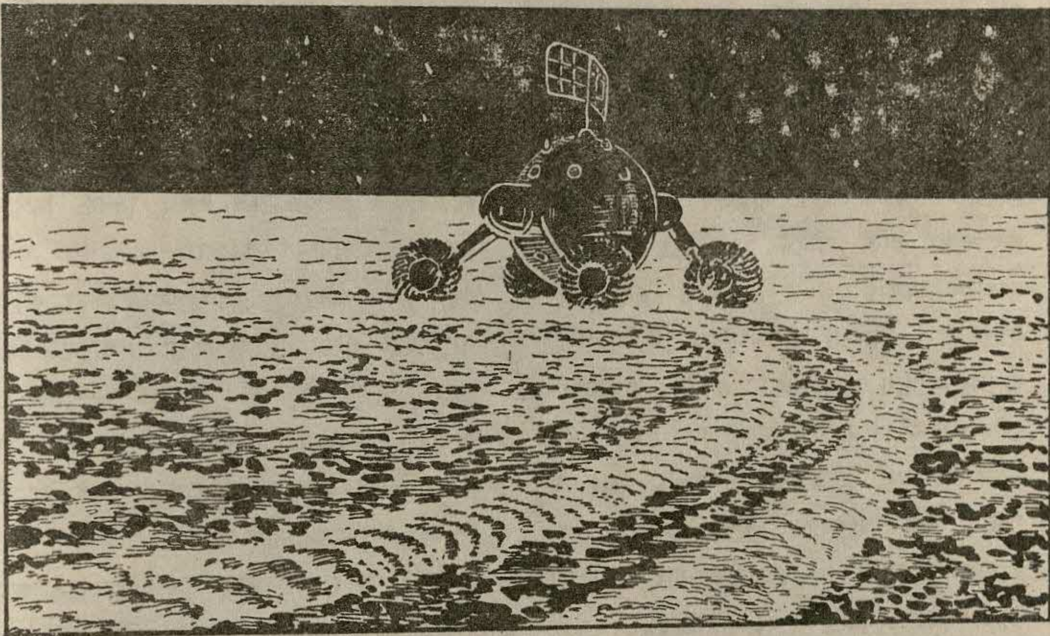
রুশ মহাকাশযাত্রীরা এখনও কেউ সশরীরে চাঁদে নামতে পারেন নি, কিন্তু রুশ বিজ্ঞানীরা অদ্ভুত কৌশলে পৃথিবীতে বসেই চাঁদের বুকে মহাকাশ-জাহাজ নামিয়ে দিয়েছেন, আবার তা ফিরিয়েও এনেছেন। এই জাহাজের নাম তাঁরা দিয়েছেন "লুনা"। অর্থাৎ লুনা প্রায় অ্যাপোলোরই স্বগোত্র। তবে অ্যাপোলোর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছেন মহাকাশযাত্রীরাই এবং ঐ জাহাজে বসেই তা করতে হয়েছে। লুনার গতিবিধি কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করেছেন রুশ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ওপর বসেই, কম্পিউটার ও বেতার যন্ত্রের সাহায্যে। এদিক্ দিয়ে রুশ বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব কিছুটা বেশিই বলতে হবে।

রুশ মহাকাশ-জাহাজ লুনা-১৭র মধ্যে ভরে পাঠানো হয়েছিল লুনোখোদকে। প্রথম যে লুনোখোদটি পাঠানো হয় তার নাম লুনোখোদ-১। তার কথাই বলি। লুনা-১৭ চাঁদের বুকে নামতেই আট চাকার এই গাড়ীটি তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীতে-বসা বিজ্ঞানীদের নির্দেশ মত চাঁদের বুকে চলাফেরা শুরু করে দেয়। বলা বাহুল্য গাড়ীটি খালি ছিল না, ওর মধ্যে ছিল সোভিয়েৎ ইউনিয়নের একটি পতাকা, লেনিনের একখানা ছবি, টেলিভিশন ক্যামেরা ও নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। অনেক ভেবে-চিন্তে, অনেক মাথা খাটিয়ে গাড়ীটি তৈরি করা হয়েছিল, কারণ ওর ওপর ছিল রকমারি কাজের ভার। যেমন, চাঁদের বুক থেকে মাটি-পাথর কুড়িয়ে তা বয়ে নিয়ে যাওয়া, নীচেকার মাটি পরীক্ষা করা, চাকার নীচে পাথরের চাঁই পড়লে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে নেওয়া, আর সেই সঙ্গে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি। শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়, আশপাশের ছবি তুলে টেলিভিশন যন্ত্রে তা পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবার ভারও ছিল ঐ নিষ্প্রাণ গাড়ীটিরই ওপর।

লুনোখোদকে চালাবার শক্তি সংগ্রহ করা হয়েছিল সূর্যের আলো থেকে—সৌরশক্তির সাহায্যে। চাঁদে ১৪ দিন ধরে একটানা দিন, ১৪ দিন ধরে একটানা রাত। রাতে তো আর তাপ আটকে রাখার জন্য সেখানে বাতাস নেই, তাই রাত হ'লেই চাঁদ তার তাপ হারিয়ে ফেলে হিমশীতল হয়ে যায়। হিমশীতল নয়,—তার চেয়েও অনেক ঠাণ্ডা। তাই সৌর ব্যাটারিও তখন অচল। তাই লুনোখোদও যাতে একটানা ১৪ দিন ঘুরে বেড়িয়ে আবার ১৪ দিন পুরো বিশ্রাম নিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

চাঁদে তৃতীয় অভিযান

চাঁদের বুকে মানুষের তৃতীয় অভিযান শুরু হয় ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৭১। এবারকার অধিনায়ক ছিলেন অ্যালান শেপার্ড, তাঁর সঙ্গে ছিলেন এডগার মিচেল। এঁরা দু'জনেই চাঁদে নেমেছিলেন আর চাঁদের চারদিকে মূল মহাকাশ-জাহাজখানা চালিয়ে রাখার ভার ছিল স্টুয়ার্ট রুসার ওপর। এর আগে মানুষ যে দু'বার চাঁদে নেমেছিল তার দু'বারই তারা নেমেছিল মোটামুটি সমতল জায়গা বেছে নিয়ে। কিন্তু এবার ওঁরা নামলেন চাঁদের পার্বত্য অঞ্চল ফ্রা মরোতে। এত জায়গা থাকতে ফ্রা মরো বেছে নেবার কারণ? বিজ্ঞানীদের ধারণা ওখানকার পাথরই সম্ভবতঃ চাঁদের সবচেয়ে পুরোনো পাথর—



শিল্পীর চোখে চাঁদের বুকে রোবোট্ গাড়ী লুনোখোদ। গাড়ীর চাকার দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

অন্তত পক্ষে ৪৫০ কোটি বছরের কম নয় ওর বয়স। বিজ্ঞানীদের অনুমান—বহু কোটি বছর আগে চাঁদের সঙ্গে কোন উপগ্রহের ধাক্কা লেগে চাঁদের ভিতরটা অনেক ওলটপালট হয়ে যায়—চাঁদের গভীর অভ্যন্তর থেকে প্রচুর পাথর ছিটকে বেরিয়ে আসে এবং পৃথিবীর মত ওখানে জল-হাওয়ার উৎপাত না থাকায় সে পাথর অক্ষুণ্ণ অবস্থায় মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। ফ্রা মরো হচ্ছে ঐ রকম একটা জায়গা। এর আগের আগের বারের কুড়িয়ে-আনা পাথরগুলো অত পুরোনো নাও হতে পারে, কারণ চাঁদে অনবরত যে উল্কাপাত ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে তার অংশ বিশেষও ওর মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া ফ্রা মরোকে অবতরণস্থল হিসেবে বেছে নেবার আর একটা কারণ ছিল। এরই অনতিদূরে আছে একটা চারশ' ফুট উঁচু মৃত আগ্নেয়গিরি, যার বিরাট গহ্বর বা জ্বালামুখ (কোন্ ক্রেটার) প্রায় দেড়শ' ফুট গভীর। কাজেই সেই পাহাড়ে উঠে ঐ গহ্বর থেকে কিছু পাথর কুড়িয়ে আনতে পারলে সেটা হয়তো আদ্যিকালের চাঁদের খাঁটি পাথরই হবে।

এবারকার অভিযানে ঘোরাঘুরি অনেক বেশি হ'ল, বসানো হ'ল আরও নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, নুড়িপাথরও কুড়ানো হ'ল অনেক বেশি। কারণ ওঁরা সেগুলি বয়ে আনবার জন্য একটা হাতে-টানা রিকৃশ গোছের গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন। গাড়ীর অংশগুলো খোলাই ছিল, চাঁদে নেমে জোড়া লাগিয়ে রিকৃশ বানিয়ে নেওয়া হয়, আর তাইতে করে নুড়িপাথরগুলি টেনে আনা হয়। চাঁদের আকর্ষণী শক্তি কম বলে টানতে ওঁদের বেশি কষ্ট হয় নি, এক

হাতেই টানতে পারা গেছে এবং দু'জনে পালা করে টেনেছেন। সেই পাহাড়টায় কিন্তু তাঁরা সবটা উঠতে পারলেন না। পাহাড়টা ছিল এত খাড়াই আর এত দুর্গম যে সেটায় চড়তে গিয়ে তাঁদের প্রচুর পরিশ্রম হতে লাগল, হৃৎপিণ্ডের গতি মিনিটে ১৫০ হয়ে দাঁড়াল—সাধারণ অবস্থায় যা ৮৪ থেকে ৯০-এর বেশি থাকে না। অগত্যা কম্পিউটারে নির্দেশ দিয়ে তাঁদের নামিয়ে আনা হ'ল। গোটা অভিযানটা শেষ হ'ল ন' দিনে, তার মধ্যে ৩৩½ ঘণ্টা ওঁরা চাঁদে ছিলেন, হেঁটেছিলেন সবশুদ্ধ প্রায় ন' ঘণ্টা। এই অভিযানে ওঁদের পেছনে খরচ হয়েছিল চল্লিশ কোটি ডলার, অর্থাৎ আমাদের টাকার হিসেবে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা।

চাঁদে চতুর্থ অভিযান

চতুর্থ অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন ডেভিড স্কট্ আর তাঁর সঙ্গে চাঁদে নেমেছিলেন আর-উইন। মূল জাহাজে বসে ছিলেন ওয়ার্ডেন।

এবারে ওঁদের সঙ্গে ছিল একটা মোটর গাড়ী। এই প্রথম। ফলে ওঁরা অনেক বেশি ঘুরে বেড়িয়েছেন, যদিও চাঁদের এবড়োখেবড়ো পাথুরে বুকের ওপর সে গাড়ী ঘন্টায় আট মাইলের বেশি জোরে চালানো সম্ভব হয় নি। রাস্তাঘাটের বালাই নেই তো ওখানে! তা ছাড়া এবার ওঁরা নেমেছিলেন আগের চাইতেও দুর্গম জায়গায়,—১৫ হাজার ফুট উঁচু অ্যাপেনাইন পাহাড়ের নীচে, যার ঠিক পাশেই রয়েছে হ্যাডলি রিলির ১২ হাজার ফুট গভীর খাদ। কাজেই জায়গাটা যে বেশ বিপজ্জনক তাতে সন্দেহ কি?

মোটর গাড়ীটির নাম দেওয়া হয়েছিল "মুন্ রোভার"। মুন্ রোভারকে চালানো হয়েছিল বৈদ্যুতিক ব্যাটারি দিয়ে। চাঁদের মাটিতে চালাবার জন্য ১ কোটি ২৯ লক্ষ ডলার (প্রায় ৯ কোটি টাকা) খরচ করে গাড়ীটি তৈরি করা হয়েছিল। গাড়ীটি কিন্তু প্রথম দিনই বিগড়ে গিয়েছিল, সামনের চাকাতে ব্যাটারি কাজ করে নি। অগত্যা কেবল পেছনের চাকা দু'টির সাহায্যেই গাড়ী কোন রকমে চালানো হয়। পরে অবশ্য পৃথিবী থেকে কম্পিউটারের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিয়ে দেন কি করলে সামনের চাকাও চলবে। সেই ভাবেই সে চাকা সারিয়ে নেওয়া হয়।

স্কট্ আর আরউইন্ মুন্ রোভারে চড়ে চাঁদের বুকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার অর্থাৎ ১৬ মাইলেরও বেশি ঘুরেছেন। অবশ্য ২।১ বার তাঁদেরকে বেশ বিপদেও পড়তে হয়েছিল। একটা টেলিভিশন-ক্যামেরা মুন্ রোভারের ওপর বসিয়ে দিয়ে নানা দিকে ঘোরানো হয়েছিল সেটা। অবশ্য ক্যামেরাটা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল পৃথিবী থেকেই। ফলে চাঁদের নানা দৃশ্য পৃথিবী থেকে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছিল। ফিরবার সময় আবার ওয়ার্ডেন চাঁদের আকাশে খানিকক্ষণ সাঁৎরেও ছিলেন চাঁদের ভেলায় ফেলে-আসা ছবি তোলার সরঞ্জাম উদ্ধার করার জন্য। তা ছাড়া ওঁরা ৩৬ কিলোগ্রাম ওজনের একটি কৃত্রিম উপগ্রহও চাঁদের কক্ষপথে ছেড়ে দিয়ে আসেন ফিরবার পথে।

আরও একবার: পঞ্চম অভিযান

এর পর ৫ম অভিযান। এবারে অধিনায়ক জন্ ইয়ং, সহযাত্রী চাল্‌র্স্ ডিউক। মহাকাশ-



শেষবারের চন্দ্র-অভিযানের আগে অধিনায়ক কারনান্ তাঁর স্পেস্ স্যুটের কাঠামো গায়ে দিয়ে দেখছেন ঠিক হয়েছে কিনা। এই কাঠামোর ওপর ঢাকনা লাগিয়ে স্যুটটি তৈরি করা হবে।

—প্রায় আট রকমের। এদের মধ্যে বিভিন্ন জাতের ব্যাক্‌টিরিয়া, এমন কি ভাইরাস জাতের অতি-সূক্ষ্ম জীবাণুও ছিল। উদ্দেশ্য, জীবন্ত প্রাণিদেহে,—আরও সঠিক ভাবে বললে প্রাণিকোষের ওপর মহাকাশের তেজস্ক্রিয় পবিবেশ কি রকম কাজ করে তাই পরীক্ষা করা। মহাকাশে রয়েছে প্রচুর কস্‌মিক্ রে—যাকে বাংলায় বলা হয় ব্যোমরশ্মি, আর তা সারাক্ষণই মহাকাশের গায়ে ঝরে পড়ছে। এই রশ্মিগুলো তেজস্ক্রিয়, তাই নিয়েই পরীক্ষা। ফিরবার পথে ম্যাটিংলি একবার মূল জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে মহাশূন্যে ভাসতে থাকেন আর একটা খোলা ট্রের ওপর অনেকগুলো জীবাণু রেখে সেটা ধ'রে রাখেন দশ মিনিট ধরে, যাতে তার ওপর কস্‌মিক্ রে অবিরল ধারায় ঝরে পড়তে পারে। সেগুলো তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন এবং জীব-বিজ্ঞানীরা ওর ফলাফল পরীক্ষা করে দেখেছেন। শুধু জীবাণুই নয়, মহাকাশ-যাত্রীরা এবার সঙ্গে আরও কিছু সজীব পদার্থ—যেমন ফলের বীজ, স্পোর বা বীজের গুটি এবং চিংড়ি জাতীয় কতকগুলি পোকার ডিমও নিয়ে গিয়েছিলেন। চাঁদের রাজ্য থেকে ঘুরে এসে তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

জাহাজ চালিয়ে রাখার ভার ছিল টমাস্ ম্যাটিংলির ওপর। এবারেও ওঁরা একটা জীপ্ গাড়ী গোছের গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন আর নেমেছিলেন চাঁদের আগ্নেয়গিরিসঙ্কুল মালভূমি ডেকার্টে অঞ্চলে। এবার ওখানে যে সব যন্ত্র বসানো হ'ল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে চাঁদের বুকে বসে আল্‌ট্রা ভায়োলেট বা অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যে ফোটো তুলতে পারে এমন একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা আর বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র। এবারে ওঁরা ৭২ ঘন্টা অর্থাৎ আমাদের পুরো তিন দিন তিন রাত্রি চাঁদে কাটিয়ে এলেন। তার মধ্যে একদিন কাটিয়েছিলেন চাঁদের খোলা আকাশের নীচে, এক নাগাড়ে ৭ ঘন্টা ১২ মিনিট। পাথর সংগ্রহ করলেন ২৪৫ পাউণ্ড। এর চেয়েও উল্লেখযোগ্য, এবারকার অভিযাত্রীরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন বেশ কয়েক কোটি জীবাণু

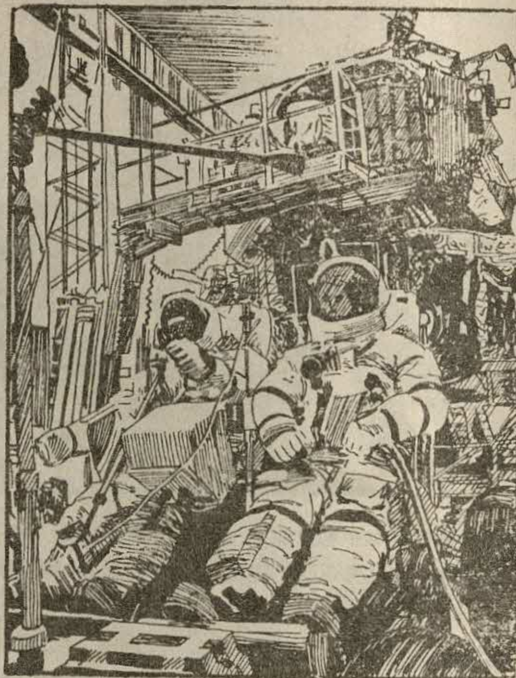
অ্যাপোলো-১৭ অভিযান শেষ করল

চাঁদে আপাততঃ শেষ অভিযান হয়ে গেছে

১৯৭২ সালের ডিসেম্বরের গোড়ায়। অ্যাপোলো-১৭র সেই স্মরণীয় অভিযান। এবারকার অধিনায়ক ছিলেন ইউজিন কারনান্, সঙ্গী ছিলেন হ্যারিসন শ্মিট্। চাঁদের চারদিকে মহাকাশ-জাহাজ চালাবার ভার ছিল রোনাল্ড ইভান্সের ওপর। শ্মিট্ হচ্ছেন ওদেশের একজন নামকরা ভূতাত্ত্বিক। অর্থাৎ এই প্রথম চন্দ্র অভিযানে একজন সত্যিকার বিজ্ঞানী যোগ দিলেন।

এবারকার অভিযান শুরু হয় রাতের অন্ধকারে যা এর আগে আর কোন দিন হয় নি। ফলে অ্যাপোলো-১৭ যখন কেপ্ কেনেডি থেকে ছুটে বেরুল তখন পৃথিবীর বিস্তীর্ণ জায়গা যুড়ে লোকেরা দেখতে পেল যেন একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আকাশপথে ছুটে চলেছে মহাশূন্যের দিকে। এবার চাঁদের ভেলা গিয়ে নামল ওখানকার টরাস লিট্রো অঞ্চলে, যে জায়গাটি নাকি বৈচিত্র্যে ভূতাত্ত্বিকদের কাছে একটি লোভনীয় স্থান। সত্যিই তাই, আর এবারকার অভিযানটিও হয়েছে বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিশেষতঃ এবার শ্মিটের মত একজন বিজ্ঞানী সঙ্গে থাকায় ভূবিজ্ঞানের দিক্ থেকেও এর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ।

অ্যাপোলো-১৭র অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে, আপাততঃ, চন্দ্রাভিযানের প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে। এখন বিজ্ঞানীদের কাজ চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন ল্যাবোরেটরীতে, এতদিন ধরে এত বারের অভিযানে সংগৃহীত নানা তথ্য আর নমুনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় ৮০০ বিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই এ কাজে লেগে গিয়েছেন। এর মধ্যে চারজন ভারতীয়



মহাকাশ-অভিযাত্রী কারনান্ ও শ্মিট্ মুন্ রোভারে চড়ে কি ভাবে চাঁদের বুকে ঘুরে বেড়াবেন তারই মহড়া দিচ্ছেন।

বিজ্ঞানীও আছেন। তাঁরা অবশ্য সবাই আমেরিকায় বসেই কাজ করছেন। যে রকেট দিয়ে অ্যাপোলো-১৭ মহাকাশ-জাহাজটি ছোঁড়া হয়েছিল (স্যাটার্ন্-৫) তার কাজ কিন্তু তখনও শেষ হয় নি। ১৯৭৩ সালের মে মাসে সেটি আর একবার ছোঁড়া হবে বলে রেখে দেওয়া হয়। আর সত্যিই, ৮৮৯০০ কিলোগ্রাম অর্থাৎ কিনা ১৯৬০০০ পাউণ্ড ওজনের একটি মহাকাশ-গবেষণাগারকে (স্কাইল্যাব) ৪৩৫ কিলোমিটার উঁচুতে পৃথিবীর কক্ষপথে বসিয়ে দিয়েছে সে। ২৮তলা বাড়ীর সমান উঁচু এই রকেটটি মহাকাশ-

যন্ত্রবিজ্ঞানের দিক্ থেকে একটি বিস্ময়। ৭৫ লক্ষ পাউণ্ডের চাপ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নিয়ে সেটি বিজ্ঞানীদের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে ছিল এবং শেষ পর্যন্ত সে নির্দেশ পালনও করেছে।

গ্রহান্তরে যাবার তোড়জোড়

এতক্ষণ আমরা চাঁদে অভিযানের কথাই বললাম, কিন্তু বিজ্ঞানীরা ওখানেই থেমে নেই। তাঁরা অন্যান্য গ্রহে অভিযানেরও চেষ্টা করছেন। পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে আছে শুক্রগ্রহ, কিন্তু সেখানকার যা অবস্থা তাতে মানুষের পক্ষে সেখানে গিয়ে নামা সম্ভব বলে মনে হয় না। মঙ্গল গ্রহে জাহাজ নামাবার কথা উঠেছে। মঙ্গলের দূরত্ব অবশ্য পৃথিবী থেকে সব সময় এক রকম থাকে না। মঙ্গল যখন আমাদের সবচেয়ে কাছে আসে তখন দূরত্ব দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৪০ মাইল। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত এই সুযোগ কিছুটা ছিল, তার মধ্যে না পারলে আবার অপেক্ষা করতে হবে ১৯৮৫ পর্যন্ত। অবশ্য সোভিয়েৎ বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন তার আগেই তাঁরা একটা ব্যবস্থা করে ফেলবেন। এ পর্যন্ত পৃথিবী থেকে পাঠানো একাধিক রকেট মঙ্গলের প্রায় গা ঘেঁষে ছুটে গিয়ে কিছু কিছু খবর যোগাড় করেছে, কিন্তু সব খবর নয়। এতদিন পর্যন্ত যে গতিবেগ মানুষের আয়ত্তে এসেছিল তাতে মঙ্গলে যেতে সময় লাগবার কথা এক বছর, আর তার বেশির ভাগ সময়ই অভিযাত্রীকে সম্পূর্ণ ভার-হীন অবস্থায় থাকতে হবে। তবে সম্প্রতি আরও দ্রুতগতি রকেট আবিষ্কৃত হয়েছে। তবুও বাধা আছে বিস্তর। মঙ্গলে পৌঁছবার মুখোমুখিও দেখা দেবে প্রচুর বাধা। চাঁদের চাইতে মঙ্গলের আকর্ষণী শক্তি অনেক বেশি, তাই কেউ কেউ বলছেন, সটান মঙ্গলে না গিয়ে প্রথমে মঙ্গলের দু'টি চাঁদের একটিতে (ফোবোয়) নেমে, ভালো করে দেখেশুনে নিয়ে, তবেই মঙ্গলে গিয়ে নামা নিরাপদ হবে। ফোবো মঙ্গল থেকে ৫৮০০ মাইল দূরত্ব রেখে ঘুরছে; তার ব্যাস কিন্তু মাত্র দশ মাইল।

শুক্রগ্রহে যেতে না পারলেও রুশ বিজ্ঞানীরা কিন্তু ইতিমধ্যেই (২২শে জুলাই, ১৯৭২) ভেনাস্-৮ নামে একটি আরোহীবিহীন মহাকাশ-জাহাজকে শুক্রের ঘন বায়ুমণ্ডলে নামিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে সেটি একটি যন্ত্রচালিত স্বয়ংক্রিয় ভেলাও নীচে নামিয়ে দিয়েছিল।

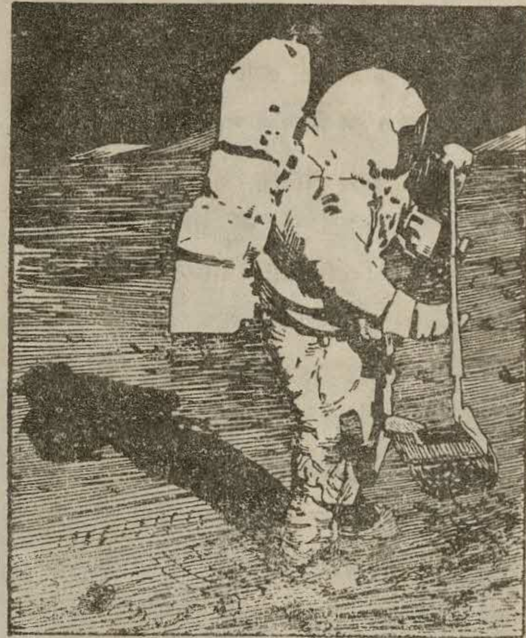


চাঁদের টরাস্ লিট্রো অঞ্চল। এইখানেই ৬ষ্ঠ অভিযানের মহাকাশযাত্রীরা নেমেছিলেন। যে সব পথ দিয়ে তাঁরা গাড়ী চালাবেন বলে ঠিক করা ছিল তারই নক্সা দেখানো হয়েছে ছবিতে দাগ কেটে কেটে।

বিশেষ ধরনের প্যারাসুটে বাঁধা এই ভেলা ধীর গতিতে ভাসতে ভাসতে শুক্রের বুকে নেমে গিয়ে সেখানকার নানা খবর হাতেনাতে পরীক্ষা করে পৃথিবীতে পাঠাতেও ছাড়ে নি। বিজ্ঞানীরা তাই নিয়ে এখনও জোর গবেষণা চালাচ্ছেন। ৩০ কোটি কিলোমিটার রাস্তা পার হয়ে ভেনাস্-৮এর শুক্রে পৌঁছতে সময় লেগেছিল ১১৭ দিন, কিন্তু শুক্রের বাতাসে পৌঁছবার ৫০ মিনিটের মধ্যেই ভেলা নামিয়ে কাজ হাসিল করা হয়েছিল।

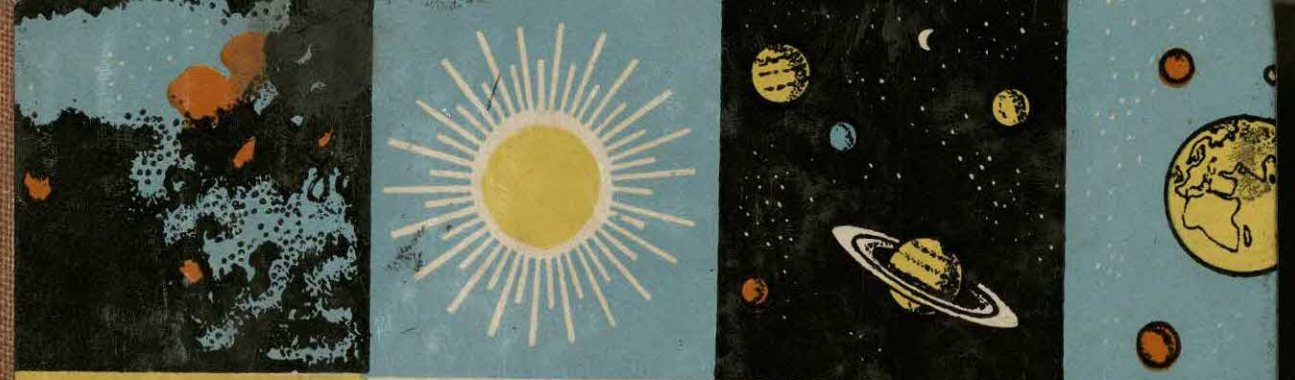
নক্ষত্রলোকের পথে

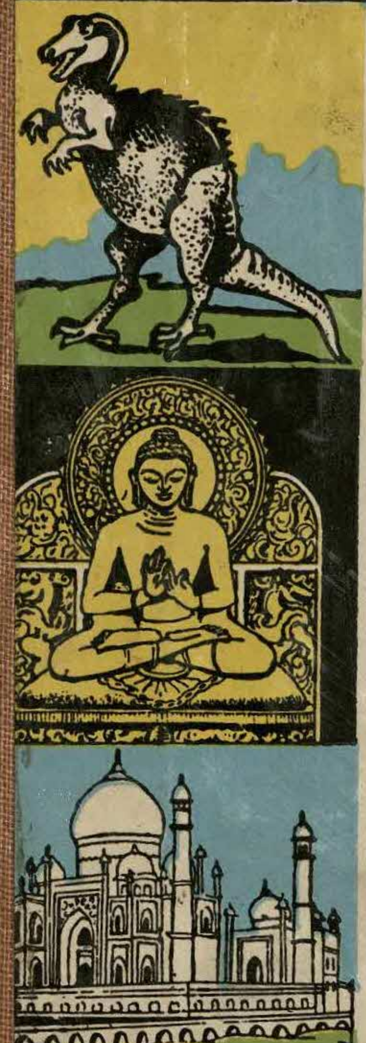
কিন্তু এতেই কি বিজ্ঞানীদের মন উঠতে পারে? নিশ্চয়ই না। তাই ইতিমধ্যে আমেরিকার কেপ্ কেনেডি থেকেও পাইওনীয়ার-১০ নামে একখানা মহাকাশ-জাহাজ ছুটে বেরিয়েছে সেকেণ্ডে ১০ মাইল গতিবেগ নিয়ে। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রহরাজ বৃহস্পতি সম্বন্ধে হাতে-কলমে নানা তথ্য সংগ্রহ, যদিও বৃহস্পতিতে গিয়েই সে থামে নি। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটোকেও ছাড়িয়ে গিয়ে সে নাকি পাড়ি দেবার চেষ্টা করবে সূর্যের রাজত্বের বাইরে। কারণ, ঐ গতিবেগে ছুটলে সূর্যের আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়াও তার পক্ষে কঠিন হবে না। এর আগে কোন মহাকাশ-জাহাজ এত বেগে মহাশূন্যের দিকে ছোটে নি। প্রথম দিনই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে চাঁদের রাজত্ব পার হয়ে গেছে; বৃহস্পতিতে পৌঁছতে তার লেগেছিল প্রায় ৯ মাস। অবশ্য এ ভাবে চললেও পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র আল্‌ফা সেন্টরাই আর তার প্রতিবেশী



চাঁদের বুকে ভূবিজ্ঞানী হ্যারিসন্ স্মিট্,—ইতস্ততঃ ছড়ানো নুড়িপাথর থেকে পছন্দসই পাথরগুলি যন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করতে ব্যস্ত।

প্রক্সিমা সেন্টরাই (দূরত্ব ৪.৩৩ আলোকবর্ষ) পৌঁছতে তার লাগবে ৮০৫৩৮০০ বছর। যদি সত্যি সে সেখানে পৌঁছতে পারে তা হলে ততদিনে পৃথিবীর অবস্থা কি হবে কে জানে? হয়তো তখন পৃথিবী থেকে মানুষই লোপ পেয়ে তার জায়গায় দেখা দেবে অন্য কোনও নতুন জীব। কারণ, পৃথিবীতে সত্যিকার মানুষের আবির্ভাব হয়েছে বড় জোর আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে। কাজেই সাড়ে আশি লক্ষ বছর পরের সেদিনের কথা এখন চিন্তা করে লাভ নেই।





ছোটদের বিশ্বকোষ

চতুর্থ খণ্ড



মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩

